জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা
লোককথার বিচার-বিশ্লেষণ

জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার-বিশ্লেষণ

অন্তরা মিত্র

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ২০০০

প্রকাশক :
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ :
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস :
প্রিন্ট ম্যাক্স
ইছাপুর, ২৪ পরগণা

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ
কলকাতা ৪

উৎসর্গ

আমার প্রণম্য

মা, বাবা

এবং

পিতৃতুল্য অধ্যাপক

ডঃ মানস মজুমদারকে

পরিচায়িকা

বাংলার লোককথার ভাণ্ডারটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হতে হয়। লোককথার সব রকমের দৃষ্টান্তই রয়েছে তাতে। রূপকথা, পশুপাখিকথা, ব্রতকথা, বীরকথা, সাধুসন্তকথা, পুরাকথা বা সৃষ্টিকথা, নীতিকথা, কিংবদন্তী, বোকার গল্প, চালাকের গল্প, হাসির গল্প, ভূতের গল্প কী যে নেই সে ভাণ্ডারে!

স্বভাবতই বাংলার লোকসাহিত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা বা গবেষণায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই লোককথার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। সে সমস্ত আলোচনা-গবেষণায় প্রধানত রূপকথা, পশুপাখিকথা, ব্রতকথা আর পুরাকথা গুরুত্ব পেয়েছে। কথা-বৃক্ষের অন্য শাখাগুলির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি তেমন পড়ে নি।

সৌভাগ্যের বিষয়, অধ্যাপিকা ড. অন্তরা মিত্র 'জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলা লোককথার বিচার-বিশ্লেষণ' নামে যে গবেষণা গ্রন্থটি লিখেছেন তাতে বাংলার লোককথার কোনও দিকই উপেক্ষিত থাকে নি। ফলে তাঁর আলোচনায় ব্যাপ্তি এসেছে, এসেছে বৈচিত্র্য।

লোককথার বিচার-বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। তুলনামূলক, জাতীয়তাবাদী, নৃতত্ত্বমূলক, মনঃসমীক্ষণমূলক, ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী, অবয়ববাদী, রূপতাত্ত্বিক, মোটিফ-মোটিফেম আশ্রয়ী ইত্যাদি পদ্ধতি তার উদাহরণ। অধ্যাপিকা মিত্র জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিটি নির্বাচন করেছেন। একসময় এ পদ্ধতিটি বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফোকলোর-চর্চায় ফোকলোরবিদেরা এ পদ্ধতির ব্যাপক সাহায্য নিয়েছিলেন। ফোকলোর চর্চার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা আয়ার্ল্যান্ড, জার্মানী, জাপান, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির অনুশীলন প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছেন। ড. মিত্র তাঁর গ্রন্থে সে ইতিহাসটি সংক্ষেপে কিন্তু আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করেছেন।

জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি আমাদের ঘরমুখী করে। একটি জাতির অন্তর স্বরূপ উদ্ঘাটনে এ পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় জীবনের নানামুখী পরিচয় এ পদ্ধতির চর্চায় উদ্ঘাটিত হয়। সামাজিক স্তর-বিন্যাস, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক, নারীর ভূমিকা, আর্থিক কাঠামো, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রণালী, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথাবৈচিত্র্য, আচার-অনুষ্ঠান, চিকিৎসাপদ্ধতি, ধর্মবোধ, ক্রীড়াবৈচিত্র্য, প্রতিবাদী চেতনা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা সজাগ ও সচেতন হই। জাতির শক্তিসামর্থ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এর গুরুত্ব অস্বীকার করে লাভ নেই। কেউ কেউ জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিকে সঙ্কীর্ণতা-দুষ্ট বলে মনে করেন। একথা ঠিক, অন্যান্য পদ্ধতি আমাদের বিশ্ব-অভিমুখী করে তোলে। প্রশ্ন হলো, নিজের

জাতিসত্তার পরিচয় গ্রহণ করা কি অপরাধ? অন্ধ জাতীয়তাবাদ নিন্দনীয় হতে পারে। হিটলারের জার্মানীতে যেমনটি হয়েছিল। কিন্তু নিছক জাতীয় জীবনের স্বরূপ-অন্বেষণ কি নিন্দার্হ? অধ্যাপিকা মিত্রের গ্রন্থ পড়ে তাতো আমার মনে হলো না। বরং বাঙালির জাতীয় জীবনের হাল হকিকত স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বাংলায় দেশি-বিদেশি মিশনারি সম্প্রদায় এবং ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ, যথা—কেরি, মর্টন, লঙ, ডামন্ট, লালবিহারী, রিজলে, গ্রিয়ারসন প্রমুখ ফোকলোর নিয়ে যে চর্চা শুরু করেছিলেন তা বস্তুতপক্ষে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, দক্ষিণারঞ্জন, দীনেশচন্দ্র, গুরুসদয় প্রমুখ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির প্রচেষ্টায় তা আরও ব্যাপকতা পায়। এঁরা কিন্তু অন্ধ জাতীয়তাবাদের ভক্ত ছিলেন না। এঁরা চেয়েছিলেন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে, আত্মবিশ্বাসী করতে। সে যাই হোক, ড. মিত্র সেই আন্দোলনের অগ্রগতির ইতিহাসটি যথাযথভাবে নির্দেশ করেছেন। সেজন্যে তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতেই হয়।

·উপসংহার ছাড়া ৬টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে লোককথা-পরিচিতিতে শ্রীমতী মিত্র লোককথার স্বরূপবৈশিষ্ট্য-আলোচনায় লোককথা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহী করে তোলেন। কথকের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, মর্জি-মেজাজ কীভাবে লোককথাকে প্রভাবিত করে সে আলোচনাও কৌতূহলোদ্দীপক। লোককথার অবয়বগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা স্বচ্ছ। বাংলা ভাষায় লোককথার প্রতিশব্দ যে নানাবিধ তাও তিনি জানিয়ে দেন। এমনটি আর কোনও দেশের ভাষায় আছে বলে আমাদের জানা নেই। লোককথার নায়ক-নায়িকা চরিত্র, সহযোগী চরিত্র, প্রতিযোগী চরিত্র, খল চরিত্র প্রভৃতির আলোচনাতেও তিনি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। বাংলা লোককথার আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তিনি চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি হলো : রূপ-বর্ণনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা চিত্রণ, যুদ্ধ-বর্ণনা, সৌন্দর্যচিত্র, আপ্যায়ন ও প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গি, শব্দ-প্রয়োগ, অলঙ্কার-সন্নিবেশ, হাস্যরস-পরিবেশন। বাংলা লোককথার শ্রেণিবিভাগের ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক। প্রতিটি শ্রেণির স্বরূপ-লক্ষণ তিনি সযত্নে নির্দেশ করেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন। বিশেষত, ক্রমপুঞ্জিত লোককথাঁর যে অনুপুঙ্খ আলোচনা তিনি করেছেন, এককথায় তা অসাধারণ। ক্রমপুঞ্জিত লোককথা সম্পর্কে এমন যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ তাঁর আগে কেউ করেন নি। না এ বাংলাতে, না ও বাংলাতে। সেদিক থেকে তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির যে ইতিহাস অধ্যাপিকা মিত্র উদ্ধার করেছেন তাতে তাঁর তথ্যনিষ্ঠা আর বিশ্লেষণী শক্তির প্রমাণ পাই। এ অধ্যায়টি লিখতে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা লোককথায় সমাজজীবনের যে সমস্ত উপাদান তিনি সংগ্রহ

ও সন্নিবেশ করেছেন সেগুলির প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করে। ড. মিত্র যেন এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছেন। এ পর্যন্ত কোনও আলোচক যা করেন নি, তিনি তাই করেছেন। তাঁর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা সম্ভ্রম জাগায়। লোককথার সহায়তায় বাঙালি সমাজে বর্ণভেদের দিকটি তিনি পরিস্ফুট করেছেন। অভিজাত ও অনভিজাত জীবনের চলমান রূপটি তাঁর আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালির পারিবারিক জীবনে স্নেহ-প্রেম, মাতৃত্ব, বাৎসল্য, সতীত্ব আর বন্ধুত্বের যে বহুবিচিত্র বহিঃপ্রকাশ ড. মিত্র অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সেগুলির পর্যালোচনা করেছেন। বাঙালি জীবনের বহুবিধ বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা, আচার-আচরণ তাঁকে কৌতূহলী করেছে। শিক্ষা প্রণালী, শাসন ও চিকিৎসাপদ্ধতি, ক্রীড়ানুষ্ঠান, গোষ্ঠীবদ্ধ, ধর্মীয় বিভেদ বিদ্বেষ, প্রতিবাদী মানসিকতা ইত্যাদি বাদ যায় যায় নি। বাঙালি সমাজে নারীর স্থানটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কুলপ্রতীক (Totem) ও নিষেধবিধি (Tabu) সম্পর্কিত আলোচনাটিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মূল্যবানও।

চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক অবস্থা চিত্রণে ড. মিত্রের পরিশ্রমের চিহ্ন পাওয়া যায়। বনজ সম্পদ, শিকার, পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ব্যবস্থা, ক্রয়-বিক্রয় রীতি, শিল্প সম্ভার, জীবিকা বৈচিত্র্য, সম্পদ সংরক্ষণ ও সম্পদ বন্টন, দ্রব্যমূল্য, বেতন ও পারিশ্রমিক, কর-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ মনোযোগের দাবি রাখে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবদান সম্পর্কে তাঁর পর্যালোচনাও প্রশংসাযোগ্য। তারিফযোগ্য অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনাটি। বস্তুতপক্ষে বাংলার লোককথার অন্দরমহল থেকে অর্থনীতি সম্পৃক্ত যেসব তথ্য তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন সেগুলির মূল্য তাঁরাই বুঝবেন, যাঁরা প্রকৃত সমঝদার।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'রাজ-প্রসঙ্গ'। অধ্যাপিকা মিত্র সচেষ্ট না হলে রাজ-মহিমার বিভিন্ন দিক আমাদের অগোচরে থেকে যেত। এ অধ্যায়টি তাই গুরুত্বপূর্ণ। রাজ-চরিত্র-ব্যাখ্যায় কুশলী তিনি। রাজকীয় জীবনচর্যা-পর্যবেক্ষণে তাঁর নৈপুণ্য বিস্ময়কর। রাজা-প্রজার সম্পর্ক চিত্রণে তাঁর সাফল্য তর্কাতীত। রাজ্য শাসন নীতির স্বরূপ কথনে তিনি দক্ষ কথক।

ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থানকে ঘিরে নানা ধরনের গল্প কাহিনী বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত। এগুলি থেকে অধ্যাপিকা মিত্র ইতিহাসের প্রকৃত সত্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়েছেন ষষ্ঠ অধ্যায়ে। লোককথায় ইতিহাসের উপাদান অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর এ প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল। আমাদের জাতীয় জীবনের নিগূঢ় বহু রহস্য এ গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাংলার লোককথার বিপুল সম্পদকে এ কাজে পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন ড. মিত্র। মনে হয়,

এ বিষয়টি যেন তাঁরই জন্যে তোলা ছিল। তিনি সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কিন্তু তাই সব নয়। লোককথার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ স্বরূপ নির্ণয়েও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বিস্ময়কর তাঁর অধ্যয়ন প্রাচুর্য। ফোকলোর সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ তিনি যেমন পাঠ করেছেন, তেমনি ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিদ্যার সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে তাও বোঝা যায়। স্বভাবতই তাঁর আলোচনা এতে ব্যাপ্তি পেয়েছে। আলোচনার প্রতি পদক্ষেপেই তিনি তথ্যনিষ্ঠ। অনুমানে তাঁর আগ্রহ নেই, প্রমাণেই তৃপ্ত তিনি।

ড. অন্তরা মিত্র যুক্তিনিষ্ঠ মনের অধিকারিণী। দৃষ্টি অত্যন্ত স্বচ্ছ। আবার রসবোধেও খামতি নেই। তাই আলোচনায় এসেছে উপভোগ্যতা। গ্রন্থটি নিছক শুষ্ক নীরস গবেষণা কর্ম হয়ে ওঠে নি। সুখপাঠ্য গ্রন্থের মান্যতা পেয়েছে।

গ্রন্থটি আমাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়। অধ্যাপিকা মিত্র লোককথাচর্চার অন্যান্য পদ্ধতি আশ্রয়ে ভবিষ্যতে বাংলা লোককথার বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে আমরা উপকৃত হই। তাঁর পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব। তাঁর যোগ্যতা তর্কাতীত। তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই।

মানস মজুমদার

নিবেদন

আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে না। সীমিত পরিসরে সমস্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় আমরা অপারগ। তাই নির্বাচন করেছি একটি পদ্ধতি-জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটির সাহায্যে বাংলা লোককথাগুলির সমীক্ষায় ব্রতী হয়েছি।

এই গ্রন্থটি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরিমার্জিত রূপ। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লোককথার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত। প্রসঙ্গত, বাংলা লোককথার বিভিন্ন শাখারও পরিচিতি দান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত এবং বিভিন্ন দেশে এ পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস বিবৃত।

লোককথায় প্রাপ্ত সমাজজীবনের বহু বিচিত্র তথ্যাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমবিবর্তিত রূপটি প্রকাশিত। আর্থিক উন্নতি ও বিপর্যয়ের গতিপ্রকৃতিও চিহ্নিত।

পঞ্চম অধ্যায়ে রাজবৃত্ত বর্ণন। রাজাপ্রজার সম্পর্ক, রাজ্যশাসন, দণ্ডবিধান, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ইত্যাদি নানাপ্রসঙ্গ সন্নিবেশিত।

বাংলা লোককথায় প্রাপ্ত ঐতিহাসিক অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। লোকমননের নবনিরীক্ষায় ঐতিহাসিক স্থান-কাল-পাত্র ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। তেমনি বিভিন্ন যুগের শাসন শোষণ সংগ্রাম ত্যাগে বাঙালি মানস কতখানি আলোড়িত সে ইঙ্গিতও প্রকাশিত।

সপ্তম অধ্যায় : উপসংহার। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলির সমীক্ষা। লোকসাহিত্য গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতিগুলিও এই তথ্যাবলীর সাহায্যে কিভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে তার ইঙ্গিত দান।

গ্রন্থ-রচনার যাবতীয় দোষ ত্রুটির দায় আমারই। কিন্তু, গবেষণা-কর্মের প্রতি পদক্ষেপেই, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বহু ব্যক্তিত্বের কাছেই আমি ঋণী। পূজনীয় তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক ডঃ মানস মজুমদার তথ্যাবলী সংগ্রহে সাহায্য করেছেন, তাঁর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে মূল্যবান পরামর্শদানে ঋদ্ধ করেছেন, প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে কাজটি ত্বরান্বিত করেছেন। শেষ মুহূর্তে একটি মূল্যবান 'পরিচায়িকা' লিখে বইটির মর্যাদা বাড়িয়েছেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার মা আর বাবার স্নেহ, আশীর্বাদ আমাকে আগাগোড়া সাহস আর উৎসাহ জুগিয়েছে, আমি ধন্য। আর ঋণী শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষ এবং শ্রীঅনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্যসংগ্রহে এঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি। দুজনেই আত্মীয়তা-সূত্রে আমার প্রণম্য গুরুজন। তাঁদের সকৃতজ্ঞ প্রণাম।

তথ্য সংগ্রহে যে সব প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেয়েছি; সেগুলি হলো : কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার, প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরী, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী, বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী, বয়েজ ওন লাইব্রেরী এবং বিবেকানন্দ মহিলা কলেজ লাইব্রেরী। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে স্বভাবতই আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তক বিপণির কর্ণধার শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার-নির্দ্বিধায় এই প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ।

এই গ্রন্থটি বুধমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধনে সক্ষম হলে চরিতার্থ হবে।

অন্তরা মিত্র

সূচি

প্রথম অধ্যায়

লোককথা পরিচিতি

'ছেলেটির যেমন কথা ফুটল, অমনি সে বললে, গল্প বলো।... শুধু শিশু বয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব।'[১]

এক চিরন্তন চিত্তজয়কারী মাধ্যম এই গল্প। 'গল্প' শব্দের উৎস সন্ধানে সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন—

'গল্প শব্দের আগে গপ্‌প শব্দটির প্রচলন ছিল। ফারসীতে অর্থ— বিশ্রম্ভ আলাপ, টুকিটাকি কথাবার্তা, এই শব্দঘটিত বিশেষ বাক্যাংশ চলিত ছিল ফারসীতে 'গপ্‌প ও শপ্‌প' রূপে। এই বাক্যাংশটিও বাংলায় চলে এসেছে। গল্পের মতো বাক্যাংশটিও সংস্কৃতায়িত রূপে পৌঁছেছে 'গল্প-স্বল্প' রূপে।

গল্পের যথার্থ প্রতিশব্দ সংস্কৃতে কথা। কিম্‌ শব্দের উত্তর থা প্রত্যয় যোগ করে এই বৈদিক অব্যয় পদটি নিষ্পন্ন। অর্থ কেমন করে? কিসে, তারপর? পদটি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় কথোপকথন অর্থে। সেই অর্থ থেকে দাঁড়িয়ে যায় গল্প।'[২]

এই মতের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় একাধিক অভিধানে, 'কথা' শব্দটির অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে—

ক) কথা— কথ্‌ (বলা)+আ, ক্ষুদ্রার্থে কথিকা, উক্তি-বচন বিবৃতি গল্প, উপাখ্যান কাহিনী।[৩]

খ) কথা— কথ্‌ (বল৷ +ঙ ভাব) উক্তি, সত্যমিশ্রিত বা কল্পিত গল্প, উপাখ্যান কাহিনী[৪]

গ) কথা— বক্তব্য-বস্তু, বিষয়, বচন, উক্তি, গল্প[৫]

অতএব সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে 'গল্প' ও 'কথা' সমার্থক।

গল্প অর্থে 'কথা' শব্দের প্রয়োগ কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে পাই 'প্রাপ্যাবন্তীনুদয়ন কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্‌' অর্থাৎ অবন্তী দেশে পৌঁছে, যেখানে গ্রামের বুড়ো লোকেরা উদয়নের গল্প খুব ভালো করে জানে।[৬]

অপরপক্ষে 'লোক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—

১। লোক— (লোক্‌+অ +ঘঞ)—মনুষ্য,জন[৭]

২। লোক— মনুষ্য, জন, ব্যক্তি[৮]

৩। লোক— মনুষ্য, জনসাধারণ সমূহ[৯]

লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই জনসাধারণ অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ জাতি বা গোষ্ঠীই ' লোক' শব্দটির অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকে। বস্তুত ইংরাজী 'Folk' শব্দটিকেই বাংলায় 'translation'-এর মাধ্যমে করা হয়েছে 'লোক'। এই 'Folk' শব্দটি সম্পর্কে অভিধানের বক্তব্য—

1. A less ethnocentric and broader definition of folk would be any group of people who share at least one common factor, for example common occupation, religion or ethnicity'[১০]

2. The great proportion of the member of a people that determines the group character and that tends to preserve its characteristic form of civilization and its customs art and crafts, legends traditions and superstitions from generation to generation'[১১]

অর্থাৎ 'Folk' বলতে বোঝায় সেই বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী যারা ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, জনতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও জীবিকাগত সমন্বয়সূত্রে সংগ্রথিত।

লোক শব্দটিও এমনই এক সংহত সমাজেরই দ্যোতনা বহন করে, যে সমাজ বৃহত্তর জন অংশের মধ্যে থেকেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভেতর দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় আপন, শিল্প-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।

এই সমষ্টিবাচক লোক শব্দটি যখন 'কথা' শব্দটির পূর্বে যুক্ত হয় তখন শব্দ দুটি একত্রে 'লোককথা'-এর পরিধি যেমন বিস্তৃত করে তোলে তেমনি গভীরতাও করে সুদূরপ্রসারী।

লোককথা : সংজ্ঞা

মানবসভ্যতার চিরায়ত জীবনকাহিনীর ফলিত সংস্কৃতির সহজিয়ারূপ লোকসাহিত্য। এই লোকসাহিত্যেরই স্বতন্ত্র শক্তিশালী শাখা 'লোককথা'। বলা প্রয়োজন ইংরাজী Folk-tale শব্দটির বাংলা ভাষান্তর হয়েছে— 'লোককথা'। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত— 'গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনীর প্রকাশ করা হয় ইংরাজীতে তাহাকেই সাধারণভাবে Folktale বলা হয়। বাংলায় লোককথা বলিলে এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহা কেবলমাত্র কথা বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে।'[১২]

ইংরেজী শব্দ 'Folktale' সম্পর্কেও প্রখ্যাত গবেষক স্টীথ থম্পসন বক্তব্য রেখেছেন—

'................ the term folktale' is legitimately employed in a much broader sense to include all forms of prose narrative, written or oral, which have come to be handed down through the years.'[১৩]

অর্থাৎ গদ্যে বিবৃত, লিখিত বা মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তরিত যে সাহিত্য সম্পদ, তাই লোককথা। অবশ্য থম্পসন, লিখিত ঐতিহ্য অর্থে মৌখিক গল্পগুলির সংগৃহীত লিখিত রূপ বুঝিয়েছেন, যার উদ্দেশ্য ঐতিহ্যের নিশ্চিত সংরক্ষণ—

'However well or poorly such a story may be written down, it always attempts to preserve a tradition, an old tale with the authority of antiquity to give it interest and importance.'[১৪]

লোককথার মৌখিক ঐতিহ্যবাহিতা স্বীকার করেছে অভিধান—

Folktale is a characteristically anonymous timeless and placeless tale

circulated orally among people.'[১৫]

অর্থাৎ অজ্ঞাত উৎসজাত সেই সব গল্প যেগুলি মৌখিক ঐতিহ্যবাহী, সেইগুলিই লোককথা।

লোককথার সার্বিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়'Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend'গ্রন্থে–

"........a general word referring to all kind of traditional narrative. It applies to such diverse forms as creative myths of primitive peoples, the elaborate frame Stories of Arabian Nights, the adventures of Uncle Remus Perse in boots and Cupid and Psyche" [১৬].

দেখা যাচ্ছে 'Folktale' শব্দটি ঐতিহ্যবাহী একাধিক আখ্যায়িকাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। আখ্যায়িকগুলিও পরস্পর ভিন্নধর্মী, যেমন আদিম মনুষ্য সমাজের সৃষ্টিশীল পুরাণ-কথা, আরব্যরজনীর বিস্তৃত গল্প সমষ্টি, আংকেল রেমাসের অভিযান, পুস ইন বুটস্ ও কিউপিড ও সাইকির গল্প।

অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা এইভাবে লোককথার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি–

শ্রুতি পরম্পরায় প্রচলিত গদ্যে বর্ণিত যে সকল আখ্যান লোকসমাজের রস গ্রহণের সাধারণ মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রাচীন কাল থেকে অবিরত সৃষ্টি হয়ে চলেছে, সেইগুলিই লোককথা। লোককথার উৎস অজ্ঞাত, বিস্তৃতি পৃথিবীব্যাপী। প্রত্যেক সমাজভুক্ত মানুষের নিজস্ব ঋক্থ, ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য এই লোককথা।

গবেষক থম্পসন লোককথার জনপ্রিয়তা ও বিস্তৃতির বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে–

'In villages of central Africa, in outrigger boats on the pacific, in the Australian bush, and within the shadow of Hawaian volcanoes, tales of the present and of the mysterious past, of animals and gods and heroes, and of men and women like themselves, hold their listeners in their spell or enrich the conversation of daily life.'[১৭]

মধ্য আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে, প্রশান্ত মহাসাগরের ভেলার মধ্যে, অষ্ট্রেলিয়ার বনে জঙ্গলে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরির আশেপাশে অবস্থিত বসতিতে, বর্তমান ও রহস্যময় অতীতকালের গল্প, হোক তা জীব-জানোয়ারের, দেবতাদের কিংবা বীরদের অথবা নিজেদের মত নরনারীদের --তা সবসময়ই শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, তাদের প্রতিদিনের কথাকে সমৃদ্ধ করেছে।

তাই, আমরা বলতেই পারি যে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক সীমা, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কার্যকারণ সম্পর্ক ও সংহত লোকসমাজের সচল জীবন প্রবাহের অখণ্ডতায় লোককথাগুলির বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে।

লোককথার উৎস : বিবিধতত্ত্ব

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "অব্যক্তাদানি ভূতানি।"[১৮] অর্থাৎ ভূত বা অতীতের কথা জীবগণ ব্যক্তি করতে পারে না। ঠিক সেইরকমই লোককথার উদ্ভবের নির্দিষ্ট কাল ও কারণ অজানা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। খ্যাতনামা লোকবিজ্ঞানীগণ অবশ্য লোককথার আবির্ভাব প্রসঙ্গে নানা বিচিত্র তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন। সেই তত্ত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে।

মননশীল তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত ঘটে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। জার্মানীর গ্রীমভ্রাতৃদ্বয় এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন— "The first serious consideration of any of these questions appeared in the second edition of the Grimms' Kinder-und Hausmarchen in 1819."[১৯]

গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থটিতে যে জিজ্ঞাসার বীজ নিহিত ছিল তা তত্ত্বাকারে রূপ পেল 'Wilhelm Grimme'-এর আলোচনায়, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ঘোষণা করলেন—

(ক) "The resemblance existing between the stories not only of nations widely removed from each other by time and distance, but also between those which lie near together consists partly in the underlying idea and the delineation of particular character and partly in the weaving together and unraveling of incidents. There are however some situations which are so simple and natural that they reappear everywhere, just as there are thoughts which seen to present themselves of their own accord so that it is quite possible that the same of very similar stories may have sprung up in the most different countries quite independently of each other."[২০]

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা চলে যে, সংগৃহীত কাহিনীগুলির মধ্যে যে সাদৃশ্য অনুভব করা যায় তা এতই বিস্তৃত যে পৃথিবীর দুই ভিন্নপ্রান্তে অবস্থিত দেশের কাহিনীর মধ্যেও তা ধরা পড়ে। জাতি-ধর্ম-দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এই সাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান। কাহিনীর অভ্যন্তরে বিধৃতভাবে, চরিত্রচিত্রণে, ঘটনার সংস্থানে এবং প্রকাশভঙ্গীতেই এসব সাদৃশ্য নিহিত। ফলে উইলহেম গ্রীম সিদ্ধান্ত করেন যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভৌগোলিক ঐতিহাসিক এবং আবহাওয়ার পার্থক্য সত্ত্বেও একই কাহিনী স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে।

খ) পাশাপাশি বা দূরস্থিত দেশে অবস্থিত কাহিনীগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান তার প্রমাণস্বরূপ গ্রীম 'The Peasant's Wise Daughter' কাহিনীটির বিচার করেন। —'........ in most cases the common root thought will by the peculiar and frequently unexpected may, even arbitrary treatment, have received a form which quite precludes all acceptation of the idea of a merely apparent relationship.'[২১]

অর্থাৎ উক্ত কাহিনীটির ভাব ও ঘটনার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রাপ্তকাহিনীর সাদৃশ্য তাঁকে অবাক করে।

গ) গ্রীম আরও সিদ্ধান্ত করেন যে কাহিনী এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিভ্রমণ করতেই পারে, নতুন দেশে স্থায়ীভাবে বাস করতেই পারে। কিন্তু "One or two solitary exceptions cannot explain the wide propagation of the properly common to all"[২২] নিজে এইসব ঘটনার ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছেন যে একা দেশের প্রাপ্ত কাহিনীর সঙ্গে আরেক দেশের কাহিনীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলে তার ব্যাখ্যা কি হবে?

পরবর্তী দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন দুটি প্রধান তত্ত্ব। সেগুলি যথাক্রমে—

i) the circle of those Tales which show close resemblances is coterminous with the Indo-European language family and these tales are doubtless inheritances from a common Indo-European antiquity'[২৩]

অর্থাৎ যে সব গল্পগুলির মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান, তারা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর পরিবারভুক্ত এবং একই ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত। এইভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর ভাষাকেই লোককথার সূত্র বলে মনে করেন গ্রীম—

'The outermost lines are coterminous with those of the great race which is commonly called Indo-Germanic or Indo-European and the relationship draws itself in constantly narrowing circles round the settlements of the Germans somewhat in the same rates as that in which we detect the common or special property in the language of the individual nations which belong to it.'[২৪]

i) দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি প্রকাশ করেন গ্রীম, সেটি এইরকম, ইন্দোইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর পুরাণ কাহিনী ভেঙ্গে গিয়েই তার থেকে লোককথার উৎপত্তি ঘটেছে। লোককথার মধ্যে পুরাণ-কথারই নানা ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। আধুনিক মনন তথা যুক্তিশীলতা বিকাশের ফলেই পৌরাণিকতা পিছু হটে গেছে কিন্তু বর্তমান থেকে যতই অতীতের দিকে যাওয়া যায়, ততই রূপকথার মহিমা উপলব্ধি সম্ভব।

—the tales are broken-down myths and are to be understood only by a proper interpretation of the myths from which they came. Fragments of a belief dating back to the most ancient times in which spiritual things are expressed in a figurative manner are common to all stories. The further we go back, to more the mythical element expands indeed it seems to have formed the only subject of the oldest fictions.'[২৫]

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত পক্ষে গ্রীমের ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব এরই প্রভাবের দরুন তাৎপর্য

মণ্ডিত হয়ে ওঠে। তদুপরি ঋক্‌বেদ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহ খ্রীষ্ট জন্মের ৩৫০০ বছর পূর্বেকার ঐতিহ্যে দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষণা ছাড়াও একই পুরাণ ও লোককথার বিভিন্ন তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ম্যাক্সমুলার, এঞ্জেলো দ্য গুবারনেটিস ও স্যার জর্জ কক্স। এঁদের মতানুযায়ী আদিম মানুষ বিশ্ব-চরাচরের সর্ববস্তুতে জীবনকে প্রত্যক্ষ করত—

'The sun, the moon, the stars and the ground on which he trod, the clouds storms and lightnings were all living beings.'[২৬]

আর এই বিশ্বাসের ফলেই ক্রুদ্ধ প্রকৃতি চন্দ্র সূর্য অন্ধকার রাত্রি ইত্যাদি বর্ণনা করত একই ধরনের আলংকারিক ভাষায়–

'Now the mind was always losing its hold on the original force of the name and the result would be a constant metamorphosis of the remark made about a natural phenomenon into a myth about something denoted by a term which had ceased to possess any meaning.'[২৭]

এইভাবে সব লোককথাকেই দিবা-রাত্রির রূপক হিসাবেই বিচার করতে হবে–

'Myths of the phenomena of day and night.'[২৮]

গ্রহদের মধ্যে সূর্য প্রধান বলে সূর্যের উদয় অস্তকে কেন্দ্র-করেই অধিকাংশ রূপকথা বিশেষ করে রাক্ষস খোক্কসদের গল্পগুলির উদ্ভব হয়েছে বলে পুরাণ তত্ত্ব উদ্‌গাতারা মনে করতেন এ মতবাদ 'Theory of Solar Myth' এবং 'Pan Babayloniasm' নামে খ্যাত।[২৯]

এই পুরাণ-তত্ত্বালোচনা প্রচণ্ড সমালোচিত হয়েছে পরবর্তী গবেষকদের আলোচনায় উপহাস করে বিজ্ঞানী গাইদোজ (Gaidoz) বলেছেন 'Comme quoi M. Max Muller n' a jamais existe' : etudeda mythologie comparee '[৩০] অর্থাৎ ম্যাক্সমুলারের সিদ্ধান্ত সমূহ অবাস্তব এবং ম্যাক্সমূলার নিজেও একটি মিথ্ তথা অবিশ্বাস্য নাম মাত্র—

'by using the approved methods of comparative mythology he disposes of the great scholar Max Muller and shows that he himself is nothing but a myth.'[৩১]

পুরাণ-তত্ত্বের ভিত্তিহীনতার পক্ষে সোচ্চার ঘোষণা করেন অ্যাণ্ড্রু ল্যাং (Andrew Lang)। তাঁর মতে–

১। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে লোককথাকে সম্পৃক্ত করা অর্থহীন।

২। লোককথার আলোচনার পৌরাণিক ঘটনায় রূপকের অনুসন্ধানও ভিত্তিহীন।

[On the whole, the student of Marchen must avoid two common errors. He must not regard modern interpolation as part of the mythical essence of a story. He must not hurry to explain every incident as a reference to the natural phenomena] [৩২]

এইভাবে গ্রীম প্রবর্তিত ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব এবং পরবর্তীকালে ম্যাক্সমুলার প্রমুখ বিজ্ঞানী দ্বারা সমর্থিত পুরাণ-তত্ত্ব যখন সার্বিকভাবে অস্বীকৃত হল তখনই এক ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠা করলেন 'Theodor Benfey' তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বগুলি প্রকাশ করেন সম্পাদিত গ্রন্থ 'Panchatantra' (১৮৫৯) -এর ভূমিকায়—

ক) নিছক জীব-জন্তুর গল্পগুলি ছাড়া আর সব কাহিনীই বাংলা, ভারত থেকে উদ্ভূত-

'My investigations in the field of fables, Marchen have brought me to the conviction that few fables but a great number of Marchen and other folktales have spread outward from India almost over the entire world.'

খ) খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় কাহিনীমালা বহির্বিশ্বে নীত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অবদান মুসলমান রাজত্বকালের।

'With the tenth century, however there began with the continued attack and conquests of the Islamites in India......... The narrative works of India were now translate into Perisian and Arabic and sometimes the contents were scattered in a reletively short time over the realm of the Islamites in Asia, Africa and Europe.'[৩৪]

অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলেই ভারতীয় কাহিনী ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নীত হয়।

গ) অপরদিকে বৌদ্ধধর্মও ভারতীয় কাহিনীকে ক্রমান্বয়ে চীন, তিব্বত ইত্যাদি দেশে বিস্তৃত করতে সাহায্য করে।

'On the other hand, the Buddhists who have brought about the diffusion of the folktales of India over China, Tibet and almost the whole world.'[৩৫]

ঘ) পরবর্তী পর্যায়ে মঙ্গোলিয়ার মাধ্যমে পুনর্বার তা ইউরোপে প্রচারিত হয়—

'the Mongols for almost two hundred years were in power in Europe and in this way opened up a wide gate for the intrusion of India conceptions into Europe'[৩৬]

ঙ) তুতিনামা-ডেকামেনন, স্ট্রাপারোলা ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ ও আলোচনা করে বেনফে সিদ্ধান্ত করেন যে ভারতীয় লোককাহিনী সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে লোকমুখে এবং লোকমুখ থেকে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে বারংবার আবৃত্ত হয়েছে।

এই পঞ্চতন্ত্র প্রকাশের পর বেনফে নির্দেশিত পথে গবেষণা করেও যিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি হলেন ইমানুয়েল কস্কুইন (Emmanuel Cosquin)। ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময় তিনি বেনফের তত্ত্বের পরবর্তন সাধন করে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন।

মঙ্গোলদের মাধ্যমে ভারতীয় লোককাহিনী ইউরোপে নীত হয়েছে—এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। এছাড়াও মিশর থেকে প্রাচীন লোককাহিনীর সংগ্রহ বের হলে প্রমাণিত হয় যে ভারতই লোককথার একমাত্র উৎস নয় কারণ 'Collections of Egyptian folktales were too early for the borrowing from India as described by Benfey'[৩৭]

এই তত্ত্ব সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক অ্যান্ড্রু ল্যাং বিস্তৃত আলোচনা করে রায় দেন যে খ্রীষ্টপূর্ব তেরো শতকের মিশরী কাহিনী এবং হোমার ও হিরোডটাসের রচনায় অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলির নিবিষ্ট পাঠে ধরা পড়ে যে ভারত উপমহাদেশই লোককথার একমাত্র উৎস বা কেন্দ্র নয়। এই আলোচনার সঙ্গেই ল্যাং তার বিখ্যাত 'Theory of polygenesis' বা বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, যার মূল বক্তব্যের সার এই প্রকার—

(১) লোককাহিনীর মধ্যে যেহেতু আদিম ভাবধারা খুঁজে পাওয়া যায়, সেহেতু প্রমাণিত হয় যে কাহিনীমাত্র পুরাকালের ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত—

'Tales were very ancient and had been handed down, with a gradual refining from ages of savagery to ages of civilization.'[৩৯]

(২) সমবিশ্বাস, রীতিনীতি একই সঙ্গে বহুদেশে জন্মলাভ করে। এইসব সম কৃষ্টির আওতায় একই সঙ্গে পৃথিবীর সর্বত্র একই প্রকার গল্প স্বাধীন ভাবে গড়ে ওঠে—

'I have frequently said that, given a similar state of taste and fancy, similar beliefs, similar circumstances, a similar tale might conceivably be independently evolved in regions remote from each other. We know that similar patterns, similar art have thus been independently evolved, so have similar cosmic myths, similar fables, similar riddles, similar proverbs, similar customs and institutions.' [৪০]

এই মতেরই সমর্থক ছিলেন ই.বি. টেলর (E.B.Tylor) জেমস ফ্রেজার প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ।

কিন্তু এই তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন স্টীথ থম্পসন। তিনি বলেন যে যদিও ইতিহাস বিবর্তনের ধারা, তবুও সভ্যতা ও কৃষ্টি কখনোই সর্বত্র একসঙ্গে বর্ধিত হয় না। ইতিহাস কখনোই এ প্রমাণ দেয় না যে, আফ্রিকা ও ইউরোপে দূরপ্রাচ্যে কিংবা আমেরিকায় একই সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতা বা কৃষ্টি গড়ে উঠেছিল। তাঁর মতে, 'Culture is a matter of historical development for each people and is subjected to all sorts of special influences internal and external so that except in the vaguest and most general sense parallelism between differing ones, especially if they are for removed in an unjustified assumption.'[৪১]

উপরোক্ত মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী মত প্রতিষ্ঠা করেন জার্মানী বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক ভনডার লিয়েন 'Friedrich Vonder Leyen' , স্বপ্নে দেখা ঘটনাবলীই যে পুরাণ ও লোককথার বিষয়বস্তু সে সম্পর্কে তিনি বলেন-- 'Some ancient dreams

may have brought about certain incidents -flight from ogres, attempts to perform impossible tasks and many other. '[৪২]

অন্যদিকে ফ্রয়েড ইয়ুং প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকরাও স্বপ্ন, লোককথা ও পুরাণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন ফ্রয়েডের মতে অবদমিত ইচ্ছাসমূহ যা আইন শৃঙ্খলা সামাজিক ন্যায় নীতির ফলে অবরুদ্ধ থাকে তাদেরই আত্মপ্রকাশ ঘটে স্বপ্নে। ফ্রয়েড শিষ্য ইয়ুং এই অবচেতন স্তর সঞ্জাত গোষ্ঠী চেতনার নাম দিলেন— 'Collective unconsciousness.'[৪৩]

স্টীথ থম্পসন এই তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই মতবাদীগণ কখন কোথায় কিভাবে লোককথা গড়ে ওঠে তা আলোচনা না করেই উদ্ভব-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, তাই তাদের মত অসম্পূর্ণ—

'Neither of these group have been realistic in their approach to the problem of folktale origins. With no knowledge of when and where or by whom a tale was first told they proceed to dogmatize as to the exact circumstance that give rise to it.'[৪৪]

স্বপ্ন-তত্ত্বে, পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মত প্রদান করেন, 'Van Gennep' [৪৫] তাঁর মতকে বলা যায় 'প্রতীক তত্ত্ব' বা 'Totemism' তিনি বলেন যে আদিবাসীরা কোন বিশেষ প্রাণীকে প্রতীক বা স্ব-সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ মনে করত। সেই প্রাণীকে কেন্দ্র করেই নানা ক্রিয়াকলাপের উদ্ভব। এই ক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল পুরাণ আবৃত্তি যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল লোককথার উদ্ভব।

গিনেপের সমর্থনে গবেষক নৌম্যান প্রতিষ্ঠা করেন মৃতের প্রত্যাবর্তন তত্ত্ব (return of the dead theory) তাঁর বিশ্বাস ছিল যে সমস্ত লোককথাই মৃতের আত্মার প্রত্যাবর্তন-জনিত নানা ক্রিয়ার কথায় পরিপূর্ণ। অথবা এও বলা যায় যে লোককথা মাত্রেই মৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত— 'A great number of folkstories either contain some disguised ritual for avoidance of the dead of else they reflect the primitive belief concerning to the dead.'[৪৬]

এই মৃতের ভয়জনিত ধারণা থেকে রাক্ষস কাহিনীগুলির উদ্ভব—

'From the belief about and fear of the dead among primitive men have come all sorts of ogre stories. The ogre is nothing but the dead, who has been variously imagined by different people.'[৪]

গেনেপ ও নৌম্যানের মতামতের সমালোচনা করে স্টীথ থম্পসন বলেন যে, বিশ্বের সমস্ত আদিম সমাজই একই রকম ছিল এই মত সীমাবদ্ধ অর্থে সত্য—

'The fundamental weakness of both theories is the assumption of much greater uniformity among primitive peoples than probably exist in fact.'[৪৮]

পরবর্তী পর্যায়ে উপরোক্ত যাবতীয় তত্ত্বের বিচার করে থম্পসন সিদ্ধান্ত করেন

যে— 'One must not try to explain everything in primitive life by one simple formula, whether it be totemism fear of the dead or obsession with stars or theory of polygenesis of motifs.'[৪৯]

অর্থাৎ কোন প্রকার একপেশে তত্ত্বকেই মুখ্যসূত্র হিসাবে মেনে নেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানীই যে যে দৃষ্টিকোণ থেকে লোককথার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যেগুলি কতিপয় লোককথার উৎস অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু তাঁদের কোন বিশিষ্ট মতই যাবতীয় লোককথার উৎস আবিষ্কারে অপারগ।

সে কারণেই লোককথার নির্দিষ্ট উৎসকাল আজও অজানা। তবে আমরা কেবল এটাই বলতে পারি যে লোককথা এমন এক শক্তিমান শিল্প মাধ্যম যার উৎস প্রাচীন আদিম সমাজের নানামুখী ধ্যান-ধারণা, প্রয়োজন—আত্মরক্ষার, ধর্ম অধর্মের ধূসর অতীত থেকে, এবং যার অনায়াস বিস্তার বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দূরবর্তী অজানায়। বহুবিধ তত্ত্বাবলীর জটিলতা লোককথার উৎসকে আলোকিত করতে না পারলেও লোকজীবনে তার ভূমিকা সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছে। সেগুলি একে একে বলা যাক।

ক) বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনা থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে লোককথা শুধুমাত্র শ্রবণসুভগ বিনোদনের উপকরণই নয়, প্রাগৈতিহাসিক মানব গোষ্ঠীর বিজ্ঞান-ধর্ম, আইন-কানুন জীবিকা ইত্যাদি বহুবিধ তথ্যের উপর আলোকপাত ঘটায় এই লোককথা—

'They are much more than mere entertainment, they are a part of the primitive man's science, medicine, religion, law and agriculture.'[৫০]

খ) কেবল প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করেই লোককথা ক্লান্ত থাকে না। সমাজ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চলমান লোকসমাজের আশাআকাঙ্ক্ষা দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তকেই যেন ধরে রাখে এই লোককথা। সমাজের হৃৎস্পন্দন যেন এই লোককথার মাধ্যমেই অনুভূত হয়—।

'And just wherever the eye can fierce we find the domestic animals, grain, field house hold furniture so do we also find stories, the dew which waters poetry, without which social life is impossible. '[৫১]

গ) প্রাচীন ইতিহাস, লোকবিজ্ঞান চেতনা ও বর্তমানের চলিষ্ণু সভ্যতার সার যেমন উপ্ত থাকে লোককথায় ঠিক তেমনি মানবমানসে কল্পনার স্ফূর্তিতে লোককথার ভূমিকাটিও বিজ্ঞানীদের সচেতন করেছে। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে দুর্জয়কে জয় করবার আশা, দুর্গতি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে চরম সুখ ও সৌভাগ্যলাভের বাসনা সাহস ও সত্যকে আশ্রয় করে ঐহিক জীবনের চরম প্রাপ্তি ঘটে লোককথায় —রূপকের মাধ্যমে।

সে কারণেই দুঃখী সিণ্ডেরলা ও স্নো হোয়াইটের জীবনে নেমে আসে সুখ ও শান্তির

বারিধারা কিংবা কুসুমকোমল রেড রাইডিং হুড মোকাবিলা করে হিংস্র নেকড়ের সঙ্গে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে লোককথার উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত বৈজ্ঞানিকগণ বহু নতুন তথ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন বিশ্ববাসীর কাছে, সম্প্রসারিত করলেন নতুন গবেষণার অবকাশ।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পাণি' [৫২] অর্থাৎ শিল্পসমূহ আত্মার সংস্কৃতি। লোককথার ন্যায় মৌখিক ও জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমটিও সমগ্র লোকজীবন সংস্কৃতির প্রাণ স্পন্দন স্বরূপ। কিন্তু এই লোককথার মাধুর্য উপযোগিতা এবং লোকজীবনে তার প্রভাবের অনেকখানিই নির্ভর করে পরিবেশন তথা উপস্থাপনার গুণে। উপস্থাপক তথা লোককথার কথকের ভূমিকাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে লোককথা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই অবধারিত হয়ে ওঠে 'কথক' প্রসঙ্গ।

লোককথা ও কথক

লোককথার সুবিশাল ঐতিহ্যকে দুইভাবে পাওয়া যায়। একটি সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ অবস্থায়, অন্যটি মৌখিকভাবে তথা কথক বা গল্পকারের বর্ণনায়।

লোকসমাজে প্রচলিত লোককথাগুলি প্রাচীনকালেই মৌখিক রূপ লাভ করেছে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ কিংবা কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি গ্রন্থে। লেখা ও সম্পাদনার মাধ্যমে গল্পগুলি রূপান্তরের আশংকা অনেকখানি রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু, কেবল মুদ্রিত পুস্তক পড়ে লোককথার রস সর্বাংশে উপলব্ধি অসম্ভব। অলবার্ট বি ফ্রিডম্যান বলেছেন—

'There are people who hate to see wild flowers in a vase or animals in cages and ballads in static print may well seen equally unnatural.'[৫৩]

ব্যালাড সম্পর্কিত এই মন্তব্য লোককথা সম্পর্কেও সর্বাংশে প্রযোজ্য।

বি ম্যালিনেস্কি যথার্থই বলেছেন—

'The stories live in native live and not on paper, and when a scholar jots them down without being able to evoke the atmosphere in which they flourish he has given us but a mutilated bit of reality.'[৫৪]

ম্যালিনোস্কির বক্তব্যের সমর্থনে শোনা যায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি--

'ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্ম মুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণমুখর রাত্রি, স্তিমিত প্রদীপ গৃহ, অন্ধকারে গৃহকোণে আলোকছায়ার লীলা-চঞ্চল নৃত্য, সর্বোপরি,কল্পনাপ্রবণ আশা-আশংকা-উদ্বেল শিশুহৃদয় এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত সরস, তরল কণ্ঠস্বর, এই সকল মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐক্যতান সৃষ্টি করে তাহা স্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বই-এর পাতায় ও সাহিত্য ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে।'

কথকের বাচনভঙ্গীর চমৎকারিত্বে, অভিব্যক্তি প্রকাশের অনবদ্যতায়, গলার স্বরের

ওঠাপড়ায় লোককথা ঘিরে যে অপূর্ব মায়ারসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা-ই এই মৌখিক সাহিত্যকে সূক্ষ্ম শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। সেই কারণেই গল্প বলা এমনই এক কারুকৃতি যা আয়ত্ত করতে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

রাশিয়ার লোকবিজ্ঞানীগণ, কথকদের মধ্যে যে বিশেষ ব্যক্তিগত পার্থক্য বিদ্যমান, সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, আজাদোভস্কি তাঁর গ্রন্থ— 'Eine Siberische Marchenerzahlerin'[৫৬] -এ বলেছেন যে সাধারণতঃ তিন ধরনের কথক লোককথার বক্তা হতে পারে। প্রথমতঃ একদল, যাদের গল্প, তাদেরই সমাজ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত, তাদের ব্যক্তিগত মেজাজ মর্জি, বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, এ সবই কথিত গল্পে প্রভাব ফেলতে পারে। আজাদোভস্কি উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করেছেন কথক 'Ananyev'-কে —'whose tale is so clearly and fully expressed the life of the exile class'[৫৭]

এই ধরনের কথকদের সম্পর্কে বিজ্ঞানী আরও বলেন 'the tales told by each informant are grouped together, along with an account of his life and social background.'[৫৮]

দ্বিতীয় যে গোত্রের কথকের পরিচিতি তুলে ধরেছেন আজাদোভস্কি, 'Medvidev' তাদের অন্যতম। এই ধরনের কথক অবশ্যই দক্ষ শ্রুতিধর, কিন্তু পূর্বশ্রুত কাহিনীকে অবিকৃতভাবে শ্রোতার সম্মুখে পেশ করা ছাড়া কোন মুন্সীয়ানা তারা দেখাতে পারে না।

—'He is an unusually gifted reconteur and for him the exact repetition of the story and all its details is of great importance.'[৫৯]

এই ধরনের কথক গল্পের বহু প্রাচীন অবিকৃত রূপটিকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে সক্ষম।

তৃতীয় গোত্রের কথকই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁদের বর্ণনায় লোককথার মূল কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ থাকে। অবিকৃত থাকে প্রারম্ভ, সমাপ্তি; কিন্তু উপমা, এমনকি বর্ণনা পর্যন্ত বদলে যায় চমকপ্রদভাবে। কখনো অন্য কাহিনীর টুকরো এসে আসন জুড়ে বসে—

'Such story tellers have learned how to elaborate their tales to an extraordinary degree. They keep the old general patterns but their special treatment is all in the direction of expansion'[৬০]

এইভাবে একের উপলব্ধিপুষ্ট লোককথার এই যে পরিবর্তিত রূপ, তা সামগ্রিক শ্রোতৃহৃদয়েই চৈতন্যজাত রসাবেদনে সিক্ত হয়। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে 'Mac Edward Leach' -এর বক্তব্য—

'All aspects of folklore, probably originally the products of individuals are taken by the folk and put through a process of recreation which through constant variation and repetition become a group product.'[৬১]

লোককথার ক্ষেত্রেও এইভাবেই একের সৃষ্টি, সমষ্টির যৌথ অভিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণ মুক্তি পায়।

কথকবর্ণিত লোককাহিনী বহু ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয় সত্য, কিন্তু গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন যে রূপান্তরিত হলেও কাহিনীগুলির কাঠামো কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্রকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। তাঁরা এও সিদ্ধান্ত করেছেন যে সম্ভবত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গল্পকথকের সচেতনতাব ফলেই এই অলিখিত নিয়মটি গড়ে উঠেছে—

'Whether stories are told by a special group trained for the purpose or by an average member of the social group, there are certain qualities of style which are found very generally valid for all oral narrative.'[৬২]

সেই সাধারণ সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে।

লোককথা : অবয়বগত বৈশিষ্ট্য

ডেনমার্কীয় পণ্ডিত অ্যাক্সেল ওলরিক লোককথাগুলির পর্যালোচনা করে কতকগুলি সূত্রের (Epic Laws) সন্ধান পান, যেগুলি বৈচিত্র্য-ভেদে সকল লোককথাতেই লভ্য—

'No matter what the genre-tale myth hero story ballad, or local legend there is so great a stylistic resemblance in all narrative which comes out from the folk and which is carried on by word of mouth and by the power of memory that Olrik feels that certain 'epic laws' may be enuciated. This principles limit the freedom of folk narrative to an extent quite unknown in written literature.'[৬৩]

সূত্রগুলি নিম্নরূপ—

১। 'A tale does not begin with the most important part of the action and it does not end abruptly. There is a leisurely introduction: and the story proceeds beyond the climax to a point of rest or ability.'[৬৪]

অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে কোন লোককথারই সূচনা ঘটে না। সমাপ্তিও অকস্মাৎ ঘটে না। শ্লথভঙ্গিতে আরম্ভ হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের পরেও ধীরে সুস্থে ঘটনা প্রবাহ একটি স্থির বিন্দু পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

২। 'Repetition is everywhere present not only to give a story suspense but also to fill it out and effort it body.'[৬৫]

অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি সর্বত্রই উপস্থিত থাকে, তা শুধু কাহিনীর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিই করে না, কাহিনীর অবয়বকে তা দান করে পূর্ণায়ত দৈর্ঘ্য।

৩। 'Generally there are but two persons in a scene at one time. Even if there are more only two of them are active simultaneously.'[৬৬]

অর্থাৎ সাধারণতঃ একই সময়ে একই দৃশ্যে দুজনের বেশী থাকে না, যদি দুজনের

অধিক থাকে, তাহলেও তাদের মধ্যে মাত্র দুজন কেই সঙ্গে সক্রিয় থাকে।

৪। 'Contrasting characters encounter each other–hero and villain, good and bad.'[৬৭]

পরস্পর বিরোধী চরিত্র পরস্পরের সম্মুখীন হয়, যেমন নায়ক ও নায়কের শত্রু, ভাল এবং মন্দ ব্যক্তি।

৫। 'If two persons appear in the same role they are represented as small or weak, they are often furicus and when they became powerful they may become antagonists.'[৬৮]

অর্থাৎ যদি একই ভূমিকায় দুজনকে দেখা যায়, তবে তাদের দুজনকেই অকিঞ্চিৎকর বা দুর্বল মনে হয়। অনেক সময়ই এরা হয় যমজ ভাই এবং যখন তারা শক্তিশালী হয়, তখন তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

৬। 'The weakest or the worst in a group turns out to be the best. The youngest brother or sister is normally the victor.'[৬৯]

দলের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল বা নিকৃষ্ট, সেই– শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীই বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়।

৭। 'The characterization is simple.' Only such qualities are directly affected the story are mentioned, no hint is given that the persons in the tale have any life outside.'[৭০]

–চরিত্রচিত্রণ খুবই সাধারণ পর্যায়ের। শুধু সেসব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়- যেগুলো সরাসরি কাহিনীকে প্রভাবিত করে। লোককথার কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আত্মা আছে কিনা তার কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় না।

৮। 'The plot is simple never complex. One story is told at a time. The carrying along of two or more subplots, is a sure sign of sophisticated literature.'

অর্থাৎ ঘটনাসংস্থানও হয় সাধারণ, সেগুলো কখনো জটিল হয় না। একই সময়ে শুধু একটি কাহিনী পরিবেশিত হয়। এক বা একাধিক উপ-কাহিনী বা ঘটনা-সংস্থান থাকলে তা জটিল বা বাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রমাণ দেয়।

৯। 'Everything is handled as simply as possible things of the same kind are described as nearly alike as possible, and no attempt is made to secure variety.'[৭১]

কাহিনীর পরিবেশন রীতিটিও সরল, সহজ ভঙ্গীর একই ধরনের বিষয়বস্তুকে যতদূর সম্ভব একইভাবে পরিবেশিত করা হয়। এককথায় বলা যায়, লোককথাকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করবার কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।

বিশ্ব-লোককথার এই জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সামনে রেখে আমরা প্রবেশ করতে পারি সীমাবদ্ধ বলয়ে— বাংলা লোককথার আসরে।

বাংলা লোককথা

গল্প বলা এবং গল্প শোনা বাংলার প্রাচীন এক জনপ্রিয় প্রথা। দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাকর সঙ্কলিত গ্রন্থ "সুভাষিত রত্নকোষ"-এ কবি শতানন্দের একটি শ্লোকে পাই ঘুমপাড়ানী গল্পের ইঙ্গিত—

'শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষিমন শিশো চৈতিমাম্ অম্ব নিদ্রা
নিদ্রোহেতোঃ সদৃণুসূত কথাং কাম্ অপূর্বং কুরুসত্ব।
রামো নাম ক্ষিতিপতির অভূত মাননীয়ো রঘুণাম্
ইত্যুক্তস্য স্মিতম্ অবতু বো দেবকীনন্দনস্য।। — (শতানন্দ)

—অমাবস্যার রাত, চাঁদ উঠেছে, ছেলে তুমি এখনো ঘুমিয়ে পড়ছ না যে? ঘুম আমার আসছে না মা। ঘুম আসবে ছেলে। একটা কথা শোন। কোন নতুন গল্প কর। রঘুদের বংশে এক মাননীয় রাজা জন্মেছিলেন রাম নামে। এইটুকু শুনেই দেবকী পুত্রের মুখে হাসি ফুটল। সেই হাসি আমাদের রক্ষা করুক।'[৭২]

গল্প বলা কেবল শিল্প মাত্রই নয়, জীবনধারণের একটি প্রাচীন বৃত্তিও বটে। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলা গল্প কথকের উপস্থিতি প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

—'প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বাল্মীকি লিখিয়াছেন যখন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভরত মাতুলালয়ে বিষণ্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন রাজসভায় নিযুক্ত কথা ব্যবসায়ীরা কথা শুনাইয়া তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা পাইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে মালিনী ও নাপিতরমণীগণই প্রধানতঃ অন্দরমহলে কথা বলিত। তাঁহাদের নাম ছিল 'আলাপিনী'। মহিলা কবি চন্দ্রবতীর (১৫৭৫)পুস্তকে আমরা কথা ব্যবসায়ীদের এই উপাধি পাইয়াছি, তিনি সীতার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন— 'উপকথা সীতারে শুনায় আলাপিনী। এই আলাপিনীগণ রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অন্দরে মহিলাদিগের গায়ে বসন ভূষণ পরাইবার সর্ববিধ কৌশল অবগত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাসের গোবিন্দ লীলামৃতে সেই কৌশলের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে বুঝা যায় বেশভূষাকারিণীদের কলা-শাস্ত্রে কতটা অধিকার ছিল। আঁতুড় ঘরে— বিশেষতঃ ষষ্ঠীর দিন— ইহারা বড় ঘরের মেয়েদিগকে গল্প শুনাইয়া নির্জনতার শ্রান্তি ও অবসাদ দূর করিত। ....রাজসভায় কথা বলিবার জন্য লোকনিযুক্ত থাকিত..........'[৭৩]

দীর্ঘ এই বিবৃতি এটাই প্রমাণ করে যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে লোককথার পরিবেশন বঙ্গ সমাজের সর্বস্তরেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দীনেশচন্দ্রের বিবৃতির সমর্থন পাই লোককথারই ঘটনাপ্রবাহে—

'দাইমাসী মালিনী আঁতুড়ঘরে চৌকাটে— পাশাপাশি শুইয়া রাণীকে 'অমুকরাজা তমুক রাজার রূপকথা শুনায়, অমুক কুমারী তমুক কুমারীর পরণকথা" শুনায়, (মালঞ্চমালা)[৭৪]

—The young thief thought that the voice must be the voice of a maid servant reciting a story as he had learnt was the custom in the palace every night, for composing the king and queen to sleep.'[৭৫]

লোকসমাজের সর্বস্তরেই যে গল্প কথকের আবির্ভাব ঘটেছে তার প্রমাণ পাই লালবিহারী দে'র বক্তব্যে। ব্রাহ্মণ থেকে তাঁতী, গৃহভৃত্য—সকলের কাছ থেকেই গল্পের খোরাব পেয়েছেন তিনি—

'An old Brahman told me two stories, an old barber three, an old servant of mine told me two and the rest I heard from another old Brahman.

.... I had myself when a little boy, heard hundreds—it would be no exaggeration to say thousands of fairy tales from that same old woman, Sambhu's mother.'[৭৬]

নারীপুরুষ নির্বিশেষে এই কথকবৃত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বহু লোকবিজ্ঞানী। বাংলা লোককথার কথক সম্প্রদায়ের বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

কথকের উপস্থাপন-বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব-লোককথার কথক সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্য লোকবিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেছেন, বাংলা গল্পের কথক সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সব গুণই লক্ষ্য করা গেছে। রাশিয়ান লোকবিজ্ঞানীগণ মূলতঃ তিন শ্রেণীর কথকের-পরিচিতি তুলে ধরেছেন। এই তিন শ্রেণীকেই আমরা খুঁজে পাই বাংলায়।

প্রথমত সেই সম্প্রদায়, যাদের গল্পে মিশে থাকে ব্যক্তিগত বোধ-অনুভূতির নির্যাস। আশরাফ সিদ্দিকী এমনই এক কথকের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' দ্বিতীয় খণ্ডে—

'এ খণ্ডের মহিলা কথক রেওয়াজের মা ও ইদন। রেওয়াজের মার বাড়ি ছিল বারহাটা থানার অন্তর্গত দশবার গ্রাম।.......তার ব্যক্তিগত মেজাজ মর্জি (Personal complex) তার গল্পে প্রকট হয়ে ওঠে। রেওয়াজে মা রাত্রিবেলা ছাড়া গল্প বলে না এবং তার গল্পও ধীরে সুস্থে অগ্রসর হয়।'[৭৭]

—অপর মহিলা কথক ইদন সম্পর্কেও বলেছেন আশরাফ সিদ্দিকী— 'জীবনে স্বামীর ভালবাসা সে পায় নাই, সন্তান সন্ততিও তার ছিল না। সেই জন্য অপুত্রক রাজা অথবা নির্বাসিতা রানীর দুঃখের চিত্র আঁকতে তার জুড়ি মেলে না। ....সে মধ্যে মধ্যে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, তার গল্পের মধ্যে যেখানেই অদৃষ্টের খেলার ইঙ্গিত থাকে সেখানেই তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পটভূমিটিকে আরও রসকরুণ করে তোলে।'[৭৮]

দ্বিতীয়ক্ষেত্রে একজাতের কথকের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, অনুকরণ করার ক্ষমতাও আশ্চর্যজনক। শ্রদ্ধেয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার যাঁদের কাছ থেকে গল্প

সংগ্রহ করেছিলেন তারা এই গোত্রের। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন—

'দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয় উহা এক ৮০ বৎসরের বৃদ্ধার মুখে তাঁহার পিতামহীর নিকট গল্পটি শিখিয়াছিলেন, এইভাবে যুগে যুগে গল্পটি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় আলাপিনীর পূর্বশ্রুত কাহিনী অতি অদ্ভুতভাবে অনুকরণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। গল্প বলিবার সময় পূর্ববর্তিনী রমণী যেখানে হাসিতেন, কাসিতেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিতেন, হাতের যে ভঙ্গী করিতেন, তিনি তাঁহার সমস্ত মুদ্রাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই আলাপিনী বলিয়াছেন তিনি যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন, তিনিও সেইভাবেই তাঁহার নিকট এই বর্ণনাকৌশল শিখিয়াছিলেন। সুতরাং ইহার ভাষার খুব বেশী পরিবর্তন হয় নাই।'[৭৯]

বাংলার এই শ্রুতিধর কথকের অবিকল পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গটি সমর্থন করেছেন, উইলিয়ম ম্যাক্‌কুলক।

'The narrator of the greater part of the tales, I gathered, was a very intelligent young Brahman, an orthodox Hindu. He possessed fine gifts both as a talkers and a recounter. Yet I found no reason to doubt his often-repeated assertion that he told me the stories exactly as he heard them ......Moreover I was able the ascertain that he did not improvise but narrated his tales in stereo-type form.'[৮০]

তৃতীয়ত, লোকবিজ্ঞানের ইতিহাসে যে কথকদলের স্থান অতি উচ্চে, বাংলা লোককথার কথক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সেই শ্রেণীর। আশরাফ সিদ্দিকী এদের প্রশংসা করে বলেছেন—'জীবনে সুযোগ পেলে এরাই হয়ত বড় কবি গায়ক বা শিল্পী হতে পারত। ..... দেশের এইসব শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দেশেরই প্রতি সম্মান প্রদর্শন।'[৮১] এই গোত্রের কথকের প্রতিনিধি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে দুজন। একজন ইমাম বক্স, অপরজন চান্দশেখ। প্রথমে ইমাম বক্সের কথা—

'ইমাম বক্স একজন খাঁটি কথক। গল্পের নানা চরিত্র বর্ণনায় তার নিজস্ব ভালোলাগা মন্দলাগা যেন রূপ পরিগ্রহ করে আসরে এসে উপস্থিত হত। ...তার গল্পের বিশেষত্ব গীতি— এগুলি সে নিজেই গায়। তার কাহিনীকে প্রাণবান করে তার Performance যাকে বলা হয় 'Dramatic Personality'— ...গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকেই সে 'Villain' বা পাপী চরিত্রকে গালাগাল দিয়ে উঠত, আবার ধর্মের জয়ে সে হত উচ্ছ্বসিত।'[৮২]

কথনভঙ্গীর এই প্রাণবন্ত সতেজতা বজায় থেকেছে চান্দশেখের ক্ষেত্রেও—

'গল্প চলতে থাকল। আশ্চর্য চান্দশেখ অনর্গল বলে যাচ্ছে কবির মত—এর কথার মধ্যে অজস্র প্রবাদ-ছড়া-বিশ্বাস- গান—একটির পর একটি আসতে লাগল।..... প্রেম ও মিলনের কথা খুব রসিয়ে বলেছে আর সঙ্গে শ্রোতারা বা-বা-তারপর-তারপর-রাজকন্যা কি কইল- পাপের শাস্তিতে- বেশ হইছে'-আচ্ছা জব্দ ইত্যাদি বাহবা দিয়ে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।'[৮৩]

এইভাবে গল্প বলা শোনার মধ্য দিয়ে কথক ও শ্রোতার আত্মিক বন্ধনটি মজবুত হয়েছে, লোককথাও বিস্তৃতি লাভ করেছে কর্মক্লান্ত চাষীর মৃৎকুটির থেকে গৃহস্থ অন্দরমহলের সূতিকাগৃহে, জনসাধারণের কোলাহলমুখর কেচ্ছাখানির বাজার থেকে রাজপ্রাসাদের সুদৃশ্য নিভৃত শয়নগৃহে। বাংলা লোককথার এই বিস্তৃতি তাকে সমৃদ্ধ করে একাধিক নামকরণে। সেই প্রতিশব্দগুলির পরিচয় নেওয়া যাক্।

লোককথা : প্রতিশব্দাবলী

কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মতোই লোকসমাজের প্রিয় এই লোককথা একাধিক অভিধায় ভূষিত হয়েছে।

লোককথা বা লোককাহিনী বঙ্গীয় লোকবিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ। যেমন— 'ঢাকার লোককাহিনী,'[৮৪] 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী'[৮৫], 'বাংলার লোককথা'[৮৬] ইত্যাদি। গ্রামবাংলায় কথা শব্দের চলন অধিক। অন্যান্য নামগুলি যথাক্রমে—

১। **কিস্‌সা তথা কেচ্ছা বা কেস্‌সা**—উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত বিলালের কেচ্ছা বলা, [৮৭] উড়াউড়ির কিস্‌সা,[৮৮] বারিবীর রাজপুত্র সুবোধ কুমারের কেস্‌সা। [৮৯]

২। **শাস্তর**— পূর্ববাংলার স্থান বিশেষে লোককথার পরিচিতি শাস্তর নামে। এ প্রসঙ্গে আমরা আশরাফ সিদ্দিকী ও চান্দশেখের সংলাপ উদ্ধৃত করতে পারি—

'আমি (আশরাফ সিদ্দিকী) —তুমি আগে অনেক গল্প বলতে এখন বলো না।

চান্দ-হ আগে কইতাম। অখন সংসারের ধান্দায়ই অস্থির। কতায় কয় যে, যে কয় **হাস্তর** (শাস্তর-গল্প) তার থাকে না বস্তর। (বন্ধনীকৃত টীকা আশরাফ সিদ্দিকী কর্তৃক প্রদত্ত)[৯০]

ধর্ম, নীতি ও আদর্শবাদের অদ্বয় সমাহারে রচিত হয় শাস্ত্র। লোকসমাজে লিখিত শাস্ত্র অপেক্ষা অলিখিত এই শ্রুতিরই শক্তি অধিক। সে কারণেই এই লোককথা পবিত্র শাস্ত্র বাক্যের ন্যায় সম্মানার্হ।

৩। **পুরাণকথা/পরাণকথা**— সম্ভবত 'প্রাচীনকালের কাহিনী' এই অর্থেরই লোককথার প্রসিদ্ধি পুরাণকথা নামে। বিশেষত লোককথার কিয়দংশই সৃষ্টি বিষয়ক পুরাকথা। অবশ্য নামটি যখন স্বরভক্তির প্রভাবে পরাণ কথা হয়ে দাঁড়ায় তখন তা লোকহৃদয়ের কাছাকাছি তথা প্রাণের (প্রাণ >পরাণ) কাছাকাছি চলে আসে। ঠাকুরদাদার ঝুলি গ্রন্থে পাই—

দাসী-মাসী মলিনী আঁতুড়ঘরের চৌকাট-পাশাপাশি শুইয়া রানীকে ... 'অমুক কুমারী তমুক কুমারী'র **পরাণকথা** শুনায়।[৯১]

৪। **প্রস্তাব**— গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, অবসরকালীন মজলিশে লোককথার সমাদর প্রস্তাব আখ্যায়। মুহম্মদ আয়ুব হোসেন এই প্রস্তাব শব্দের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেন, 'কথাটির ভাব এই যে গ্রাম্য কোন বৈঠকখানায় একজন **প্রস্তাব** করল ''আজ অমুক কেচ্ছা গাক''। সেই **প্রস্তাব** অনুসরণে অনুরুদ্ধ ব্যক্তি গল্প বলা শুরু করলেন। গল্পটি চলল দু'রাত ব্যাপী।[৯২]

এই প্রস্তাব পেশ করার চিত্রটি পাই 'Santal Folk tales' গ্রন্থে 'P.O.Bodding' -এর উক্তিতে ' When Santals sit together without having anything special to do somebody **may ask for telling story**. Someone of the party may ask about something.This reminds another of an incident of a story which is mentioned, and a third asks whether they have not heard this. After some talking one man will commence to tell.'[৯৩]

এইভাবে বিচিত্র আখ্যায় ভূষিত হয়ে বাংলা লোককথা হয়েছে উজ্জ্বল। স্নেহের পাত্রপাত্রীকে যেমন লোকসমাজ নানা প্রিয় সম্বোধনে তৃপ্তি পান, ঠিক তেমনি একাধিক প্রতিশব্দের মাধ্যমে লোককথা এই যে পরিচিতি তাও লোককথার সঙ্গে লোকমানসের দৃঢ় সংসক্তির প্রমাণই বহন করেছে।

বাংলা 'লোককথার' বিকল্প নাম যেমন একাধিক, তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্যে ভরপুর লোককথার ভাণ্ডার। অবশ্যই গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'Axel Olrik'-এর 'Epic Laws' লঙ্ঘিত হয় নি, তবুও স্বীকার করতেই হবে দেশীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বাংলা গল্পগুলিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছে, আন্তর ধর্মকে অতিক্রম করে যা প্রভাব ফেলেছে বহিরঙ্গেও।

বাংলা-লোককথার গঠন প্রকৃতি

মৌখিক সাহিত্যের সরলতা, বঙ্গীয় শ্যামলিমার স্নিগ্ধতা, বর্ণনার নিজস্বতা বাংলা লোককথাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। লোককথার অবয়ব-গত কারুকৃতি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি।

ক) কাহিনী-বিন্যাস পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক লোককথার মতোই বাংলা গল্পগুলিরও সূচনায় কোন আকস্মিকতার চমক মেলে না। "এক দেশের এক রাজা,"[৯৪] কিংবা এক তাঁতী, তার দুই স্ত্রী,[৯৫] অথবা এক ছিল সওদাগর, তার একটি ছেলে এক মেয়ে[৯৬]—ইত্যাদি বহুপরিচিত সাধারণ নৈর্ব্যক্তিক চরিত্রাবলীর সহায়তায় লোককথার অবয়ব গড়ে ওঠে। সমাপ্তিও ঘটে সর্বসুখকর নিশ্চিত নিরাপত্তায়— 'তারপর দুজনে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলেন।'[৯৭]

'গ্রামের লোকেরা তখন খুশি হয়ে ব্রাহ্মণকে আর তার বউকে ঢের টাকা দিয়ে বিদায় করলে।'[৯৮]

'এই বলে গড়ুই মাছ ঝুপ করে জলে গিয়ে পড়ল।'[৯৯]

অবশ্য অনেক সময়ই কথক গল্পের সমাপ্তিতে এক দীর্ঘ ছড়া বলেন—

আমার কথাটি ফুরোলো,
নটেগাছটি মুড়োলো।
কেন রে নটে মুড়োলি?
গোরুতে কেন খায়?

কেন রে গরু খাস?
রাখাল কেন চরায় না?
কেন রে রাখাল চরাস না?
বউ কেন ভাত দেয় না।
কেন রে বউ ভাত দিস না?
ছেলে কেন কাঁদে?
কেন রে ছেলে কাঁদিস?
পিঁপড়ে কেন কামড়ায়?
কেন রে পিঁপড়ে কামড়াস?
কুটুস্ কুটুস্ কামড়াব,
গর্তের ভেতর সেঁধোব।। [১০০]

বহু গল্পের সমাপ্তিই গ্রামজীবনের এই চলমান ছবিতে ঋদ্ধ হয়েছে। ছড়াটি যেন লোককথার জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে শ্রোতার মনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার যাদু-কাঠি।

ভিন্নতর সমাপ্তি খুঁজে পাওয়া যায় 'Indian Antiquiry' পত্রিকায় সংগৃহীত একটি গল্পে—

'Tailorbird my story is ended. Let me hear yours.'[১০১]

'অর্থাৎ টুনটুনি পাখি, আমার কথাটি ফুরোলো, এবার তোমার কথাটি শুরু হোক্'—বোঝা যাচ্ছে গল্প শোনার অতৃপ্ত ইচ্ছাই এই উক্তির পশ্চাতে কার্যকর। কথক ও শ্রোতার পারস্পরিক স্থান পরিবর্তিত হয়ে এবার শুরু হবে অন্য গল্প। বাংলা লোককথার ভাণ্ডারটি যে অফুরন্ত, সেই সত্যটিই এই ক্রমানুসারে গল্প কথনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

লোককথার যে যে শাখায় নীতিমূলক গল্পের প্রাধান্য সেগুলির সমাপ্তি ভঙ্গিমা ভিন্ন। শ্রোতার প্রতি উপদেশ বর্ষণেই গল্পগুলির পরিতৃপ্তি।

যেমন—

ক) অতএব বিদ্যা থাকিলে তাহার উপযুক্ত সম্মান অবশ্য হয়। [১০২]

খ) If god wishes to give a man anything, no one can tell in what way he will give it.[১০৩]

গ) উপদেশ—

বিদ্বানেরও ভুল হয় আর বড়োরও ভুল হয়
নয়কো দোষ যদি সে ভুল শোধ্ রে সুসময়। [১০৪]

প্রারম্ভ ও সমাপ্তির সর্বজনবেদ্য গতানুগতিকতা সত্ত্বেও লোককথার আর্কষণী শক্তি তীব্র। সম্ভবত জটিল বর্ণনা পরিত্যক্ত, নির্মল নদীর স্বচ্ছ স্রোতধারার ন্যায় কথার একমুখী গতিই এই জনপ্রিয়তার উৎস।

চুটকী লোককথার বর্ণনাভঙ্গী তুলনামূলকভাবে অধিক আকর্ষক। উদাহরণ স্বরূপ ' 'বিলালের কেচ্ছাবলা'-র কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

'কি আর করি, দৌড়াইতে দৌড়াইতে শেষে এক বাড়ির পেছনে এক বদনা দেখিতে পাইয়া তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িলাম, হাতিও পেছন ছাড়ে না। ... সেও ঢুকিল... বহু কষ্টে নাল দিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম হাতিও নাল দিয়া বাহির হইতেছে। ... দেখিলাম আস্তে আস্তে—হাতির সবটা শরীর বাহির হইল। কিন্তু বাহির হইলে কি হইবে, বাছার লেজ বদনার নালে আটকাইয়া গিয়াছে। এখন আর যায় কোথায়।'[১০৫]

যে হাতির প্রকাণ্ড শরীর বদনার নাল দিয়ে বাইরে আসতে পারে, তার সরু লেজটি সেখানে কিভাবে আটকে যায়, এই অসঙ্গতিই বর্ণনার গুণে শ্রোতার মনে প্রভূত হাসির খোরাক যোগায়।

কল্পনা ও বাস্তবের তন্নিষ্ঠ মেলবন্ধন ঘটেছে লোককথায়। কিন্তু ঘটনার ঠাসবুনন সত্ত্বেও বর্ণনা কদাপি ভারাক্রান্ত হয় না। বরং বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও সমগ্র সম্ভাব্যতার ঊর্ধ্বে এক বর্ণিল জগৎ শ্রোতার প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে ওঠে—

'তর্‌তর্ করিয়া হীরার গাছ বড় হইল, ফর্‌ফর্ করিয়া রূপার গাছপাতা মেলিল, রূপার ডালে হীরার শাখে টুক্‌টুকে সোনার ফল থোকায় থোকায় দুলিতে লাগিল। হীরার ডালে সোনার পাখী বসিয়া হাজার সুরে গান বাধিল। চারিদিকে মুক্তোর ফল, থরে থরে চম্‌চম্, তারি মধ্যে শীতল ঝরণায় মুক্তার জল ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিতে লাগিল।'[১০৬]

খ) পুনরাবৃত্তি

মৌখিক কথাসাহিত্যের একটি ধর্ম হল পুনরাবৃত্তি। লোককথা বিবৃতির ক্ষেত্রে এই পুনরুক্তির ব্যবহার দেখা যায় একাধিকবার। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভিন্ন সময়ে যখন একই অবস্থার বর্ণনার প্রয়োজন ঘটেছে; তখনই বিবিধ ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে পূর্বোক্ত ভাষারই অবিকল পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি 'বাঁদর স্বামী'[১০৭] গল্পটির কথা।

নদীতে 'সিনান' করতে গিয়ে 'ব্রাহ্মণের বিটি' বাঁদরকে কথা দিয়েছে যে তাকেই বিয়ে করবে। নিরানন্দ-বিবাহের পর প্রভাতেই বানরস্বামীর সঙ্গে পদব্রজে কন্যা চলল শ্বশুরবাড়ী। পথশ্রমে ক্লান্ত কন্যা মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করছে—

বাঁদর যায়, মা, ডালে পাতে
আমি যাই মা, রাস্তাতে।
সত্য করে বলরে বাঁদর
আর কতদূর আছে?
বাঁদর বললে —ঐ তো কাছে। [১০৮]

গল্পটিতে তিনবার ব্রাহ্মণ-কন্যা ঐ একই প্রশ্ন করেছে, বাঁদরও ঐ এক উত্তরই দিয়েছে। অবিরাম এই পুনরাবৃত্তি কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করেছে। সেই সঙ্গেই কোমল-

কন্যার পথশ্রমের ক্লান্তি, পথের দীর্ঘ দূরত্ব, স্বামীর স্নেহ আশ্বাস—এই সবই ঐ পুনরুক্তি মারফৎই প্রকাশিত হয়েছে।

পুনরাবৃত্তি যে কেবল ছড়ার ছন্দেই কথিত, তা নয়। সুললিত গদ্যের পুনরুক্তিও বহু সময় শ্রবণ-সুখকর। 'শঙ্খমালা' গল্পের দুঃখিনী শক্তিসুন্দর ও সওদাগর রূপলালের পুনর্মিলনের পর কথক ও শ্রোতার উভয়ের কণ্ঠ থেকেই যেন নির্গত হয়েছে জিজ্ঞাসা—

'তারপর কি?—তারপর কি?— তারপর কি?[১০৯]

অর্থাৎ গল্পের সমাপ্তিটুকু শোনার জন্য শ্রোতা যেমন উদ্‌গ্রীব ঠিক সেই রকমই চঞ্চলতা কথকের মনেও।

পুনরাবৃত্তি লোককথার যে ব্যবহারিক প্রয়োজনটি পূরণ করে, তা হলো এর সংরক্ষণ। কথকের স্মৃতিতে এই একই কথার একই ভাষার পুনরুক্তি সহজেই সংরক্ষিত হয়ে যায়। ফলে পরবর্তীকালে গল্পটি পেশ করার সময় অবিকল পুনরুদ্রেক সম্ভব হয় সহজেই।

গ) উপকাহিনীমালার সংযোজন

বাংলা লোককথার বর্ণনাভঙ্গি সাধারণত সরল একমুখী ঘটনা প্রবাহকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই টুকরো টুকরো আখ্যান এসে মূল কথার সঙ্গে যুক্ত হয়। সংস্কৃত আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে (যেমন হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি) এইভাবে একটি কথার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে রাখা অসংখ্য আখ্যানের উদাহরণ সুলভ। আমরা অনুসন্ধানে দেখি বাংলার বহু লোককথার মধ্যেও কাহিনীর পরতে পরতে মোড়া থাকে ভিন্ন গল্প। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি—চূড়ামণির কিস্‌সা,[১১০] Strike But Hear,[১১১] সাদ ও সাইদ,[১১২] ইত্যাদি দীর্ঘায়তন গল্পগুলি।

'চূড়ামণির কিস্‌সা' নামক লোককথাটিতে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর আধারে সাতটি স্বতন্ত্র লোককথার গ্রন্থনায় সমগ্র কিস্‌সা সমাপ্ত। জনৈক জ্ঞানপিপাসু শিষ্য (চূড়ামণি তার নাম) পথিমধ্যে যত আশ্চর্যজনক বস্তু দেখেছে, প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা শুনতে চেয়েছে গুরুর কাছে। ব্যাখ্যাত কাহিনীগুলি নিয়েই গ্রথিত হয়েছে 'চূড়ামণির কিস্‌সা'।

'Strike But Here' গল্পটিতেও নিজ পুত্রের হত্যাকার্যে উদ্যত রাজাকে একে একে তিন রাজপুত্র শুনিয়েছে তিনটি ভিন্ন গল্প। গল্পগুলি শুনে রাজার ভ্রান্ত ধারণা দূর হল। অবিমৃষ্যকারিতার ভয়ঙ্কর কুফল বুঝে রাজা পুত্রহত্যা থেকে বিরত হলেন।

'সাদ ও সাইদ' গল্পটিতেও বিশ্বাসঘাতিনী বাদশাহজাদী সাইদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। যত বড় পাপীই হোক না কেন অবশ্যই সে ক্ষমার যোগ্য হয়— এই যুক্তির সমর্থনে ভিন্ন এক লোককথার অবতারণা করেছে। শেষে তার উদ্দেশ্য পূরণ তো হয়েছেই এমনকি সাইদ তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদাও দিয়েছে। সুতরাং আমরা দেখছি যে উপ-আখ্যানগুলি সংযোজনের উদ্দেশ্য কেবল কাহিনীকে বৃহত্তর আয়তন দানই নয়, এগুলি কখনো সৎ পালনীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। কখনো অসৎকর্মের প্রতিফলকে প্রকট করে গল্পের সমাপ্তি সুখকর ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে।

বাংলা লোককথার চরিত্র-চিত্রণ বৈশিষ্ট্য

'What is incident but the illustration of character?'[১১৩]

—চরিত্রের বিশ্লেষণই ঘটনার অগ্রগতির কারণ, বাংলা লোককথার ভাণ্ডার যেহেতু বিশাল, সাধারণ লোকসমাজ থেকে পুরাণ কিংবা ইতিহাসের রাজকূল পর্যন্ত বিস্তৃত, সেহেতু সেই বিশাল ঘটনামালার কর্মযজ্ঞে এসেছে অজস্র চরিত্র। মানব ও মানবেতর, কাল্পনিক, অতিপ্রাকৃত এবং বাস্তব ইতিহাস-নির্ভর-যাবতীয় চরিত্রের উপস্থিতি এখানে। প্রতিটি চরিত্রই তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে যথাযথ সার্থক। মুখ্য ও গৌণ চরিত্ররা পারস্পরিক সাহচর্যেই পূর্ণ বিকশিত হয়েছে।

লোককথার অভিজাত পুরুষ সম্প্রদায়. সাধারণত ব্যক্তিপরিচিতি অপেক্ষা শ্রেণী চরিত্রকেই ভাবে, ভঙ্গীতে ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য কিংবদন্তীব রাজন্যবর্গ তাঁদের স্বচারিত্রিক মহিমাতেই আত্মপ্রকাশ করেন। তা বাদে, অবশিষ্ট লোককথার রাজবংশীয়গণ আচার-আচরণে এক বাঁধা ধরা ছকেই সীমাবদ্ধ থাকেন। বরং পুরুষ যেখানে মধ্যবিত্ত জীবনের মৃত্তিকা-ধূসর প্রেক্ষাপট থেকে আবির্ভূত, সেখানেই দেখা যায় লক্ষ্যের সঙ্গে বাস্তবের, ইচ্ছার সঙ্গে আদর্শের তীব্র সংঘাত। তাই কাঠুরিয়ার ছেলে দেড় আঙ্গুলে [১১৪] কিংবা সরকারের ছেলে রামধন [১১৫] ইত্যাদি চরিত্রেরা অতি মাত্রায় অস্থির, গতিময় ও প্রাণচঞ্চল।

পুরুষের তুলনায় বাংলা লোককথার নারী সম্প্রদায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আদ্যন্ত সক্রিয়। অবশ্য, সীমিত সংখ্যক নারী যেমন মধুমালা, পঞ্চকলা, ইলাবতী আদ্যন্ত রোমান্টিক কাব্যময়তায় পরিপূর্ণ—একমুখী বিলাসমন্থর জীবনেই অভ্যস্ত। এ ব্যতীত বেশীরভাগ নারীই লঘুসঞ্চারী অনায়াস জীবন উপভোগ করেনি, বহু সংকটের ঘূর্ণাবর্তেও আপন চরিত্রবলেই নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে চালিত হয়েছে। সৌন্দর্য্য, সাহস আর বুদ্ধিমত্তার জীবন্ত বিগ্রহ লোককথার নারী।

বাংলা লোককথার দৈব চরিত্রেরা দেবমহিমা অপেক্ষা মানব প্রকৃতিকেই যেন আঁকড়ে ধরেছে— তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতাগুলি যেন অতিরিক্ত আরোপিত, অন্যথায় হিংসা দ্বেষ, মায়া মমতা, স্নেহ-বাৎসল্য প্রকাশে তার আদ্যন্ত মানবরসেই অভিসিঞ্চিত।

'আন্তর্জাতিক স্তরে লোককথায় যে যুগ্মক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তা বাংলার লোককথার ক্ষেত্রেও সুলভ। এরা কখনো নায়ক-প্রতিনায়ক, কখনো সহোদর-ভ্রাতা, কখনো ভ্রাতা-ভগিনী, কখনো বা মনুষ্যেতর প্রাণিকুল, কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

সহযোগী চরিত্রাবলী

পুরুষ চরিত্র—নীলকমল-লালকমল,[১১৬] অরুণ বরুণ,[১১৭] আই-রাক্ষস-কাই-রাক্ষস,[১১৮] জয়-বিজয়,[১১৯] রূপলাল- সোনালাল,[১২০] আপাংদুলাং,[১২১] শীত-বসন্ত,[১২২] সাদ-সাইদ,[১২৩] বুদ্ধু-ভুতুম,[১২৪] ইত্যাদি।

নারী চরিত্র— কাল্‌পরী-নিদ্রাপরী,[১২৫] আকুলি-সুকুলি,[১২৬] উম্‌নো-ঝুমনো,[১২৭] রমুনা-

যমুনা[১২৮] ইলাবতী-লীলাবতী,[১২৯] ইত্যাদি।

পুরুষ-নারী যুগ্মক চরিত্র— জয়দেব-জয়াবতী,[১৩০] হারাই-ডোরাই,[১৩১] বুড়ো-বুড়ী,[১৩২] ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী,[১৩৩] ইত্যাদি। বিশেষতঃ মনুষ্যেতর প্রাণী যেখানে যুগ্মক চরিত্র গঠন করেছে সেখানে সাধারণত একটি নারী, অপরটি পুরুষ। দৃষ্টান্ত—শুক-শারী,[১৩৪] চড়া-চড়ী,[১৩৫] পিঁপড়া-পিঁপড়ী,[১৩৬] পেঁচা-পেঁচি,[১৩৭] ষাঁড়া-ষাঁড়ী,[১৩৮] ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী,[১৩৯] শেয়াল-শেয়ালনী, বাঘ-বাঘিনী[১৪০] ইত্যাদি।

অধিকাংশ যুগ্মক-সহযোগী চরিত্রাবলীর নামের ক্ষেত্রে ধ্বনিসাম্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য প্রতিযোগী চরিত্রাবলীর ক্ষেত্রেও দ্বৈত-চরিত্র লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিযোগী চরিত্রাবলী— ধ্বনিসাদৃশ-বিশিষ্ট দ্বৈত চরিত্র বহু ক্ষেত্রেই পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়—অর্থাৎ নায়ক-প্রতিনায়ক, নায়িকা-প্রতিনায়িকা। সেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। এই ধরনের কয়েকটি প্রতিযোগী যুগ্মক চরিত্রের উদাহরণ—

প্রতিযোগী পুরুষ চরিত্র— বাইশজোয়ান- তেইশজোয়ান· পালোয়ান,[১৪১] বাইশমণ্ড গাঁজাখোর- তেইশমণ্ড গাঁজাখোর,[১৪২] টেট্‌না- বেকুল,[১৪৩] বেন্দা-আফুট্যা,[১৪৪] রাজারপুত-উজীরের পুত[১৪৫] ইত্যাদি।

প্রতিযোগী নারী চরিত্র— সুয়োরাণী-দুয়োরানী,[১৪৬] কাঞ্চনমালা-রতনমালা,[১৪৭] সুখু-দুখু, [১৪৮] বড়-বৌ-ছোট-বৌ, [১৪৯] কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা,[১৫০] তিলভুস্‌কী-চালভুস্‌কী,[১৫১] পুষ্পবতী-রূপবতী[১৫২] ইত্যাদি অসংখ্য বিপরীতমুখী চরিত্রের সমন্বয়ে বাংলার লোককথা সমৃদ্ধ।

খলচরিত্র— কাহিনীর গতি ত্বরান্বিত করতে লোককথায় আবির্ভাব ঘটেছে দুর্বৃত্ত চরিত্রের। এই ধরনের খল চরিত্র প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীর। একদল ভয়াল অতিপ্রাকৃত বিদেহী ভূত-প্রেত ও রাক্ষস-খোক্কসের দল। এদের অনিষ্ঠ প্রবণতা সাধারণতঃ একমুখী—স্বাদু-মাংসল মানবদেহ আস্বাদনই এদের লক্ষ্য। কিন্তু যেখানে মানুষই অনিষ্টকারীর ভূমিকা নিয়েছে, সেখানে এসেছে রং ও রেখায় বহুমাত্রিক বিধৃতি। লক্ষণীয় এই নেতিবাচক কর্তৃত্বের সিংহভাগের সম্পাদিকা নারীগণ। 'শঙ্খমালা' গল্পের কুঁজী,[১৫৩] 'কাঞ্চনমালা' গল্পের মালিনী,[১৫৪] 'কিরণমালা' 'কিরণমালা' গল্পের হিংসুক ভগিনীদ্বয়[১৫৫] প্রমুখ পাপীয়সী চরিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসে। জাগতিক রুক্ষতা হিংসা দ্বেষ, ধূসরতার আদিম বর্বর পথেই এদের কুটিল রূপের উৎকট প্রকাশ ঘটেছে।

ফস্টার যাকে বলেছেন 'to reveal the hidden life at its source'[১৫৬] অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার বিবর্তন বা ক্রম উন্মোচন, সেই ধরনের জটিল চরিত্রের প্রাথমিক আভাস তুলে ধরেছে লোককথার কতিপয় নারী ও পুরুষ চরিত্র। 'শঙ্খমালা' গল্পের কাঠুরানী[১৫৭] বাৎসল্যের তীব্রতা ও পরসন্তান অপহরণজনিত পাপবোধের দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়েছে—

'ভাবিয়া চিন্তিয়া পথ না পাইয়া শেষে কাঠুরানী গর্জিয়া উঠিল—'জন্ম হইল গহন

বনে, আজ বসেছিস্ সিংহাসনে আমি পেটে ধরিলাম না তো কে ধরিল?—'আবার একটু নরম হইয়া কাঠুরানী বলে,—'ষাঠ, ষাঠ, ষাঠ —কোন যে ডাইনী চাঁদের গা ছুঁইল,—দাসী লো বাঁদী লো, ওঝা ডাক্।[১৫৮]

'কাঞ্চনমালা' গল্পে মালিনীর বোন্‌ঝি একদিকে রূপলালের প্রতি তীব্র প্রণয়, অপরদিকে নৈতিক সংকটের একান্ত বাস্তব অভিঘাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে—

বোনঝি শুধু শুনে—সে কার সুর? যার সুর তারি সুর।—মালিনীর বোনঝি সেই যেখানে সাধুর পুত্র একবার বসিয়াছিল, সেই ধূলার উপর আসিয়া বসিয়া থাকে!'[১৫৯] কিন্তু এই বোনঝিই কাঞ্চনের পট দেখে মাসীকে নিষেধ করেছে—

না কয়ো না এমন কথা মাসী ধরি তোমার পায়ে,
আমি কেমন করে আঁচড় দিব মাসী এই পটের গায়ে
যার রূপের কথা শুনি, এরূপ তাঁরি সমান মানি।[১৬০]

'মালঞ্চমালা' গল্পেও একইভাবে 'রাজা' অর্থাৎ মালঞ্চের শ্বশুর একাধিক বোধ ও বৃত্তির তীব্র দ্বন্দ্বে অন্য মাত্রা পেয়েছে। মালঞ্চের প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণায় যে রাজা বারংবার বলেছে—

"রাজকন্যা পেলেম বউ
কোটাল কন্যা ফেলে থোও"[১৬১]

সেই রাজাই গল্পের শেষে অনুতপ্ত চিত্তে আক্ষেপ করে। 'রাজা দুই চোখের জলে ভাসেন—মা! না বুঝিয়া বড় তোরে কষ্ট দিয়াছি। সে সব সম্বরিয়া মা আ! আজ আমার মুখ চাহিয়া ঘরে চল।.......রাজার রাজত্ব সকলি তোর; আমাকে ক্ষমা দে মা, ঘরে চল্।[১৬২]

ঠিক এইভাবেই পুনকাবতী,[১৬৩] 'পুষ্পমালা' গল্পের 'রাজা-রানী'[১৬৪] 'সোনাফর বাদশা',[১৬৫] 'রাজকন্যা অতুলা',[১৬৬] প্রমুখ অজস্র চরিত্র ব্যক্তিসত্তার ক্রমউন্মোচন এবং আত্মিক দ্বন্দ্ব সংকটের মধ্য দিয়ে সজীব ও প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

লোককথার এই যে অজস্র চরিত্র, এবং ঘটনা সামাজিক পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে জীবনের তীব্র দ্বন্দ্বময়তা নিয়ে বিকশিত হয়েছে, সেগুলি সম্পূর্ণই নির্ভরশীল প্রাণবন্ত ভাষাবিন্যাসের উপর। কথকের মৌখিক উচ্চারণের সঙ্গে শারীরিক অভিব্যক্তির সংযোগে লোককথার ঘটনা এবং চরিত্রের প্রত্যক্ষতা যেন দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। তাই বাংলা লোককথার ভাষা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে।

বাংলা লোককথার ভাষা বৈশিষ্ট্য

ভাষারূপ মৃত্তিকা দিয়ে লোককথার কথক সৃষ্টি করেছেন.একের পর এক লোককথার ছাঁচ, 'বুকের ভাষার কচি পাপড়িতে সুরের গন্ধের আসনে'[১৬৭] উপবিষ্ট হয়েছে লোকগল্পের আকর্ষক চরিত্রগুলি। জীবনের বহু বিচিত্র সমবায়ী ঐকতানকে ফুটিয়ে তোলে এই ভাষা। লোককথার ভাষায় তাই একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে জীবনের বিভিন্ন বাস্তবতা ও কল্পনাশ্রয়ী

রোমান্স, নাট্যোচিত দ্বন্দ্বময় বিক্ষোভ ও কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনাময় শান্ত সৌন্দর্য ইত্যাদি নানা বিরোধী বিচিত্র দিক। লোককথার বিশাল ভাণ্ডার থেকে আমরা কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

বিবিধ পরিস্থিতি বর্ণনা কৌশল

বর্ণনাভঙ্গীর অকৃত্রিম সুরবিন্যাস বাংলা লোককথাকে স্বচ্ছন্দ গতিদান করেছে। স্থূলতা, স্বার্থসেবা রোমাঞ্চকর ঘটনাবিন্যাস কলহের ভাষা সর্বত্রই শ্রবণসুভগ সুরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

রূপবর্ণনা—পায়ের নূপুর ভোমরা বাজে, হাঁটন পথে ফুল ফোটে, হাত-দুটি হাঁসের গলা, ঢেউ তরঙ্গ চুল, নাক-বাঁশী, স্বর্ণসোনার প্রতিমা—এই কন্যা কোটালের।[১৬৮]

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা—উপরে বৃষ্টিবজ্রের ধারা মেঘের গর্জন লক্ষকাড়া,—শব্দে...পাহাড় পর্বত উল্টে পৃথিবী চৌচির।—সাত পৃথিবী থরথর কম্পমান বাজ, বজ্র-শিল-চমক।[১৬৯]

যুদ্ধ-বর্ণনা—সুতাশঙ্খ বত্রিশফনা ছড়াইয়া বিষদাঁতে আগুন ছুটাইয়া লক্‌লক্ করিয়া উঠিয়াছে রাজপুত্রের তলোয়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঘরের ঝাড়বাতি চূর্ণ করে সুতাশঙ্খের বত্রিশ ফনায় গিয়ে লাগল।[১৭০]

সৌন্দর্যময় দৃশ্যাবলীর বর্ণনা—বসন্ত পাহাড়ে উঠলেন, যেন গজমোতির আলোয় ক্ষীরসায়রে হাজার চাঁদের মেলা পদ্মের বনে সোনার পাতে কিরণ-খেলা।[১৭১]

গৃহসজ্জা-ফুলের সজ্জা, ফুলের বাসর, লক্ষ ফুলের গন্ধে ভরা[১৭২]

আন্তরিক আপ্যায়ন—কে ভাই? টুনটুনি ভাই? এস ভাই, বোস ভাই, খাট পেতে দিই, ভাত বেড়ে দিই খাবে ভাই?[১৭৩]

প্রত্যাখ্যানের অপমান—সুয়োরানীর যে সাজা। ছেলে তিনটা সঙ্গে, এক নেকড়া পরণে, এক নেকড়া গায়, এ দুয়ারে যায় 'দূর দূর!' ও দুয়ারে যায় 'ছেই-ছেই'[১৭৪]

অনাবিল হাস্যস্রোত— গা-ময় তিলকছাপ, চিতা বাঘের ঠাকুরজামাই—তিননামাবলী গায়ে, তিন নামাবলী গলায়, বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, ফুলের ভারে টিকিঝোলা, খুঙ্গি পুঁথি ছাতি লাঠি সকল নিয়া ব্রাহ্মণ রাজার সভায় গিয়া উপস্থিত।[১৭৫]

—এই প্রকার অসংখ্য উদাহরণে লোককথা সমৃদ্ধ। ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশের যাবতীয় অভিনবত্ব বাঁধা পড়েছে এই ভাষা-পিঞ্জরে। চীনদেশীয় কবি লু-চি (Lu-Chi)যথার্থই বলেছেন—

'.......language traps Heaven and Earth in case of form......form is a net to capture the whole of experience experience as a whole.[১৭৬]

অলঙ্কার-বৈচিত্র্য

সৌন্দর্য কল্পনার বিস্তার ও রসসঞ্চারের তাগিদে কথকের বর্ণনায় অনায়াসে গৃহীত হয়েছে উপমা, উৎপ্রেক্ষা রূপকের সম্ভার। বিভিন্ন লোককথা থেকে কয়েকটি উদাহরণ

উদ্ধৃত হল—

'শঙ্খমালা'[১৭৭] গল্পে গর্ভবতী শক্তিসুন্দর 'যেন মুক্তামোতির ঝিনুকখান সোনার কদলীর মোচাখান।'[১৭৮]

এ গল্পেই সদ্য প্রসূতি শক্তিসুন্দরের কোলে সদ্যোজাত নীলমানিকের তুলনায় বলা হয়েছে—'চাঁদের কোলে চাঁদ ভরে পড়েছে। এ যে সাত স্বর্গের নিছনি কপালে জ্বলে টীকা।'[১৭৯]

রূপবর্ণনায় চাঁদেরই রাজত্ব। রাজকন্যা মধুমালা হলেন উগরানো চাঁদের লছমী,[১৮০] অপরূপ সুন্দর সাত ভাই চম্পা চাঁদের পুতুল, ফুলের কলি।[১৮১] আর চাঁদের বুড়ির পবিত্র সৌন্দর্য বর্ণনাতেও সেই চাঁদের আলো দুধের ফেনা[১৮২]

চাঁদকে আশ্রয় করে ব্যতিরেক অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে নিদ্রিত মধুমালার লাবণ্য বর্ণনায়—'ছার সে সমুদ্রের লক্ষ ভাঙ্গা চাঁদ—পলকে গড়ে পলকে ভাঙ্গে, এ চাঁদকে সোনার কুঠুরীতে, ফুলের ঢেউয়ে আস্তে কে অক্ষয় পুষ্পের বাঁধনে বাঁধিয়া দিয়া গেছে।'[১৮৩]

কদাপি সীমাহীন কল্পনার আকাশ থেকে পেড়ে আনা হয়েছে পুষ্পকরথকে, তুলনা করা হয়েছে দুরন্ত গতির সঙ্গে—'ছয় মাসের পথ দণ্ডে গেল যেন পুষ্পকের রথ'[১৮৪]

কল্পলোকের কৌলিন্যবর্জিত মৃত্তিকাশ্রয়ী বাস্তব ঘেঁষা বস্তু-সম্ভারও অনায়াসে উপমানরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। কখনো নিন্দার্থে, কখনো তুচ্ছার্থে, কখনো বা স্নেহ-আদর-আবদারের মন কাড়ানো অভিব্যক্তি প্রকাশে।

শিশু দেড় আঙ্গুলের শারীরিক বর্ণনায় মিশেছে কিন্তু বিস্ময়, তাচ্ছিল্য এবং তারি সঙ্গে সমর্থ দেহ-বলের প্রতি পরোক্ষ প্রশ্রয়—এক বিঘৎ ধানের চৌদ্দ বিঘৎ চাল। টলটলে হাতী হেন ছেলেটা।[১৮৫]

অগণিত দাসীর কর্মমুখর গুঞ্জন—দাসী বাঁদীর ঝাঁক যেন **মৌমাছির চাক** (শঙ্খমালা)[১৮৬]

যুদ্ধবিজয়ী রক্তস্নাত নীলকমল আর লালকমল—দুই রাজপুত্র যেন **রক্তজবার** ফুল। (নীলকমল আর লালকমল)[১৮৭]

ঐ গল্পেই শক্তিশালী রাজপুত্রের কবলে ভয়ঙ্কর দাসীর অসহায়ত্ব সকলের বড় রাক্ষসটা নীলকমলের হাতে পড়িয়া যেন **গিরগিটির ছা**।[১৮৮]

'ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী' গল্পে ব্রাহ্মণের ভীত অসম্বৃত অবস্থা—'ডরে ভয়ে **কেন্নোটি**'[১৮৯]

'শীত-বসন্ত' গল্পে সুয়োরানীর রুগ্ন তিন পুত্রের বর্ণনা—**ছেলেগুলি যে বাঁশের পাতা, পাটকাটি, ফুঁ দিলে উড়ে, ছুঁতে গেলে মরে।**[১৯০]

সুতরাং অতিরিক্ত অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি না করেই নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাংলার লোককথার বর্ণনায় অলঙ্কারের প্রয়োগ অভিনব আকর্ষণ যোগ করেছে। পল্লী বাংলার শ্যামলিমার সর্বস্তর থেকেই আহরিত প্রাণ-শক্তি অলঙ্কারগুলিকে দান করেছে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকত্ব।

ক্রিয়া-বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদি প্রয়োগে অভিনবত্ব

কথকের বর্ণনায় শিল্প-চমক সৃষ্টি করেছে—সমাপিকা ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ব্যবহার—

i) হাতী সাজিল, ঘোড়া সাজিল, সিপাহি সাজিল, সান্ত্রী সাজিল।[১৯১]

ii) ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহ খাবে।[১৯২]

iii) আজ সওদাগরের গাই মরে, কাল সওদাগরের বাছুর মরে, আজ সওদাগরের মাল্লা মরে, কাল সওদাগরের মাঝি মরে।[১৯৩]

বহুক্ষেত্রেই অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্রমিক অবস্থানে ঈপ্সিত ব্যঞ্জনার অব্যর্থ প্রকাশ ঘটেছে—

i) তাকে দেখেই পাড়াকুঁদুলি কোমর বেঁকিয়ে আঁচল ঘুরিয়ে, আঙুল মটকিয়ে গালাগাল শুরু করে দিলে।[১৯৪]

ii) হিংসুকে দুই বোনে মনের সুখে হাসিয়া গলিয়া পানের পিক্ ফেলিয়া আপনার বাড়ী গেল।[১৯৫]

—ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে, কথকের কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতনে, স্বরাঘাত ও সুরের তারতম্যে এই সকল পুনরাবৃত্তি অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।

বাংলা লোককথার বিশেষণ প্রয়োগে লক্ষ্য করা গেছে অভিনবত্ব। কোন জটিল কারুকৃতি চয়ন করে আনেননি লোককথার কথক, বাস্তব জগতাশ্রয়ী অথচ আশ্চর্য মৌলিক বিশেষণ প্রয়োগেই চমৎকৃত হন মুগ্ধ শ্রোতা—

i) আঁজলাপূরা তেল[১৯৬]

ii) দাঁতবিকটী রাক্ষসী[১৯৭]

iii) টুলটুলে মুখ;[১৯৮] ফুরফুরে গা,[১৯৯] ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না[২০০]

iv) রায়-বাঘিনী ননদী,[২০১] নিষ্পাষাণে সাধুর বেটী[২০২] ক্ষুর-পায়ে হাঁটন,[২০৩] বক্‌ঠেঙ্গী পা,[২০৪]

v) কপিলা-লক্ষণ বক্‌না[২০৫]

—লক্ষণীয়, বিশেষণ কখনো এক-শাব্দিক, কখনো বহুশাব্দিক, উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণনীয় ব্যক্তি বা বস্তুর যাবতীয় বিশিষ্টতাই ঐ একটি বিশেষণের সীমিত গণ্ডিতেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

শব্দ-প্রয়োগে নৈপুণ্য

স্বচ্ছন্দ বর্ণনা ভঙ্গীকে রোচক করে তুলেছে নানা অনুচর-সহচর এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিপুণ প্রয়োগ। 'মিতালী আর ফিতালী,[২০৬] জ্বালাতন-পালাতন,[২০৭] বিশ্রাম-টিশ্রাম[২০৮] লিখন-টিখন[২০৯] বুলায় ঢুলায়,[২১০] কিছু মিছু,[২১১] কুণ্ডলী-মুণ্ডলী,[২১২] গুটুর-মুটুর[২১৩] উষ্টি-গুষ্টি[২১৪] কুটি-মুটি,[২১৫] ইত্যাদি অসংখ্য অনুচর সহচর শব্দের অবিশ্রান্ত ব্যবহার করেছেন কথক।

স্মরণীয় বহু ব্যাকরণবিদ্ এই শব্দগুলিকে লোককথার দুর্বলতম সংযোজন মনে করে

থাকেন। তাঁদের বৈজ্ঞানিক মন এইসব শব্দ ব্যবহারে খুঁজে পেয়েছে বিভ্রান্তিকর গ্রাম্য সরলতা ও ব্যাকরণগত ত্রুটি। 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায়ের মন্তব্য—

'ঝুলির ভাষা সরল বটে, কিন্তু গ্রাম্য শব্দ এত অধিক প্রবেশ না করা হইলেও চলিত। লেখক শব্দগুলি বিশিষ্ট লোকের মুখে শুনিয়াছেন, কি নিরন্তর গ্রাম্য লোকের শিশু ভাষা অনুকরণ করিয়াছেন। ইহারা বৃথা ধোঁকা জন্মায়।'[২১৬]

—এই মনোভঙ্গী নিদারুণ একপেশে। কারণ, কোন সজীব ভাষাই ব্যাকরণের সূত্রাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না, বরং ভাষা অনুযায়ীই পৃথক চলিষ্ণু ব্যাকরণ গড়ে ওঠে। সেইরকম লোককথায়, লোকসমাজ চেতনা-বিবিক্ত অজস্র ভাবানুভূতির শিল্পায়িতরূপের জন্য প্রয়োজন পৃথক ভাষাশৈলী। মৃত্তিকাসুরভিত দেশজ শব্দের কাঁচা গলিপথেই লোককথার রসের সম্যক স্ফূর্তি সম্ভব।

দেশীয় ভাষার সক্রিয়তায়, ধ্বনিঝঙ্কারের সুখশ্রাব্য রব তুলেছে ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলীর বহুলপ্রয়োগ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

রাজসভায় জনতার সমাবেশ—রাজ্য **রম্‌রম্‌** সভা **গম্‌গম্‌** লোকজন **গুব্‌গুব্‌**[২১৭]

জলাশয়ের স্নিগ্ধতা—সরোবরের জল ঢেউয়ে নাচে **খল্‌খল্‌ ছল্‌ছল্‌**[২১৮]

উদ্বিগ্ন রাজার দোলাচল মনন—রাজার বুক **ধুকুধুকু**। রাজার মন **উসুখুসু**[২১৯]

বাধাহীন নিশ্চিন্তগতি—চিংড়ীমাছ চলেছে ঠ্যাং **গড়াগড়** ঠ্যাং **গড়াগড়** [২২০]

—দেখা যাচ্ছে ছন্দোবহুল এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি লোককথার সর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা সক্ষম।

বর্ণনায় আবিষ্ট কথক কখনো ব্যবহার করেছেন নামধাতুজ ক্রিয়াপদের।

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে বুদ্ধু ভুতুমের নিদারুণ বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতা ফুটেছে এইভাবে—'দুয়ারী তাহাদের দূর দূর করিয়া **খেদাইয়া** দিল।'[২২১]

হিংস্র রাক্ষসের উন্মাদনা—গাছপালা **মুচড়িয়া** নদীর জল **উছ্‌লিয়া** রাক্ষসের ঝাঁক দেশে **ছুটিল**[২২২]

প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলায় নারীর দৃঢ়তা—লক্‌লক্‌ শিখা—দাউদাউ আগুন গর্জে....ভূত প্রেত খা খা করিয়া আসে—মালঞ্চ বুকে স্বামী **সাপটিয়া** বসিয়া আছে।[২২৩]

স্থানীয় শব্দের অনুপ্রবেশ

জনসমক্ষে গল্পরসের জমাটী পরিবেশনের জন্য বহুক্ষেত্রেই কথকের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক শব্দাবলীর সহজাত ব্যবহার। কিছু দৃষ্টান্ত—

i) বামুন হাট হতে নিয়ে এল একটা **ছনছন গাবুরালি**।[২২৪] (পূর্ণযুবতী)

ii) তুই আসলে **দেওনিন্দি** (দেবতার নিন্দাকারী) **বত্ত-খণ্ডি**।[২২৫] (ব্রতখণ্ডনকারী)

iii) ভোরের দিকে **ঝুজকী** (অন্ধকার) থাকতে পাখ ছয় ভাইকে **লাক্‌ড়ান** দিয়ে **উগ্‌লে** দিলে।[২২৬]

ভাষার এই স্থানীয় বিশেষত্ব সর্বাধিক পুষ্টি পেয়েছে সম্ভবত কলহের ভাষাকে কেন্দ্র

করে। 'শঙ্খমালা' গল্পে কুটিলা কুঁজী গরলভরা ঈর্ষা প্রকাশ করেছে ভ্রাতৃজায়া শক্তিসুন্দরের প্রতি—

'রায়বাঘিনী ননদী কুঁজ ঘুরাইয়া নথবেসর উড়াইয়া তিন ঝাঁকর ঝ্যাকনা, 'তিন থ্যাকর থ্যাকনা' চৌদ্দ হাতে ভাজের গায়ের যত গহনা খুলিয়া নিল .... মুখের কাছে নথ নাড়িয়া কয়—'কুলবুলুনী' শঙ্খমালা ঢুলানী ও গঙ্গাজলী সৎকুমারী!—শঙ্খমণির শঙ্খ সুন্দরী ও শাঁখচুন্নী যা যা ঘর ছাড়িয়া বনে যা। গাছের ডালে ডালে মোমবাতির মশাল জ্বালা।[২২৭]

'ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী' গল্পে কর্মবিমুখ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিদারুণ ভর্ৎসনা—'কুলো মুলো ফেলিয়া খ্যাংরা নিয়া ব্রাহ্মণী গর্জে উঠিল—'হ্যাঁ পিঠে করতে বসেছি, চাল বাড়ন্ত, হাঁড়ি খট্‌খট্ এককড়ার মুরোদ নেই। পিটা খেকোর ভূত পিটা খাবে। —বেরো আমার বাড়ী থেকে।[২২৮]

—এইভাবে শিষ্টরুচির হানিকারক শব্দগুলি বাধাহীন, এক নিপুণ ছন্দোবহুল পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। শব্দগুলি ঝাঁঝালো, কিন্তু জীবনরসে পরিপূর্ণ।

চলতি স্থানীয় শব্দাবলীর বহুল অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও লোককথার ভাষার সম্প্রসারণশীলতায় রয়ে গেছে কিন্তু স্থানুপ্রকরণ, যেগুলি প্রাচীন বাগবিধির নিদর্শন। এরাও আঞ্চলিক, তবে প্রাচীন। কথক পরম্পরায় লোককথায় এদের অনড় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কয়েকটি নিদর্শন—

ক) সতীন তো উরী পুরী দক্ষিণ দুরী[২২৯]
খ) মায়ের পেটের রক্তের পোম্ আপন বলতে তিনুটি বোন[২৩০]
গ) রানীর পা উছল, রানীর চোক উখর[২৩১]
ঘ) রাজপুত্রের মন ছবছব[২৩২]
ঙ) কি করেন বামুন, জারে লোহা কাঁকড়[২৩৩]
চ) প্রভাত কালের ভিজা নিওর[২৩৪]
ছ) সূর্য্য কিরণের চল-বাতাস।[২৩৫]
জ) 'আথিবিথি' করিয়া রানী ডালা সাজাইলেন।[২৩৬]
ঝ) 'নির্গুম 'রাজে রাজকন্যা উঠিয়া বসিলেন।[২৩৭]
ঞ) নদীর জল 'সোম দোম'[২৩৮]
ট) জ্যোৎস্না চারিদিকে 'ভিন্ ফুট্‌ছে'[২৩৯]
ঠ) এক অপরূপ পরমা সুন্দরী কন্যার মুখ, তাহার 'গলান্ধারা' চোখের জলে সরোবর মুক্তায় ছাইয়া যায়।[২৪০]
ড) বাঘিনীর 'ডম্বুর' বাঘে ধরিয়া খায়।[২৪১]
ঢ) রাজার রাজ্য 'চার-চাকলা' বাঁধিয়া উঠে।[২৪২]
ণ) রাজা যে মোহনলাল চেৎনাই ভেৎনাই।[২৪৩]

—উদাহরণ সংখ্যা আর না বাড়িয়ে বলা যায়, অন্যত্র শব্দগুলির ব্যবহার লুপ্ত

হলেও, লোককথাতেই তারা স্থায়িত্ব পেয়েছে, লোককথার রূপ ও রসের পরিপুষ্টিতে সহায়ক হয়েছে।

প্রবাদের ব্যবহার

জীবন ঘনিষ্ঠ ভাষার স্বাভাবিক উদ্ধারের তাগিদে, লোককথার অনায়াসে গৃহীত হয়েছে নানা প্রবাদ। কয়েকটি নিদর্শন—

১) রুই কাৎলার আটকাট্ সবই কেবল মালসাট [২৪৪]

২) ভাল ভাল ছিলাম বোকা, কপালের না জানি লেখা[২৪৫]

৩) ঘরে থাকলে রামে মারে, বাইরে গেলে রাবণে মারে[২৪৬]

৪) নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা[২৪৭]

৫) যদি পাস সতীনের না, ছলে বলে লাথি মেরে পার হয়ে যা।[২৪৮]

৬) হাতি ঘোড়া গেল তল, ফড়িং বলে কত জল[২৪৯]

৭) সাপের হাঁচি বেদেয় বুঝি।[২৫০]

—এই প্রকার অজস্র প্রবাদ, লোককথার সমাজজীবন মন্থন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সগৌরবে। বাংলার লোককথায় ব্যবহৃত প্রবাদগুলিতে পাওয়া যায় বাঙালী ঘরেরই প্রাত্যহিক দ্বন্দ্ব-কলহ। সুতরাং ডঃ সুশীল কুমার দে'র অনুসরণে বলতে পারি যে লোককথার ব্যবহৃত প্রবাদে 'পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আস্তাকুঁড় পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়ে নাই।'[২৫১]

পরিস্থিতি বর্ণনায় প্রতীকধর্মিতা

ঘটনার তীব্রতার সঙ্গে আকস্মিকতাকে যুক্ত করার জন্য লোককথার কথক আশ্রয় নিয়েছেন বাংলার প্রকৃতির। লোককথার প্রকৃতি কেবল ঘটনার প্রেক্ষাপটই রচনা করেনি, পরবর্তী পরিস্থিতির ইঙ্গিত প্রদান করে গল্পের গতির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। অজস্র উদাহরণ থেকে সীমিত কয়েকটিরই উল্লেখ করা হলো—

'শঙ্খমালা' গল্পে ননদ কর্তৃক লাঞ্ছিতা শক্তির বনগমনের পর—'পালানের গাছ হেলিয়া পড়িল, তাল-সুপারি ভাঙ্গিয়া পড়িল, সাধুসরোবরের দু'পারের জল শুকাইয়া গেল।'[২৫২]

—নিপীড়িতা শক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং আসন্ন ভবিষ্যতের দুর্ঘটনার ইঙ্গিতের এইভাবেই অবধারিত প্রকাশ ঘটেছে প্রাকৃতিক চিত্রের মধ্যস্থতায়।

'কাঞ্চনমালা' গল্পেও অসৎ উদ্দেশ্যে গ্রথিত মালাটি মালিনী হাতে নিতেই 'ঘরের ভরা কলসীটা ঠাস করিয়া ফাটিয়া গেল।[২৫৩] ভগ্ন কলসীটি ইঙ্গিত করেছে কাঞ্চনমালার দুর্বিষহ যন্ত্রণার অশুভ ভয়াবহতাকে। সেই সঙ্গে মালিনীর অসৎ প্রচেষ্টার প্রতিও এক ধরনের সোচ্চার প্রতিবাদের সুরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুধু জীবনের অশুভ মুহূর্তগুলিই প্রাকৃতিক চিত্রপটে ধরা পড়ে নি, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অনাগত স্বপ্নও প্রতীকায়িত হয়েছে প্রকৃতির মাধ্যমে।

জীবন-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, বঞ্চিতা শক্তিসুন্দর সাগরদেবীর কৃপায় যখন পুত্রের সন্ধান পেলেন তখন 'আকাশে রাঙা মেঘে তারার সরে বিজলী খেলে গেল'[২৫৪] মাতা পুত্রের আসন্ন মিলনের শুভ মুহূর্তটিই যেন বিদ্যুৎচমকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে মধুরেণ সমাপয়েৎ-এর পর দুই রাজপুত্র বিবাহ করলেন ইলাবতী আর লীলাবতীকে এবং তারপরের দিনই 'দুপুর বেলা রাজপুরীর তাল গাছটা কিছুক্ষণের মধ্যে শিকড় ছিঁড়িয়া দুম করিয়া পড়িয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।'[২৫৫] —রাক্ষসীর আবাসস্থল এই তালটি ফেটে সমস্ত অশুভ ছায়াই নিমেষে দূরীভূত হয়ে গেল রাজ্য থেকে। স্বস্তি আর তৃপ্তি ও চিরস্থায়ী পবিত্রতার পুনর্জন্মই সূচিত হয়েছে প্রতীকে।

এইভাবেই প্রকৃতির বহিরাশ্রয়ী রূপের স্তরভেদ করে অন্তর্নিহিত গূঢ় শক্তির সঙ্গে এক প্রকার আত্মিক যোগ অনুভব করেছেন কথক, শুনিয়েছেন শ্রোতাদের। শব্দ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রতীকায়িত এই অসামান্য বাচনিক ভুবনে কথকের কণ্ঠ মিলে গেছে সমষ্টির ভাবনায়।

গদ্যভাগে ছড়ার মিশ্রণ

বাংলা লোককথার সুললিত গদ্য বর্ণনার মাঝে মাঝে অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত ছাড়া অনুরণিত হয়ে উঠেছে। ছড়াগুলিতে গভীরতর প্রতীকী ব্যঞ্জনা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা বৃথা। সাংসারিক গৃহস্থ জীবনের যাবতীয় টানাপোড়েন, অর্থাৎ মাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, বন্ধুর পরামর্শ, সাফল্যের উল্লাস, ব্যর্থতার ক্ষোভ, শিশুর সৌন্দর্য ইত্যাদি বহুবিধ অভিব্যক্তির বর্ণচ্ছটায় এই ছড়াগুলি রঙীন। লোককথার বিশাল ভাণ্ডার থেকে সীমিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

সদ্যোজাত কন্যার অফুরন্ত সৌন্দর্য—

টুকটুকে মেয়ে, টুলটুলে মুখ, হাত-পা-যেন ফুল তুক্‌তুক্[২৫৬]

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা—

উপরে বৃষ্টি বজ্রের ধারা মেঘের গর্জন লক্ষ্য কাড়া কত পাথর টলে, কত পাথর গলে।[২৫৭]

রসনালোভন খাদ্যের পরিচয়—

উপরে দেবে তেল পানি, নীচে দেবে নুন,
গেরস্তরা জানে ভাই তোর আমার গুণ।[২৫৮]

আত্মগরিমার কৌতুক—

সিংহের মামা আমি নরহরি দাস,
পঞ্চাশ বাঘে মোর এক এক গ্রাস[২৫৯]

স্নিগ্ধ এই ছড়ার ছন্দ পারস্পরিক উক্তি প্রত্যুক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'কলাবতী রাজকন্যা' লোককথাটিতে রানীদের উদগ্র জিজ্ঞাসা—

কোন্ দেশের রাজকন্যা, কোন দেশে ঘর?

সোনার চাঁদ ছেলে আমার তোমার বর।[২৬০]

উত্তরে কলাবতীর বক্তব্য—

কলাবতী রাজকন্যা মেঘবরণ কেশ,

তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।[২৬১]

—সংলাপের এই চাপান-উতোরের নির্ঝর গতির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে শ্রোতাবর্গের কৌতূহল যা গল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত থাকে টান টান উত্তেজনায় ভরপুর। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'The stops the sighs and even the coughing passed from one generation of reciters to the other preserving the original stories in a really wonderful manner like a flower-woman's wreath fresh wild life and fragrance.[২৬২]

—এইভাবে বাঙালীর হৃদয়ের অপূর্ব কবিত্ব শুভ্র ললাটে 'সিন্দুর বিন্দুর উজ্জ্বলতায়' শোভিত হয়েছে এই গল্পগুলিতে। এরা যথার্থই 'বঙ্গসাহিত্যের কিরীট।'[২৬৩]

লোককথায় গণনা ও পরিমাপ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

বাংলা লোককথায় সংখ্যা গণনা পদ্ধতিটি অভিনব। প্রায়শই দেখা গেছে যে বস্তু বা সময়ের পরিমাণ নির্দেশক সংখ্যাটি নিঃশ্বাসের এক ঝলকে উচ্চারিত হয় নি, কতকগুলি উপবিভাগ সৃষ্টি করে সংখ্যাগুলিকে অভিনব বিস্তৃতি দান করা হয়েছে। বক্তব্যের পক্ষে কয়েকটি উদাহরণ—

১) .... সাত সন্তান মাঝি কর্ণধার ....**তিন চোদ্দ-তের** কাছিতে চোদ্দ ডিঙা মধুকর আনিয়া ঘাটে বাঁধিল।[২৬৪]

২) কি করে সাধু, তিনশ-ষাট বছরে ভাঙ্গা এক নায়ে কাঞ্চনকে দিয়ে **চার-চোদ্দ-ছাপ্পান্ন** পাল তুলিয়া আপন নৌকা ছাড়িয়া দিল [২৬৫]

৩) ঝড় থমকাইয়া, বিদ্যুৎ চমকাইয়া **তেররাত্রি তেত্রিশ দিনে** কিরণমালা পাহাড়ে গিয়া উঠলেন। [২৬৬]

৪) রাক্ষসী সতীন পুত্রকে **তিন-ছত্রিশ** গালি দেয়। আপন-পুত্রকে ঠোনা মারিয়া খেদায়।[২৬৭]

৫) রাজা ধনরত্ন মণিমানিক্য জলা জাঙ্গল পাটন **বারো-বাহান্ন-সত্তর কুড়ি** রাজত্ব রাজগী যৌতুক দিয়া শুভক্ষণ উষায় জামাই কন্যা তুলিয়া দিলেন।[২৬৮]

৬) পুরীর **সাত-ছত্রিশ-তের** কুঠুরীপার মধুমালার ঘর।[২৬৯]

গণনার এই অভিনবত্ব সম্বন্ধে মতামত রেখেছেন দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর ধারণায়—'In the folktale we find in several instances a peculiar mode of calculation which certainly does not illustrate the mathematical proficiency of the calculator but proves that the mathematician is a woman.' [২৭০]

অর্থাৎ ডঃ সেনের মতে, গণনা পদ্ধতিটি গণকের দক্ষতা প্রমাণ করতে অপারগ,

তবে এটা অবশ্যই প্রমাণ করে যে কথক একজন মহিলা। তিনি তাঁর মতের পক্ষে এও বলেছেন যে কুড়ি অথবা পঞ্চাশের গুণিতকের এইভাবে সংখ্যার পরিচিতি দান করেন একমাত্র বঙ্গমহিলারাই। এছাড়াও ডঃ সেন বলেন পরবর্তীকালে যে সব পুরুষ গল্প বলিয়ের আবির্ভাব ঘটেছে, 'they had learnt the art from their grand-mother.'[২৭১] সেই কারণেই অবিকৃত পরিবেশনের খাতিরেই লোককথার গণনা পদ্ধতির এই একাধিক বিভঙ্গের ধারা বহমান।

সতত চলিষ্ণু লোককথার জগতে পরিমাণ প্রকাশের এই যে স্থবির রীতি তার অপর একটি কারণ আমরা উল্লেখ করতে পারি। লোককথায়, শ্রোতার কল্পনা সম্যক স্ফূর্তি লাভ করে। সেই সীমাহীন পরিতৃপ্তিকে সোজা হিসাবের মধ্যে বাঁধতে গেলে রসভঙ্গ হবারই সম্ভাবনা—এই বোধটিও সম্ভবত আত্মস্থ করেছেন কথক। তাই মধুমালার কুঠুরির সংখ্যা হয়ে যায়, সাত-ছত্রিশ-তের[২৭২], নৌকায় উড্ডীন হয় চার চৌদ্দ ছাপ্পান্ন পাল[২৭৩] অর্থাৎ সংখ্যা এখানে প্রধান নয়, প্রধান সেই অসম্ভব সংখ্যক চাহিদাপূরণের তৃপ্তি। প্রসঙ্গ ত বলতে পারি শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-এর কথা—

'তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশবাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে। তারপর ও সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! এখানে সে মনে মনে যতগুলো হইলে তাহার আশ মিটে, তাহাই কল্পনা করে।'[২৭৪]

—এই যে কল্পনার অবাধ রসমুক্তি, এরই সুর অনুরণিত হয়ে উঠেছে লোককথার শুষ্ক সংখ্যাগুলিতে।

অবশ্য, গণনার ক্ষেত্রে কতগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যার একাধিকবার আবির্ভাব উল্লেখের দাবী রাখে। সম্ভবত, লোকমনস্তত্ত্ব মন্থন করে নানা সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কারের অন্বয় মিশে আছে এগুলিতে। মনীষী ম্যাকডেভিড যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

'It is [the study of folkspeech] unextricably related to the historical and social and cultural forçes to which we are also heirs.'[২৭৫]

বাংলা লোককথার ক্ষেত্রেও খুঁজে পাওয়া যায় এমন কতগুলি সংখ্যা, লোকপ্রকরণে (Folkregister) যারা স্থায়ীরূপ পেয়েছে। উদাহরণ দিয়ে তথ্যাদি স্পষ্ট করা যাক্।

গণনায়, বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে 'সাত' সংখ্যাটি। সংখ্যাটি ব্যবহার করে অবশ্য বহুপ্রাচীন ঋকবেদ সপ্তনদী(১/৭১/৭) [২৭৬]

সপ্তমানুষ (৮/৩৯/৮),[২৭৭] সপ্তপুরী (৬/২০/১০)[২৭৮] ইত্যাদির উল্লেখ পাই। অথর্ব বেদে উল্লিখিত আছে 'ত্রিষপ্তা'[২৭৯] শব্দটি। 'ত্রিষপ্তা' পদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য বহু আলোচনা করেছেন। তিন ও সাত—এদুটির সম্বন্ধে যত কিছু থাকতে পারে, তা গ্রহণ করেছেন[২৮০] লোককথার ক্ষেত্রেও সাত শব্দটি হয়ে উঠেছে এমনই একটি সংকেত সংখ্যা যার মাধ্যমে বিবিধ অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ করেছেন কথক।

পরিমাণ-বহুলতা

১) ডরে থরথর রাজপুত্র **সাত-পরত** কাপড় চোকে বাঁধিয়া বিয়ে করিতে গেলেন।[২৮১]

অনাবশ্যক আড়ম্বর—সাতবার করিয়া তেল মাখে, সাতবার করিয়া মাথা ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, সাতবার করিয়া আরসি ধরিয়া দেখে তবু সুখুর মনের মতো হয় না।[২৮২]

সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান

১) **সাত-সাত মাস** শক্তির এইভাবে কাটিল।[২৮৩]

'সাত' সংখ্যাটি দ্রব্যের বিশেষণ হিসাবেও বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। **সপ্তদলমণি**,[২৮৪] **স্বর্ণমুখসাতশঙ্খ**,[২৮৫] **সাত-ফলাছুরি**[২৮৬] **সাত-হাত কাপড়**[২৮৭] ইত্যাদি ব্যতীত পৌরাণিক **সপ্তসমুদ্র**[২৮৮] **সপ্তলোক**[২৮৯] ইত্যাদির ধারণাও অবাধে স্থান পেয়েছে। যেমন—

১) **সাত-সমুদ্র** ছেঁচে এনেছে মানিক রতন। [২৯০]

২) ডরে **সাত-পৃথিবী** থর থর কম্পমান।[২৯১]

৩) বাসরের বাহির হইয়া াত-**নদীর** কিনারা ধরিয়া রাজপুত্র চলিতে লাগিলেন।[২৯২]

সাত ব্যতীত যে সংখ্যাটির বহুবার উপস্থিতি দেখা গেছে বাংলা লোককথায় সেটি তিন। শুভ কর্মে কিংবা অশুভ কর্মে দুক্ষেত্রেই সংখ্যাটির প্রাধান্য। নানা বিশ্বাসের ঘেরাটোপে তিন সংখ্যা অর্থবহ হয়ে উঠেছে। কয়েকটি নিদর্শন—

ব্যক্তি-সংখ্যা নির্দেশক

১) পাটকাটী **তিন ছেলে** নিয়া সুয়োরাণী গুমরে গুমরে আগুনে পুড়িয়া ঘর করে।[২৯৩]

খল চরিত্রের অভিব্যক্তিও তিন সংখ্যাটির আশ্রয়ে প্রকাশিত—

১) মালিনী ....হেঁচড়িয়া বোনঝিকে পাঁশ গাদায় নিয়া **তিন-থ্যাকনা** দিয়া লাথি মারিয়া থুইল।[২৯৪]

২) সাধুর বেটী **তিন খাঁকার** গলা শানাইয়া মায়ের দুয়ারে ধাক্কা দিল।[২৯৫]

শপথ, প্রায়শ্চিত্ত, ব্রত ইত্যাদি বিবিধ কর্ম

১) রানী-কোটালনী দুইজনে স্নান করিয়া **তিন-সত্য** শপথ করিলেন।[২৯৬]

২)দুইজনে সাক্ষীর **তিন-তারা** ডাকাইয়া গোয়ালিনীকে ডিঙাইয়া যান।[২৯৭]

৩) বৌ তিন-বার যম্‌পুকুর ব্রত করেছে, তোর মা তা ভেঙেছে।[২৯৮]

অশুভ যাদুশক্তির সূচক

১) She snapped her fingers **three times** and uttered the charm.[২৯৯]

২) **তিন-ফুঁয়ে** রাক্ষসী রানীর আয়ু-পাশা কোথায় পাঠাইল কে জানে।[৩০০]

সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান সূচক

১) কাঞ্চনের নৌকা **তিন তিন মাসে** এক গলুই যায়।[৩০১]

২) **তিন তিন বছর** গেল শঙ্খমণি আর বাড়ীই আসেন না। [৩০২]

কথক গণনার ক্ষেত্রে সংখ্যার সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রকাশ করতে বেছে নিয়েছেন হাজার শব্দটি, কখনো বা হাজারের গুণিতক। যেমন—

জনসংখ্যার প্রাচুর্য

১) রাজবাড়ীর **হাজার** ছুতার আমগাছে কুড়াল মারিল।[৩০৩]

মনুষ্যেতর প্রাণীর সংখ্যাধিক্য

১) কন্যা কথা বলে আর সেই **পাঁচহাজার এক** ছাগলের সারিবন্দী হাড়ের উপর জলের ছিটা দেয়।[৩০৪]

৩) The jackal made his appearance accompanied by a train of a **thousand** jackals, a **thousand** crows and a **thousand** paddy-birds.[৩০৫]

এইভাবে পাঁচ ছয়, আট, বারো তের, চৌদ্দ, ছত্রিশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলিকেও ব্যবহার করেছেন কথক। সীমিত কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হল—

১) কোটালিনী সমাদরে আনিয়া রানীর সাথে **পঞ্চব্যঞ্জন** পারশা দিলেন।[৩০৬]

২) যাইতে যাইতে ডিঙ্গা **ছয় মাসের** পথ[৩০৭]

৩) সওদাগর দেখে— ফুলফুটন্ত অন্ন। **অষ্টসম্ভার মাংস** পদ্মপাতে ভাসিয়া আসে।[৩০৮]

৪) বারো হাত **কাঁকুরের তের** হাত বিচি।[৩০৯]

৫) **তের রাত্রি** বারোদিন পৃথিবীর যত লোক আমোদ আহ্লাদ করে যত সামগ্রী ফেলিয়া ছড়াইয়া খায়।[৩১০]

৬) **চৌদ্দ** পুরুষের **চৌদ্দ** ভরা লক্ষ্মীর বাসর মধুকর।[৩১১]

৭) ডিঙ্গার **ছত্রিশ পাল** উড়াইয়া সাধু রাজ্যে মনের সুখে বাণিজ্য যাত্রা করে।[৩১২]

গল্প বর্ণনকালে কথকের সুরাশ্রিত ভাষায় কখনো বা সংখ্যার অনুক্রমিক প্রয়োগ দেখা যায়, যা শ্রোতার কাছে গতির এক দোলায়িত ছন্দকে আমন্ত্রণ করে আনে--

১) দুইদিন, তিনদিন চারদিন চলিয়াও সে মাঠের শেষ হয়না।[৩১৩]

২) একদেশ, দুইদেশ, তিনদেশ- এক রাজ্য দুই রাজ্য তিন রাজ্য ছাড়িয়া বাদশার ছেলেরা পিতার দোস্ত সওদাগরের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।[৩১৪]

৩) এক জঙ্গল ছাড়িয়া দুই জঙ্গল দুই জঙ্গল ছাড়িয়া তিন জঙ্গল, এইভাবে সাত জঙ্গল ছাড়িয়া তাহারা বেঘুর জঙ্গলে পড়িল।[৩১৫]

'শঙ্খমালা' গল্পে 'দিবস' গণনার অভিনব ঐকটি পদ্ধতি পাই। বিরহিণী শক্তি তিন তিন বছর পর একশ আটটি শঙ্খের হিসাবে তার বিরহ্ কাল গণনা করেছে। স্বামীকে নিবেদন করেছে সেই বিরহ্ অশ্রুতে গ্রথিত একশ আটটি শঙ্খে সমৃদ্ধ মালাটি— 'শঙ্খের জন্য তিন তিন বছর চোখের জলে মাথা গাঁথিয়া আপন গলায় পরে' শক্তির উক্তি-

লক্ষ ফোঁটা চোখের জল, পতি একে শঙ্খেরে পিয়াইলাম।
শত আট শঙ্খের, স্বামী আমি, এহি মালা গাঁথিলাম।[৩১৬]

এই ১০৮ সংখ্যাটির ঐন্দ্রজালিক জাদু শক্তি অথবা শুভদায়ক ক্ষমতার প্রসঙ্গ অন্যান্য লোককথাতেও এসেছে। সুবচনীর অন্যতম ব্রতকথাতে দেখা যায় দুখিয়া 'রাজবাড়ীর ১০৮টি হাঁস চরাইত'[৩১৭] তান্ত্রিক ধর্মাচরণে ১০৮টি নরবলির মাধ্যমে সিদ্ধিলাভের ঘটনাটি-

উল্লিখিত 'শঙ্খকুমার' গল্পে।[৩১৮] যাত্রার পূর্বে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখে (পূজার্চনার বিকল্প হিসাবে) প্রণাম জানানোর প্রসঙ্গটিও বাদ পড়ে নি—

'.......he had written in red ink the name of Durga at least one hundred and eight times.'[৩১৯]

দৈর্ঘ, উচ্চতা, বিস্তৃতি ওজন ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে পরিমিতির বিভিন্ন 'একক' ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষুদ্র পরিমাপ ব্যক্ত হয়েছে আঙ্গুলের সাহায্যে। যেমন—

১) এক **দেড় আঙ্গুলে** ছেলে তার **তিন-আঙ্গুলে** টিকি।[৩২০]

২) একখানে এক ছোট্ট ঘর তারি মধ্যে এক **আড়াই আঙ্গুলে** কামার **তিন আঙ্গুল** দাড়ি নাড়িয়া এক **পৌনে আঙ্গুলে** কুড়াল আর এক কাস্তে গড়িতেছে।[৩২১]

বৃহৎ পরিমাপের ক্ষেত্রে আঙ্গুলের বদলে উল্লিখিত হয়েছে হাতের মাপ। যেমন—

১) **বারো হাত** কাঁকুরের তের হাত বিচি।[৩২২]

২) তারপর বিবি ফৈলন খাঁকে ধরিয়া **দশ হাত** দূরে উড়াইয়া দিল।[৩২৩]

'বিঘৎ' পরিমাপকটি পাই 'দেড় আঙুলে' গল্পে— এক বিঘৎ ধানের চৌদ্দ বিঘৎ চাল।[৩২৪]

জমির বিস্তৃতি গণনায় এসেছে বিঘার প্রসঙ্গ। 'The story of Brahmadaitya' গল্পে দেখি—

He would make him a present of a hundred bighas of rent-free land.[৩২৫]

এই 'বিঘা' সম্পর্কে সংগ্রাহক লালবিহারী দে পাদটীকায় বলেছেন—

'A bigha is about the third part of an acre,'[৩২৬]

'ক্রোশ' এককটিও আবির্ভূত হয়েছে বিস্তৃতির ক্ষেত্রে—

ক) দেখিতে দেখিতে পাশের মাটি সাত ক্রোশ সরোবর হইয়া গেল।[৩২৭]

খ) দেখিতে দেখিতে পাহাড়াংশের ময়দানে '**ক্রোশ পাথার**' জুড়িয়া মদনকুমারের কানাৎ পড়িয়া গেল। [৩২৮]

অপেক্ষাকৃত আধুনিক মাপের একক 'গজ'-এর প্রসঙ্গ এসেছে 'Adventures of Two Thieves And their Sons'গল্পে।

He went before him in the highway about a distance of **200 yards**.[৩২৯]

ওজনের মাপনীতে স্থান পেয়েছে মাপের 'মন' -একক, দৃষ্টান্ত—

১) **ছয় মন** চাউলের ভাত চড়াইয়া দেওয়া হোক্, তাহারা একসঙ্গে দুইজনে বসিয়া খাইবে।[৩৩০]

নারীর সতীত্ব পরীক্ষার মাপনীটি হল 'তুলা' বা 'ফুল' পরীক্ষা। সতী-অসতী পরীক্ষা করার জন্য একধারে ফুলের মালা আর একধারে কন্যা চাপাতো। 'কণ্ঠ কমল পাখী' গল্পে[৩৩১] মেলেনি আশংকা প্রকাশ করেছে—'হুজুর আগে আপনার মেয়ে একটি ফুলের মালায় ওজন হতো। এখন দেখছি, তোলাবতীকে ওজন করতে বাগানের যত ফুল আছে

সবই লেগে যাচ্ছে।[৩৩২]

পাঁচতোলা, একতোলা কন্যার ক্ষেত্রেও দেখি 'রাজা নিজের কন্যাকে প্রতিদিন তুলাদণ্ডে ওজন করিতেন।'[৩৩৩]

—এইভাবে 'Axel Olrik'-এর নির্দেশিত নিয়মগুলি বজায় রেখেও বাংলা লোককথা নীরস গদ্যের আবৃত্তিমাত্র হয়ে ওঠেনি। একটি অপূর্ব শ্রুতিসুখকর ব্যঞ্জনার অনুভূতি, বর্ণনা-কৌশলের মাধ্যমে, অভিব্যক্তির চিত্রেও নূতনত্বে শ্রোতার মানসপটে জুড়ে বিরাজ করে চিরকাল। চিরচেনা পার্থিব উপকরণগুলি সংগ্রথিত করেও লোককথার জগৎ সম্ভব ও অসম্ভবের ঊর্ধ্বে রঙীন বিশ্বাসের তবকে মোড়া। ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ এই লোককথার বিস্তৃতি পেয়েছে বিভিন্ন শাখায়। বাংলা লোককথার সেই বিচিত্র শ্রেণীর পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে—

রূপকথা

বাংলার লোককথা-ভাণ্ডারের এক সমৃদ্ধ শাখা রূপকথা। 'রূপকথা' শব্দটির উদ্ভব প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, "'রূপকথা' শব্দটি 'অপরূপকথা' থেকেই এসেছে। তবে এ অপরূপ সংস্কৃত থেকে আসেনি, এসেছে প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে........

.......সংস্কৃত অপূর্ব শব্দটি সুপরিজ্ঞাত। অপূর্ব সুন্দরী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতায় অপরুব সুন্দরী > অপরুব সুন্দরী > অপরূপ সুন্দরী হয়ে এসেছে কালক্রমে।"[৩৩৪]

ইংরাজী 'Fairy Tale'-এর বঙ্গ রূপান্তর হয়েছে 'রূপকথা', আক্ষরিক বঙ্গানুবাদটি গ্রহণ করলে সম্ভবত 'পরীকথা' শব্দটিই গ্রাহ্য হতো। তবে সব রূপকথাতেই যে পরী আছে, তা নয়, অবশ্য ইংরাজী 'Fairy Tale'গুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেও পরীরা অনুপস্থিত। সে সম্বন্ধে স্টীথ থম্পসনের বক্তব্য— 'Fairy-tales seems to imply the presence of fairies but the great majority of these tales have no fairies.'[৩৩৫]

বরং বলা চলে জার্মান মরশ্যেন (Marchen)-এর মধ্যে রূপকথার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। 'Marchen' শব্দের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে—

'A Marchen is a tale of some lenth involving a succession of motifs or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never never land humble heroes kill adversaries, succeed to kingdoms, and marry princes.' [৩৩৬]

অর্থাৎ 'Marchen' হল এক ধরনের কাহিনী, যার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে, আর আছে মটিফ বা অনুকাহিনীর পরম্পরা। এই কাহিনীর ঘটনা ঘটে অবাস্তব পৃথিবীতে, যে পৃথিবীতে না আছে নির্দিষ্ট স্থান, না নির্দিষ্ট চরিত্র, এই অসম্ভবের দুনিয়ায় নিরহঙ্কার নায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে রাজত্ব ও রাজকন্যা দুই-ই লাভ করে।

উপরোক্ত এই বিশেষত্বই বাংলা লোককথার ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। 'রূপকথা' বলতে ঠিক যে ধরনের লোককথাকে বুঝি, সেখানে রাজা, রাজকন্যা, রাজপুত্র, মন্ত্রী উজীর প্রমুখ অভিজাত চরিত্রেরই পদচারণা। বাস্তব জীবন-নিরপেক্ষ ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া রাক্ষস খোক্কস ইত্যাদি নানা অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির টানাপোড়েনে নায়ক নায়িকার দুর্দৈবময় অভিযান এবং সব অশান্তির অন্তে অপেক্ষা করে আছে সুখী এবং পরিপূর্ণ জীবনের পূর্ণতা।

অবশ্য, বাংলা রূপকথায় পরীর আবির্ভাব একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। আর পরীর ভূমিকাও বিচিত্র। 'মধুমালা'[৩৩৭]গল্পে কাল্‌পরী-নিদ্রাপরী,[৩৩৮] ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারা মধুমালা এবং মদনকুমারের পালঙ্ক পাশাপাশি রেখেছে, ফলে নায়ক-নায়িকা উভয়েই উভয়ের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে— আর সমগ্র গল্পটির ভিত্তিও এই ঘটনার উপরই গড়ে উঠেছে।

ঋক্‌বেদে 'অপ্সরা' সম্প্রদায়ের যে চিত্র পাই— সেখানে তারা আকাশবিহারিণী।[৩৩৯] ঠিক এই বৈশিষ্ট্য বাংলা গল্পের পরীর ক্ষেত্রেও বজায় থেকেছে। 'কাঞ্চনমালা' গল্পে স্বর্গের অপ্সরা কাঞ্চনের সাত বোন্ ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করে।[৩৪০] এই সাত বোনই আবার 'স্বর্গের রথে সাতপরী সাত তারা সাত চন্দ্রের জ্যোৎস্না' —[৩৪১] অপ্সরা ও পরী এখানে সমার্থক।

পরী কখনো বা দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ। কাজফল বাদশা[৩৪২] গল্পে বাদশার ভয়কাতর উক্তি—

'তুমি এই পরীদের দেশে কি করিয়া আসিলে? এখানে যদি পরীরা তোমাকে দেখে তবে আর রক্ষা নাই। আমাকে তোমাকে দুইজনকেই মারিয়া ফেলিবে।'[৩৪৩]

আবার ঐ গল্পে যে পরী সাহায্যকারিণীর ভূমিকাও পালন করেছে, সে জলপরী।[৩৪৪]

তবে পরীকন্যার সর্বাপেক্ষা মধুর ভূমিকাটি হল নায়িকার—'রাজকুমার সফরচান আর সোবুজ নিশা পরীর কিস্‌সা,'[৩৪৫] ইত্যাদি গল্পে মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে 'পরীস্থান'-এর পরীর প্রণয় সম্পর্ক শ্রোতার মনকে রঙীন কল্পনায় ভরিয়ে তোলে।

ডঃ সুকুমার সেন 'পরী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— 'ছেলে-ভুলোনো গল্পে পরীর আবির্ভাব আরব্যরজনী কাহিনীমালা প্রচারের সময় থেকে,..........শব্দটি এসেছে ফারসী থেকে ইংরেজী ' Fairy' শব্দের সমার্থক। পরীর বিশেষত্ব—অসাধারণ সৌন্দর্য ও প্রজাপতির মতো পাখাযুক্ত এবং যথেচ্ছ গমনাগমন করতে পারে। বৈদিক কালের প্রবাদের ধারা রেখে এসেছে তবে কতক ইংরাজের পথ দিয়ে।[৩৪৬] --অর্থাৎ পরীর উদ্ভব-মূলে মিশ্র সাংস্কৃতিক প্রভাবই কার্যকর।

SDFML-এ বলা হয়েছে—

'There is a difference in the style of fairy tales........... even when the same series of motifs is used. But these differences are much less striking than the common style used in tales of this kind everywhere.'[৩৪৭]

অর্থাৎ অল্প-স্বল্প পার্থক্য থাকলেও বিষয়, এবং উপস্থাপনা ভঙ্গীর ক্ষেত্রে রূপকথাগুলি একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বা ছাঁচই অনুসরণ করে।

রূপকথার প্রারম্ভিক বাক্যবিন্যাসের রীতিটি হল--এক যে ছিল রাজা। কিন্তু এই বহুশ্রুত পরিচিত বাক্যটিই শ্রোতার মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে তার সুন্দর বিবৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

'যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে--এক যে ছিল রাজা।' [৩৪৮]

সুতীব্র প্রেমের জন্য দুরন্ত অভিযান ও অদৃশ্য অমোঘ নিয়তির পদে পদে শত্রুতা, অজানাকে জানার জন্য অদম্য অভিপ্রায়। দৈব এবং ঐন্দ্রজালিক শক্তি, অলৌকিক জন্মকথা, কুহক-মায়া ইত্যাদি রূপকথার নিত্য-সহচর। নানা বাধা-নিষেধ এবং নিষেধ ভঙ্গ জনিত কারণে ঘটনার বিপত্তি অধিকাংশ রূপকথার ঘটনার গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

বাংলা লোককথার মধ্যে রূপকথা আকারে দীর্ঘতম। স্থল-জল-অন্তরীক্ষ জুড়েই এর বিশাল সীমানা। চরিত্রের নির্বিশেষত্বও রূপকথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাত-সমুদ্র তের নদীর পার থেকে যে রাজপুত্র উড়ে আসে পক্ষীরাজ ঘোড়ায়, তাকে যে কোন সময় যে কোন দেশের, যে কোন জাতি আপন করে নিতে পারে। ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্র। [৩৪৯]

পরিবেশ ও চরিত্র চিত্রণের এই নির্বিশেষত্বের জোরেই রূপকথা যুগাশ্রয়ী হয়ে যুগাতীত।

তবু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে বাংলা রূপকথায় অসম্ভব সুন্দর এক অচিনপুরের গল্প থাকলেও যে সমস্ত উপাদানের সাহায্যে এই গল্প শরীর গড়ে উঠেছে, তার অধিকাংশই অতিমাত্রায় বাস্তব—কৃষিভিত্তিক বঙ্গসমাজের সর্বস্তর থেকেই আহরিত। তীক্ষ্ণ সমাজ চেতনা, দেশজ সমস্ত কিছুর প্রতি একান্ত ভালবাসা ও কল্যাণবোধ, রূপকথাগুলিকে লৌকিক জগতের সঙ্গে দৃঢ় সংসক্ত করে রেখেছে।

এই বিপুল বাস্তব উপাদানের উপর নির্ভর করে রূপকথা পাড়ি দিয়েছে আশ্চর্য সুন্দর দায় ভারহীন কল্পলোকে। গবেষকদের মতে, রূপকথার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা, সেই অন্বেষণ হল বাস্তব পৃথিবীরে নানা অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে সার্বিক পূর্ণতা ভূমিতে উত্তরণের ইচ্ছা—যে ইচ্ছা চরিতার্থ হয়েছে লোককথার কল্পভূমিতে--রূপকথা যাদের মধ্যে অন্যতম। ----

'This is evident when we consider the material studied in folklore, whether to be customs, beliefs, fairytales or folk-songs, for without exception in the product of dynamic mental processes, **the responses of the folksoul to either outer or inner needs, the expression of various longings fears, oversions or desires.**'[৩৫০]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতেও এই সমর্থন খুঁজে পাই--

'যে শক্তি আমাদের অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানবমনের আদিম সনাতন নীতিরই আধিপত্য, সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তি সম্পদ লাভ, পাপ-পুণ্যের জয়-পরাজয়--পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষ এই রাজ্যের অধিবাসী। [৩৫১]

দেখা যাচ্ছে, বাস্তব আদর্শ ও মূল্যবোধগুলিই কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে রূপকথায়। রূপকথা তাই বহুক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে রূপক কথা--

'.....folknarratives have not merely the surface meaning but contain also a less explicit perhaps in the main unconscious meaning which may call allergorical or symbolic.'[৩৫২]

অবশ্য বাংলার পল্লীকুটীরে, অলিন্দ আসরে যখন কথকের অনবদ্য বর্ণনায় এই রূপকথা যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন মুগ্ধ শ্রোতার নিকট কাহিনীর তত্ত্ব অন্বেষণ নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর অজগর অধ্যুষিত পরিত্যক্ত প্রাসাদের বন্দিনী ঘুমন্ত রাজকন্যার সম্মুখীন হওয়া, তারপর শ্বাসরোধকারী এক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন---রাজপুত্রের এই রোমঞ্চকর যাত্রা ও নির্বিঘ্নে ফিরে আসার মধ্য দিয়েই বাঙালীর রস পিপাসা চরিতার্থ হয়েছে। এইভাবেই রূপকথার দ্বন্দ্ব মধুর পরিবেশ, বাস্তব ও অবাস্তব মিলে অতিবাস্তবের প্রকাশ, সুরাশ্রয়ী ভাষা ও রূপসৃষ্টির বৈচিত্র্যই শ্রোতৃমনকে রসৈশ্বর্য্যের অমেয় সৌন্দর্য্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রূপকথার আলোচনা প্রসঙ্গে 'Cante Fable'-এর বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

SDFML এ এগুলিই cante Fable। [৩৫৩]

গীত-গদ্য মিশ্রিত কাহিনীগুলিকে শ্রদ্ধেয় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আখ্যা দেন গীত কথা। তাঁর মতে—

'রূপকথার কল্পনা সদ্য ঊষার শিশির সিক্ত ফুলের মতো মনোরথ। ... বঙ্গোপন্যাস গীতকথা-সুনিপুণগ্রথিত মাল্য। পূর্ণিমার আকাশে স্তরে স্তরে পর্দায় পর্দায় ভাষা কল্পনা, সমুদয় ক্রমশঃ উঠিয়াছে।[৩৫৪] এছাড়াও বলেছেন রূপকথা একেবারে দিদিমাদের এবং গৃহিণীদের একচেটিয়া সম্পত্তি, ইহাতে পুরুষের অধিকার খুবই কম। আর 'গীতকথা' প্রধানত পুরুষেরই অধিকারে।

কিন্তু দক্ষিণাবাবুর যুক্তিতেই স্ববিরোধিতা আছে কারণ তিনিই স্বীকার করেছেন—

'বঙ্গোপন্যাস গীতকথা বহু নারীও জানেন।... বঙ্গোপন্যাস কর্মক্লান্ত জীবনে ও চিন্তানিপুণ মনে অনবদ্য আনন্দ শিহরণ সঞ্চারিত করে এবং শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই ইহা সমভাবে ক্রোড়ে ধরিয়া আসিয়াছে।[৩৫৫]

অর্থাৎ দক্ষিণারঞ্জন, রূপকথা ও গীতকথাকে পৃথক গোত্রের অন্তর্গত করেছেন কিন্তু স্পষ্ট তফাৎ নির্দেশ করতে পারেন নি। একবার বলেছেন যে গীতকথায় রূপকথার মতো

রাক্ষস খোক্কস কথা প্রায়শই না। কিন্তু পরেই বলেছেন, 'গীতকথায় অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় বটে।[৩৫৬]

বাংলা লোককথার ক্ষেত্রে গদ্য ও গীতমিশ্রিত কাহিনীগুলিকে পৃথক কোন একটি গোত্রবদ্ধ করা সম্ভবত অনুচিত। কারণ, লোককথার একাধিক শাখায় এই গীতের অংশ বিদ্যমান, অবশ্য রূপকথার গোত্রজাত কাহিনীগুলিতেই এই গীতের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সাধারণত মন্ত্রোচ্চারণ, আশীর্বাণী, স্বগতোক্তি ইত্যাদি সংলাপমূলক অংশগুলিই গীতির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, বর্ণনাধর্মী অংশগুলি গদ্যে কথ্য বিবৃতির উপরেই নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে SDFML-এর বক্তব্য—

'The song sections usually in dialogue are the most important on emotionally charged elements of the story containing magical utterances, witty or wise replies to questions riddles saying of poets,musicians, birds or animals, wishes or calls etc. '[৩৫৭]

'ঠাকুরদাদার ঝুলি' গ্রন্থে সংগৃহীত লোককথাগুলিতে কিংবা 'চূড়ামণির কিস্‌সা' নামক লোককথার সংগ্রহ গ্রন্থে গীতের মাধুর্য লক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে আসন্ন ভ্রাতৃবিচ্ছেদের আশঙ্কায় কাতর ভগিনী গান গেয়ে শোক জ্ঞাপন করেছে—

সাত ভাইয়ের বইনী গো আমি
　　　　বাপের দুলালী
আজি তোমরা যাও বেভারে
　　　　আমার এক অঙ্গ খালি।[৩৫৮]

সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির মোকাবিলায় পারস্পরিক উক্তি-প্রত্যুক্তির ক্ষেত্রেও গীতের চাপান-উতোর প্রাধান্য পেয়েছে। 'সখীসোনা' গল্পে সত্যপ্রকাশের মহাসমস্যার সমাধানে সখীসোনার উদগ্র আবেদন প্রকাশিত হয়েছে গানের মাধ্যমে—

সত্যের সাক্ষী দাও গো বৃক্ষ সত্যের সাক্ষী দাও,
কে বা আগে এসেছিল, তুমি ওগো জানাও।
আমি সত্যবটবৃক্ষ, সত্য সাক্ষী দিব
আগে এসেছে উজীরপুত্র এই না সাক্ষী দিব
পরে এসেছে সখীসোনা, আমার শাখাতলে
সত্যসাক্ষী দিল বৃক্ষ এই না কথা বলে।[৩৫৯]

এইভাবেই গীতিগুলি লোককথার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতিতে, মানবিক অনুভূতির নানা উত্থান পতনের আবেগ-জারিত মুহূর্তে, এমনকি জীবনের আদর্শ সম্বলিত নানা নীতিজ্ঞান পরিবেশনে লোককথায় অনন্য মাত্রা সংযোজন করেছে এই সঙ্গীত। 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করেছেন শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন, তা বোধকরি যাবতীয় গদ্য-সঙ্গীতমুখর লোককথাগুলি সম্পর্কেই প্রযোজ্য—

The smell of fresh buds is in them the charm of poetry– of rural life,

the love of pure women, the wealth of juvenile mirth which is of eternal delight to the old, the renunciation of saints and the devotion of martyrs–have all combined in these unassuming tales rendering their sublime and beautiful in every sense of the words."[৩৬০]

ব্রতকথা

'ব্রত' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণে পাই ' বৃ-ধাতু থেকে ব্রত উৎপন্ন। এর মূল অর্থ প্রার্থনা করা বৃ+অত (র্ম্ম)=ব্রত। নিয়ম, সংযম। ধনাদি কামনায় নিয়মিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান। [৩৬১] অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠান ধর্মচারণার অঙ্গবিশেষ । পণ্ডিত নাগার্জুন বলেছেন, 'অপ্রতীত্য সমুৎপন্নো ধর্ম্মঃ কশ্চিন্ন বিদ্যতে [৩৬২]— অর্থাৎ এমন ধর্ম নেই যা কার্যকারণ সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন হয়নি। নাগার্জুনের এই মতটিকেই পোষণ করেছেন পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দ। টেলর পূজার্চনা ও ধর্মের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

Animism in its full development includes the belief in souls and a future state, in controlling deities and subordinate spirits these doctrinces practically resulting in some kind of active wordship."[৩৬৩]

অর্থাৎ আদিম মানব সমাজ নৈসর্গিক শক্তিসমূহে প্রাণারোপ করেছিল বলেই সর্বপ্রাণবাদ ও আত্মার ধারণার উদ্ভব ঘটে, সেই বিশ্বাসের প্রাতিস্বিক চলনেই ধর্ম-কর্মের উদ্ভব ঘটেছে।

ফ্রেজারের বক্তব্যেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়

...'religion consists of two elements a theoritical and a practical, a belief in powers higher than man and an attempt to propitiate or please them. Hence belief and practice are equally essential to religion which cannot exist without both of them."[৩৬৪]

অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহের অস্তিত্বের বিশ্বাস এবং নানা আচরণের মাধ্যমেও সেই বিশ্বাসের প্রদর্শনী উভয়েই ধর্মপালনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

—'Ritual is the instrument by which communication is renewed and strengthened."[৩৬৫]

প্রার্থনা সম্পর্কে 'Cultural Anthropology'গ্রন্থে বলা হয়েছে—

'Prayer may be defined as the use of words to bring about the favourable intervention of the powers of the universe in the affairs of men."[৩৬৬]

অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিসমূহকে প্রার্থনার মাধ্যমেই মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী করে তোলা হয়। এই প্রকার ঐন্দ্রজালিক চিন্তা, যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানের পশ্চাতেই কার্যকর। সুতরাং সেই ভাবনা থেকেই বলা যায় ব্রতধর্ম পালন করলেও মানবজীবন দৈব আশীর্বাদে ধন্য হবে।

'ব্রত' অনুষ্ঠানেরই অন্যতম অঙ্গ 'কথা'। কোন বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক যে লৌকিক কাহিনী, তাই ব্রতকথা। ব্রতধর্ম পালন করে কোন পুরুষ বা স্ত্রী যেভাবে দেবদেবীর আশীর্বাদ ধন্য হয়েছেন, সেই কাহিনীর ভক্তিভরে রোমন্থন, বর্ণন ও শ্রবণ করলে গৃহস্থ জীবনও সমৃদ্ধ হবে—এই বিশ্বাসই ব্রতকথার জনক।

প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে বশীভূত করার যে প্রচেষ্টা থেকেই ধর্ম এবং তারই অনুষঙ্গে ব্রতগুলির উদ্ভব, সেই প্রচেষ্টা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল অ-শ্রেণী ও অ-সম্প্রদায় কেন্দ্রিক। বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্রত অনুষ্ঠানের সামাজিকীকরণের ব্যাপারটিও লক্ষণীয়।

'আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রস প্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সম্মিলিত চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। ... অনার্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আর্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল—তাহা কেবল একটি বিশেষ জাতির পুরাণ কথা-রূপ রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপক রূপে প্রকাশ পাইল। এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে।'[৩৬৭]

সংস্কৃতির এই মিশ্রণ প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন মনীষী অবনীন্দ্রনাথ—

'এ এক রকমের প্রক্রিয়া, যেখানে ব্রতের নাম হুবহু বজায় রেখে তার অনুষ্ঠান ও উৎপত্তির ইতিহাস একেবারে বদলে ফেলা। আর এক রকমের কারিগরী হচ্ছে নামটা পুরো নয়তো আধাআধি বদলে দেওয়া—অনুষ্ঠান অনেকটা বজায় রেখে প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা এই রালদুর্গা ব্রতটি।' [৩৬৮]— অর্থাৎ প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে লৌকিক ব্রতের ব্রাহ্মণীকরণ হয়েছে। সাধারণ নায়কনায়িকার পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে চুপিসাড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের যা প্রাপ্য তা ব্রাহ্মণের কৌশলে আদায় করে নিয়েছেন কোন সময় বিকল্পিত রচনা করে, আবার কোন সময়ে লৌকিক ব্রতকে ব্রাহ্মণকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে পরিণত করে। রালদুর্গার ব্রতকথাটি লক্ষ্য করলে দেখি—'হরপার্বতী পাশা খেলছিলেন, হঠাৎ শিব পাশা ফেলে বললেন, 'কার জিৎ'? দুর্গা বললেন, 'কার জিৎ'? বড়ুর ব্রাহ্মণ ছিলেন পাশে বলে উঠলেন, 'মার জিৎ'। অমনি শিবের অভিসম্পাতে ব্রাহ্মণের হল কুষ্ঠব্যাধি। দুর্গার দয়া হল। তিনি তাঁকে সূর্য-অর্ঘ্য দিয়ে রালদুর্গার ব্রত করতে শিখিয়ে দিলেন। এখানে সূর্যও রইলেন, দুর্গাও রইলেন। সূর্যের প্রাচীন নাম 'রা' বা 'রাল' বোঝালে এটি সূর্যপূজা, কিন্তু রাল দুর্গা' বললে এটি দুর্গার ব্রত।'[৩৬৯] আবার এই ব্রতকথাটিতেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্যও বিস্তৃত হয়েছে যখন দেখি, নায়িকা রাজকন্যার জীবন সার্থক হয়েছে একমাত্র ব্রাহ্মণকেই (সে ব্রাহ্মণ যতই কুৎসিত এবং বিকলাঙ্গ হোক না কেন) পতিরূপে বরণ করে।

সাংস্কৃতিক সমন্বয় নির্ভরতার এই প্রকার অজস্র উদাহরণ ব্রতকথায় সুলভ। সেখানে লৌকিক চণ্ডী শিবানীর সঙ্গে অভিন্না হয়েছেন, 'বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী

এইরূপ আরও কত কি নামে। লৌকিক দেবসমূহের অনেকেই পৌরাণিক দেবতার নাম গুণ ও কর্মের আবরণে আত্মগোপন করে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করছেন।

একদিকে এই সমন্বয় নির্ভরতা, অপরদিকে বহু ব্রতকথাতেই মূল ধর্মবিশ্বাসের আদিম বীজকণা রয়ে গেছে সংরক্ষিত।

শ্রদ্ধেয় দীনেন্দ্রকুমার সরকার তাঁর 'বারোমাসের তের পার্বণ' [৩৭০] প্রবন্ধে ষষ্ঠী প্রসঙ্গে এই অনার্য ধারণার প্রাধান্যটিকে স্বীকার করেছেন—

লৌকিক ব্রতকথার সিংহভাগ জুড়ে বিরাজিতা দেবীষষ্ঠী। লোটনষষ্ঠী, অরণ্যষষ্ঠী, শীতলষষ্ঠী প্রমুখ বিবিধ তার রূপ। সর্বত্রই তিনি বৃদ্ধা। সম্ভবত এই বার্ধক্যই তাঁর পূজার বয়স নির্ণয় করতে সক্ষম। ইনি প্রাচীনতমা লৌকিক দেবী—সন্তানদায়িনী ও সন্তানের রক্ষাকর্ত্রী। [৩৭১] এই ধারণার উৎস সন্ধানে আবার দীনেন্দ্রকুমার আলোকপাত করেছেন অতীতে—

'আদিম মানুষের চিন্তায় যে কামনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো গৃহপালিত পশু ও মানব গোষ্ঠীসমূহের বংশবৃদ্ধি। ...তাই প্রজনন চিন্তার সঙ্গে পশুপালনমূলক জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ্য রেখেই দেবী ষষ্ঠী কল্পনার উদ্ভব। ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল। কারণ বিড়াল এক গর্ভে বহু সন্তান উৎপাদন করতে পারে। [৩৭২]

অর্থাৎ একদিকে বিড়াল ছিল, গোষ্ঠীগতভাবে একটি কুলপ্রতীকী আরাধ্য পশু উর্বরতাতান্ত্রিক ধারার বিকাশ ঘটলে ধীরে ধীরে সন্তান কামনা ও রক্ষণের প্রতীকে পরিণত হয়েছে—দেবী ষষ্ঠীর সঙ্গে সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে পড়েছে। সেকারণেই 'অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথা'য় [৩৭৩] বেড়ালের নামে দোষারোপ করে অপরাধিনী ছোটবউ-এর প্রায়শ্চিত্ত তখনই সার্থক হয়েছে যখন সে মরা বিড়ালের গায়ে দই মাখিয়ে জিভ দিয়ে চেটে সেই দই পুনরায় ভাঁড়ে তোলে।

এইভাবে অন্যান্য ব্রতকথাতেও আরাধ্যাদেবী এবং তাদের বাহন সম-শ্রেণীভুক্ত। ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায় [৩৭৪] পেঁচা-শাবকের প্রতি যত্ন ও নিষ্ঠাই খুশি করেছে দেবী লক্ষ্মীকে। আর মনসা পূজার অন্যতম ব্রতকথাতে এয়োরাজ-মুনিরাজ, আড়োশ-পাড়োশ [৩৭৫] ইত্যাদি নাগ সন্তানগণ যেন মনসা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাশালীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এইভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ এবং প্রাগার্য সংস্কৃতির পরিচয় ছড়িয়ে আছে ব্রতকথাগুলিতে।

বাংলা ব্রতকথাগুলির গঠন বিশ্লেষণে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় দুটি বিপ্রতীপ দল। একপক্ষ নিষ্ঠাভরে ব্রত পালন করে সুখের মুখ দেখছে, অন্যপক্ষ ব্রতকে তুচ্ছ করে পৌঁছে যাচ্ছে সর্বনাশের অতলে।

ব্রতকথার প্রচার্য দেবমহিমা, প্রচারক বঙ্গরমণী তাঁরা কখনও ব্রাহ্মণী, কখনওবা রাজরানী, কখনও বা সওদাগর পত্নী, আবার গোয়ালিনীরূপে ব্রতের কথায় প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহের কল্যাণ কামনায় দেবতার বর লাভ করে সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ, কোনও সময়ে

বা দেবতার কোপে নষ্টশ্রী ও নষ্টসম্পদ এবং পুনরায় আরাধনায় রুষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করে লব্ধৈশ্বর্যে গরীয়সী। [৩৭৬] সেকালের ব্রতকথার মধ্য দিয়ে ক্লিষ্টা অথচ কল্যাণী, দুঃখে খিন্না অথচ শুচিস্মিতা রমণীরূপই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে একাধিক ব্রতকথা রূপকথার লক্ষণাক্রান্ত। বলা চলে, বহু রূপকথাকেই ধর্মীয় প্রলেপে ব্রতকথায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেমন সঙ্কটার ব্রতকথা, ইতুর ব্রতকথা ইত্যাদি। অবশ্য রূপকথার দীর্ঘ বিস্তৃতি ব্রতকথায় পরিত্যক্ত হয়েছে, সংক্ষিপ্ততাই প্রধান গুণ।

ব্রতপালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাশীরাম দাস বলেছেন—

শুদ্ধচিত্তে এ ব্রত যে করে আচরণ
সর্বদুঃখ তরে সেই পাপ বিমোচন। [৩৭৭]

কিন্তু লৌকিক ব্রতকথাগুলি অবশ্য সর্বপাপমুক্ত হয়ে ঈশ্বরচরণ আরাধনাকেই একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেনি। এখানে জীবনের প্রতিটি ছন্দ অনুরণিত হয়েছে। সমাজমান্যতা, নৈতিকশুদ্ধতা, ঐশ্বর্যধনবৃদ্ধি স্বজন নিরাপত্তা ইত্যাদি বহুব্যাপ্ত পার্থিব চাহিদা পূরণের কল্পিত পরশপাথর এই ব্রতকথা। জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথায় ব্রতপালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জয়াবতীর বক্তব্য—

নির্ধনের ধন হয়
অপুত্রকের পুত্র হয়
জলে ডোবে না
আগুনে পোড়ে না
খাঁড়ায় কাটে না
হারালে পায়
মরে গেলে বেঁচে ওঠে। [৩৭৮]

স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্রতকথা কেবল ধর্মাচরণ নয় 'কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া।'[৩৭৯] একের আকাঙ্ক্ষা গোষ্ঠীর ইচ্ছারসে জারিত হয়েই প্রকাশিত —

'When a girl observes a rite for the growth of paddy or for rain, she observes it not for herself alone but the common desire of the community, these rites are really observed for collective social prosperity.'[৩৮০]

সন্দেহ নেই, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের কামনাই ব্রতকথার প্রত্যক্ষ নিয়ামক মানসিকতা, তবুও লোকসমাজের প্রতি ব্রতকথার দায়বদ্ধতা সেখানেই থমকে যায় নি।

এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর মতে—

'Nothing could be more perfect educationally than the bratas which Hindu society has preserved and hands to its children in each generation,

as perfect lesson in worship, so in the practice of social relationships or in manners.Some of these bratas like that which teaches the service of the cow, or the sowing of seeds or some which teaches to set out on the elements of geography and astronomy have an air of desiring to import which we now distinguish as secular knowledge. They appear, in fact, like surviving fragments of an old educational scheme."[৩৮১]

এইভাবে স্মরণাতীত কাল থেকেই ব্রতকথাগুলি গুরুভক্তি, ধর্মে বিশ্বাস, গৃহধর্মে আস্থা, ইন্দ্রিয় সংযম, দৈনন্দিন ব্যবহারিক শিক্ষা ইত্যাদি যে বিবিধ সদ্‌গুণের প্রচার করে আসছে, তারই ফলশ্রুতিতে পারিবারিক সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে ব্রতকথা মুক্তি পেয়েছে সর্বমানবীয় ক্ষেত্রে। ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রগঠন থেকে শুরু করে জাতীয় সামাজিক কল্যাণ সাধনের নানামুখী অভীপ্সাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে প্রভূত নৈতিক প্রেরণা সঞ্চার করেছে এই ব্রতনির্ভর লোককথাগুলি।

পশুপাখিকথা

'Animals play a large role in all popular tales.'[৩৮২]— লোককথাগুলিতে পশুপাখির আবির্ভাব ঘটেছে অজস্রবার। কিন্তু যে ধরনের লোককথায় পশুপাখি কেন্দ্রীয় চরিত্র সেই লোককথাগুলিই 'পশুপাখিকথা' আখ্যা লাভের যোগ্য—ইংরেজীতে 'Animal Tale'।

SDFML-এ বলা হয়েছে—

'A story having animals as it principal characters one of the oldest forms, perhaps the oldest of the folk-tale and found everywhere on the globe at all levels of culture.'[৩৮৩]

—অর্থাৎ প্রধান-চরিত্রে পশুপাখির ভূমিকা কার্যকর এবং পৃথিবী-বিস্তৃত এই ধরনের লোককথাই সম্ভবত প্রাচীনতম সৃষ্টি। এই প্রাচীনত্বের কারণ অনুসন্ধানে পৌঁছে যেতে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

আদিম মানব ছিল প্রকৃতির হাতে বড় অসহায়, প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আত্মরক্ষার তাগিদে কখনও গুহার অভ্যন্তরে, কখনো বৃক্ষশাখায় অন্যান্য জীবজন্তুর পাশাপাশি তার জীবনচর্যা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষ দেখেছে পশুপাখির তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম বুদ্ধি, নিবিড় বোধশক্তি, গভীর প্রজ্ঞা, ক্ষেত্রবিশেষে অসীম দৈহিক শক্তি—

'To early man, the animals were different only in shape not in nature. He witnessed their acuteness and wisdom in many cases also their superior strength and cunning. He admired, loved, feared.' [৩৮৪]

এই ভাবেই আদিম মানুষের মানসিক বিকাশের সঙ্গেও পশুপাখির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যার প্রত্যক্ষ ফল টোটেম সংস্কার—

'Thus throughout the folk-belief and religious of the world animals

figure as reicarnated ancestors creators or as aids to creator, scouts messengers and earth divers.' [৩৮৫]

নিজেকে কোন মনুষ্যতর প্রাণীর বংশধর রূপে পরিচয় দিত আদিম মানুষ, সেই প্রাণীটিই সেই মানবগোষ্ঠীর টোটেম বা কুল-প্রতীক।

প্রথমে পশুশিকার, তারপর পশুপালন ও পশুচারণ এবং অবশেষে কৃষি—সর্বক্ষেত্রেই মানবের অর্থনৈতিক জীবন তথা অস্তিত্বের নির্ভরস্থল পশুই। সুতরাং যে পশুপাখি মানুষের পরিচালক অভিভাবক, সামাজিক অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের অন্যতম মুখ্য সহায়, তাদের কেন্দ্র করেই আদিম পূর্বপুরুষের কল্পনাশক্তি বিকশিত হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষত, আদিম মানুষের। কল্পনাশক্তি তার আরণ্যক ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই এই আরণ্যক সহবাসী জীবকুলকে ঘিরেই কাহিনীর জাল বুনেছে সে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির বলেই নিজ প্রকৃতির বিবিধ বৈশিষ্ট্যের রেণু খুঁজে পেয়েছে এই মনুষ্যেতর চরিত্রগুলিতে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই পশুপাখি কথাগুলিকে 'উপকথা' নামাঙ্কিত করেন। অভিধানে 'উপকথা' শব্দের অর্থ এই প্রকার—

১) উপ (সদৃশ) কথা (আখ্যায়িকা) বিকশিত গল্প উপাখ্যান।[৩৮৬]

২) কথার অন্তর্গত কথা, সংক্ষিপ্ত কথা।[৩৮৭]

এ প্রসঙ্গে আমরা সুকুমার সেনের বক্তব্য স্মরণ করতে পারি—

'উপকথা শব্দটি সংস্কৃতে অপরিচিত নয়, যদিও কোন প্রামাণ্য বইয়ে এ শব্দের প্রয়োগ মেলেনি, কোন প্রাচীন অভিধানেও শব্দটি উল্লিখিত নয়। তবে অর্বাচীন সংস্কৃত ইডিয়মে 'কথোপকথন' আছে, উপকথাও আছে। উপকথা মানে ছোট সাইজের গল্প, অথবা কোন গল্পের মোড়কের মধ্যে ভরে দেওয়া তার থেকে ছোট অথবা অবান্তর গল্প (অর্থাৎ যাকে ইংরাজীতে বলে (boxed-in-tale)[৩৮৮]

—অর্থাৎ ক্ষুদ্র বর্ণিল লোককথাই উপকথা আখ্যাত হবার যোগ্য। কেবল Animal Tale-কে উপকথা আখ্যা দিলে নামকরণ অ-ব্যাপ্তি দোষমুক্ত হতে পারে। সুতরাং 'Animal Tale'-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে বাংলায় 'পশুপাখিকথা' বেছে দেওয়া হয়েছে।

স্মরণীয়, পশুপাখির উৎপত্তি ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য সূচক কাহিনীগুলি কিংবা পশুপাখি যে সব লোককথায় দেবতা রূপে পূজিত, সেই সব লোককথাগুলিকে পৃথক পুরাকথা বিভাগেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মানুষের পশুতে এবং পশুর মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা সম্বলিত কাহিনীগুলিও অনুরূপ পৃথক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে Stith Thompson বলেছেন—

'Animals appear in myths especially those of primitive peoples where the culture hero often has animal form though, he may be conceived of as acting and thinking like a man or even on occasion of having human

shape animals also appear when the tale is **clearly not in the mythical** cycle. it is such non-mythical story that we designate by the simple term **animal tales.** They are designed usually to show the cleverness of one animal and the stupidity of another and their interest usually lies in the humour of the deceptions or the absurd predicaments the animal's stupidity leads him into.[৩৮৯]।

সুতরাং 'Animal Tale' সেই জাতীয় অলৌকিকতামুক্ত পশুকেন্দ্রিক গল্প যেখানে, পশুপাখির আকৃতি নয়, স্বভাবগত বিশেষত্বের ওঠাপড়ায় গল্পরস জমাট বাঁধে। এই স্বভাব আবার মানবীয় নানা অনুভূতির প্রতিচ্ছবি।

বাংলার পশুপাখিকথাগুলিতে যে সকল মনুষ্যেতর জীবের কলকাকলি ও গর্জন শোনা যায় তাদের মধ্যে কাক, চড়ুই, হাতি, পিঁপড়ে, বাঘ, শিয়াল, কুমীব, চিংড়ী, কাঁকড়ারাই দলে ভারী। প্রতিটি দেশের লোককথাতে সেই দেশজ মাটির ছোপ কিছু না কিছু থাকে। আমাদের এই বাংলার পশুপাখির গল্পেরও নিজস্ব কিছু আয়োজন আছে।

প্রথমত শেয়ালের কথাই ধরা যাক্। শেয়াল বাংলা পশুকথায় এক বিশিষ্ট পরিচিত চরিত্র। চতুর শৃগালের চরিত্রে বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান ঘটেছে। একজাতীয় গল্পে বাঘের সঙ্গে শৃগাল মাতুল ভাগিনেয়র অম্লমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, নানা কূটবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। যেমন বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগিনে[৩৯০]'দুষ্টুবাঘ[৩৯১] 'বাঘ খেকো শিয়ালের ছানা[৩৯২] ইত্যাদি গল্পগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

অপরটি শৃগালের নেতিবাচক খল ভূমিকাটিও প্রকট হয়েছে কুমীরের সঙ্গে কপট বন্ধুত্বের মাধ্যমে (বোকা কুমীরের কথা,[৩৯৩] শিয়াল পণ্ডিত [৩৯৪]) কিংবা নাপিতের সঙ্গে পদে পদে শত্রুতার মধ্য দিয়ে (রত্নার শ্রাদ্ধ [৩৯৫] ইত্যাদি গল্প দ্রষ্টব্য)।

এই মিশ্র চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন মনীষী Sten Knew। তাঁর মতে—

'The Jackal is not throughout described and characterized in a uniform way. Usually he is clever and dexterous animal, which is always prepared to assist those who have suffered wrong in asserting their right. In some tales, however, he acts in a different way. He is malicious and treacherous but usually he is defeated in the end.'[৩৯৬]

একদিকে প্রাজ্ঞ বিচারশক্তি অপরদিকে খলতা ও বিশ্বাসহন্তা শৃগাল চরিত্রের এই বৈপরীত্যের কারণ সম্পর্কে Sten বলেন যে, পাণ্ডিত্যের গুণের পরিকল্পনা আর্যভাষীয় সমাজ থেকে এসেছে, অপর পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুর্যগুণ অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সম্প্রদায়েরই অবদান এবং শিয়ালের ধূর্ততা ও চাতুরীই এ সম্পর্কিত বিশ্বাসের আদিমতম স্বরূপ।

সুতরাং পৃথক সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বাংলার মাটিতে মানুষের চিন্তায় অনুপ্রবেশ করেছে জন্ম দিয়েছে বাংলার নিজস্ব ধারার।

শৃগালের মতো বাংলা পশুপাখি-কথায় একটি বিশিষ্ট চরিত্র বাঘ। অপরিসীম দৈহিক শক্তি ও নরমাংস লোলুপতা থাকা সত্ত্বেও বাঘ সর্বদাই মানুষের বুদ্ধির নিকট বারংবার পর্যুদস্ত হয়েছে। এই বাঘ কেবল নির্বোধই নয়, গল্প বিশেষে ভীরুও বটে। যেমন 'বুদ্ধুর বাপ' গল্পে।[৩৯৭] বাঘের এই চারিত্রিক অধঃপতন সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও ইহার চরিত্র অনুরূপ ভয়ঙ্কর.....কিন্তু উত্তর ব্রহ্ম অঞ্চলের উপকথায় ব্যাঘ্র চরিত্রে কেবল বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়, অতএব মনে হয় বাংলা উপকথায় ব্যাঘ্রের চরিত্রের এই বিশিষ্ট পরিকল্পনা পূর্ব-দক্ষিণ অর্থাৎ মালয়-ব্রহ্ম হইতে বাংলা দেশে আসিয়াছে, তারপর বাংলাদেশ হইতে তাহা কালক্রমে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রচার লাভ করিয়াছে।[৩৯৮]

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে রূপকথা কিংবা কিংবদন্তী অথবা পুরাকথা অন্যান্য শাখায় বাঘ তার সমগ্র বিভীষিকা নিয়ে মূর্তমান। তার শক্তি কখনো বা শুভদায়ক। (স্মর্তব্য 'মালঞ্চমালা'[৩৯৯]গল্পে বাঘ-বাঘিনী চরিত্র, কিংবা দেবতা দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গ[৪০০])। কিন্তু এই পশুকথাতেই সে নির্বোধ ভীরু। এক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বটি কার্যকর, তা সম্ভবত সার্বজনীন। বাস্তব জীবনে হিংস্র বাঘের মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম, তার বিরুদ্ধে জন্ম নিয়েছে একাধারে ভীতি ও ক্ষোভ। ভীতির অনুষঙ্গে এসেছে শ্রদ্ধা, যার প্রকাশ পুরাকথা বা রূপকথায় বাঘের সাহায্যকারী সুহৃদের ভূমিকায়। আর ক্ষোভের রূপান্তর ঘটেছে প্রতিশোধস্পৃহায়, যার প্রমাণ ব্যাঘ্র সংক্রান্ত পশুকথাগুলি। সেখানে বাঘকে সর্বক্ষেত্রে পরাস্ত ও উপযুক্ত শাস্তিদানের মাধ্যমে মানুষের আক্রোশ তৃপ্ত হয়েছে। 'চড়াই আর বাঘের কথা'[৪০১]'বাঘের উপর টাগ',[৪০২] 'বাঘের রাঁধুনি[৪০৩] ইত্যাদি গল্পে এই কাল্পনিক প্রতিশোধের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

ঠিক এক ভাবনার প্রভাবে, ব্রতকথায় যে বিড়াল ষষ্ঠী[৪০৪]বাহনরূপে সম্মানার্হ, এই বাংলা পশুকথায় সে গৃহস্থের অনিষ্টকারী ভিন্ন কিছুই নয়। 'মজন্তালী সরকার'[৪০৫] এই রাশভারী নাম গ্রহণ করেও সমাজের ক্ষোভে সে হয়ে যায় 'লক্ষ্মীছাড়ি বিড়ালনী'[৪০৬] স্ব-দোষে হাস্যাস্পদ হয় প্রতিক্ষেত্রে, আর রান্নাঘরের ঠাকুরঝি [৪০৭] হয়ে হাঁড়ি খাবার অপরাধে তার গলায় জোটে দড়ির মালা।

লাঞ্ছিত হয়েছে সেই বায়সপক্ষীও চতুরতার জন্য যার খ্যাতি লোকসমাজের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে—

'Crow is the trickster and references to crow as a character, occur in various South Western Plains Indians and other tales.'[৪০৮]

অর্থাৎ কাক ধূর্ত এবং প্রবঞ্চক হিসাবে পৃথিবীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য গল্পে চিত্রিত। কিন্তু তার ধূর্ততা লোলুপতা এবং অসৎ পরিকল্পনা বারংবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে চড়ুই টুনটুনি ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র পক্ষীর নিকট। চিংড়ীর

বুদ্ধি[৪০৯] গড়ুইমাছ[৪১০] চড়াই আর কাকের কথা[৪১১]ইত্যাদি গল্পগুলি দ্রষ্টব্য।

এই ধরনের পশুপাখিকথাগুলিতে সর্বদাই ক্ষুদ্র এবং দুর্বলের জয়ই ঘোষিত হয়েছে—

'Amongst the animals themselves, the smaller out-wits fiercer. The goat defeats the bear and the jackal the tiger.'[৪১২]

দুর্বলের নিকট পরাজিত হয়েছে শক্তিমান পশুপক্ষী। না বলা যায়, প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারীর স্বরূপ প্রকাশে অক্ষম লাঞ্ছিত লোকসমাজ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আশ্রয় নিয়েছে এই লোককথাগুলির। সেকারণে সর্বদাই দৈহিক শক্তির অভাব পূরিত হয়েছে মস্তিষ্কের বুদ্ধির দ্বারা। ফলে গল্পগুলিকে উপলক্ষ্য করে ক্ষুদ্র ও অক্ষমের প্রতি করুণাঘন সহানুভূতিই ফুটে উঠেছে।

মানুষ বহুক্ষেত্রেই পার্শ্বচরিত্র হিসাবে উপস্থিত থেকে কাহিনীর গতি ত্বরান্বিত করেছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে সম্পর্ক তখন নিতান্ত প্রতিবেশীর সমাজ সদস্যের মতোই সহজ স্বাভাবিক। এই ধরনের লোককথাগুলিতে নরনারী চরিত্র নির্দিষ্ট নামধারী নয়। এক জোলা[৪১৩] এক নাপিত [৪১৪]ইত্যাদি নির্বিশেষ চরিত্রের অবস্থিতি লক্ষণীয়। কাহিনীগুলিতে মানুষের উপর পশুপাখির একছত্র বিজয় ফুটে উঠেছে টুনটুনি আর রাজার কথা,[৪১৫] টুনটুনি আর নাপিতের কথা[৪১৬] ইত্যাদি গল্পে, তেমনি মানুষ অপেক্ষা শক্তিশালী পশুও চূড়ান্তভাবে অপমানিত হয়েছে বাঘের উপর টাগ,[৪১৭] বাঘ বর,[৪১৮] ইত্যাদি গল্পে।

কয়েকটি পশুপাখিকথায় মানুষের হিতকারী বন্ধুর ভূমিকা পালন করে লোককথার পরিণাম রমণীয় করে তুলেছে পশুপাখির দল। সাক্ষী শেয়াল,[৪১৯] শেয়াল ঘটক[৪২০] ইত্যাদি গল্পগুলি মানুষ-পশুর মেলবন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি।

বাংলা পশুপাখিকথা আলোচনায় নীতিকথা বা 'Fable' -এর প্রসঙ্গটি অবশ্যই উল্লেখ্য। 'SDFML'-এ বলা হয়েছে--

'When the animal tale has a definite moral usually expressed at the end of the story it is known as a fable. The fable uses the animal tale not to explain animal characteristics or behaviour, but to indicate a moral lesson for human beings or to satirize the conduct of human being.[৪২১]

অর্থাৎ পশুর রূপকে বা পশুকে উপলক্ষ্য করে রচিত নীতি উপদেশমূলক কাহিনীই হল নীতিকথা। এই নীতিকাব্যটি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়েছে গল্পের সমাপ্তিতে। বাংলার পশুপাখিকথাগুলিতে কিন্তু স্বতন্ত্র নীতিবাক্য অনুপস্থিত। কৌতুক রসের উচ্ছ্বাসিত প্রবাহেই মিশে থাকে নীতিবাক্যের ফল্গুধারা। 'টুনটুনি আর রাজার কথা' গল্পে টুনটুনি যখন জয়ের গর্বে বলে ওঠে--

নাককাটা রাজারে
দেখতো কেমন সাজারে।[৪২২]

—মুহূর্তেই স্বার্থপর মদগর্বী রাজার পদানত রূপটি শ্রোতাকে সচকিত করে। এইভাবেই পশুকথাগুলিতে বিশ্লেষিত হয়েছে মানুষের দুষ্টবুদ্ধি, অন্যের সারল্যের সুযোগে নিজ স্বার্থসিদ্ধি ক্ষমতার অবাঞ্ছিত প্রকাশ ইত্যাদি। পশুপাখির কথাগুলি ব্যতীত বাংলা লোককথার অনান্য শাখায় নীতিকথার অবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। দুষ্টের দমন, ধর্মের জয় ইত্যাদি মহৎ পরিণামসূচক ইঙ্গিত কেবল ফুটে ওঠেনি। কথক কর্তৃক স্পষ্টভাবেই নীতিবাক্য উচ্চারিত হয়েছে উইলিয়াম কেরী কর্তৃক সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে একাধিক গল্পে এই নীতি কথার উপস্থিতি লক্ষ্য করি। যেমন-- ১০৫ সংখ্যক গল্পের শেষে কথিত হয়েছে,

'অতএব পরের দুঃখ নিবারণের নিমিত্তে সাধু ব্যক্তিদের আপন প্রাণত্যাগও সহ্য হয় কিন্তু পরের দুঃখ সহিষ্ণুতা করিতে পারেন না।[৪২৩] অথবা ১০২ সংখ্যক গল্পের শেষে দেখি 'অতএব অত্যন্ত লোভ করা ভাল নয়।'[৪২৪]

—ব্যঙ্গ ও কৌতুকের কোনও রূপক আবরণ গল্পগুলিতে নেই। সোজাসুজি ঘটনার মাধ্যমে ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়-- এই নীতি প্রকাশিত হয়েছে। পশুচরিত্রের উপস্থিতিও আবশ্যিক শর্ত নয়, তাই বাংলায় নীতিকথাশ্রিত গল্পগুলির বিস্তৃতি পশুপাখিকথার সীমিত পরিধি অতিক্রম করে স্থায়িত্ব পেয়েছে লোককথার অপর শাখাগুলিতে। Strike But Hear[৪২৫] গল্পে যখন অবিমৃষ্যকারিতার কুফল বর্ণিত হয়, কিংবা অন্যের জমিতে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী যখন তিলসন খাটেন[৪২৬] তখন কেবল সমাপ্তিই নয় সমগ্র গল্পগুলিই নীতিজ্ঞানের আকর হয়ে ওঠে।

ভূতপ্রেতের কথা

বাংলায় 'ভূত' শব্দটি চলিত আছে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে, শব্দটির আকৃতি তৎসম, তবে অর্থে একটিতে তৎসম অপরটিতে তদ্ভব।........ভূত তদ্ভব অর্থে হল, যা ফুরিয়ে গেছে কিন্তু যার আদল লুপ্ত হয়নি। অর্থাৎ শব্দটির তদ্ভব রূপ ভূয়ো যা বোঝায়। ভুয়ো মানে যার ভিতর সারবস্তু কিছু নেই তবে বাইরের খোলার বা আবরণের আদল আছে। ভূত তাই যেন মরা মানুষের না মরা ছাঁচ।[৪২৭]

Stith Thompson বলেছেন—'There is so much variety in the general concept of ghost that one can hardly make an exact definition of it.'[৪২৮]

সত্যই 'ভূত' বা বিদেহী প্রেতাত্মার সার্থক সংজ্ঞা বা উদ্ভব সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণা গড়ে তোলা দুরূহ কাজ। প্রাগৈতিহাসিক নানা আদিম বিশ্বাসের প্রত্ন-কণিকাই সম্ভবত এই ভূতের অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল।

আদিমকাল থেকে বর্তমান অবধি সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন যে ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তার মধ্যে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে গতিশীল হয়ে আছে নিজস্ব পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কে অজস্র চিন্তার অসংখ্য কল্পিত সমাধান। সেই কল্পনার অন্যতম বলা যায় প্রধানত বিশ্বাসটিই হল সর্বপ্রাণবাদ। অর্থাৎ আকাশ, মাটি, জল, হাওয়া, গাছ, পাহাড় প্রভৃতি যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে অলক্ষ্য শক্তি, ঐ অলক্ষ্য শক্তির সূত্রে যেমন এসেছে

প্রকৃতির উপাসনা, দেবতার কল্পনা, যাদুশক্তিতে আশ্বাস ঠিক তেমনি আসছে মৃতের আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই এর সৃষ্টি।

'In spite of endless diversity of details, the general principles of this investigation seem comparatively easy of access to the enquirer of he will use.....two keys....first that spiritual beings are modelled by man on his primary conception of his own human soul and second that their purpose is to explain nature on the primitive childlike theory that it is truely and throughout 'Animated Nature'[৪২৯]

এইভাবেই মগ্ন চৈতন্যের অতলে অনির্দেশ্য ভয়ের উত্তরাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জন্ম দিয়েছে 'আত্মা' নামক ধারণাটি যা ভূতেরই সমার্থক—

'All unusual natural phenomena are held to be inhabited by good or evil spirits among these primitive people the concepts of soul and ghost are not sharply differentiated. Ghosts are greatly feared, however since the spirit of the dead can return to earth to the reward or punish their living relatives.[৪৩০]

নানা আধিভৌতিক ধ্যানধারণায় প্রভাবিত পূর্বপুরুষগণ তাদের জীবনে অপরিহার্য নানা ধরনের নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে কেবল উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তারা চাইল এদের অবলোকন করতে, প্রত্যক্ষ অবলোকের মাধ্যমে এই শক্তির কাছাকাছি যেতে এবং রূপলাভে ধন্য হতে সেকারণেই আপন দৈহিক রূপকেই আরোপিত করল এই সব বিদেহী চরিত্রে। 'He (primitive man) finds the clay for molding the body of the gurdian spirit'[৪৩১]

ফলে অতিপ্রাকৃত ভূতপ্রেতের তথা বিদেহী শক্তির নবত্বারোপ [Anthromorphization][৪৩২] ঘটল।

বাংলার লোককথাগুলির ক্ষেত্রে এই ভূত প্রেতের চরিত্র অবলম্বনকারী গল্পগুলি যথেষ্ট আকর্ষক। সেখানে ভূতের স্বরূপ সম্পর্কে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—

'ভৌতিক ভীতির মূল শুধু প্রত্যক্ষের অগোচর বাস্তব কায়াহীন সত্তার অস্তিত্ব কল্পনায় নয়, প্রাণের নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মৌলিক অসহায়তা ভীতির মধ্যেই এর বীজ রয়েছে। উপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে, সোহবিভেৎ তস্মাদ একাকী বিভেতি—উপনিষদের মিতভাষিণী উক্তিতে এই যে নিঃসহায় একাকিত্বের অহেতুক ভীতি এই-ই ভূতের ভয় প্রভৃতি সর্ববিধ অনির্দেশ্য আতঙ্কের বীজ।[৪৩৩]

অনেক ধরনের ভূতের সাক্ষাৎ মেলে, তারা পরোপকারী। অসম্পূর্ণ কর্ম সম্পূর্ণ করতে, মানবকে বিপদের পূর্বাভাস দিতে অথবা রক্ষকের ভূমিকায় তাকে দেখা যায়।

বাংলা ভৌতিক লোককথাগুলিতে জমাট বেঁধেছে—অদ্ভুত রস। ফলে এইসব বিদেহী

সত্তাগুলির শারীরিক অবয়ব ও আচরণ সম্পর্কে গড়ে উঠেছে নানা বিচিত্র ধারণা। স্মর্তব্য এই ধারণার অনেকখানিই অথর্ব সংহিতায় পূর্বাভাসিত হয়েছে।

অথর্ব বেদে পিশাচ বা রাক্ষসদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'ব্রহ্মাদ্‌কিষ ক্রাব্যাদে ঘোরচক্ষসে দ্বেষো ধত্তমনবায়ং কিমীদনে।

ব্রাহ্মণদ্বেষী, মাংসাশী, ঘোরদর্শন, ইতস্তত বিচরণশীল রাক্ষসদের প্রতি তোমরা দ্বেষ কর।[৪৩৪]

ভূতেদের আনুনাসিক-স্বর বৈশিষ্ট্যটির প্রতিরূপ অথর্ব বেদে উল্লিখিত হয়েছে। পিশাচের সম্পর্কে উক্ত হয়েছে—

'অরায়াংচ্ছুংকিঙ্কিণো বজঃ পিঙ্গো অনীনশৎ। ৮/২/৩

অর্থাৎ অলক্ষ্মীকরকিষ্‌কিষ্‌ শব্দকারী হিংসকপিশাচ্‌দের পীতবর্ণ সর্ষপ বিনাশ করুক'[৪৩৫]

এই কিষ্‌কিষ্‌ শব্দেরই প্রায় অবিকল প্রয়োগ করেছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

'খানিকক্ষণ বাদে শুনতে পেলে অনেকগুলো ভূত কিচ্‌মিচ্‌ করে বাড়ীর উঠোনে জড়ো হলো। নাকে নাকে কথা কয়ে কেউ বলছে আমি ঐ তঁখন সেঁতখানায় ছিঁনু, কেউ বলছে, আঁমি পঁগারের ধাঁরে ছিনু।'[৪৩৬]

বাংলা লোককথায় দেখি ভূতেরা দলবদ্ধ। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ'—'একটা বনের মাঝে ভূতেদের আড্ডা ছেলো।....যেখানকার যত ভূত সেইখানে থাকে।[৪৩৭] স্মরণীয় এই বনে অবস্থানের ধারণাটিও অথর্ববেদ বহন করেছেন।—'বনে যে কুর্বতে ঘোষং'[৪৩৮] অর্থাৎ বনে যারা শব্দ করে।

অবশ্য একক অবস্থানকারী ভূতও দুর্লভ নয়—

এক পেত্নী শেওড়া বনের বটগাছের উপর থাকত [৪৩৯] এছাড়া হেঁড়ে ভূত,[৪৪০] খোনা ও বাঁটুল[৪৪১] খোনা আর মোনা,[৪৪২] ঘোরো ভূত [৪৪৩]—এরা সাধারণত একাই বিচরণ করতে পছন্দ করে।

ভূতের নৃত্যরত রূপটিও লোককথায় সুলভ—'বনে যেতেই একটা ভূত নাপিতকে দেখে নাচতে লাগল।[৪৪৪]

মনুষ্যজাতির উপর উপদ্রব শুধু নয়, তাদের গৃহজীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলা অনিষ্টকারী প্রেতের ধর্ম। এই অভিপ্রায়টি আন্তর্জাতিক। স্টীথ থম্পসন বলেছেন—'...they haunt buildings and molest those bold enough to stay in them.' (E 282-84)[৪৪৫]

বাংলা লোককথাতেও একই চিত্র—

'এক গয়লাদের বাড়ীতে ভূতের ভারি উৎপাত হলো। রোজ ঢিল পড়ে, গো-হাড় পড়ে,...কখন ঘরের ভেতর খাটের নীচে দুম্‌দাম্‌ শব্দ হয়, কখনও বা ছাদের উপর দুপ্‌দাপ্‌ হড়্‌ হড়্‌ গড়্‌ গড়্‌ শব্দ হয়।[৪৪৬]

অনেক ভূতের গল্পে আছে পেঁচো ভূতের প্রসঙ্গ সদ্যোজাত শিশুর উপর যারা ভর করে। অথর্ববেদের মন্ত্রে শুনতে পাওয়া যায় এই পেঁচোভূতকেই দূরে রাখার স্তব

(৮/৩/৪)[৪৪৭] এবং সেখানে একটি বহুল প্রচলিত লোকবিশ্বাসও স্থান পেয়েছে 'যেষাং পশ্চাৎ প্রপদানি পুরঃ পাষীঃ পুরো মুখো। অর্থাৎ যে পিশাচদের পেছন দিকে পায়ের অগ্রভাগ, সামনে পায়ের গোড়ালি ও মুখ।'[৪৪৮]

পেঁচোভূত যে কিনা শিশুমারক, তার চেহারা অবশ্য বিকটদর্শন শিশুরই দেহধারী। (স্মর্তব্য, পেঁচোভূত,[৪৪৯] ভাগ্যের বিবর্তন[৪৫০] ইত্যাদি গল্প), 'ভূত-পেত্নী' নামক সংকল্প গ্রন্থে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ,[৪৫১] ঘোনা মোনা[৪৫২] ইত্যাদি গল্পে ভূতের যে ছবি আছে তা লোক বিশ্বাসটিরই সাক্ষ্যবাহী, অর্থাৎ তাদের গোড়ালি উল্টোদিকে।

প্রাচীন লোক-বিশ্বাসগুলি সম্পর্কে আলোচনাকালে ফ্রেজার বলেন—

'The soul may be extracted temporary from the body against its will by ghosts, demons, or sorcerers.'[৪৫৩]

অর্থাৎ অশুভ ভূতপ্রেত বহুক্ষেত্রেই মানুষের আত্মাকে সাময়িকভাবে দেহচ্যুত করে নিজ অধিকারে রাখতে পারে। বাংলার লোককথায় একাধিক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, গল্পের শাঁকচুন্নী যখন গৃহস্থ বৌটিকে গাছের কোটরে রেখে নিজেই বৌ সেজে বসে—

'The ghost put on the cloths of the woman and went into the house of Brahman. Neither the Brahman nor his mother had any idea of the change.'[৪৫৪]

তখনই ফ্রেজার বর্ণিত তথ্যটির আভাস পাওয়া যায়। বাংলার লোকবিশ্বাসে এই ঘটনাটি ভূতে পাওয়া বা ভূতের ভর হওয়া নামেই পরিচিত। ভূত-গ্রস্ত মনুষ্যের অস্বাভাবিক আচরণের বর্ণনা পাই, 'ভূত ছাড়ান'[৪৫৫] গল্পে—

'ছেলেটা অমনি মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল আর তার মুখ দিয়ে গোটা নাল ভাঙতে লাগল',[৪৫৬]

স্বয়ং অপদেবতার স্বীকৃতিই ভূতে পাওয়া ঘটনাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে—আঁমি সিঁদু মঁয়রা, গঁলায় দঁড়ি দিঁয়ে মঁরেচি এই বাঁড়ীতেঁ; ঐ পেঁয়ারা গাঁছে থাঁকি। ঐঁ ছেঁলেটা পেঁয়ারা খেঁলে কেঁন? তাঁই ওঁর ঘাঁড়ে চঁড়িচি।[৪৫৭]

নিজ ইচ্ছামতো শারীরিক অবয়ব ধারণ ক্ষমতায় ভূত-প্রেতের অনায়াস অধিকার—

'.....the wraithlike nature of these ghosts has permitted them to assume a multitude of forms in the imagination of those whom they have appeared.'[৪৫৮]

—সেকারণেই কখনো বা গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে গৃহকর্তার রূপ ধরে গার্হস্থ্য জীবন সুখ উপভোগ করে (The Ghost Brahman)[৪৫৯] কখনো বা নিকষ কালো মার্জাররূপ ধারণ করে মানুষের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করে। কখনো আবার প্রত্যঙ্গ ইচ্ছামতো ছোট-বড় করে গৃহকর্ম সম্পাদন করে—

'The ghost instead of going inside the next room would stretch a

long arm–for ghosts can lengthen or shorten any limb of their bodies–from the door and get the thing.'[৪৬০]

প্রকৃতপক্ষে কেবল আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতেও এই বিদেহী আত্মা মানবেরই প্রতিরূপ। অবশ্যই অবিকল প্রতিরূপ নয়। পার্থক্য কেবল অতিকায় আকৃতিতে আর অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শনীতে।

এখন, বাংলা লোককথায় সাধারণত যে সকল বিদেহী আত্মা বারংবার আবির্ভূত হয় তাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যেতে পারে—

পেত্নী—নারী ভূতের নাম হলো পেতনী, (সংস্কৃত প্রেতিনী অর্থাৎ মৃতাত্মা থেকে) এবং এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে ভূতের (পুরুষ) সঙ্গে এদের শ্রেণীভেদ ঘটেছে।[৪৬১] বাসস্থান 'শেওড়া ছয় বনের বটগাছ।'[৪৬২] কিন্তু স্বভাবে মানবীর মতোই প্রসাধনপ্রিয়া—'শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে পেত্নীর আলতা পরার সাধ হলো।[৪৬৩] এমনকি রক্তমাংসের কাঠামোর অধিকারিণী এই পেত্নী।—এই কথা বলে নাপ্‌তিনী পেত্নীর পায়ের মাস তুলতে আরম্ভ করলে, শেষে এমন মাস্ তুলতে লাগলো যে পেত্নীর পা থেকে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো।[৪৬৪] কেবল, অলৌকিক গুণের মধ্যে দেখি এদের শূন্যে বিচরণ ক্ষমতাটি—'তারপর পেত্নী উড়ে উড়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে লাগলো।'[৪৬৫]

শাঁখচুন্নী—'A Ghostly Wife' গল্পের পাদটীকায় শাঁখচুন্নীর পরিচয় দিয়েছেন রেভারেণ্ড লালবিহারী 'Sankchunnis or Sankh churnis are female ghosts of white complexion. They usually stand at the dead of night, at the foot of trees, and look like sheets of white cloth.'[৪৬৬]

অর্থাৎ শ্বেত গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট শাঁকচুন্নী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের নীচে। এরা অনিষ্টকারী। এদের ঝোঁক সংসারে প্রবেশের দিকে অর্থাৎ মানবী রূপ ধারণ করে নবজীবন উপভোগের প্রতিই আগ্রহী এরা।

ডাইনী বুড়ি—লোকগল্পের 'ডাইনী' চরিত্র হল এক বিশেষ জাতের প্রেতাত্মা, যারা বুড়ির বেশ ধরে থাকে। মানবশিশুর কচি মাংসেই এদের লোলুপতা। স্পষ্টই, আদিম নরমাংসাহারী সমাজের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে এরা। থালু মালু[৪৬৭] গল্পের একপেয়ে পেত্নী বুড়ি কিংবা রাখাল ছেলে[৪৬৮] গল্পের ডাইনী বুড়ি এই জাতীয় চরিত্র।

ব্রহ্মদৈত্য—ভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো ব্রহ্মদৈত্য। শুদ্ধাচারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের মতোই যেন ব্রহ্মদৈত্য। 'The story of a Brahmadaitya' গল্পের পাদটীকায় সংগ্রাহক লালবিহারী বলেছেন—

'A ghost of a Brahman who dies unmarried'[৪৬৯]

এই ভাবনাটির মধ্যে দিয়ে জন্মান্তরবাদ এবং জাতিবাদও স্বীকৃত হয়েছে। ব্রহ্মদৈত্যের বাসস্থান বকুলগাছ,[৪৭০] কখনও বা বেলগাছ।[৪৭১]

মামদো—লোকগল্পে 'দৈবাৎ মুসলমান ভূতও দেখা যায়। এদের বলা হয় মামদো

(অর্থাৎ মামুদিয়া)'[৪৭২] এই ভূত সাধারণত উদার চরিত্রের হয়। 'সেখানে ভূতেদের খাওয়া দাওয়া হচ্ছেলো.....ভিখিরীর তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গেলো কিন্তু একটা মাম্‌দো ভূত বললে, 'না না, এ বড় গরীব, একে ছেড়েদে।'[৪৭৩]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূত-পেত্নী'[৪৭৪] নামক ভৌতিক গল্পের সংকলন গ্রন্থটিতে গন্নাখাঁদা, বেঁটে, হেঁড়ে, খেঁড়ে, ইত্যাদি বিচিত্র বৈশিষ্ট্যধারী ভৌতিক সত্তার সন্ধান মেলে।

মানব ও ভূতের পারস্পরিক সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা যায় ভূত ও মানব পরস্পরের প্রতি বিতৃষ্ণ, বিকর্ষক এক সম্পর্কের শৃঙ্খলে বাঁধা। সর্বদাই ক্ষতিকারক চিন্তার কারবারী এই ভূতকুল। কিন্তু অধিকাংশ ভূতের গল্পেই লক্ষ্য করা গেছে অতিপ্রাকৃত বিদ্যার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ধূর্ত মানবের কূটবুদ্ধির কাছে তারা পরাজিত হয়েছে। 'তাতাই পাতাই'[৪৭৫] 'ভূতের ভয়'[৪৭৬] ইত্যাদি লোককথাগুলি শারীরিক ক্ষমতায় দুর্বল নশ্বর দেহধারী মানব তার অপেক্ষা অধিক বলবান বিদেহী আত্মাকে পরাজিত করেছে কেবল উপস্থিত বুদ্ধির চাতুর্যে, এবং নিজ আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্রে পরিণত করেছে এই ভয়ঙ্কর ভূতগোষ্ঠীকে।

মানুষের সর্বব্যাপী আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষায় ভৌতিক তাণ্ডব খর্ব হয়েছে। আবির্ভূত হয়েছে ভূতের ওঝা বা রোজা—'An exorcist one who drives away ghosts from possessed person.'[৪৭৭]

লোককথাতেও রোজার অলৌকিক মন্ত্র-তন্ত্র, সর্ষেমারা ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের দর্শন পাই—

'......সন্ধ্যে হতেই রোজা এসে......,যেখানে সেই ছেলেটা ছিল, তার চারিদিকে গণ্ডী কেটে মন্ত্র পড়ে তার গায়ে সরষে দিতে লাগলো। তারপর ক্রমে ক্রমে যখন সেই সর্ষের বাণ অসহ্য হলো তখন নিজ মূর্তি ধরে চেঁচাতে লাগলো।'[৪৭৮]

অবশ্য কখনো দেখা গেছে, ভূত শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনটি অধিকার করেছে। নানা প্রকার ইচ্ছাপূরণের বরদান করে ভূত প্রেত দেবতার ন্যায় সম্মানার্হ হয়েছে। 'The Story of a Brahmadaitya'[৪৭৯] গল্পে ব্রহ্মদৈত্য এমনই এক 'Blessed Spirit'[৪৮০] যে, ব্রাহ্মণের দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছে, আপন অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিঃস্ব দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পৌছে দিয়েছে সম্পদের শিখরে।

মানব ও ভূত-প্রেত এবং ঐশ্বর্য একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে বহু গল্পে। পার্থিব সম্পদের মোহ এড়াতে না পেরে বিদেহী আত্মা সম্পদ পাহারা দিয়ে চলেছে, অনন্তকাল ধরে— 'এই গাছের গোড়ায় আমার বাপ সাতাশ জালা মোহর রেখে মারা গেছে, আমিও মরে তাই গাছের গোড়াতে বসে থাকি।[৪৮১] সেই মোহর উদ্ধার করেছে মানব সন্তান। বুদ্ধির কূটকৌশলে জয়ী মানব তাই উল্লসিত হয়ে বিদেহী আত্মার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কই গড়ে তুলেছে—

ভূত আমার ছেলেমেয়ে ভূত আমার নাতি
ভূতের দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতি।[৪৮২]

কেবল সম্পদই নয়, বিদেহী আত্মার সাহায্য যে অন্যভাবেও বহু সংকটের সমাধান করতে পারে, তার প্রমাণ 'লিঙ্গ বদল'[৪৮৩] গল্পটি। সেখানে, এক ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যাকে আপন পুরুষত্ব অর্পণ করে পুত্রহীনতার দুঃখ থেকে রাজা ও রানীকে মুক্তি দিয়েছে। রাজকন্যা রূপান্তরিত হয়েছেন শক্তিশালী রাজপুত্রে। ফলে রাজ্যের ভবিষ্যৎ শাসনভার রাজা নিশ্চিন্তে অর্পণ করেছেন পুত্রের প্রতি।

অবশ্য মানুষ কখনই ঋণী থেকে যায় নি ভূতেদের কাছে। তাই উপকারের প্রতিদান দিতে তারা সদাই তৎপর। বরং বলা চলে সূক্ষ্ম উন্নাসিক বোধ যা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আস্বাদ দিয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে, তাই গল্পগুলির ক্ষেত্রে কার্যকর। সেকারণেই বিদেহী আত্মার মুক্তি সম্ভব হয়েছে একমাত্র মানুষেরই স্পর্শে। 'The Story of a Brahamadaitya' গল্পে দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া প্রদর্শনের ফলেই ব্রহ্মদৈত্যের অক্ষয় স্বর্গবাসের পুণ্য অর্জিত হয়েছে, প্রেতজীবনের অবসান ঘটেছে—'as by befriending the Brahman the Brahmadaitya's allotted period had come to an end, the pushpaka chariot had been sent to him from heaven.'[৪৮৪]

কোন কোন গল্পে দেখি জীবনের স্পর্শে মৃতব্যক্তির পুনর্জন্ম ঘটেছে। আত্মার পুনর্জীবন প্রাপ্তি একটি আন্তর্জাতিক অভিপ্রায়। Stith Thompson বলেছেন—'The dead soul may be brought back to life by using a magic oinment.'[৪৮৫] ঠিক এইরকম ঘটনাই ঘটেছে 'ঘোরো ভূত' গল্পটিতে সেখানে এক রাজপুত্র অত্যাচারী ভূতের অতৃপ্ত আত্মাকে পুনর্জীবন দান করেছে।

'ভূতকে কাঁধে করে ও ওষুধ নিয়ে রাজপুত্র রাজবাড়ীতে এসে রাজাকে বল্লে, "মহারাজ আপনার ছেলে যেমন ছিল ঠিক সেই রকম করে দোবো।' এই বলে ওষুধ গায়ে বুলুতে যেমন রাজপুত্র ছিল ঠিক সেই রকম হলো, সমস্ত লোক দেখে অবাক হয়ে গেল।'[৪৮৬]

এইভাবে বাংলার ভৌতিক লোককথাগুলিতে ভয়ঙ্কর রস ততটা জমাট বাঁধে নি, যতটা ঘন হয়েছে অদ্ভুত ও হাস্যরস। বিদেহী-আত্মার নানা অসঙ্গত আচরণ ও তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে মানুষের বিচিত্র কর্মপন্থা।

সর্বত্রই বিদেহী আত্মা পদানত হয়েছে, অসীম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কখনো বোতল বন্দী অসহায়, (The Ghost Brahman)[৪৮৭]

মাছ ভাজা খাওয়ার লোভ বিতাড়িত হয়েছে গরম লোহার স্পর্শে, গল্পে নরমাংস লোভী পেত্নী আগুনের তাতানো পোড়া ফালের খোঁচা খেয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে---

আর যাব না থালুমালুর পাড়া
আমার মুখটা গেল পোড়া।[৪৮৮]

—এই অসঙ্গতি, প্রতি মুহূর্তে বিদেহী আত্মার অপদস্থ হওয়ার ইঙ্গিত, ভূত-প্রেতের

কাহিনীগুলিকে ভয়ঙ্করত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে লোকমননের উপভোগ্য করে তুলেছে।

সাংসারিক কথা

পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ঐতিহ্য বাঙালী জাতি বা গোষ্ঠী মানসে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে, তারই উৎকৃষ্ট ফসল এই ধরনের লোককথাগুলি। সাংসারিক লোককথা কতগুলি উপশাখায় বিভক্ত হতে পারে। সেগুলি যথাক্রমে--

ক) বোকাদের লোককথা

স্টীথ থম্পসন এই জাতীয় বোকামির কথাগুলিকে Numskull Tale' আখ্যা দিয়ে বলেছেন--

'Important themes producing these popular jests are the absurd acts of foolish person.'[৪৮৯]

জনপ্রিয় এই কাহিনীগুলিতে নির্বুদ্ধিতাজনিত অসঙ্গতিই হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে।

বাংলা লোককথার এই অসঙ্গত কীর্তিকলাপের নায়ক কখনও বোকা জোলা বা তাঁতী কখনও বোকা জামাই। এরা কখনো লাল সূতা নীল সূতার নির্গমনকে মৃত্যুর কারণ ধরে নেয়, (লাল সূতো আর নীল সূতো),[৪৯০] কখনো ফুটি কিনে ঘোড়ার ডিমের মতো মহার্ঘ বস্তুর আস্বাদ পেতে ব্যগ্র হয়, (বাঘের উপর টাগ,[৪৯১]) কখনো আবার শ্বশুরগৃহে মিষ্টিবুলির নিদর্শন হিসাবে কেবল কুহুকুহু শব্দ করে।[৪৯২]

গল্পগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকগুলি এক ভিন্ন চিন্তার জগতে বাস করে-- The fools live in a mental world of their own fantacy.'[৪৯৩] ফলে জীবনযাত্রা সম্পর্কে অস্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনাই ঐসব অসঙ্গত আচরণের প্রেরণা যোগায়। যেমন-- 'Don't try to please everyone.'[৪৯৪] গল্পটিতে বোকা ছেলেটি এক টাকায় কিছু মিছু'-এর নামে একটি বৃহৎ ওল কিনে খায় এবং গলা ফুলে অসম্ভব জ্বালা ধরলেও সে মুখ ধোয় না, কারণ--'The foolish fellow thought that the fluid which cost him a quarter of a rupee should not dribble away from his mouth. So he began to restrain the flow.'[৪৯৫]

অদ্ভুত ভাবনাগুলি সাধারণত নির্দোষ হাস্যরসের পরিবেশই সৃষ্টি করে। (সওদাগরের সাত ছেলে[৪৯৬] ইত্যাদি গল্প) কিন্তু সময় বিশেষে এই বোকামির ফল চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটাতে পারে, কখনওবা ভয়ঙ্কর মৃত্যুও ডেকে আনে। যেমন 'বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা'[৪৯৭] গল্পে জোলা তার অসুস্থ মাকে জলে ডুবিয়ে বসে থাকে--মার জ্বর ভাল হবে এই আশায়। (যেহেতু একই প্রক্রিয়ায় জোলা তার কাস্তের জ্বর ভাল করেছে)। এরই ফলে বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু ঘটে। অবশ্য বিপরীত দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। কতগুলি কাহিনীর আরম্ভের চূড়ান্ত বোকামির পরিচয় নায়ককে প্রতি মুহূর্তে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। কিন্তু এই বোকামিই গল্প শেষে তাকে সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে--

'Sometimes a story begins with a series of absurd actions where we

are amused at their utter foolishness. But later the fool turns out to be really clever.' যেমন 'Madarchand The Cracked Quack' গল্পটির নায়ক মদরচাঁদ প্রতি পদে চূড়ান্ত বোকামির পরিচয় দিয়ে বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শেষে যখন দেশ বহিঃশত্রু আক্রমণ করেছে তখনই নিজদেশের সৈন্যদলের বাহুবল বৃদ্ধির জন্য সে দিয়েছে ওষুধ বড়ি, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে কড়া জোলাপ। সেই জোলাপের ফলে সৈন্যদল মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে। দলে দলে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে নদীতীরস্থ হাসপাতালে। নদীর অপর পারে শত্রুপক্ষের ছাউনি--

'The invaders who were stationed on the other side of the river marked this. They fancied that a dreadful plague was raging in the city. A panic broke out amongst the deluded invaders and they thought it prudent to break up the emcampment and beat a hasty retreat.'[৪৯৮]

শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্‌পসরণে কাহিনীর সুখকর পরিণতি ঘটেছে। মদরচাঁদ আর তার বোকামির গল্প শ্রোতার মনে এটি স্থায়িত্ব পেয়েছে।

লোককথায় বোকামি আর চালাকির গল্প পাশাপাশি অবস্থান করছে। একপক্ষের বোকামি অন্যপক্ষের বুদ্ধিমত্তাকেই প্রকট করে তুলেছে।

খ) চালাকদের লোককথা

এই ধরনের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কৌশলী প্রতারণা ও বিচিত্রপন্থী চাতুর্যের নানা নিদর্শন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সাধারণ দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের পীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের দলই এই কৌশলী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

'Especially if the cheater is naturally weaker or poorer than his adversary the interest in the swindle is heightened. Several of the well-known complex folktales, are filled with sales of pseudomagic objects, false treasure and worthless animals and service.'[৪৯৯]

'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী' গল্পসংগ্রহে 'ঠগ ও সেয়ান'[৫০০] Popular Tales of Bengal' গ্রন্থে 'The Worthy Nephew'[৫০১] ইত্যাদি গল্পগুলি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি। এই ধরনের গল্পে শ্রোতার সহানুভূতি আকর্ষণ করে নেয় চতুর প্রতারকের দল। 'The History of a Rogue,'[৫০২] 'Kangala,'[৫০৩] 'The Lucky Rascal,'[৫০৪] ইত্যাদি গল্পে প্রতারণার সাহায্যে নায়কগণ একের পর এক সঙ্কটের মোকাবিলা করেছে, তাই যখন রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড দেখাবার নাম করে সেয়ান ছেলেটি সত্যই বাঁদরের লেজে আগুন ধরিয়ে গ্রামবাসীদের নাজেহাল করে (The Lucky Rascal) কিংবা একটি অন্যায়ের জরিমানা আট আনা শুনে কাঙ্গাল বিচারকের গালে চড় মেরে দুটি অন্যায় করে হিসাব মেলায় (কেননা তার কাছে একটি টাকা আছে, ভাঙ্গানী নেই) (Kangala) তখন ক্রোধের পরিবর্তে শ্রোতার মন অনাবিল প্রসন্ন প্রশ্রয়ে ভরে যায়। তাই এই ধরনের গল্পগুলি সুখকর সমাপ্তি লাভ করে। কখনো দেখি, 'The King laughed and dismissed Kangala and

his accusers.'[৫০৫] কখনো বাধ্য হয়ে নিজ রাজ্য সেই প্রতারকের হস্তে অর্পণ করেছেন—

তারপর রাজা তাকে 'চোর চক্রবর্তী', উপাধি দিয়ে 'সিংহাসনে বসাল'।[৫০৬]

অবশ্য সর্বত্রই প্রতারণা বা চৌর্যবৃত্তি সমাদর লাভ করেনি। প্রতারণার ফল যখন মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় কিংবা দুর্বল ব্যক্তির উপর সবলের অত্যাচারে পর্যবসিত হয়, তখন শ্রোতার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা প্রতারকের স্বরূপ উন্মোচনেই স্বস্তি পায়—

'.......more often the impostor is the villain of the price and much of the interest of the story hides upon his unmasking.'[৫০৭]

তিলিসমৎ খাঁ, টেটনা, বিটলা ও বেক্কল 'Adventures of Two Thieves and Their Sons' ইত্যাদি গল্পে প্রতারণা ও চৌর্যবৃত্তির যাবতীয় অপরাধের শাস্তি বর্ষিত হয়েছে সমাপ্তিতে—

'But soon after he ordered four pits to be dug in the earth ın which were buried alive, with all sorts of thorns and thistles, the elder thief and the younger thief and their two sons.'[৫০৮]

রাজার ন্যায় বিচারের মধ্যে দিয়ে সত্যের জয় হয়েছে।

চৌর্যবৃত্তিমূলক বা প্রতারণার গল্পগুলি, চালাকির গল্পগুলি কিংবা বোকাদের লোককথাগুলির সাধারণ উপাদান হাস্যরস। প্রধানত নির্দোষ মজাই এগুলির লক্ষ্য। আফিংখোর ও বাঘ[৫০৯] ইত্যাদি গল্প কিংবা 'বিলালের কেচ্ছা'[৫১০] ইত্যাদি গল্পগুলি লঘু কৌতুকীমোড়কে পরমরমণীয় হয়ে উঠেছে। কখনো অবশ্য ভিন্ন ব্যঞ্জনাও পরিলক্ষিত হয়। যেখানে নিপীড়িত মজুর অন্যায়কারী জোতদারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নানা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিচ্ছে, (Master and Man)[৫১১] কিংবা বোকা জামাই শ্বশুরগৃহে পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছে। (নতুন জামাই[৫১২]) সেখানে শ্রেণী চেতনার বিদ্রোহের সুর কিংবা পণপ্রথায় জর্জরিত সমাজের মৃদু প্রতিশোধের বিদ্রূপই ফটে ওঠে।

গ) গার্হস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক কাহিনী

গৃহস্থ জীবনের কাহিনীগুলিতে বাঙালীর হাসি-কান্না দুঃখ সুখে ভরা দৈনন্দিন জীবনই প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে এই ধরনের কথায়। সামাজিক সম্পর্কের যাবতীয় টানাপোড়েন থেকে শুরু করে (ননদের দাসী[৫১৩] দুঃখের শেষ[৫১৪] ইত্যাদি গল্প দ্রষ্টব্য), প্রেম-বিচ্ছেদ (চড়া-চড়ী)[৫১৫] উপস্থিতবুদ্ধি (পাড়াকুঁদুলী), [৫১৬] কৃষিমাহাত্ম্য (লোভের দণ্ড), [৫১৭] পরিশ্রম বুদ্ধি ও চাতুর্যের পুরস্কার (সরকারের ছেলে) [৫১৮] ইত্যাদি বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ধরনের লোককথাগুলি কথিত। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির বলে সাংসারিক লোককথাগুলি জীবনের সর্ববিধ অবস্থা থেকেই তার উপাদান সংগ্রহ করেছে।

উল্লেখ্য যে, সাংসারিক লোককথাগুলিতে গৃহস্থ পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র অথবা কনিষ্ঠ বধূর প্রতি কোমল মধুর পক্ষপাতিত্ব ফুটে ওঠে। গল্পের প্রারম্ভে যে কনিষ্ঠ পুত্র অকর্মণ্যতার জন্য অথবা ছোট বৌ নির্বুদ্ধিতার জন্য পরিবারের ও সমাজের সদস্যদের কাছে লাঞ্ছিত

অপমানিত হয়েছে, গল্পের শেষে তারাই বিপুল সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিকার লাভ করেছে। স্টিথ থম্পসন বলেছেন—

'It is normally true that in all tales of this kind the youngest child is also specially unpromising, either because of appearance, shiftless habits or habitual bad treatment by others. But even though such qualities or emphasized in the narrative, it is never forgotten that the distinguishing quality of these heroes and heroines is the fact that they are youngest.'[৫১৯]

—বলা চলে, অক্ষম ও দুর্বলের প্রতি করুণাঘন সহানুভূতিই এক্ষেত্রে কার্যকর।

বাংলা লোককথার ভাণ্ডারে বোকা-বুকি[৫২০] গল্পের বোকা, 'The Bold Wife'[৫২১] গল্পের টেকোবউ নিজের ভাগ্যে খাই[৫২২] গল্পে সওদাগরের কনিষ্ঠা কন্যা, ভাগ্যের বিবর্তন[৫২৩] গল্পের দুর্বল অথচ বুদ্ধিমতী কনিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূটি ইত্যাদি অজস্র চরিত্র সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে।

সাংসারিক লোককথাগুলিতে অলৌকিক ঘটনা বা আকাশচারী কল্পনার নিদর্শন একেবারে নেই তা নয়। তবে গল্পের নিয়ামক হয়নি। শারীরিক পরিশ্রম এবং বুদ্ধির চাতুর্যকে মূলধন করেই নায়ক বা নায়িকা সাহসের সঙ্গে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে এবং পরিশেষে পুরস্কার স্বরূপ অলৌকিক শক্তির আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে তাদের উপর দ্বিতীয়ার ফোঁটা[৫২৪] প্রাণ-সঞ্চারিণী[৫২৫] ইত্যাদি গল্পগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ধাঁধামূলক লোককথা

বাংলার বহু লোককথার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে নানা সমস্যামূলক জিজ্ঞাসা—যার ব্যাখ্যাই গল্পের সুষ্ঠু সমাধান রচনা করে। ইংরাজীতে 'Enigma' জাতীয় রচনার সঙ্গে এই ধাঁধামূলক কথাগুলি অনেকটা সমধর্মী।—

'Enigmas are generally employed in Indian Folklore to measure the intellegence of the person interrogated and this intellgence test is used for a variety of purpose.'[৫২৬]

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় বুদ্ধি পরীক্ষার জন্যই এই ধরনের লোককথার আবির্ভাব 'Enigma' শব্দটির আভিধানিক অর্থও ধাঁধা জাতীয় সমস্যাকেই ইঙ্গিত করে, 'to speak in riddles, something hard to understood or explain.'[৫২৭]

ধাঁধামূলক বাংলা লোককথায় যাবতীয় রস কেন্দ্রীভূত থাকে সমস্যাটির সমাধানে। শ্রোতার অনুসন্ধিৎসু কৌতূহল কথকের বক্তব্যের সূত্র ধরে এগিয়ে চলে সমাধানের উদ্দেশ্যে। সমস্যাটির রস সম্যক অনুধাবনের জন্য কেবল শ্রুতি নয়, প্রয়োজন হয় বুদ্ধি ও মননধর্মী বিশ্লেষণ।

এই ধরনের কাহিনীগুলির উদ্দেশ্য বহুবিধ। উইলিয়ম কেরী সংকলিত 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে একাধিক ধাঁধামূলক লোককথার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম গল্পটিতেই দেখি—

'সেই দেশে সুবাহু নামে রাজা থাকেন। তাঁহার সভাতে এক রাক্ষসী আসিয়া সমস্যা

দেয়। রাজা সমস্যা পুরিতে না পারিয়া এক এক মনুষ্য প্রত্যহ রাক্ষসীকে দেন।[৫২৮]

-অর্থাৎ এইভাবে প্রাত্যহিক খোরাকির ব্যবস্থা করেছে রাক্ষসী।

উদরপূর্তির মতো জৈবিক অবশ্যই সর্বত্র প্রযুক্ত হয়নি, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পূর্বরাগে পরস্পরের প্রতি আত্মপরিচয় দানও এই ধাঁধার আবরণে মধুর ও আকর্ষক হয়ে উঠেছে। ইতিহাসমালার ২১ সংখ্যক গল্পটিতে[৫২৯] বণিককন্যা সঙ্কেতে আত্মপরিচয় প্রদান করেছে মুগ্ধ রাজপুত্রকে রাজপুত্রের মিত্র মন্ত্রীপুত্র সঙ্কেতটি সরলীকরণ করেছে--

'নালিতা শাকে জানা গেল নালিত গিরিতে কন্যার ঘর, শঙ্খতে বুঝা গেল, সে শঙ্খ সওদাগরের কন্যা, কেশেতে বুঝা গেল তাহার নাম বালবতী, জলেতে জানা গেল তৃষ্ণা থাকিলে যাইবা।'[৫৩০]

জটিল সমস্যার বেড়াজালে প্রতিপক্ষকে বন্দী করে নিজ প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করেছে 'আয়রা বাইজী'[৫৩১] সোনাফর বাদ্শা'[৫৩২] গল্পে, 'আক্কেল পরীক্ষার[৫৩৩] খেলায় অকৃতকার্য পুরুষগণ দলে দলে বাইজীর কুজতখানায়[৫৩৪] বন্দী হয়েছে।

কখনো বা নিছক বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্যই ধাঁধা সমস্যার আলোচনায় রত হয়েছে লোককথার চরিত্র। ইতিহাসমালার ২২ সংখ্যক গল্পে রাজকন্যা সর্বাঙ্গসুন্দরী 'বড় গুণবতী : সর্বদা পণ্ডিত লোকের সহিত আমোদ করেন। সেই রাজার মন্ত্রী অতি বড় গুণবান; প্রতিদিন তাহার সঙ্গে সর্বাঙ্গসুন্দরীর বিদ্যার সমস্যা হয়।[৫৩৫]

দেখতে পাচ্ছি, এই যে জটিল সমস্যা চর্চা তা বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করে তোলে, ভবিষ্যৎ রাজ্য শাসনের উপযোগী করে তোলে।

সেকারণেই রাজপুত্র[৫৩৬] গল্পের মুমূর্ষু পিতা পুত্রকে হেঁয়ালির মাধ্যমে উপদেশ বিতরণ করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন--

'তিন-ঠেঙ্গে তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নিও' পুত্র পিতৃবাক্যের মূল মর্ম গ্রহণে প্রাথমিক পর্যায়ে অক্ষম হল। ফলে রাজ্যে এল বিপর্যয়। শেষে জরা, অভিজ্ঞতা ও বয়সের ভারে ন্যুব্জদেহ (মস্তক ঝুঁকে পড়েছে হাঁটুর কাছে তাই তে-মাথা এবং লাঠির সাহায্যে চলেন তাই তিন ঠেঙে) এক বৃদ্ধই রাজপুত্রের সমস্যার সমাধান করলেন। পিতৃবাক্যের প্রকৃত অর্থ তিনি ব্যাখ্যা করে সুশাসনরীতিকে প্রাঞ্জল করলেন।

পূর্ববঙ্গে বহু অঞ্চলে 'শোলোকী কিস্‌সা'[৫৩৭] জাতীয় রচনা দেখা যায়, একপক্ষ একটিকে হেঁয়ালী মূলক 'শোলোক' শোনায়। প্রতিপক্ষ সেই শ্লোকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গল্পটি ব্যাখ্যা করে। উদাহরণ হিসাবে একটি শোলোকী কিস্‌সা উল্লিখিত হল--

'কাল কাল বরষাকাল
ছাগিনী ছাতে বাঘিনীর পাল
শুন ছাগিনী কই দিন গুনে সই
যদি পাই সুদিনের লাগ, বুঝবি আমি
কোন্ গুণের বাঘ।'

'একবার দেশের মাইঝে মেঘ অইয়া গাঙ-টাঙ-পানিতে ভাইস্যা গেল। পাহাড়ের পানি নাইম্যা গাঙকে উত্‌লা কইরা তুল্য। গাঙের পার ভইঙ্গা হুগল দেশ পানিতে ডুইব্যা গেল। এক বাঘা পানির জ্বালায় এক গিরস্তের মুরুইলের (খড়ের গাদা) তলে আইয়া বাসা বান্দল। এর পরদিন গিরস্ত হেই মুরুইলবার কাছে নিয়া একটা ছাগিনী ছিরগা (খুটা) দিয়া আইল। চাইরদিক বৈন্যার পানিতে থই থই করিতেছে। ছাগিনী তহন বাঘিনীর গাল লইতে লাগিল। দুইজনারই বিপদ। আদতে বিপদের সময় হুগলের অবস্থা একই এই রকমই অইয়্যা থাকে।'[৫৩৮]

জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশ যেমন লোককথাগুলির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে, ঠিক তেমনি লঘু হাস্যরসও হেঁয়ালিগুলিকে সরস করে তুলেছে।

'গব্যগবাং'[৫৩৯] বা 'The Barber Brahman.' ইত্যাদি গল্পগুলির উক্তি প্রত্যুক্তি কৌতুকরসে জারিত হয়ে লোক-উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। যেমন—'The Barber Brahman' গল্পে ব্রাহ্মণ বেশী নাপিত পুত্রের ছদ্মবেশ ধরতে পেরে গ্রাম্য প্রতিবেশী, নাপিতের ব্রাহ্মণ শ্বশুরের সামনেই নাপিতপুত্রকে হেঁয়ালীতে সাবধান করেছে—

'This manners betray the birth of a man, A jackdaw plays the part of a swan. The priest forbids you to make any fuss. Pray do, remember, yours is thus and thus.'[৫৪০] 'thus and thus' অর্থাৎ ক্ষুরচালানোর 'ঘস্‌ঘস্‌' শব্দটি নাপিতবৃত্তির পরিচায়ক।

কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্বশুর এই হেঁয়ালী সম্পূর্ণই উপলব্ধি করেছে এবং প্রত্যুত্তরে নিজ বংশের গলদটিও প্রকাশ করেছেন সরস মোড়কে—

'While yours is thus and thus, know you that ours is 'Tini-ki-ti-tak''[৫৪১] অর্থাৎ ব্রাহ্মণও আদতে 'মুচি'। মুচিদের বৃত্তিরই একটি অঙ্গই ছিল ঢোল বাজিয়ে খরিদ্দারকে সচকিত করা।

এইভাবেই ধাঁধামূলক লোককথাগুলি কখনো নীতি উপদেশ বিতরণ করেছে। কখনো বা বুদ্ধির প্রতিযোগিতার আবাহন করেছে, কখনো আবার বাক্‌কুশলতার পরিচয় দানের মাধ্যমে উপভোগ্য হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাগ্‌যুদ্ধ কিংবা গল্পকারের প্রশ্ন ও শ্রোতার উত্তর দানের মাধ্যমে জীবনের বহুবিধ সৎমূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দৃঢ়ভাবে।

ক্রমপুঞ্জিত লোককথা

ইংরাজী 'Chain Tale' বা 'Cumulative Tale'-এর বিশেষত্বগুলিই ক্রমপুঞ্জিত লোককথায় লভ্য—

'A folktale based on a characteristic series of numbers, objects, characters, events etc. in specific relation'[৫৪২]

—অর্থাৎ একটি মূল ঘটনা বা চরিত্রের কথোপকথনের সঙ্গে পরপর শিকলের মতোই পরবর্তী ঘটনা বা সংলাপ আবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলে। বিচ্ছিন্ন ঘটনাংশ পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট ধারাবাহিক জ্যামিতিক সংঘবদ্ধতায় যুক্ত হয় এবং এইভাবেই প্রত্যেকটি

বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরের ঘটনাটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

'The cumulative tale always gradually works upto one long final routine containing the entire sequence. The cumulative tale reaches its most interesting development however, when their is not merely an addition with each episode, but when every episode is dependent upon the last.'[৫৪৩]

'টুনটুনির বই' গল্পগ্রন্থে 'চড়াই আর কাকের কথা'— এর শেষে কাকের দীর্ঘ সংলাপ—

গেরস্ত ভাই, দাও তো আগুন,
গড়বে কাস্তে কাটব ঘাস
খাবে গাই, দেবে দুধ, খাবে কুত্তা
হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি
তুলব জল ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক [৫৪৪]

— লক্ষ্য করি এই শেষ অংশেই সমগ্র ঘটনাবলীর ধারাবাহিক ছবিটি উদ্ভাসিত, এবং প্রতিটি ঘটনাই পরের ঘটনার উপর নির্ভরশীল।

ঘটনাবলীর ক্রমপুঞ্জন দ্বিবিধ, প্রথমটির যাত্রা সরলরৈখিক পথে, একমুখী পরিণতিই সেগুলির কাম্য। সেখানে গল্পের শেষাংশটির মধ্যদিয়েই সমগ্রের নিখুঁত ছবিটি ফুটে ওঠে।—

'There has been a series of events bound together by one slender thread"...The person examining cumulative tales, therefore has only to look at this final formula to learn all that is to be learned about the whole tale.'[৫৪৫]

যেমন 'উকুনে-বুড়ির কথা' গল্পটির শেষে রাজা বলেছেন—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইলো
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকালো
দাসীর হাতে কুলো আটকালো
রানীর হাতে থালা আটকালো,
পিঁড়িতে রাজা আটকালো, [৫৪৬]

বলতেই আর তারা যাবে কোথায়! এমনি করে তারা তক্তাপোশে আটকে গেল যে উঠবার সাধ্যি নেই।' এই গল্পে ঘটনার গতি একমুখী। উকুনে বুড়ির মৃত্যুজনিত দুঃখের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রাণীর উপর কিভাবে বর্তেছে তারই ক্রমপুঞ্জিত চিত্র লভ্য—

উকুনে বুড়ির মৃত্যু→ বক → নদী→ হাতি→ গাছ→ ঘুঘু→ রাখাল→ দাসী→ রানী→ রাজা→ সভার লোকজন।

এই একমুখী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে কাক ও চড়াই, [৫৪৭] কুঁজো বুড়ির কথা [৫৪৮] ইত্যাদি গল্পে।

বাংলায় অপর এক ধরনের শিকলি লোককথার সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি প্রত্যাবর্তনমূলক। ঠিক যে ধারাবাহিকতায় গল্প এগিয়েছে সেই একই বিপরীত ধারাবাহিকতায় গল্পটি প্রত্যাবর্তিত হয়ে সুখকর সমাপ্তি পেয়েছে 'The action characters, names, speeches or whatever is the feature of the accumulation, builds up to an image impasse or a climax, and often, but not always goes through the list again in reverse in order to resolve the plot.'[৫৪৯]

টুনটুনি আর নাপিতের কথা [৫৫০] গল্পে সাহায্যপ্রার্থী টুনটুনি তার প্রত্যেক বন্ধুর কাছে বিফল হয়েছে। কিন্তু গল্পের শেষে মশার সক্রিয় সহযোগিতায় বৃত্তাকার পথে ঘটনাবলীর বিপরীত প্রত্যাবর্তন ঘটেছে—

হাতি বলে, সাগর শুষি।
সাগর বলে, আগুন নেবাই
আগুন বলে লাঠি পোড়াই
লাঠি বলে, বিড়াল ঠেঙাই,
বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি,
ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি
রাজা বলে, নাপতে বেটার মাথা কাটি। [৫৫১]

আর নাপিতের ভীত অনুতপ্ত উক্তি—'রক্ষে কর টুনিদাদা। এস তোমার ফোড়া কাটি', অর্থাৎ যে টুনটুনির ক্রম বিফলতায় গল্পের গতি শিকলের মতো সংঘবদ্ধ হয়েছে, শেষে তারই জয় ঘোষিত হযেছে চরিত্রাবলীর ধারাবাহিক সম্মতিতে।

বলা চলে ক্রমপুঞ্জিত লোককথার আবশ্যিক শর্ত পুনরাবৃত্তি। এই পুনরাবৃত্তি অবশ্যই স্মৃতি সংরক্ষণের সহায়ক। ফলে এই ধরনের লোককথাগুলি তাদের অবিকৃত রূপ বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে দীর্ঘকাল—'many of these tales maintain their form unchanged over long periods of history and in very diverse environment.'[৫৫২]

এছাড়াও উৎসুক শ্রোতার ও কথকের কাছে এই পুনরাবৃত্তি বড়ই শ্রুতিরঞ্জক—'Most of the enjoyment, both in telling and listening to such tales, is in the successful repeatation of the ever-growing rigmarole.'[৫৫৩]

যেমন 'টুনটুনি আর নাপিতের কথা' [৫৫৪] গল্পে টুনটুনি বিভিন্ন সুহৃদের কাছে একই ভাষায় আপ্যায়িত হয়েছে। 'কে ভাই ? টুনি ভাই? এস ভাই বোস ভাই খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি খাবে ভাই।' বিভিন্ন সমব্যথীর কাছে শোক জ্ঞাপনের সঙ্গে দ্বিধান্বিত

জিজ্ঞাসার ভাষাও একই—

বুড়ো মোলো, বুড়ি মরে।
তার কুলগাছটি কে যত্ন করে, [৫৫৫]

এইভাবে ক্রমপুঞ্জিত লোককথাগুলি তাদের বর্ণনাভঙ্গীর চমৎকারিত্বে লোককথার জগতে নিজ স্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

আজগুবি লোককথা

লোককথার একাধিক ধারাতেই অপার্থিব, কাল্পনিক উপাদান থাকলেও বিশেষ এক ধরনের লোককথার উদ্ভট কল্পনারসের আধিক্য দেখা যায়। ইংরাজীতে যাদের বলা হয় 'Tales of lying' যেমন 'বাইশ জোয়ান আর তেইশ জোয়ান পালোয়ান তালগাছ ও বটগাছ দিয়ে দাঁতন করে। চাষীগৃহস্থ ট্যাঁকের মধ্যে সাতশো মোষ বয়ে আনে। অদ্ভুত কাল্পনিক ঘটনাগুলি শ্রুতিপরম্পরায় সংরক্ষিত হয়ে যায় অবিকৃতভাবে—

'The complexicity of plot, the machinery of wonder and supernaturalism, the far-off world of the unreal–all of this seem to give to a tale and to assist its faithful preservation over centuries of telling, even in far-separated lands'[৫৫৬]

—এই উদ্ভট কল্পনা রসে আর্দ্র ঘটনাগুলি লোকসমাজের চিরন্তন ক্ষমতার বিশেষ এক মাত্রাকেই ফুটিয়ে তোলে।

আজগুবি লোককথায় অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলির সম্পাদক সাধারণ মানুষ অথবা দুর্বলচরিত্রের পশুপাখী। যেমন সাধারণ এক ভৃত্য, সমগ্র পুকুরের জল পান করে ফেলে একচুমুকে, আর তারপর বটগাছ গিলে বাঁধ দেয় গলায়, যাতে জল না বেরোতে পারে।[৫৫৭]

সাধারণ মানুষের দ্বারা এই অসাধ্য সাধনের ঘটনাগুলির মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের আভাস খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক সমালোচক। পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর গল্পটি ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে—

—'অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে ক্রমে ক্রমে অতি সাধারণ মানুষেরা, যারা সবাই সমাজ-জীবনে অবহেলিত এবং শোষিত। সামান্য পিঁপড়ে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়ার পরিবর্তে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বা সামান্য এক মেছুনি, কুস্তিরত দুই পালোয়ানকে মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা রাজবাড়ীর সামান্য এক দাসী শুধুমাত্র থুতুর সাহায্যে অসামান্য বস্তুকে চোখের থেকে বার করে আনছে—এই ঘটনাগুলি বাস্তবের শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ারই দ্যোতনা আনছে।' [৫৫৮]

পুরাকথা

'বাংলা লোককাহিনীর সবচেয়ে প্রাচীনতম অংশ হল পুরাকথা। এর ইংরেজী শব্দ মিথ্ (Myth)। 'Myth' শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকেই এসেছে। 'Myth' শব্দের পুরাতত্ত্ব পুরাকথাটির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

পুরাকথা তথা মিথ-এর সংজ্ঞা নির্ণয় কঠিন কাজ।—'Of all the words used to

distinguish the classes of prose narrative, myth is the most confusing. The difficulty is that it has been discussed too long and that it has been used in too many different senses.'[৫৫৯]

সত্যই বিষয় বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা এবং অভিনবত্বের জন্য মিথের নিখুঁত সংজ্ঞা রচনা জটিল কাজ। 'SDFML'-এ বিবৃত সংজ্ঞাটি এই প্রকার—

'A story represented as having actually occured in a previous age explaining the cosmological as super natural tradition of a people, their gods heroes,cultural traditions religion belief.'[৫৬০]

অর্থাৎ আদিম মানবের ধ্যন ধারণা, বিশ্বাস ধর্ম দেবদেবী সৃষ্টি রহস্য, নানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক এই মিথ্। মিথের উদ্ভবমূলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণের প্রভাব ব্যক্ত করেছেন নানা লোকবিজ্ঞানী—

—'Myths are intimately connected with religious beliefs and. practices of the people.'[৫৬১]

অর্থাৎ পুরাকথা বা মিথ্ এবং ধর্মভাবনা ও তৎসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে, সন্দেহ নেই।—

'At a certain stage of development men seem to have imagined that the means of averting the threatened calamity were in their own hands and that they could hasten or retard the flight of the seasons by magic art. In course of time the slow advance of knowledge which has dispelled so many cherished illusions convinced at least the more thoughtful portion of mankind that the alternations of summer and winter, of spring and autumn were not merely the result of their own magical rites but that some deeper cause some mightier power was at work behind the shifting scenes of nature.'[৫৬২]

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সংঘটক শক্তি হিসাবেই উদ্ভব হল দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা। দেবতারা একদা যে ভাবে ঐন্দ্রজালিক এবং অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করতেন, আচার অনুষ্ঠান তারই অনুকরণ মাত্র—এর পশ্চাতে লোকবিশ্বাস এই যে এর সাহায্যে দেবতাদের মতোই অলৌকিক এবং ঐন্দ্রজালিক কার্যাবলী সম্পন্ন করা যায়।

'... they still thought that by performing certain magical rites they could aid the god who was the principle of life and death. The ceremonies which they observe for this purpose were in substance a dramatic representation of the natural process which they wished to facilitate ... thus a religion theory was blended with a magical practice.' [৫৬৩]

ধর্মীয় আচার ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুষঙ্গেই পুরাকথার আবৃত্তি প্রচলিত হল—

'Myth is the earliest from the description of such rites, the story of

them, which accompanies the dramatic representation of ritual.'[৫৬৪]

কালক্রমে অগ্রতর সমাজে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াসমূহ লুপ্ত হয়ে গেলেও, পুরাকথাটি রয়ে গেল অপরিবর্তিত—

'Ceremonies often die out while myths survive and thus we are left to infer the dead ceremony from the living myth.'[৫৬৫]

এই যে সৃষ্টি-রহস্য সমাধানের প্রচেষ্টা, তাঁর পশ্চাতে কেবল ধর্মীয় ভাবনাই কার্যকর তা নয়, আরও আছে অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা জানার আগ্রহ।

ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে—

নাসাদাসীন্নো সদাসীওদানীং নাসীদ্রজোনো ব্যোমা পরোয়াৎ।

কিমাবরীরঃ কুহ কস্য শর্মন নভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।।

সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল? [৫৬৬]

বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সন্ধান কার্যে আত্মনিয়োগ করেছে। শুধু তাই নয় আদিম প্রপিতামহ তাদের লৌকিক চেতনা ও রুচি অনুযায়ী প্রকৃতির নানা দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টাও করেছে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য লোক্‌বিদ্ মনে করেন যে এই ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম আত্মশ্লাঘা অর্থাৎ অজ্ঞতাকে আবৃত করার প্রয়াস—

'I should imagine that the fathers of 30,000 B.C. were just as anxious to maintain the fiction of their omniscience as the parents and school masters of today..'[৫৬৭]

—শিশুপুত্র যখন প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবিধ প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে পিতাকে প্রশ্ন করত, তখন পিতা নিজ মর্যাদা রক্ষার খাতিরে নানা অসম্ভব কাহিনী বর্ণনা করতেন যা ক্রমে পুরাকথায় স্থানলাভ করে।

অপর একটি কারণ পুরাকথার উদ্ভব মূলে কার্যকর বলে মনে করা হয়। সেটি হল সামঞ্জস্য কল্পনা অথবা তুলনা করার প্রবণতা—

'The most common and natural consequence of analogy is identification. Because the wind, the sea the fire move, they must, the savage suppose be like men, they must be persons individual.'[৫৬৮]

পক্ষী ডিম্ব প্রসব করে, তার থেকেই জন্মায় শাবক। আদিম সমাজও ভাবত যে ডিম্ব থেকেই বিশ্ব প্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে। এইভাবে ভাবসংহতির সাহায্যেই আদিম মানুষ বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বার করত এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস পেত।

'Myth'-এর কিয়দংশ গড়ে উঠেছে 'Cultural Hero'অর্থাৎ সংস্কৃতির নায়কদের দিয়ে। দেবতাদের উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণা পরবর্তী স্তরে সভ্যতার যাবতীয় গৌরব অর্পিত হয়েছে মানুষের প্রতি কিংবা বলা যায় আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে মানুষই দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছে—

'Myth tales of sacred beings and of semi-divine heroes... The hero is somehow related to the rest of the pantheon and the story becomes an origin myth.'[৫৬৯]

এই প্রসঙ্গটির অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু-মন্তব্য— 'যে ভূমি হল চালনার অযোগ্যা বা অহল্যা হইয়া পাষাণবৎ পড়িয়াছিল ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমি একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।'[৫৭০]

— দেখা যাচ্ছে অংশটির মধ্যেই নিহিত আছে কৃষিমুক্তি সংক্রান্ত প্রাগাধুনিক ধারণাটি। অনুর্বর কৃষিভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে তুলে 'রাম' হলেন Culture Hero এবং উন্নীত হলেন দেবত্বে।

এইভাবেই পুরাকথার মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করেছে প্রকৃতির উপরে চূড়ান্ত জয়লাভের এবং দেবতার সমকক্ষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

এছাড়াও বলা যায় পুরাকথায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা কল্পনানির্ভর হলেও সকল প্রকার সৃষ্টির মূলে যে নির্দিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই বাস্তবসত্যের স্বীকৃতি প্রদান করে পুরাকথা, তাই বলা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বাস্তব অনুভূতি থেকে উৎসারিত বিপ্রতীপমুখিনতাই পুরাকথার জনক। সেই কারণেই পুরাকথার তাৎপর্য অতি গভীর—

'They are much more than mere entertainment, they are apart of the primitive man's science, medicine, religion, law and agriculture.'[৫৭১]

বাংলা পুরাকথাগুলির মধ্যে ধর্মীয় চেতনা অপেক্ষা সামাজিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিজ্ঞানচেতনা এবং শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি পর্যায়ের এই পুরাকথাগুলি বিভক্ত—

ক) বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কার্যকারণ ব্যাখ্যা। যেমন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ, বিভিন্ন গাছের জন্ম কথা, দিন ছোট বড় হওয়ার কারণ ইত্যাদি।

গ) দেবতা গনের পশুপাখীর উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণ ব্যাখ্যা— যেমন দুর্গার দশহাত ও গণেশের কলা বৌ কেন, শনির দৃষ্টি অশুভ কেন; শিবের মাথায় জটা এল কি করে ইত্যাদি।

ঘ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কারণ সংক্রান্ত পুরাকথা।

বাংলা পুরাকথাগুলির সঙ্গে ধর্মের যতটা নিকট সম্পর্ক, তার অপেক্ষা অনেক বেশী

সম্পর্ক লোকবিশ্বাসের। 'আরণ্যক' উপন্যাসের রাজু পাঁড়ে যে বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিয়েছে যে রামধনু ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকেই [৫৭২] সেই একনিষ্ঠ দৃঢ়তাই পুরাণকে লোকমান্য করে তুলেছে।

বাংলা পুরাকথার বীজ কৃষিভিত্তিক বঙ্গভূমিতেই উপ্ত। ধান তুষে ঢাকা পড়ল কেন,[৫৭৩] বেনাগাছের সৃষ্টি কি করে [৫৭৪] হলো ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর লোকমানস সংগ্রহ করেছে চতুষ্পার্শ্বস্থ ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে। সেই কারণেই পুরাকথায় খুঁজে পাওয়া যায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা, সমাজনীতি বিশ্লেষণ, গোষ্ঠীগত আচরণ বিধি ব্যাখ্যা, (দুর্গার দশ হাত ও গণেশের কলা বৌ কেন[৫৭৫]ব্যাঙের ছাতা কিভাবে হলো [৫৭৬] শুশুক কিভাবে হলো [৫৭৭] ইত্যাদি পুরাকথা দ্রষ্টব্য)

পুরাকথাগুলি বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যা বহন করে চলেছে। পুতপুতপাখির জন্মরহস্য[৫৭৮]কাক ও বাদুড়ের জন্মকথা,[৫৭৯] চাতকপাখিকে জল খেতে কষ্ট পেতে হয় কেন ইত্যাদি কথার পাপ-পুণ্য, আশীর্বাদ অভিশাপের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছে যে নীতিবোধ সেগুলিই সমাজের সংহতির শক্তি জুগিয়েছে, গড়ে তুলেছে নিজস্ব মূল্যবোধ।

পুরাকথার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় প্রবণতা লোকমানসের বৈজ্ঞানিক চিন্তন ক্ষমতাকে চিনিয়ে দেয়। যেমন The Origin of Opium[৫৮০] আফিং কি করে হলো গল্পে পোস্তোমনি যতগুলি প্রাণীর রূপ গ্রহণ করে ছিল অহিফেন সেবীদের মধ্যে সেই সেই প্রাণীর অন্তত পক্ষে একটি করে গুণ পরিলক্ষিত হয়।

—He will be mischievous like a mouse, fond of milk like a cat, quarrelsome like a pig, fillty like an ape, savage like a boar, and high tempered like a Queen[৫৮১]— বাস্তবের আফিংখোর ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে ইতর প্রাণীর আচরণের সমতা খুঁজে পাওয়া এই বাস্তব অভিজ্ঞানও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নিরিখেই পুরাকথাটি রচিত হয়েছে।

এইভাবেই বাংলা পুরাকথাগুলি ধর্মীয় রহস্য সংরক্ষণের যাদুকরী প্রচেষ্টাকেই মুখ্য অবলম্বন করেনি। 'একমাত্র সৃষ্টি তত্ত্বের বিবরণ বাদ দিলে ইহার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাস্তব ও গার্হস্থ্য পরিবেশের সুকোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়।[৫৮২]

পুরাকথার এই যে ধর্মীয় সংস্কার বিচ্যুতির প্রবণতা, সে প্রসঙ্গে লোকবিজ্ঞানী বলেন—

'Myth jealously adhers to the letter and circumstance of that which it narrative or describes to alter it in anyway is though to destroy its magical or supernatural efficacy.'[৫৮৩]

বাংলা মিথের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহমান ঐতিহ্যের সুদৃঢ় অনুভবের ব্যাপারও থাকে, ঠিক তেমনি স্থানিক কালিক বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করে, পরিবর্তনশীল লোকাচার ও লোকবিশ্বাসকে অবলম্বন করেই কোন নব জিজ্ঞাসা লোকসমাজের অন্তর্লোকের গভীরে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতও হয়ে যায়। তাই বোয়াজ যথার্থই বলেন—

'Before one can speculate about what must have happened in far-off times and places he should find what actually happens today in a particular tribe'[৫৮৪]

এই ভাবেই সংস্কৃতির ধ্রুপদী ও পরিবর্তনশীল লোকয়ত ঐতিহ্যের সুচারু মেলবন্ধনের স্মারক হয়ে উঠেছে এই বাংলা পুরাকথাগুলি।

কিংবদন্তী

বিশেষ কোন স্থান বা ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত বিচিত্র জনশ্রুতি এই ধরনের বাংলা লোককথার বিষয়বস্তু। আভিধানিক অর্থে 'কিংবদন্তী' বলতে বোঝায় 'সত্য বা অর্দ্ধসত্য কাহিনী, জনশ্রুতি, বিচিত্র গুজব।[৫৮৫]

যে কাহিনী বিচিত্র, তা মানবমনের কাছে স্বভাবতই আকর্ষক। মহাভারতের আদিপর্বে আছে যে নৈমিষারণ্য-বাসী তপস্বীরা মহাভারত কথা শ্রবণ করার জন্য সৌতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন কারণ, সে কথা বিচিত্র—

তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ
চিত্রা ঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিব্রুস্তপস্বিনঃ।।[৫৮৬]

সেইরকম অসাধারণ বিচিত্রকে বিশ্বাসের সঙ্গে মনে স্থায়িত্ব দেবার স্বাভাবিক প্রবণতাই কিংবদন্তীর জনক। সেই কারণেই কিংবদন্তী গড়ে ওঠে কোন অসাধারণ বিষয় বা ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। মানবমনের অবচেতনে সর্বদাই অতিলৌকিক সাধারণাতীত কিছু সম্পর্কে একটা ভয়, কিছুটা বিষয় এবং অনিবার্য কৌতূহল থাকে। সেই সব কিছু মিলেই বাস্তব ইতিহাসের কাঠামোর উপর বহিরঙ্গের কাহিনী সৌধটি গড়ে ওঠে। উৎস মূলের বাস্তব ঘটনাটির সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান কাল বস্তু অথবা মানুষের প্রসঙ্গে কালক্রমে এক একটি কিংবদন্তীর জন্ম হয়।

আশরাফ সিদ্দিকী যথার্থই বলেছেন, 'ইতিহাসের কোন কাহিনী যদি লোক ঐতিহ্যে বহুল প্রচার লাভ করে তবে মাত্র দেড়শ বছর ব্যবধানে তার ঐতিহাসিক মেজাজ ঝাপসা হতে হতে কিংবদন্তীর উপাদানে পরিণত[৫৮৭] হয়ে যায়। অর্থাৎ বলা যায় যদিও নির্বিশেষ সাধারণ চরিত্রাবলীর পরিবর্তে বাস্তব চরিত্র বা স্থান বা অতীত ঐতিহাসিক ঘটনার রেণুই কিংবদন্তীর নিয়ামক, তবু অলৌকিক অসাধারণ প্রতীতির কোন ঘাটতি থাকে না সেখানে।

—"This form of tale purports to be an account of an extraordinary happening believed to have actually occured. And it may give what has been handed down as a memory–often fantastic or even absurd–or some historical character."[৫৮৮]

ইংরাজী লিজেণ্ড অনেকাংশে কিংবদন্তীর সমধর্মী, Legend-এর পরিচিতি এই ভাবে দেওয়া হয়েছে—

"Originally something to be read at religious service or at meals usually a saint's or martyr's life.......a narrative supposedly based on fact,

with an inter-mixture of traditional materials told about a person place or incident"[৫৮৯]

অর্থাৎ কিংবদন্তী মূলতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অথবা ভোজন অনুষ্ঠানে পঠিত হত আর বিষয় সাধারণতঃ সাধু বা শহীদের জীবনবৃত্তান্ত। ইতিকথা আখ্যানধর্মী এবং সত্য বলেই অনুমিত। সকল সময়ই যে ব্যক্তি সম্পর্কিত হবে তার কোন নিশ্চয়তাকেই স্থানও ঘটনা কেন্দ্রিক হতে পারে।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দিষ্ট মানসিকতা সক্রিয় থাকায় কিংবদন্তীর বর্ণনায় কল্পনার আতিশয্যই প্রকাশ পায়, যা মূল চরিত্র বা আখ্যানের উৎস মূলকে আবৃত করে রাখে—

".......many traditions strongly attached particular places or persons have tendencies to wander, so that it is frequently hard to determine the original location or person about whom the legend grew up."[৫৯০]

বাংলা কিংবদন্তীর একটি রূপ বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বলয়কেন্দ্রিক। যেমন রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক ঘটনাবলী পরিচিতি ভারতব্যাপী। কিন্তু বাংলার অনেক স্থানই সেই পৌরাণিক ঘটনার আধারভূমি রূপে বাঙালী লোকমননে স্বীকৃত—

"It may recount of something which happened in ancient times at a particular place–a legend which has attached itself to that locality."[৫৯১] কৃষ্ণনগরে শিলাই নদীর তীরেই গণগনির মাঠে [৫৯২] ভীম ও বক রাক্ষসের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল—বাঙালীর এ দৃঢ় বিশ্বাস। তাই সেখানকার প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ড হয়েছে ভীমের গদা, শিলাখণ্ডগুলি রাক্ষসের অস্থি।[৫৯৩] বাস্তবস্থানকে কেন্দ্র করেই পৌরাণিক ঘটনাটির সংযোগে গড়ে উঠেছে কিংবদন্তী—যে ঘটনার পরিচিতি সর্বভারতীয়। আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"লোকপুরাণও কোন সময় কিংবদন্তীর রূপ নেয়।"[৫৯৪]

অর্থাৎ পুরাকথার মধ্যে যতক্ষণ ধর্ম ও দেবত্বের নির্যাস মেশানো থাকে ততক্ষণই তা পুরাকথা বা মিথ্। কিন্তু সেই অলৌকিকত্ব বিমুক্তি ঘটলেই তা বাস্তবের অনেকটাই কাছাকাছি চলে আসে। ফলে সেই চরিত্র বা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে কিংবদন্তী গড়ে তোলা সহজ হয়—

"A myth remains properly myth only as long as the divinity of its actor or actors is recognized then the trickster becomes human rather than divine when the hero to a man than a God, myth becomes legend.[৫৯৫]

সেই কারণেই মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব যখন সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন তখন তারা পুরাকথার চরিত্র। কিন্তু লোকস্মৃতিতে এঁরা যখন বাস্তবের গণগণির মাঠে লড়াই করেন, তখন তা মাঠে প্রস্তরীভূত বাস্তব শিলাখণ্ডের মতোই যেন সত্যের গন্ধবাহী হয়ে পড়ে

ও কিংবদন্তী আখ্যা পায়।

সুইডিস লোকবিজ্ঞানী ভন্ সিডো তারই নাম দিয়েছেন Oikotype বা স্থানীয় রূপ।[৫৯৬]

এইভাবে রাজা বিক্রমাদিত্য, সাধু তুলসীদাস, কালাপাহাড়, দস্যু গঞ্জালেস প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তথা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বলয়ে পরিচিত চরিত্রেরাও স্থানীয় কিংবদন্তীর আধারে বদ্ধ হয়েছেন।

দ্বিতীয় একধরনের কিংবদন্তীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেগুলি আঞ্চলিক। ঢেঁকি ঘুরিয়ে ডাকাত তাড়ানো আশানন্দ ঢেঁকি, একমণ চালের ভাত খাওয়া মুনকে রঘু'[৫৯৭] 'ঝুড়ি ভর্তি কড়ি বোঝাই হয়ে ভেসে আসে এমন মাইনে পুকুর'[৫৯৮] ইত্যাদি সুপ্রচুর কাহিনী গড়ে উঠেছে বাংলার অলি গলিতে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, এদের পাত্রপাত্রী স্থানিক অর্থাৎ তাদের পরিচিতি বাঙালীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বলয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ অঞ্চল বিশেষে।

অবশ্য উভয় প্রকার কিংবদন্তীর মূলেই কার্যকর বাঙালীর নিজস্ব বিশ্বাস বোধ যা লোকমননে কিংবদন্তীকে ঐতিহাসিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।—

"As fantastic as some of this material is, it is related as an object of belief and its effect, is the effect of history."[৫৯৯]

তাহলে ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কিংবদন্তীর সম্পর্কটি যাচাই করা যাক্। কিংবদন্তীর সমগোত্রীয় Legend সম্পর্কে SDFML-এ বলা হয়েছে "All of them contain a grain of truth but none give entire satisfaction",[৬০০] অর্থাৎ বাস্তবের বিক্ষিপ্ত কণার সন্ধান পাওয়া যায় কিংবদন্তীতে, কিন্তু সমগ্র বাস্তব সেখানে উদঘাটিত হয় না। প্রাচীনতম ঐতিহ্য আলো-আঁধারি সাংস্কৃতিক হিমবাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাস্তব ও কল্পনার অভিঘাতে জন্ম দেয় কিংবদন্তীর।

অপরদিকে ইতিহাসের মূল বক্তব্য হল 'ইতি হ আস' অর্থাৎ এমনটি পূর্বে ছিল।[৬০১] পূর্বে অর্থাৎ অতীতের সত্য কাহিনী যা সমস্ত মিথ্যা রাগ বিরাগ কল্পনার যাদুমুক্ত—তাই যে বিচারবুদ্ধিও মনশক্তি সত্যসন্ধিৎসা ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ইতিহাস রচনায় প্রয়োজন। তার তুলনা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে চলে কিংবদন্তীর সঙ্গে নয়।

কিংবদন্তী যে ইতিহাস ব্যক্ত করে, তাকে বলা যায় মুক্ত মনের কাহিনী। যদিও অবিন্যস্ত, অগ্রহিত ঐতিহাসিক তথ্যের কাঁচামাল থেকেই লোকমানসে জন্ম নেয় সুগঠিত কিংবদন্তীর পূর্ণাবয়ব রূপ। তাই কিংবদন্তী যে ইতিহাস ব্যক্ত করে তার সঙ্গে লোকসমাজের প্রাণসত্তার সমীকরণ ঘটে। তাদের যুক্তি, স্মৃতি কল্পনা ও শৈল্পিক সৃষ্টি ক্ষমতাই প্রকাশিত হয় কিংবদন্তী তাদের আলোকে।

—'Legends represent the efforts of mankind in the exercise of reason memory and imagination.'[৬০২]

মহাভারতে ইতিহাস সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সে ইতিহাস কোন্ কবি পূর্বে আংশিক

বলেছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলছেন এবং অন্য কবিরা ভবিষ্যতে বলবেন'—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষাতে পবে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিনং ভুরি।।[৬০৩]

এই মন্তব্য কিংবদন্তী সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সেকারণেই ঐতিহাসিক গবেষক ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ কিংবদন্তীতে খুঁজে পাবেন না, তবে কিংবদন্তীর মধ্যে দিয়ে সন্ধান পাবেন এক বিশেষ স্বাজাত্যবোধের, স্বদেশের বস্তু, স্থান, বিখ্যাত এমন কি কুখ্যাত চরিত্রগুলি সম্পর্কেও এক তীব্র অনুসন্ধিৎসার, যা লোকমননে ইতিহাসচেতনারই নামান্তর। ম্যালিনোস্কি তাই যথার্থই বলেছেন—

Folktales Legends and myth must be lifted from their flat existence of paper and placed in the three dimentional reality of full life.[৬০৪]

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক, সংস্কৃতি ও পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সংমিশ্রণের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধিতে সহায়ক এই কিংবদন্তী।

'Legends play a vital role to know the man's social life pursuing of customs, development of institution reation of values, behavioural pattern'[৬০৫]

জাগতিক প্রেম, আত্মত্যাগ, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে প্রাণবন্ত, সংকল্পে স্থির, সত্যের প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠ মানসিকতার বিচিত্র ধারা বহন করে চলেছে কিংবদন্তী। ইতিহাস ও কিংবদন্তী তাই বিশিষ্ট অর্থেই পরস্পরাশ্রয়ী। উভয়ের সংযোগেই প্রাচীন প্রসঙ্গে বর্তমানের জ্ঞানবিস্তার ঘটে—

"Combined history and folkliterature (i.e. myth legend etc) can restore much of the picture of early times and can work through the fullness of later time with some degree of success.[৬০৬]

এইভাবেই কিংবদন্তীগুলি লোকসমাজে জনপ্রিয়তা ও লোকমান্যতার তৌলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পেরেছে।

যে গল্পের শেষ নেই

বাংলায় কতগুলি লোককথার সমাপ্তি অসম্পূর্ণ অনিশ্চিত, গল্পগুলির বর্ণন ভঙ্গি সরল, অথচ কোন সর্বজনগ্রাহ্য অবশেষরেখা স্পর্শ করেন না কথক। গল্পটি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁছে যায় যেখানে ক্রমাগত একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে যতক্ষণ না শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে—

"These are usually quite simple in pattern. A situation is afforded in which a particular task must be repeated an indefinite number of times. Thousands of sheep, for example must be put over a stream one at a time and the narrator proceeds inexorably with his literal repeatition of the performance until his listeners can stand no longer.[৬০৭]

বাংলা লোককথার ভাণ্ডারেও এই রকম কাহিনী দুর্লভ নয়। ইঁদুরের একটি গল্পের

উল্লেখ করা যায় যেখানে খরার সময় তারা নদীর অপর পারে বনে যাওয়া ঠিক করল। ডিঙিতে উঠে তারা রওনা দিল। মাঝনদীতে আর একটা ডিঙির সঙ্গে দেখা হল। ডিঙি ভর্তি ইঁদুর। তারা বলল আমাদের এপার-ওপার দুপারেই বাঁচার পথ নেই। একটা ইঁদুর লাফ দিল জলে, হাবুডুবু খেল, তলিয়ে গেল জলে। তারপর আর একটি ইঁদুর.....তারপর আর একটা, আরও একটা.....।[৬০৮] উল্লেখ্য, এখানে গল্পটি সমগ্র ইঁদুরের মৃত্যুতে শেষ হয়নি, আত্মহত্যার সূচনা করে অসমাপ্ত থেকেছে। তবুও এই গল্পটি মৃত্যুজনিত অসহায় দীর্ঘশ্বাস বয়ে আনে।

কিন্তু 'পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর কথা' গল্পে যথার্থই এক অন্তহীন যাত্রায় কাহিনীর ছেদ টানা হয়েছে আকস্মিকভাবে পিঁপড়ে আর পিঁপড়ী, ধানের খোসার নৌকায় উঠে বসল, নৌকা ছেড়ে দিল। খানিক দূর গিয়ে সেই নৌকা চড়ায় আটকে গেল। তখন পিঁপড়ে বললে, পিঁপড়ী, আমিও ঠেলি তুমিও ঠেল!

আমার কথাও ফুরিয়ে গেল[৬০৯]

অসমাপ্ত লোককথার একটি ধারা উৎকণ্ঠার তীব্রতম মুহূর্তেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়—

'It sustains great interest up to a certain point but gets nowhere,'[৬১০]

মনীষী আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত 'যে গল্পের শেষ নেই'[৬১১] এই রকমই একটি গল্প যেখানে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রাজকন্যা সূর্যমণি তার প্রেমাস্পদ কামদেবের সঙ্গে আবদ্ধ হল বিবাহ বন্ধনে। শিশুপুত্রকে নিয়ে একটি কলার ভেলায় চেপে দেশে প্রত্যাবর্তন পথে একটি ইঁদুর ভেলাটিকে তিন টুকরো করে ফেলল। ফলে তিনজনে তিনদিকে ভেসে চলল।

—এমনই এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে পৌঁছে গল্পটির অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যাশিত মিলনের সম্ভাবনা এইভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার দায়িত্ব স্বভাবতই কথকের উপরই বর্তেছে—

'Sometimes a story teller teases his audience by stopping just as the interest has been aroused.'[৬১২]

তবে এই অসমাপ্ত কাহিনীও যে বর্ণনার একটি নিজস্ব আঙ্গিক গড়ে তুলেছে, সেই সত্যকে উপেক্ষা করা যায় না।

বাংলা লোককথার এই শ্রেণী বিভাগের বহির্ভূত কিছু শ্রেণী হয়তো থাকতে পারে, তবে তা নেহাৎই নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে স্পষ্ট বিভাগের প্রাচীর নির্মাণ করা চলে না। কারণ একটি লোককথার মধ্যে একাধিক শ্রেণী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকতে পারে।

মোটের উপর এই বহুবিধ শ্রেণী থেকে এই সত্যই ফুটে ওঠে যে বাংলা লোককথার ভাণ্ডারটি সুবিশাল এবং বহু বৈচিত্র্যসম্পন্ন বাংলা লোককথার এই বিপুল সম্পদের উৎপত্তিস্থল ও সৃষ্টিকালকে নির্ভুল মাপকাঠিতে আবদ্ধ করা অসম্ভব। স্রোতস্বিনী নদীর ভাঙ্গুনি পাড়ের মতোই যুগে যুগে বাংলার রাষ্ট্রীয় সীমার অনিশ্চয়তা দেখা যায়। মনীষী

রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—

"সমগ্র বঙ্গদেশের একটি ভৌগোলিক চিত্র চীনদেশের পরিব্রাজক হুয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায়।

হুয়েন সাং বঙ্গদেশের যে চারিটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন সেই চারিটি রাজ্য পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) সমতট (পূর্ববঙ্গ) তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ) এবং কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ)"[৬১৩]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'বঙ্গদেশ ও বাঙ্গলাভাষা গড়িয়া উঠিবার কালে এবং তাহার পর কয়েক শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গভাষী জনগণের নিবাসভূমি দুইটি প্রধান নামে অভিহিত হইত। গৌড় ও বঙ্গ বা বঙ্গাল, উত্তরবঙ্গ রাঢ় সুহ্মা। এই অঞ্চলগুলি লইয়া গৌড় দেশ আর বড় নদী পদ্মার অপর পারে ও পদ্মানদীর দক্ষিণের দেশে তথা সুদূর প্রাচ্য বাঙ্গালায় ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুমিল্লা, চট্টল অঞ্চল—এই সমস্ত ধরিয়া বঙ্গদেশ....খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ হইতে তুর্কী মুসলমান বিজেতাদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ ও ক্রমে পূর্ববঙ্গ বিজয় ঘটে গেল সারা দেশের জন্যই একটি নাম বঙ্গাল্‌হ—এই বিস্তৃতরূপ মিলিতভাবে গৌড় ও বঙ্গ উভয় অঞ্চলের জন্যই গৃহীত হইয়া যায় এবং বঙ্গালী শব্দের উত্তর বিশেষণার্থে ঈ-প্রত্যয় যোগ করিয়া বঙ্গালী সারা বাংলার অধিবাসীরূপে পরিচিত হয়।'[৬১৪]

বাংলা লোককথার মধ্যে বঙ্গভূমির এই বিস্তৃতি ধরা পড়েছে। 'শীতবসন্ত' গল্পে বসন্ত আরোহণ করেছেন দুধ-মুকুটে ধবল পাহাড়ে।[৬১৫]

এই ধবল পাহাড় বরফাবৃত হিমালয় পর্বতের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবার দক্ষিণের বিস্তৃত সমুদ্রের কথাও এসেছে বহুবার—

'পাঁচ ময়ূরপঙ্খী ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রে গিয়া পড়িল।'[৬১৬] আর এই সমুদ্রের কবল থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বুদ্ধ-ভুতুম মাঝিদের বলেছে—

'উত্তর দিকে পাল তুলিয়া দে'......দেখিতে দেখিতে ময়ূরপঙ্খী সমুদ্র ছাড়াইয়া এক নদীতে আসিয়া পড়িল, নদীর জল যেন টল্‌টল্‌, ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। দুই পাড়ে আম কাঁঠালের হাজার গাছ।'[৬১৭]

এই চিত্র স্পষ্টতই সমুদ্রবেষ্টিত সমভূমিকেই স্মরণ করায়।

এছাড়া বহু স্থান নাম উল্লিখিত হয়েছে লোককথার যেগুলির কিছু অবশ্যই কাল্পনিক, কিন্তু বহুস্থানেরই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যেমন—পক্ষীরাজ[৬১৮] গল্পে এসেছে কাকদ্বীপের প্রসঙ্গ। কখনো এসেছে লঙ্কদ্বীপ, (The King's Cousin)[৬১৯] আর কিংবদন্তী তো বাস্তবের নানাস্থানকেও কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

সুতরাং বাংলা লোককথার উৎসভূমি ও বিকাশ বলতে মনীষী সুনীতিকুমার কর্তৃক উল্লিখিত বিস্তৃত গৌড়বঙ্গকেই বলা যায়। একদিকে সুউচ্চ পর্বত আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, মাঝখানে সমভূমির সাম্য—এই ভূখণ্ডই বাংলা লোককথার ধর্মকর্মনর্মভূমি।

বাংলা লোককথার উৎপত্তিকালকেও নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। লোককথার জন্ম বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর বাঙালীর সংস্কৃতি তো বিশেষ একদিনে গড়ে ওঠে নি।

—'অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য এই তিন জাতির মিলনে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হইল। উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতা তৎসঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসিল.....পাল ও সেন আমলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল....তারপর তুর্কী আক্রমণে বাঙ্গালী বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিল কিন্তু তাহার মূল জীবনীশক্তি অটুট হইল।'[৬২০]

এই বৈতসীবৃত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায় বহু পূর্বে কালিদাসের রঘুবংশে—

পৌরস্ত্যানেব মাত্রানংস্তাংস্তান্ জনপদানজয়ী
প্রাপ্য তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ।।
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিত সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্।।[৬২১]

'অর্থাৎ পূর্বদেশের জনপদগুলিকে আক্রমণ করে ও জয় করে বিজয়ী (রঘু) এইভাবে তাল গাছের বনে শ্যাম হয়ে যাওয়া সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হলেন। এই উৎপাটনকারী রঘুর (যিনি সমুদ্রের মতো) কাছ থেকে সুহ্মোরা আত্মরক্ষা করল বেতগাছের ধর্ম (অর্থাৎ নত হওয়া) অবলম্বন করে।'[৬২২]

বাঙালীর সংস্কৃতির এই ধর্মটিই লোককথায় প্রসারিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। যুগযুগ ধরে পাঠান মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর সান্নিধ্য, সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে। সমগ্র আর্যাবর্তের মৌল সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করেই পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে যে সংস্কৃতি, লোককথাগুলি তাকেই বহন করে চলেছে। যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা বাঙালীর গৌরব ও লজ্জা, আনন্দ, যন্ত্রণা, প্রত্যয়, গ্লানি, সংগ্রাম ও পরবশ্যতার ইতিহাস বহন করে চলেছে লোককথা।

'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, 'প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, সাহিত্য তাহাকেই ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে।'[৬২৩]

একই কারণে ইতিহাস যখন প্রাচীনের মধ্যে সভ্যতার উপকরণ অন্বেষণ করে তখন সে শুধু ধ্বংসস্তূপ কিংবা স্থাপত্যের বিকীর্ণ চেহারার সন্ধান করে না, সে অনুসন্ধান করে—লোকায়ত সংস্কৃতির। এই লোকসাহিত্যের অন্তর্গত লোককথাগুলিও বাঙালী জাতির স্মৃতি, সম্প্রতি ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞানের দ্যোতক। লোককথার অন্তর্নিহিত বাঙালীর জাতীয় জীবনের ক্রমান্বিত বিবর্তনের পরিচয় যে পদ্ধতির সাহায্যে সংগ্রহ করা যায় সেটি হল জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, লোকসাহিত্য আলোচনায় এই পদ্ধতির গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ লিপিকা (গল্প), বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪০১, পৃ: ৪৫, ৪৬

২। সেন সুকুমার, গল্পের গাঁটছড়া, সাহিত্যম্, বাংলা ১৩৯২, পৃ: ৭৭

৩। দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, প্রথম ভাগ, ৩য় সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, পুনর্মুদ্রণ অগস্ট ১৯৭৯, পৃ: ৪১৯

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮, পৃ: ৫২৯

৫। মিত্র সুবলচন্দ্র, সরল বাংলা অভিধান, নিউবেঙ্গল প্রেস, অষ্টম সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৪, পৃ: ৩৩২

৬। জানা নরেশচন্দ্র, অনুবাদে মেঘদূত সার্ধশতবর্ষ, সাহিত্যলোক ১৯৯১, পৃ: ৬

৭। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯৭১

৮। দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) দ্বিতীয়ভাগ, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ: ১৯১০

৯। মিত্র সুবলচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ১১৯৪

১০। Hunter, E. Devid, and Whiten Phillip ed. Encyclopaedia of Anthropology, U.S.A. 1976 P. 173

১১। Webster's Seventh New Collegiate Dictionary. Indian Edition, Second Reprint. April, 1971, Scientific Book Agency. P. 324

১২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ৩য় সং। ১৯৬২, পৃ: ৩৯৭

১৩। Thomson Stith, The Folktale, University of Calefornia Press, 1977, P.4

১৪। ঐ P.4

১৫। Webster's Seventh New Collegiate Dictionary, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১ সংখ্যক), P 324

১৬। Leach Maria ed. Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend. VI. Funk and Wagnalls, New York 1949, P.401

১৭। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক) p.3

১৮। ভট্টাচার্য বিধুভূষণ সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ২৮, জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রিন্টার্স, ১৩৮২, পৃ: ২০

১৯। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 368

২০। ঐ, P. 368

২১। ঐ, P. 369

২২। ঐ

২৩। ঐ, P. 370

২৪। ঐ, P. 370

২৫। ঐ, P. 369

২৬। ঐ, P. 372

২৭। ঐ, P. 373

২৮। ঐ, P. 373

২৯। সিদ্দিকী আশরাফ, লোকসাহিত্য প্রথম খণ্ড, মল্লিকবাজার, ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৪

৩০। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 375

৩১। ঐ, P. 375
৩২। ঐ, P.375
৩৩। ঐ, P.376
৩৪। ঐ, P.377
৩৫। ঐ,
৩৬। ঐ,
৩৭। ঐ, P.379
৩৮। ঐ,
৩৯। ঐ, P.381
৪০। ঐ,
৪১। ঐ, P.382
৪২। ঐ, P.385
৪৩। ঐ,
৪৪। ঐ, P.386
৪৫। ঐ,
৪৬। ঐ, P.387
৪৭। ঐ,
৪৮। ঐ,
৪৯। ঐ, P.388
৫০। ঐ, P.389
৫১। ঐ, P.369
৫২। দাস ক্ষুদিরাম (সভাপতি), একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯২, পৃ:৪২
৫৩। Friedman B. Albert, ed. The Viking Book of Folk Ballad, New York, 1961, P.11
৫৪। Malinowski B. Magic, Science and Religion, New York, 1948. P. 104
৫৫। চক্রবর্ত্তী বরুণকুমার, মজুমদার দিব্যজ্যোতি, বাংলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৬, পৃ:৪০
৫৬। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ নং) P.449
৫৭। ঐ, P.451
৫৮। ঐ, P.452
৫৯। ঐ
৬০। ঐ
৬১। ঐ
৬২। Leach Maria, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক) P. 401
৬৩। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক) P. 455
৬৪। ঐ, P. 456
৬৫। ঐ
৬৬। ঐ
৬৭। ঐ

৬৮। ঐ
৬৯। ঐ
৭০। ঐ
৭১। ঐ
৭২। সেন সুকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ১১৬
৭৩। সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ, দে'জ পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃ: ৩৮৬
৭৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরদাদার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ, ষোড়শ সংস্করণ ১৩৯৩ পৃ: ১৫৯-১৬০
৭৫। Dey Lal Behari, Folk Tales of Bengal. Uccharan, 1993, P. 153
৭৬। ঐ, Preface
৭৭। সিদ্দিকী আশরাফ কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৫, পৃ. ৫
৭৮। ঐ, পৃ: ৬
৭৯। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৩ সংখ্যক)
৮০। Mcculloch William, Bengali Household Tales, London, 1912 P. VI.
৮১। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (৭৭ সংখ্যক) পৃ. ৩
৮২। ঐ
৮৩। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) পৃ: ৫৯৬০
৮৪। মণিরুজ্জামান মোহাম্মদ সম্পাদিত, ঢাকার লোককাহিনী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২
৮৫। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (৭৭ সংখ্যক)
৮৬। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব সম্পাদিত, বাংল্যর লোককথা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৮ হিজরী
৮৭। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক) পৃ: ২২২
৮৮। ঐ, P. 208
৮৯। ঐ, P. 179
৯০। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) পৃ: ৫৮
৯১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক) পৃ: ১৫৯-৬০
৯২। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬ সংখ্যক) পৃ: ২৪
৯৩। Bodding P.0. Santal Folk Tales, Oslo 1925, P. 165
৯৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ৩৩
৯৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ভাদ্র ১৪০০, পৃ: ১১৫
৯৬। গুপ্ত বিভূতিভূষণ বেড়াল ঠাকুরঝি, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৮ পৃ: ১১
৯৭। ঐ, P. 87
৯৮। ঐ, P. 89
৯৯। ঐ, P. 47
১০০। ঐ, P. 88
১০১। Damant G.H. Indian Antiquiry Vol.I. 1872. The Third Story, P. 171
১০২। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত, কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা, শান্তিসদন, পৃ: ১
১০৩। Damant G.H. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), Vol. IX, 1880, P. 1
১০৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় ভাগ, মিত্র ও ঘোষ, ভাদ্র ১৪০০, পৃ: ১২৫
১০৫। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃ: ২২৩
১০৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০ সংখ্যক), পৃ: ৬১
১০৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, কথা ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৬,

পৃ: ৭০৭-৭০৮
১০৮। ঐ, পৃ: ৭০৮
১০৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক)
১১০। মণিরুজ্জামান মোহাম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৪ সংখ্যক) পৃ: ১৮১
১১১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 129-138
১১২। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ: ১৬৮
১১৩। James Henry, The art of Fiction and other Essays, Oxford University Press, 1948, P. 13
১১৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন (৯৫ সংখ্যক) পৃ: ১২৯
১১৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক) পৃ: ৭৫
১১৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক) পৃ: ৬৯
১১৭। ঐ, পৃ: ১৫৫
১১৮। ঐ, পৃ: ৭২
১১৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক) পৃ: ৪৫
১২০। ঐ
১২১। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক), পৃ: ১১৮
১২২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৩৫
১২৩। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক), পৃ: ১৬৮
১২৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৫
১২৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক). পৃ: ৫৫
১২৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক) পৃ: ৩২১
১২৭। ঐ, পৃ: ৩৫২
১২৮। ঐ, পৃ: ৩৩৫
১২৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৭৮
১৩০। মজুমদার আশুতোষ, মেয়েদের ব্রতকথা, দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯০, পৃ: ৬০
১৩১। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক) পৃ: ১১
১৩২। ঐ, পৃ: ২৭
১৩৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ১২১
১৩৪। ঐ, পৃ: ৪২
১৩৫। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক) পৃ: ৭৩
১৩৬। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী, পাত্রজ পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ: ৩৯২
১৩৭। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩০ সংখ্যক), পৃ: ১
১৩৮। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩০ সংখ্যক), পৃ: ২২৬
১৩৯। মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৭৩
১৪০। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩৭৫
১৪১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ৪৪
১৪২। Indian Antiquiry Vol. II, 1873, P. 271-272
১৪৩। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃ: ২১১
১৪৪। ঐ, পৃ: ২২৩
১৪৫। ঐ, পৃ: ১০৯

১৪৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯০ সংখ্যক), পৃ: ৩৬
১৪৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ: ১৬১
১৪৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ১১৫
১৪৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ: ১৫৩-৫৪
১৫০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ২৫
১৫১। Mcculloch William, Bengali Household Tales, London, 192, P. 218
১৫২। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১২ সংখ্যক), পৃ: ১১-৩৯
১৫৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক) পৃ: ২৭৫
১৫৪। ঐ, পৃ: ২২৫
১৫৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক) পৃ: ৫৩
১৫৬। Forster F.M. Aspects of the Novel, Penguin, 1963, P. 53
১৫৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ. ৩১৫
১৫৮। ঐ, ৩৫৪
১৫৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ২৩০
১৬০। ঐ, পৃ: ২৩১
১৬১। ঐ, পৃ: ২০৫
১৬২। ঐ, পৃ: ২১৫
১৬৩। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক), পৃ: ১৯৯
১৬৪। মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ১০৫
১৬৫। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃ: ১০৮
১৬৬। ঐ, পৃ: ১১২
১৬৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ১৬
১৬৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ১৬৫-৬৬
১৬৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ১৩১
১৭০। ঐ, পৃ: ১৭৩
১৭১। ঐ, পৃ: ১০২
১৭২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ৩২২
১৭৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক) পৃ: ৩০৮
১৭৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ৪০
১৭৫। ঐ, পৃ: ১২৭- ১২৮
১৭৬। Archilbald Macleish, Poetry and Experience, Penguine Book, 1960, P.16
১৭৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ২৭৪-৩৭০
১৭৮। ঐ, পৃ: ৩১৬
১৭৯। ঐ, পৃ: ৩২৪
১৮০। ঐ, পৃ: ৮৭
১৮১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৩২
১৮২। ঐ, পৃ: ১১৬
১৮৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ৬৩
১৮৪। ঐ: পৃ: ২৯৪
১৮৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ১৩০, ১৩১

১৮৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৩৪৫
১৮৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৭২
১৮৮। ঐ
১৮৯। ঐ, পৃ: ১২৫
১৯০। ঐ, পৃ: ৭৪, ৭৫
১৯১। ঐ, পৃ: ৫০
১৯২। রায় চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩০৮
১৯৩। ঐ, পৃ: ৩১৪
১৯৪। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক), পৃ: ৪৯
১৯৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৪৯
১৯৬। ঐ, পৃ: ৩৬
১৯৭। ঐ, ১৩০
১৯৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ১৭৭
১৯৯। ঐ, পৃ: ৭৫
২০০। ঐ, পৃ: ৯৯
২০১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ১৭৭
২০২। ঐ
২০৩। ঐ
২০৪। ঐ, পৃ: ২৯৯
২০৫। ঐ, পৃ: ১১৭
২০৬। ঐ, পৃ: ১৩৫
২০৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ১১৭
২০৮। ঐ, পৃ: ১৩৫
২০৯। ঐ, পৃ: ১২১
২১০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক) পৃ: ৮১
২১১। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক), পৃ: ৩০
২১২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৮১
২১৩। মণিরুজ্জামান মোহাম্মদ সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৪ সংখ্যক), পৃ: ৪০
২১৪। ঐ, পৃ: ৪৩
২১৫। ঐ
২১৬। রায় যোগেশচন্দ্র, ঠাকুরমার ঝুলি, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৫, পৃ: ১৬৩-১৬৬
২১৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ৫০
২১৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), পৃ: ১১৮
২১৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৫৫
২২০। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক), পৃ: ২৩
২২১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৭
২২২। ঐ, পৃ: ৬৭
২২৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক) পৃ: ১৭৬
২২৪। ভট্টাচার্য্য হিমাদ্রিশঙ্কর, ভট্টাচার্য্য সুধীরশঙ্কর সম্পাদিত, কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা, দায়ো-বায়োকথা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ: ৭৮

২২৫। ঐ, পৃ: ৪৮
২২৬। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১২ সংখ্যক), পৃঃ ৯৫
২২৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ৩০১
২২৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ১২১
২২৯। ঐ, পৃ, ৩
২৩০। ঐ,পৃঃ ৫
২৩১। ঐ,পৃঃ ৬
২৩২। ঐ,পৃঃ ৮
২৩৩। ঐ,পৃঃ ১৫
২৩৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ৮৪
২৩৫। ঐ, পৃঃ ৫৫
২৩৬। ঐ, পৃঃ ৮৪
২৩৭। ঐ, পৃঃ১২০
২৩৮। ঐ, পৃঃ ২৫৫
২৩৯। ঐ, পৃঃ ২৬৬
২৪০। ঐ, পৃঃ ৩২৬
২৪১। ঐ, পৃঃ ৩২৬
২৪২। ঐ, পৃঃ ৩৩২
২৪৩। ঐ, পৃঃ৩৭০
২৪৪। মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ১২৬
২৪৫। ঐ,পৃঃ ১২৭
২৪৬। ঐ,পৃঃ ১২৫
২৪৭। ঐ,পৃঃ ১২১
২৪৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ ৩২০
২৪৯। ঐ,পৃঃ ১৫৭
২৫০। ঐ,পৃঃ ৩১৯
২৫১। দে সুশীলকুমার, বাংলা প্রবাদ, এ মুখার্জী কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯২ ভূমিকা, পৃঃ ২৬
২৫২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ৩০৪
২৫৩। ঐ, পৃঃ ২৩৬
২৫৪। ঐ, পৃঃ ৩৪১
২৫৫। ঐ, পৃঃ ৮৬
২৫৬। ঐ, পৃঃ ৫৩
২৫৭। ঐ, পৃঃ ৫৯
২৫৮। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক), পৃঃ ৪০
২৫৯। রায় চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যাক), পৃঃ ৩১৬
২৬০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ৮
২৬১। ঐ,পৃঃ ৮
২৬২। Sen Dinesh Chandra. Folk Literature of Bengal, University of Calcutta,

1920, P.265

২৬৩। সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃঃ ৮১
২৬৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ২৫৮
২৬৫। ঐ, পৃঃ ২৪৯
২৬৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ৫৮
২৬৭। ঐ,পৃঃ ৬৫
২৬৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ, ৯২
২৬৯। ঐ, পৃঃ ৬৩
২৭০। Sen Dinesh Chandra পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩০৬ সংখ্যক), p. 78
২৭১। ঐ
২৭২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ৬৩
২৭৩। ঐ, পৃঃ ২৪৯
২৭৪। বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, পথের পাঁচালী, কাত্যায়নী বুক স্টল, বৈশাখ, ১৩৫৯ সন, পৃ ঃ৬০
২৭৫। দে আশিসকুমার সম্পাদিত, লোকভাষা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ ১৪০০, পৃঃ ২১
২৭৬। গোস্বামী বিজনবিহারী সম্পাদিত ঋক্‌বেদ, ১ম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩, পৃঃ১৭১
২৭৭। ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭২
২৭৮। ঐ, পৃঃ ৪২
২৭৯। গোস্বামী বিজনবিহারী সম্পাদিত অথর্ব বেদ, হরফপ্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২, পৃঃ ১৭, শ্লোকাংশটি প্রথম অনুবাদের প্রথম সূক্তের অন্তর্গত। মূল পংক্তিটি— যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বারূপাণি বিভ্রতঃ
২৮০। ঐ, পৃঃ ২৭
২৮১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ২৪০
২৮২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ১১৮
২৮৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ৩০৬
২৮৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ২৪৪
২৮৫। ঐ, পৃঃ ২৪৪
২৮৬। ঐ, পৃঃ ৬৭
২৮৭। ঐ, পৃঃ ২৫৩
২৮৮। মিত্র সুবলচন্দ্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, নিউবেঙ্গল প্রেস্, অষ্টম সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৪, পৃঃ ১২৬৭
২৮৯। ঐ
২৯০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক)
২৯১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ ,সংখ্যক)
২৯২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ৭৭
২৯৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ৩৬
২৯৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ২৩৮
২৯৫। ঐ, পৃঃ ২৯৮
২৯৬। ঐ, পৃঃ ১০৭
২৯৭। ঐ, পৃঃ ১৬১
২৯৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ৩৫২

২৯৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 71
৩০০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ৭৯
৩০১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ২৪২
৩০২। ঐ, পৃঃ ২৭৭
৩০৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ৮২
৩০৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৪ সংখ্যক), পৃঃ ১৪৭
৩০৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 201
৩০৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ১৯২
৩০৭। ঐ, পৃঃ ২৯৩
৩০৮। ঐ, পৃঃ ২৫৩
৩০৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ ৯৯
৩১০। ঐ, পৃঃ ৯৭
৩১১। মিত্র মজুমদার পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক) ২৭৭
৩১২। ঐ, পৃঃ ৩৩৩
৩১৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ১২৩-২৪
৩১৪। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃঃ ১৬৩
৩১৫। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃঃ ৮৯
৩১৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ ২৮৯
৩১৭। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃঃ ৩১৩
৩১৮। ঐ, পৃঃ ১১৫
৩১৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), পৃঃ ৪৭
৩২০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃঃ১৩০
৩২১। ঐ, পৃঃ ১০৩
৩২২। ঐ, পৃঃ ৯৯
৩২৩। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃঃ ২৭
৩২৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ১৩১
৩২৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P.175
৩২৬। ঐ
৩২৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ২৫৮
৩২৮। ঐ, পৃঃ ৫৫
৩২৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 146
৩৩০। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক) পৃ.: ২৬
৩৩১। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১২ সংখ্যক), পৃঃ ৮২-১১৭
৩৩২। ঐ, পৃঃ ১০০
৩৩৩। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃঃ ৭০৪
৩৩৪। বসু মলয়, বাংলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮০, P.VIII
৩৩৫। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 8
৩৩৬। ঐ
৩৩৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ২৯-১০০
৩৩৮। ঐ, পৃঃ ৫৫

৩৩৯। ঋক্‌বেদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২৪ সংখ্যক), পৃঃ ৪০৫
৩৪০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃঃ ২৫৫
৩৪১। ঐ, পৃঃ ২৫৬
৩৪২। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃঃ ১৪০-১৫১
৩৪৩। ঐ, পৃঃ ১৪৯
৩৪৪। ঐ, পৃঃ ১৪৭
৩৪৫। মণিরুজ্জামান মোহাম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৪ সংখ্যক) পৃঃ ৮৩-১২৬
৩৪৬। সেন সুকুমার, গল্পের ভূত, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃঃ ১০
৩৪৭। Leach Maria ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P. VI, P. 365-366
৩৪৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, অসম্ভব কথা, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯৪ পৃঃ ১৭৫
৩৪৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃঃ ৬৭
৩৫০। Jones Ernest, Psycho Analysis and Folklore, Jubilee congress of the folk-lore, Society paper and Transactions, London, 1930, P. 22
৩৫১। মজুমদার দিব্যজ্যোতি, সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৫ সংখ্যক), পৃঃ ৪
৩৫২। Dawkins R.M. The Meaning of Folktales, Folklore. LXII, 1951, P.418
৩৫৩। Leach Maria ed,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P. 189
৩৫৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), ভূমিকা পৃঃ ১৭-১৮
৩৫৫। ঐ
৩৫৬। ঐ
৩৫৭। Leach Maria ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), পৃঃ ১৮৯
৩৫৮। মণিরুজ্জামান মোহাম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৪ সংখ্যক), পৃঃ ২২
৩৫৯। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১২ সংখ্যক), পৃঃ ১৩৫
৩৬০। Sen Dinesh Chandra,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩০৬ সংখ্যক) P. 45
৩৬১। দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮ সংখ্যক), পৃঃ ১৬৫৬
৩৬২। বসু মণীন্দ্রমোহন সম্পাদিত চর্যাপদ, ভূমিকা অংশ, কমলা বুক ডিপো, ১৯৬৬, পৃ. ২৯
৩৬৩। Taylor E.B. Primitive Culture, Vol.1, New York, 1872, P. 427
৩৬৪। Frazer James, Golden Bough. Ch. IV, Magic and Religion, Macmillian, Company, 1951, P 58
৩৬৫। Herskovit, Melville J Cultural Anthropology Chapter Twelve. Religion Man and the Universe, Oxford, 1954, P. 222
৩৬৬। ঐ
৩৬৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ইতিহাস, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৩৯৫, পৃঃ ৪৮-৫১
৩৬৮। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২, পৃ. ২২
৩৬৯। ঐ
৩৭০। সরকার দীনেন্দ্রকুমার, বাঙালীর বারো মাসে তের পার্বণ ও ষষ্ঠীব্রত, লোকলৌকিক পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৮৪, পৃঃ ১৯
৩৭১। ঐ
৩৭২। ঐ
৩৭৩। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩০ সংখ্যক), পৃঃ ৩২-৩৩
৩৭৪। ঐ, পৃঃ ১

৩৭৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ.৫৮৪
৩৭৬। ভট্টাচার্য গুরুবন্ধু, হরি পরমেশ্বরের ব্রত, প্রতিভা, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩১৮, পৃঃ ৫২৬
৩৭৭। ভট্টাচার্য নবকৃষ্ণ সম্পাদিত সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স ১৩৩৫, পৃঃ ১০৩০
৩৭৮। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩০ সংখ্যক), পৃঃ ৬০
৩৭৯। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫০৪ সংখ্যক), পৃ. ৩৮
৩৮০। Man in India, Oct-Dec 1952, page 214
৩৮১। Nivedita Sister, The place of the kinder garden in Indian Schools. The Modern Review, Aug 908
৩৮২। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক) P.8
৩৮৩। Leach Maria, ed পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), পৃঃ ৬১
৩৮৪। ঐ
৩৮৫। ঐ
৩৮৬। দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৩২৬
৩৮৭। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ; পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক), পৃঃ ৪১৭
৩৮৮। বসু মলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৫ সংখ্যক), P.VIII
৩৮৯। Thompson Stith,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 8
৩৯০। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃঃ ৩১৭
৩৯১। ঐ, পৃঃ ৩৪১
৩৯২। ঐ, পৃঃ ৩৭৫
৩৯৩। ঐ, পৃঃ ৩৭০
৩৯৪। ঐ, পৃঃ ৩৭১
৩৯৫। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক), পৃঃ ৮১
৩৯৬। Bodding P.O. Santal Folk Tales, Oslo 1928, Vol-1, Page.IX,
৩৯৭। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃঃ ৩৬১
৩৯৮। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২ সংখ্যক), পৃ. ৪৯৬
৩৯৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ. ১৫১-২২০
৪০০। বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪, পৃ ১৬৯
৪০১। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃ. ৩৩৮
৪০২। ঐ, পৃঃ ৩৪৮
৪০৩। ঐ,পৃঃ ৩৬৫
৪০৪। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩০ সংখ্যক), পৃঃ ৩২-৩৩
৪০৫। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (১৩৬ সংখ্যক), পৃঃ ৩৪১
৪০৬। ঐ,পৃঃ ৩০৬
৪০৭। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (৯৬ সংখ্যক), পৃঃ ৯
৪০৮। Leach Marie ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P. 266
৪০৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (১০৭ সংখ্যক), পৃঃ ৪৮০
৪১০। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (৯৬ সংখ্যক), পৃ.৪৪
৪১১। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (১৩৬ সংখ্যক), পৃঃ ৩৩৬
৪১২। Archer Mildred, The Folk Tale in Santal Society, Man in India, Vol.XXIV,

1944, P.321

৪১৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃঃ ৩১৯
৪১৪। ঐ, পৃঃ ৩০৭
৪১৫। ঐ, পৃঃ ৩১১
৪১৬। ঐ, পৃঃ ৩০৭
৪১৭। ঐ, পৃঃ ৩৪৮
৪১৮। ঐ,পৃঃ ৩৪৪
৪১৯। ঐ, পৃঃ ৩৭২
৪২০। ঐ, পৃঃ ৩১৯
৪২১। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P.361
৪২২। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃঃ ৩১৪
৪২৩। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা, শান্তিসদন প্রকাশকাল অনুল্লিখিত
৪২৪। ঐ, পৃঃ ৭৮
৪২৫। Dey Lal Behari,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক),P.129-138
৪২৬। মজুমদার আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩০ সংখ্যক), পৃঃ ২৬-৩০
৪২৭। সেন সুকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৬৭ সংখ্যক), পৃ: ১
৪২৮। Thompson Stith,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 256
৪২৯। Tylor E.B.পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৯৭ সংখ্যক), P. 168
৪৩০। Herskovits Melville J.পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৯৯ সংখ্যক), P. 214-15
৪৩১। ঐ
৪৩২। Fowler and Fowler ed. Pocket Oxford Dictionary Oxford University Press, 1955, P. 30
৪৩৩। সেন সুকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৬৭ সংখ্যক), পৃঃ ৩০
৪৩৪। অথর্ব বেদ, হরফ প্রকাশনী, জানুয়ারী, ১৯৯২, পৃঃ ২৩৮
৪৩৫। ঐ, পৃঃ ২৪৩
৪৩৬। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃঃ ২২
৪৩৭। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃঃ ২৭
৪৩৮। অথর্ব বেদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮৩ সংখ্যক), পৃঃ ২৪৩
৪৩৯। ঐ, পৃঃ ৬
৪৪০। ঐ, পৃঃ ৩৩
৪৪১। ঐ, পৃঃ ৪৯
৪৪২। ঐ, পৃঃ ১৪
৪৪৩। ঐ, পৃঃ ২৫
৪৪৪। ঐ
৪৪৫। Thompson Stith.পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক),P. 257
৪৪৬। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮৩ সংখ্যক), পৃ: ৩৮
৪৪৭। অথর্ব বেদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮৩ সংখ্যক), পৃঃ ২৪৪
৪৪৮। ঐ, পৃ: ২৪৩
৪৪৯। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৮২ সংখ্যক), পৃঃ ৪১
৪৫০। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃঃ ৬১৭

৪৫১। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮৯ সংখ্যক) পৃ: ২৭
৪৫২! ঐ, পৃ: ১৪
৪৫৩। Frazer James, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৯৮ সংখ্যক), P. 215
৪৫৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 172
৪৫৫। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৮২ সংখ্যক), পৃ, ৩৮
৪৫৬। ঐ, পৃ: ৩৮
৪৫৭। ঐ, পৃ: ৩৯
৪৫৮। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 257
৪৫৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 159-162
৪৬০। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P.173
৪৬১। সেন সুকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৬৭ সংখ্যক), পৃ: ৩
৪৬২। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃ: ৬-৭
৪৬৩। ঐ
৪৬৪। ঐ
৪৬৫। ঐ
৪৬৬। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 173
৪৬৭। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃ:
৪৬৮। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক),পৃ: ৩৭
৪৬৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P.175
৪৭০। ঐ, P. 176
৪৭১। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃ: ২৭
৪৭২। সেন সুকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৬৭ সংখ্যক), পৃ: ১২
৪৭৩। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃ: ২২
৪৭৪। ঐ
৪৭৫। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃ, ৩০
৪৭৬। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ: ৪২১-২২
৪৭৭। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 173
৪৭৮। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক),পৃ: ৪১-৪৫
৪৭৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 175-181
৪৮০। ঐ, P 176
৪৮১। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃ: ১৬
৪৮২। ঐ, পৃ: ৫
৪৮৩। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬ সংখ্যক),পৃ: ২৬২-৬৫
৪৮৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬ সংখ্যক), P. 181
৪৮৫। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 255
৪৮৬। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক),পৃ: ২৬
৪৮৭। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 159-162
৪৮৮। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৮২ সংখ্যক), পৃ:২১
৪৮৯। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 10
৪৯০। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, (১৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৬০২-৬০৫

৪৯১। ঐ পৃ: ৩৪৮-৩৫০
৪৯২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক), পৃ: ৩০
৪৯৩। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 191
৪৯৪। Banerjee Kasindranath, Popular Tales of Bengal, Calcutta, 1905, P. 5657
৪৯৫। ঐ, P. 51-52
৪৯৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক), পৃ: ১২৫
৪৯৭। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক)। পৃ: ৩১৯
৪৯৮। Banerjee Kasindranath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৮৪ সংখ্যক), P. 139
৪৯৯। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 198
৫০০। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃ: ২১৩-১৭
৫০১। Banerjee Kasindranath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৮৪ সংখ্যক), P. 101-122
৫০২। Damant D. H., পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), P. 344-345
৫০৩। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫১ সংখ্যক), P. 111-118
৫০৪। ঐ, P. 152-174
৫০৫। ঐ, P. 118
৫০৬। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২২ সংখ্যক)
৫০৭। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 206
৫০৮। ঐ
৫০৯। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃ: ১৯৩
৫১০। ঐ, পৃ: ৯২২
৫১১। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫১ সংখ্যক), P. 131-137
৫১২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক), পৃ: ৩০
৫১৩। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ: ৫৯৯
৫১৪। ঐ, পৃ: ৬১১
৫১৫। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক), পৃ: ৭০
৫১৬। ঐ, পৃ: ৪৮
৫১৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ:৪৫৩
৫১৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক), পৃ: ৭৫
৫১৯। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 125
৫২০। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ: ৪২৩
৫২১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক). P. 244
৫২২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ: ৬০৯
৫২৩। ঐ, পৃ: ৬১৬
৫২৪। ঐ, পৃ: ৬৪৩
৫২৫। ঐ, পৃ: ৬০৬
৫২৬। Mitra Kalipada Enigma in Fiction, Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XIV, 1928, P. 83
৫২৭। Fowler and Fowler, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৭৯ সংখ্যক), P. 275
৫২৮। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০২ সংখ্যক), পৃ: ১
৫২৯। ঐ, পৃ: ১৮

৫৩০। ঐ, পৃ: ১৯
৫৩১। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক), পৃ: ১২১
৫৩২। ঐ, সোনাফর বাদশা, পৃ: ১০৮-১৩৯
৫৩৩। ঐ, পৃ: ১২০
৫৩৪। ঐ
৫৩৫। দ্যতিয়েন ফাদার, সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০২ সংখ্যক), পৃ: ১৮
৫৩৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক), পৃ: ১১০-১২৫
৫৩৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ৫ম খণ্ড, ক্যলকাটা বুক হাউস, ১৯৭১, পৃ: ৫১৬- ৫১৭
৫৩৮। ঐ
৫৩৯। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১২ সংখ্যক), পৃ: ২৬৫-৬৬
৫৪০। Mitra Kalipada, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭২৩ সংখ্যক), P. 32-40
৫৪১। ঐ, P. 45
৫৪২। Leach Maria ed, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P. 269
৫৪৩। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 232
৫৪৪। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩৩৬-৩৩৮
৫৪৫। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 232
৫৪৬। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩২৮-৩৩০
৫৪৭। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক), পৃ: ৪৪-৪৭
৫৪৮। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক) পৃ: ৩২৫-৩২৭
৫৪৯। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P. 236
৫৫০। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩০৭-৩১০
৫৫১। ঐ, পৃ: ৩১০
৫৫২। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 230
৫৫৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক) পৃ: ৩০৭-৩১০
৫৫৪। ঐ, পৃ: ৩০৮
৫৫৫। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৬ সংখ্যক), পৃ: ৩১
৫৫৬। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 216
৫৫৭। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩৯১
৫৫৮। ঘোষ রীতা, বাংলা লোককথায় শ্রেণী চেতনার প্রতিভাস, লোকশ্রুতি পত্রিকা, ৬ই মার্চ, ১৯৯৩,পৃ:৬৪
৫৫৯। Thompson Stith,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 9
৫৬০। Leach Maria ed,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), 1950, P. 778
৫৬১। Thompson Stith,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 9
৫৬২। Frazer James, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৯৮ সংখ্যক), P. 377
৫৬৩। ঐ
৫৬৪। Spence L. An Introduction to Mythology, London, 1931, P. 23
৫৬৫। Frazer James The Golden Bough London, 1911-15, P. 374
৫৬৬। ঋকবেদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২৪ সংখ্যক), পৃ: ৬৪০
৫৬৭। Kellet E. E., The Story of Myth, London, 1927, P. 25
৫৬৮। Spence L.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭০ সংখ্যক), P. 54
৫৬৯। Thompson Stith,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 9

৫৭০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫০৩ সংখ্যক), পৃ: ৩০-৩১
৫৭১। Thompson Stith,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 389
৫৭২। বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, আরণ্যক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩, পৃ:১৫২
৫৭৩। চক্রবর্তী বরুণকুমার, প্রসঙ্গ লোকপুরাণ, জানুয়ারী ১৯৯১, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, পৃ: ৭৪
৫৭৪। ঐ, পৃ: ৭১
৫৭৫। ঐ, পৃ: ৫৪
৫৭৬। ঐ, পৃ: ৭৭
৫৭৭। ঐ, পৃ: ৭০
৫৭৮। ঐ, পৃ: ৭০
৫৭৯। ঐ, পৃ: ৫৩
৫৮০। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৫ সংখ্যক), P. 122-128
৫৮১। ঐ, P. 128
৫৮২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২ সংখ্যক), পৃ: ৬৪৭
৫৮৩। Spence L.,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭০ সংখ্যক), P. 23
৫৮৪। Boas Franz, Race, Language and Culture, New York, 1940, P 404
৫৮৫। বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক), পৃ: ৬২৫
৫৮৬। দাস ঘনশ্যাম সম্পাদিত মহাভারতম্, গীতা প্রেস, ২০১৬ বিক্রমাব্দ, পৃ: ১
৫৮৭। সিদ্দিকী আশরাফ, লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮৫, পৃ: ১২
৫৮৮। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 8-9
৫৮৯। Leach Maria ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), V-2, 1950, P. 612
৫৯০। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 263
৫৯১। ঐ, P. 8
৫৯২। ঘোষ সুবোধ, কিংবদন্তীর দেশে, নিউ এজ, ১৯৬১, পৃ: ১৩১
৫৯৩। ঐ
৫৯৪। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৯৩ সংখ্যক), পৃ: ১২
৫৯৫। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P. 778
৫৯৬। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), পৃ: ১২
৫৯৭। সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, ১৯৯২, পৃ: ১৫০
৫৯৮। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), পৃ: ১৮
৫৯৯। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 271
৬০০। Leach Maria ed., পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), P. 612
৬০১। একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২, পৃ: ৪৫
৬০২। Burne Charlotte Sophia, The Handbook of Folklore, London, 1914, P.26
৬০৩। মহাভারতম্, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৯২ সংখ্যক), পৃ: ১৯
৬০৪। Malnowski, Myth in Primitive Psychology. U. S. A. 1926, 992
৬০৫। Chattopadhaya Tushar, Folklore and Social Science. Fourth Indian Social Congress, 1979
৬০৬। Gomme George Lawrence, Folklore as on Historical Science London, 1908, P. 122
৬০৭। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 229

৬০৮। মজুমদার দিব্যজ্যোতি, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস্, অনুষ্টুপ, ১৯৯৩ পৃ: ১৮৬
৬০৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩৯২
৬১০। Leach Maria ed, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক), V. I. P. 345
৬১১। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৭ সংখ্যক), পৃ: ৬৯৬-৭০২
৬১২। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক), P. 230
৬১৩। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, অক্টোবর, ১৯৯৮, পৃ: ৭
৬১৪। চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ: ৩৮
৬১৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৫ সংখ্যক), পৃ: ৪৩
৬১৬। ঐ, পৃ: ১২
৬১৭। ঐ
৬১৮। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ২১০
৬১৯। Banerjee Kasindranath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৮৪ সংখ্যক), P. 182
৬২০। চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮২০ সংখ্যক), পৃ: ৬-১২
৬২১। বসু প্রসূন সম্পাদিত, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার খ ঃ ১০, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ: ৩১৭
৬২২। ঐ
৬২৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃ: ৮৭-১২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি

শিল্প, সাহিত্য ও বাস্তবতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মাও-সে-তুং বলেছেন—

'Writers and artists should study society that is to say, should study the various classes in society, their mutual realitions and respective conditions, their physiognomy and their psychology.'[১]

অর্থাৎ জীবনকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করাই মহৎ সাহিত্যিকের আদর্শ লক্ষণ। ঠিক সেই নীতি অনুসৃত হয় লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও। লোকসাহিত্য জাতির আত্মচৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার স্বকীয়, চিন্তাধারা রীতি-নীতি রাগ-বিরাগ ভাবকল্পনার স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ—

'Folkliterature studies full perspective ancient and modern, literary and historical; primitive and advanced, sociological and psychological promise great rewards in the understanding of man and society.'[২]

এইভাবে লোকসাহিত্যের অয়নে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে জাতিরই আত্মকথা।

জাতির অগ্রগতিতে যে আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাস, তার নেপথ্য প্রেরণা হিসাবে লোকসাহিত্যের মূল্য অসীম। লোকবিজ্ঞানী রিচার্ড এম. ডরসন নবীন জাতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছে—

'Folklore and Folk-tradition have formed a large component of emergent nationalism'[৩]

অপরপক্ষে 'জাতীয়তাবাদ' শব্দের অন্তরালে আত্মজাগরণ, দেশের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এবং দেশের তুলনায় স্বদেশের মহোত্তর ঐতিহ্য কীর্তনের প্রবণতাই ক্রিয়াশীল। কোষগ্রন্থে পাই—

'......loyalty and devotion to a nation, especially a sense of national consciousness exalting one nation above all others and placing primary emphasis on promotion of its culture and interests as opposed to those of other nations or supranational groups.'[৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুইজারল্যাণ্ডের মানবতাবাদী দার্শনিক মোসার ও তাঁর অনুগামীদের রচনায় 'জাতি' এবং 'লোক' অভিন্ন বলে স্বীকৃত হয়—

'In the works of Suiss and Moser the folk or popular spirit was identified with the nation, and this nation was identified with a civilization of peasants.'[৫]

নবজাগরণজাত সংস্কৃতি প্রথম এই উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে—দেশের বৃহত্তর অংশের

সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির মধ্যেই সমগ্র জাতির সংস্কৃতির ভিত্তি নিহিত রয়েছে। কালক্রমে জাতিগত চিন্তা চেতনা এবং জাতির উৎসমুখে সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ—এই দুইধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় জাতীয়তাবাদী লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায়।

জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির জন্ম এই স্বাদেশিক চেতনায়। সুতরাং বাংলা লোককথার ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র লোকসাহিত্য-আলোচনা-বিশ্লেষণে এই জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির গুরুত্ব অসীম।

জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির সাহায্যে লোকবিজ্ঞানী প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন সূত্রের সন্ধান করেন লোকসাহিত্যে।

প্রথমত, লোকসাহিত্যে চিরায়ত সংস্কৃতির অনুশীলন জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির লক্ষ্য। লোকসাহিত্যের অয়নে জাতির চিৎপ্রকর্ষের যে সর্বাঙ্গীন প্রতিফলন ঘটে, সেই জীবন ও মানসচর্চার উপকরণগুলি সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে এই পদ্ধতি। তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—

'This folkloric Research plays a vital role to know the man's social life, pursuing of customs, development of institutions, creation of values, behavioural pattern and function in relation to faith and belief. Towards an integrated approach to the study of socio-cultural phenomena folklore may help well.'[৬]

দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি জাতিবিশেষকে কেবল লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিতই করে না, দেশাত্মবোধ জাগরণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকেই আত্মোপলব্ধির সোপানে উত্তীর্ণ করে—

'The concern with folklore and the rise of a nationalistic spirit frequently coincide.'[৭]

তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্যের এই পুনর্মূল্যায়ন জাগরণের মূল উৎসরূপে কাজ করে এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে অপর দেশের ঐতিহ্যিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে পার্থক্য দেখিয়ে স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করে—

'.........folkloric research has always emphasized local ethnological patterns in order to promote nationalism.'[৮]

জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি : চর্চা ও অনুশীলন

দেশে দেশে; জাতীয়তা পদ্ধতির সহায়তায় লোকসাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও জাতীয় আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আত্মপীঠ প্রতিষ্ঠার সাধনা কিভাবে রূপায়িত হয়েছে সেই ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ছোট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশ ফিনল্যাণ্ডের লোকসংস্কৃতির চর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘ সময়ের। হেনারিকাস্ ফ্লোরিনাই ১৭০২ সালে ফিনদেশীয়

লোকপ্রবাহের এক বৃহৎ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের চর্চার প্রসঙ্গে Christian Ganander-এর নামও যুক্ত—

'Christian Gannder published in 1789 his Mythologia Fennica, it was also he who published the first two Finish animal tales (1784) and the first collection of Finish riddles (1783).'[৯]

এছাড়া H. Florinus, H. G. Parthan, R. Hertzberg প্রমুখ সংকলকের নিষ্ঠাও উপেক্ষণীয় নয়।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিনিশ লিটারারী সোসাইটি।[১০] অতীতের ঐতিহাসিক স্মৃতি উদ্ধারের ক্ষেত্রে এই সংস্থাই পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করে—

'Society has carried out an extensive programme; to spread the knowledge of the native country and its fortunes, to further the development of the Finish tongue into a cultivated language and to publish literature in the native speech for the use of both the educated class and the masses of the people.' [১১]

এই সংস্থাটি বিশ্বের সর্বপ্রথম লোকসাংস্কৃতিক সংস্থা।

লোকায়ত ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসার ও ফিনিশীয় সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত ভাষার উচ্চমান গঠনের কাজ শুরু হয়। ১৮৫২-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চারটি খণ্ডে বিপুল লোককথা প্রকাশিত হয়।[১২]

এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ইলিয়াস লনরট (১৮০২-১৮৮২)।[১৩] কর্মসূত্রে ফিনল্যাণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং লোকগাথা, গীতিকা ছড়া সংগ্রহ করে (কালবেলা) Kalevala প্রকাশ করেন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংকলটি 'National Epic' [১৪] অভিধায় ভূষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কালবেলা সংকলন ফিনল্যাণ্ড তথা সমগ্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকসংস্কৃতির চর্চায় এক নূতন দিকের সন্ধান দেয়। লনরট স্বয়ং বলেছেন কালবেলায় সংকলিত গাথাগুলির মধ্য দিয়ে ফিনল্যাণ্ড তার হৃত গৌরব পুনরোপলব্ধি করতে পারবে—

'Finland, as the owner of these epic poems will learn to understand rightly her past with heightned self-esteem, as well as her future spiritual development. She can say to herself : I too have a history' [১৫]

Kalevala সংকলনকে ভিত্তি করেই অতীত বীর পূজার সূত্রপাত ঘটে—

'In arranging his material he grouped the various, epic songs in cycles about the chief heroes.......' [১৬]

লোকসংস্কৃতির সাহিত্যগত উপাদানের পাশাপাশি বস্তুগত উপাদান সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করাও ফিনল্যাণ্ডের লোকসংস্কৃতি চর্চার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

লোকজীবনচর্চার যাবতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ গ্রন্থ—

'The Old Magic Practices of the Finns'-এর নাম প্রসঙ্গত স্মর্তব্য—

'A significant part of folk beliefs concerning hunting, fishing, farming and rising live stock was published in a work entitled Suomen kansan muinaisia taikoja (The Old magic Practices of the Finns) I-II, 1891-92, by M. Warronen, and III-IV by A. V. Rantasalo, 1912-1934' [১৭]

এছাড়া যাবতীয় লোকচিকিৎসার সংকলন করেছেন লনরট, তার সম্পাদিত 'The Magic Medicine of the Finns' (1832)[১৮] গ্রন্থটির নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এছাড়া লোকসংস্কৃতি চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সমরূপ গুরুত্বে সক্রিয় অংশগ্রহণ,[১৯] ইলিয়াস্ লনরট, কার্ল ও জুলিয়াস ক্রোন্, অ্যাডোলফাস্, হিলটন, ক্যাভালিয়াস, জরগেন ও মোলটমো প্রমুখ লোকসংস্কৃতিবিদ্ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের সর্বস্তরে লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ উৎপাদনে সক্ষম হন—

'Among those who have assisted with its work and have written down folklore material and presented it to the society, there are numbered many humble officials teachers in the public schools, educated peasants and artisans. To their efforts should be added the results of trained investigators scholars supported by the society and other students' [২০]

সংগ্রহ সংকলনের পাশাপাশি তাত্ত্বিক আলোচনা সমভাবে বিকশিত হয়েছে ফিন্ল্যাণ্ডে। জুলিয়াস ক্রোন্ (1835-1888) এবং তাঁর পুত্র কার্ল ক্রোন (1863-1933)[২১] ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটান। স্থান এবং কাল ভেদে লোককথার স্থানান্তকরণ এবং বিভিন্ন পাঠভেদের বিষয়টি এই 'Historical Geographical Method' পদ্ধতিতে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে কার্ল ক্রোনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানটি হল বিখ্যাত গ্রন্থ—

'Die folkloristische Arbeitsmethode, Oslo 1926' [২২]

পরবর্তী পর্যায়ে কার্ল শুরু করেছেন 'Kalevala' গ্রন্থটির তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পৌঁছে গেছেন গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে, যার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে বিখ্যাত গ্রন্থ Kalevalastudien (1924-28) -এর বক্তব্যে—

'The epic songs collected in the 'Kalevala' refer to historical happenings the figures which played a part were heroes of a past age, the geographical background is a land scape of southwestern Finland with its old population centres The period of development of these old historical Songs goes bark into the dawn of Finish history'[২৩]

'তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ধারা পরবর্তী পর্যায়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। লরি হংকো এবং তাঁর সমসাময়িক লোকসংস্কৃতিবিদগণের প্রচেষ্টায়। ফিনল্যাণ্ডের International Soci-

ety for Folk Narrative Research তথা ISFNR আন্তর্জাতিক লোকসংস্কৃতি চর্চার পরিচালন সংস্থারূপে কার্যনির্বাহ করে চলেছে সাফল্যের সঙ্গে'। ২৪

সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, ফিনল্যাণ্ডে ঐতিহ্যানুসারী লোকসমাজের সঙ্গে গবেষক ও তথ্য সংগ্রাহকদের সম্পর্ক, লোকসমাজের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, লোকসংস্কৃতির চর্চা, সংরক্ষণ স্বরূপ বিশ্লেষণ ইত্যাদি আলোচনা উৎসারিত হয়েছে জাতীয়তাবাদের অনুষঙ্গেই। সর্বোপরি জাতীয় গৌরবোদ্ধারের প্রয়াসে ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীগণ আপন ঐতিহ্যের শিকড় অনুসন্ধান করেছেন সর্বপ্রথম এই লোকসংস্কৃতি ক্ষেত্রেই--

'For the cultivation of the sentiment of nationality of the Finish people their folk literature has been extraordinarily important and their whole cultural life upto the present time has been permeated and nourished by their folk traditions'[২৫]

'ফিনল্যাণ্ডের পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যাবত্তা সবচেয়ে বেশী প্রেরণা জুগিয়েছে আয়ার্ল্যাণ্ডে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে কিছু কিছু লোক-সাহিত্য সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল, তবে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফোকলোর ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। ফিনল্যাণ্ডের মতই লোক-সাহিত্য সম্পদ আসতে লাগলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে।'[২৬] ফলে প্রতিষ্ঠিত হল Irish Folklore Commission—

'By for the most spectacular achievement in the field of the folktale in recent years has been that of the Irish folklore Commission under the leadership of Seamus O' Duilearga.' [২৭]

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে লোকবিজ্ঞানী ও সুলিভান (Sean O' Suilleabhain) লোকসাহিত্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য ছাপালেন—'A Hand Book of Irish Folklore'— এই গ্রন্থটি দেশীয় লোক ঐতিহ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য লেখকের উদার আহ্বান স্বরূপ। বিজ্ঞানসম্মত সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে নিজ নিজ অঞ্চলের লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য আহ্বান জানালেন লেখক। এই পুস্তকে লোকসাহিত্য সংগ্রাহকদের নিজ নিজ অঞ্চলের পুরাকাহিনী বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা উৎসব, যাবতীয় লোককথা তথা লোকসংস্কৃতির প্রভূত উপকরণ সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করা হল। এই ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সংগ্রাহকদের আগ্রহে অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি ঘুমন্ত জাতি তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল, জাতীয়তার মন্ত্রে হল দীক্ষিত।[২৮]

জাতীয়মানসের ঐশ্বর্য এবং মূল সুর আবিষ্কারের তাগিদে লোককথা তথা লোকসাহিত্য পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। এই জাতীয়তাবাদের রোমান্টিক মননভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত অনুসন্ধানের সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিত্বমূলক অভিব্যক্তি দেখা যায় জার্মানীতে।

জার্মানীতে লোকসাহিত্য চর্চার প্রাথমিক প্রয়াস শুরু হয় জার্মানীর বাইরে বিদেশী উদ্যোগে। সম্ভবত ১০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Germania' গ্রন্থটিই লোকঐতিহ্য চর্চার আদি গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে আর্চার টেলর-এর বক্তব্য—

'........... German folklore began about A.D. 100 and not in Germany. I am referring to Tacitus Germania, a description of Germany written by a Roman for his countrymen at a time when rampant luxary promised to destroy the roman city and state' [২৯]

রোম সাম্রাজ্যের উচ্ছল জীবনযাত্রার বিকল্প হিসাবে জার্মানীর আদিম ও লৌকিক জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর দেশীয় ঐতিহ্যকেই গৌরবান্বিত করেছে।

'জার্মানীর লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনার কালে এর প্রকৃতিগত প্রবণতা ছিল মূলতঃ বর্ণনামূলক এবং স্থানীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের প্রেক্ষাপটেই এই চর্চা বিকাশলাভ করে। ষোড়শ শতকে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ থেকেই এই প্রবণতার ধারাটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়। যেমন—

Joannes Boemus কর্তৃক প্রকাশিত Omnium Gentium Mores, Leages et Ritus. (1520) Sebastian Frank এর Weltbuch (1534) ইত্যাদি। [৩০]

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা মূলতঃ দার্শনিকদের রোমান্টিক চিন্তা চেতনারই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব—

'Around 1800 the Ramanticists who were especially interested in song and tales, began to collect and interpret folklore...... Its theme was to go back through a long history of previous literary versions to tales conceerning chiefly the kings and heroes of the age of migration' [৩১]

অতীতচারিতাজাত প্রাচীন অনুসন্ধিৎসু এই দৃষ্টিকোণ প্রসঙ্গে রোমান্টিক দার্শনিক Novalis বলেছেন—

'It is like a vision in an insubstantial dream, a mixture of extraordinary events and happenings.' [৩২]

জার্মানীর লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রথম যুগেই শিক্ষাক্ষেত্রে এর অন্তর্ভূক্তি এবং সচেতনতার বিস্তার এক উল্লেখযোগ্য বিষয়—

'Teachers retold folktales, and didactic writers collected proverbs as examples of moral advice and for use in schools.' [৩৩]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা লোকসংস্কৃতির উপর তাদের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে। প্রসঙ্গত ডরসনের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যাক—

'During this pioneer period, German students at the universities already were writing dissertations on such strictly folk loristic subjects as superstitions and ghosts.' [৩৪]

নিজস্ব জাতি, তার ভাষা, রীতি প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে অতিসচেতনতার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ। জার্মানী চিন্তাবিদ্‌গণ বিশ্বাস করতেন

'popular traditions reflecting the best part of each nation."[৩৫]

এই বোধে সঞ্জীবিত হয়েই জ্যাকব গ্রীম (১৭৮৫-১৮৬৩) জাতির ঐতিহ্য সম্বলিত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহে নিজে আত্মনিয়োগ করেন এবং অন্যদেরও এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। লোকসংস্কৃতিচর্চার তীব্র স্বদেশী আলোক জার্মানীর অতীত থেকে বন্য বর্বরতাকে বিতাড়িত করে সভ্য উন্নত পূর্বপুরুষের পাদপীঠ আবিষ্কার করেছিল জার্মানীর মাটিতে। আর্চার টেলরের মতটি প্রণিধানযোগ্য—

'Grimm was moved by a feeling that everything characteristically German ought to be preserved especially because it was threatened by the imperialism and internationalism of Napoleon."[৩৬]

গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের (Jacob Ludwig Karl Grimm এবং Welhelm Karl Grimm) (১৭৮৬-১৮৫৯) অবিস্মরণীয় গ্রন্থ-এর দুটি খণ্ডই প্রকাশিত হয় ১৮১২-১৮১৫ অব্দের মধ্যে।[৩৭] ১৮৫৬ অব্দে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণে Wilhelm Grimm মন্তব্য করেন গল্পগুলো অবশ্যই প্রাচীন এবং এগুলোর ভাষা ও বিষয় পরীক্ষা করেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর মূল স্থির করা যেতে পারে।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মূল হিসেবে জার্মান ভাষাকেই স্থান দেবার জন্য ওকালতি করা।[৩৮]

এই মত অনুসরণ করে উদ্ভব হয় 'Indo-European Theory' তথা 'Broken down myth theory'[৩৯] পরবর্তী পর্যায়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় থিওডোর বেনফের 'Indianist Theory'[৪০] ফেড্রিখ ম্যাক্সমুলারের 'Solar Mythological Theory' প্রভৃতি লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারায় এক একটি নূতন যুগের সূচনা করে।

কিন্তু প্রতিটি তত্ত্বের অসংগতি পরবর্তী পর্যায়ে গবেষকদের পর্যালোচনায় প্রকট হয়ে ওঠে। নৃতাত্ত্বিক Andrew Lang ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করে বললেন—

'Selfishness and violence, the cruelty and slavishness of savages had the most exquisite poetical tender and sympathetic way of regarding the external world'[৪১]

জাতীয়তাবাদের সুস্থ মানসিকতা জাতির পক্ষে গৌরবের। কিন্তু জার্মানীর জাতীয়তাবোধ উগ্র সঙ্কীর্ণতার প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। শতাব্দী অতিক্রম করে সেই বিশ্বাসই রাজনৈতিক প্রচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে, যার প্রধান উদ্‌গাতা হলেন অ্যাডলফ্ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) ও তার নাৎসী বাহিনী।

১৯২০-এর দশকের নাজী মতবাদের সমর্থনে ফোকলোর সম্পর্কিত প্রচুর গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়— যেগুলোতে প্রমাণ করা হয় যে জার্মানজাতি সুসভ্য জাতি। জাতীয় ঐক্যের খাতিরে হিটলারের জাতীয়তাবাদী মতবাদকেই ফোকলোরবিদ্‌গণ সমর্থন করেন এবং হেন্‌স্ ন্যাগুমান প্রমাণ করেন যে ফোকলোর-এর জন্ম সুসভ্য ভদ্র পরিবারে,

তবে ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে তা সাধারণ মানুষের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ... .পরবর্তীকালে তাঁর এই সুরের প্রতিধ্বনি মেলে হিনরী রিসল-এর কণ্ঠে।.........১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Adolf Bach-এর Deutschs Volkskunde গ্রন্থে হিটলারকে ফোকলোর-এর বিশিষ্ট উদ্‌গাতা হিসাবে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং Fuhrerschicht মতবাদে ফোকলোর-এর পঠন পাঠনকে অভিষিক্ত করা হয়'[৪২]

হিটলার সমগ্র জার্মানজাতিকেই বিশ্বকৃষ্টির ধারকবাহক প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন যে জাতীয় ইচ্ছানুভূতিকে রূপদান লোকসংস্কৃতির ধর্ম, কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিশ্বে কেবলমাত্র রাজনীতির ছত্রছায়ায় আত্মপ্রচারের বিকৃত হাতিয়ার হিসাবে বর্জনীয়। লোকসংস্কৃতি আন্তর্জাতিক, দেশে দেশে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের শিকড়ে তার অচ্ছেদ্য বন্ধন। SDFML কোষগ্রন্থে বলা হয়েছে—

'In brief, folklore is international and with the increasing collection of evidance we see the fact more and more clearly'[৪৩]

জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে জাপানও উৎসাহিত হয়েছে। অবশ্য এই দেশে লোকসংস্কৃতিচর্চা নিজস্ব ধারায় ক্রিয়াশীল থাকলেও তার সচেতন চর্চা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বিলম্বে শুরু হয়েছে এবং আরো বিলম্বে এই চর্চার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে পৃথিবীর অনান্য দেশের নিকটে।

জাপানের প্রাচীন লোকসংস্কৃতির উপাদান সম্বলিত প্রথম প্রকাশনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় 'Kojiki' (Records of Ancient Matters) এটি প্রকাশিত হয়— ৭১২ খ্রীষ্টিয় অব্দে। এতে জাপানের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বলিত মিথ, এখানকার শিন্টো ধর্ম (shentoism) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তী দ্বাদশ শতাব্দীতে সংকলিত 'Konjakie Monogatari' এবং এয়োদশ শতকে সংকলিত 'Ujishui Monogatari' জাপানের লোকচর্চার উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটায়[৪৪]

পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটির পরিবর্তন জাপানের সংস্কৃতি চর্চার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ যুগসময় Aizuchi-Momoyama Period (1568-1600)[৪৫] লোকসাধারণের সংস্কৃতিও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এই যুগে—

'Azuchi Monoyama period was however the seedbed of rich development in popular culture.'[৪৬]

সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত বিভিন্ন গেজেটিয়ারে লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহ এই পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে সংকলিত হয়। স্থানীয় ইতিহাস বা সমাজ-সংস্কৃতির তথ্য সংকলনই সেখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল—

'Government administrative records, official histories, gazetteers, traveldiaries and literary accounts from that time contain much informa-

tion of value to folklore scholars.'[৪৭]

জাপানের লোকসংস্কৃতিচর্চার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সূচনা মেইজি যুগে (১৮৬৪-১৯১২) [৪৮] নিজসংস্কৃতিভাণ্ডারকে বিশ্বের সম্মুখে উন্মোচন করার প্রচেষ্টা এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য।

'Mid twentieth century Japan offers the folklorist a rich harvest of ancient legends, lates, crafts and folk observances'[৪৯]

জাপানের আধুনিক লোকসংস্কৃতির চর্চার পথিকৃৎ—কুনিও ইয়ানাগিতা (Kunio Yanagita') (১৮৭৫-১৯৬২)[৫০]। এই বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদের একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে— উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র 'Minzokugalu Kenkyusha' (১৯৪৮) তথা 'The Folklore Research Institute'[৫১], এ প্রসঙ্গে মনীষী ডরসন বলেছেন—

'The Japanese Folklore Institute was the lengthened shadow of one man, Kunio Yanagita.'[৫২]

এই লোকসংস্কৃতিগবেষণা কেন্দ্রের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বিভাগ ছিল প্রকাশনা বিভাগ। এই সংস্থা থেকেই স্বয়ং ইয়ানাগিতা সংকলিত অভিধান 'Minzokugaka Jiten' প্রকাশিত হয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। [৫৩] জাপানী ইতিকথা, ট্যাবু কিংবা যাদুসংক্রান্ত ঘরোয়া বিভিন্ন বিষয়, নানাপ্রকার লোকউৎসব, আত্মীয়বাচক সম্পর্কগুলির পরিভাষা এবং জাপানের লোকসংস্কৃতিচর্চার ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে অভিধানটিতে আলোচনা করা হয়েছে। [৫৪]

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইয়ানাগিতা স্থানীয় লোকধর্ম বিয়য়ে গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন The Nipponology (১৯৪৭)[৫৫] এতে শিন্তোবাদের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। শিনতোবাদের একদিকে যেমন কোন গোষ্ঠীর বীরবৃন্দ এবং অনন্যসাধারণ নেতারা পূজা পেতেন তেমনি অন্যদিকে পরিবারের পূর্বপুরুষের আত্মাকেও পুজা করা হতো। অর্থাৎ বীরপূজার মন্ত্র দিয়ে মহান ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই মুখ্য হয়ে ওঠে।[৫৬]

ইয়ানাগিতা জার্মান দার্শনিকদের মতো জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে ততটা প্রয়াসী ছিলেন না। তাঁর আগ্রহ ছিল, সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্যকে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে উন্মোচিত করা। এই প্রসঙ্গে জাতিগৌরবে দৃপ্ত তাঁর আহ্বান স্মরণীয়—

' I would like to welcome folklorists in greater numbers to come to Japan to examine and to enjoy the rich, ancient lore of traditional narratives and beliefs and folk arts and manners.'[৫৭]

জাপান এক অতি আধুনিক শিল্পোন্নত দেশ হওয়ায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চা ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই এখানে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটেছে। তৎসত্ত্বেও প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জাপানীদের কিছুমাত্র কম নয়। তাই প্রাচীন ও আধুনিক ধারার সমন্বয়ে জাপানের লোকসংস্কৃতি চর্চা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রিচার্ড এম. ডরসন যথার্থই বলেছেন—

'.....In Japan, where the ancient folk culture and modern ways com-

mingle, a vigorous folklore scholarship has developed in virtual isolation from the rest of the world.'[৫৮]

লোকসাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের দাবীদার হয়ে আমেরিকাও এগিয়ে এসেছে আত্মপ্রচারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রাথমিক পর্যায়ে লোকসংস্কৃতি চর্চা ছিল ক্রমবিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত, কিন্তু এই অসচেতন প্রয়াস ছিল যথেষ্ট মূল্যবান। প্রসঙ্গত হেনরি বো স্কুলক্যাস্কট্ এবং Algic Researches (1839) এর জোয়েশ গ্যাণ্ডলার হ্যারিস এর Uncle Remus বিষয়ক গ্রন্থের (১৮৮১) উল্লেখ করা যায়। আমেরিকার আদি অধিবাসী ইণ্ডিয়ানদের সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থগুলিকে আমেরিকার পরবর্তী লোকসংস্কৃতি চর্চার পথিকৃৎ বলা যায়।[৫৯] Flanagon এবং Hudson এর ভাষায়—

'Together the Indian and the negro have supplied a very large and significant part of the corpus of American folklore.'[৬০]

১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল American Folklore Society.'[৬১] পূর্ববর্তী বিক্ষিপ্ত আলোচনাগুলি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই সংহত সুনির্দিষ্ট চর্চার রূপ নিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করা হল—

'American Folklore is too big to be treated as a whole, led to the following division of the field by the American Folklore Society at the time of its organization in 1888'—

(a) Relices of Old English Folklore (ballads, tales Superstitions, dialectics)

(b) Lore of Negroes in the Southern States of the Union ;

(c) Lore of the Indian tribes of North American (myths, tales etc)

(d) Lore of French Canada, Mexico.[৬২]

যুক্ত আমেরিকার বর্তমান শতাব্দীর বিশ এবং তিরিশের দশকের দিকে প্রথম ফোকলোর সম্পর্কিত উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয় কবি কার্ল স্যাণ্ডবার্গের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ 'The American Songbag (১৯২৭)'[৬৩] এবং এলান লোমাক্স এর 'The American Ballads and Folksongs (১৯৪৪)'[৬৪] গ্রন্থদ্বয় প্রকাশের পর থেকে। গ্রন্থগুলি প্রসঙ্গে গবেষক মযহারুল ইসলাম বলেছেন—'জাতীয়তাবাদের অন্ধআবেগ এদের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে আকীর্ণ ছিল। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত জেম্‌স স্টীভেনস্ পল রেনিয়ান নামক লোকবীরের সম্পর্কে যে আলোচনা করেন তাতে মনে হয় যে আমেরিকার লোকবীর সম্পর্কিত কিংবদন্তী যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত সত্যিকার আমেরিকার আদর্শেই গঠিত একথা, প্রমাণের জন্য লেখকের সমস্ত শক্তিই ক্ষয়িত হয়েছে। কিন্তু পল রেনিয়ানের পর একে একে আরো লোকবীরের আবির্ভাব ফোকলোর আলোচনা ক্ষেত্রে আবির্ভূত হতে থাকে— পেক্‌সবিল নামক রাখাল, বুড়ো স্টরম্যালঙ্গ নামক নাবিক এবং জো মাগারেস নামক লৌহশ্রমিক।'[৬৫]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরোয়া না করে যদৃচ্ছা নিজস্ব চিন্তা-সংযুক্ত এইসব কাহিনী সম্পর্কে কোষগ্রন্থেই পাই সতর্কবাণী—

'The mixture of history and legend has given rise to a large body of unhistorical historical tradition.'[৬৬]

লোকসংস্কৃতির এই কৃত্রিম অভিব্যক্তি, যা প্রয়োজন সাপেক্ষে ভিন্ন শক্তির সক্রিয়তাজাত তা লোক্‌বিদ ডরসনের ভাষায় 'Fakelore' তথা লোকবিকৃতি—

'For this contrived, romantic picture of folklore I coined in 1950, the term 'fakelore'. Fakelore falsifies the raw data of folklore by invention, fabrication and similar refining processes, but for capitalistic gain rather than for totalitarian conquest.'[৬৭]

ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে লোকসংস্কৃতি চর্চা আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

'The science of folklore is a historical science, historical because it seeks to throw light on man's past, a science because its endeavours to attain this goal not by speculation or deduction from some a priory princilie but by the inductive method used in all scientific research.'[৬৮]

আমেরিকার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শুরু হল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। লোকসংস্কৃতির পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বহুমুখী ঘটনা ও কর্মপ্রয়াসের ঘাত প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা জটিল ইতিহাসের কর্মোদ্ধার করতে সচেতন হন লোকবিজ্ঞানীগণ। তাঁরা জানতেন—

'America is rich, not only in local history........but also in folk history from the bottom up, in which the people as participants or eye-witness are their own historians.'[৬৯]

অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায় যে চর্চা ছিল নিতান্ত 'local pride and patriotism'[৭০]দ্বারা আবেগতাড়িত পরবর্তীকালে 'Archer Taylor, Stith Thompson', ও and 'Mac Edward Leach' প্রমুখ লোকসংস্কৃতিবিদের প্রচেষ্টায় তা শৃঙ্খলিত হয় তাঁরা পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেন—

'Three mens' contribution stand out in this emergence of American folk studies as a vigorous and respected scholarly discipline are Archer Taylor....Stith Thompson, and Mac Edward Leach...A high percentage of the American scholars working the field today owe their training and interest to the writings and teachings of these three workers in dawn'[৭১]

আর্চার টেলর কর্তৃক সংকলিত 'The proverbs (1932)' A collection of Welsh Riddles (1942), The Library Riddle before 1600 (1948) ; ম্যাক এডওয়ার্ড লীচের বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ A Guide for collectors of Oral traditions and Folk

Culture Material in Pennsylvenia (1923)' ইত্যাদি সমৃদ্ধ গ্রন্থগুলি ব্যতীত স্টীথ থমসনের 'Motif index of Folk literature (1955-58)' এবং 'The Folktale'-এর খ্যাতি আন্তর্জাতিক।[৭২]

পরবর্তীকালে জটিল গাণিতিক পদ্ধতিতে লোককথা বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন মারাণ্ডা দম্পতি 'Elli Kongas Maranda Pierre Maranda' তাঁদের বিখ্যাত রচনা 'Structural Models in Folklore and Transformational Essays.'[৭৩]

এইভাবে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ-সংকলন, প্রকাশনা ও সাংগঠনিক প্রয়াস ছাড়াও বিশ্লেষণধর্মী মূল্যবান শাস্ত্রালোচনার ক্ষেত্রেও আমেরিকার লোকবিদ্‌গণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ রিচার্ড. এম. ডরসন আমেরিকার লোকসংস্কৃতিবিদদের নিজস্ব মত পন্থা অনুসারে সাতটি পৃথক-শ্রেণীতে ভাগ করে। দেখিয়েছেন—

১। তুলনাকারী লোকসংস্কৃতিবিদ——(Comparative folklorists)
২। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ্——(Cultural anthropologists)
৩। লোকসঙ্গীত বিশারদ——(Folksong and folkmusic specialists)
৪। বিশেষ সমর্থক——(Special pleaders)
৫। আঞ্চলিক সংগ্রাহক——(Regional collectors)
৬। সাহিত্যগত ইতিহাসবিদ্——(Literary historians)
৭। জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতিবিদ্——(Popularizers)[৭৪]

সুস্থ জাতীয়তাবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ আমেরিকার লোকশ্রুতিবিদ্‌গণ লোক-ঐতিহ্যের চেতনা বিস্তারিত করতে চেয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে। সেই কারণেই বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে আমেরিকার শিক্ষাক্রমে লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়।[৭৫] এইভাবে বিদ্যায়তনিক শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার সমগ্র বিশ্ব লোকসংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রেই এক মূল্যবান সংযোজন।

রাশিয়ায় লোকসংস্কৃতি চর্চা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় নিতান্ত পরে শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে গবেষক মত—

'জারের আমলে লোকসংস্কৃতি চর্চা একরকম নিষিদ্ধ ছিল। ১৬৯৯ অব্দে জার প্রায় প্রতিটি গভর্ণরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যদি কোন ব্যক্তিকে লোক-কাহিনী বলতে শোনে তবে যেন তাদের মোটা জরিমানা দেওয়া হয়। কারণ They destroy their souls অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী থেকেই মোটামুটি লোক-সম্পদ সংগ্রহ শুরু হয়। ১৯২৭ অব্দের দিকে অধ্যাপক আজাদ্‌সকির সম্পাদনায় বেশ কিছু সংখ্যক মূল্যবান সংগ্রহ সম্পাদিত হয়।'[৭৬]

পরবর্তী পর্যায়ে 'সাম্যবাদের নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ পণ্ডিতগণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ফোকলোর এর পঠন-পাঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। ফলে বীর কাহিনীতে, কর্মসঙ্গীত

এবং গীতিকায় পণ্ডিতগণ শ্রেণীসংগ্রামের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর খুঁজে পেলেন—খুঁজে পেলেন স্বার্থান্বেষী-ভূস্বামীর নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, নীচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন যাজকের মুখোস, অত্যাচারী জার সৈনিকের অমানুষিকতা এবং অর্থপিশাচ মিল মালিকের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, সবই ফোকলোর-এর ভাণ্ডারে এক একটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ।'[৭৭]

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত লেখকদের মহাসম্মেলনে অতীতের মূল্যায়নের আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করলেন পরিশ্রমী জনসাধারণই ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করে। আর লোকসংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে এই জনগণের দিনাতিপাতের বিবরণ—

'The true history of the toiling people cannot be learnt without a knowledge of the folklore.'[৭৮]

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক সংঘের এক বিশেষ অধিবেশনে ম্যাক্সিম গোর্কী লোকসংস্কৃতির সংগ্রামী ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি লোকসংস্কৃতির চর্চার গুরুত্ব ঘোষণা করেন।[৭৯] জার্মানীর রক্ষণশীল লোকসংস্কৃতি প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করে বিজ্ঞানী সকোলভ সমাজপ্রতিষ্ঠায় ও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেন—

Folklore has been, and continuous to be a reflection and a weapon of class conflict. In class analysis of Folklore it is natural to begin first of all with an effort to understand its social function in contemporary times.[৮০]

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার মার্ক আজাদভস্‌কি লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে কথকের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন অর্থাৎ গবেষণার সংগ্রহস্থল ও সংগৃহীত-তথ্যদাতার প্রাথমিক গুরুত্ব প্রসার লাভ করে।

এইভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংকলন ও বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে পৃথিবীর বহু দেশ। এবার বিদেশী পটভূমি থেকে চোখ ফেরানো যেতে পারে বাংলার লোকসংস্কৃতির জগতে।

উনিশ শতকের প্রায় সূচনালগ্ন থেকে লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে দেশী বিদেশী নানা ব্যক্তিত্বের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপীয় মিশনারী, রাজকর্মচারী, সাধারণ কর্মচারী, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ভারততত্ত্ববিদ প্রমুখ উৎসাহী রসিকজনের চেষ্টায় লোকসংস্কৃতির উপাদান সমূহ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে প্রাচীন সংগ্রাহকদের বিক্ষিপ্ত অপরিকল্পিত প্রয়াস ধীরে ধীরে ঋদ্ধ হয়েছে, যথাযথ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে রাখার নিরলস সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রসঙ্গত, গবেষক পবিত্র চক্রবর্তীর মতটি প্রণিধানযোগ্য—

'বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার মৌলপ্রকৃতি অনুসরণে বিভিন্ন কালপর্যায়ে যুগবিভাগ করে ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করাই বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস অনুশীলনের প্রাথমিক শর্ত।.....আমাদের দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবন-বাস্তবতার

মধ্য থেকে যুগান্তকারী ঘটনার অভিঘাতে লোকসংস্কৃতি চর্চার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশের বৈশিষ্ট্যই সাধারণ লক্ষণও স্বরূপ নির্ণয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলা লোকসংস্কৃতির চর্চার ইতিহাসের যুগবৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়......'[৮১]

গবেষক চক্রবর্তী লোকসংস্কৃতির আলোচনার যে যুগবিভাগ করেছেন তন্মধ্যে তৃতীয় পর্যায়টি অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সময়কাল হল, স্বদেশানুরাগমূলক জাতীয় উদ্যোগের পর্ব।[৮২] পূর্বসুরী লোকবিদ মযহারুল ইসলামও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সময়কালকে ও তার পরবর্তী সময়ের লোকসংস্কৃতির চর্চার অনুপ্রেরণা সম্পর্কে বলেছেন—

'........a strong nationalistic spirit in the field of folklore became evident.'[৮৩]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক আশরাফ সিদ্দিকী 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা-লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ ও চর্চার যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে ১৯২০-১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং সংগ্রহপর্ব'[৮৪] হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

অর্থাৎ গবেষককুল মোটের উপর সহমত হয়েছেন যে জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ ও চর্চার প্রবণতা প্রধানত বিংশশতকের প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য পূর্বেও 'স্বতন্ত্ররূপে লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের মূল বিদেশীয়গণের প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত।'[৮৫] কিন্তু এদের কর্মপ্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচারের সার্থকতা। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারা ও তাদের সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, ভাষাতত্ব প্রভৃতির অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে শ্যামুয়েল এম. জুইমার বলেছেন—

'When a missionary loses himself and his first love in the study of comparative religion native music, archaeology, onithology or folklore he may remain acumanic in his interest and thought, but he will cease to be a practising missionary with a passion for souls.'[৮৬]

দিব্যজ্যোতি মজুমদারের বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে আনন্দবাজার পত্রিকায়—

'ইউরোপীয় সিভিলিয়ান কিংবা মিশনারিরা যে মানসিকতায় বাংলা লোকসাহিত্য চর্চা করেছেন, পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী সম্পূর্ণ অন্য মানসিকতায় এই চর্চায় আগ্রহী হয়েছিলেন। কেরি-মর্টন-ক্যাম্বেল-টেম্পেলরা যে উদ্দেশ্যে লোকসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-দক্ষিণারঞ্জন-দীনেশচন্দ্র-চন্দ্রকুমারদের মানসিক মিল ছিল না। এক যুগের মানসিক লক্ষণ ধরতে না পারলে পরবর্তী যুগে চিন্তার উত্তরণকে বিশ্লেষণ করা যাবে না।'[৮৭]

মানসিকতার বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না যে বিদেশীদের বাংলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহ লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের প্রাথমিক

ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। স্পষ্টভাবে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের স্ফুরণ প্রাথমিক পর্যায়ে নেই সত্য, কিন্তু দেশীয় জনজীবন ও মানসিকতার প্রতি সংগ্রাহকদের দরদী চিন্তাধারার প্রকাশ অবস্যই পাই। সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যেতে পারে।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪)[৮৮] নাম বিশেষভাবে যুক্ত। শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে উনিশ শতকে যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আছে কেরীর অবদান। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আসেন কিন্তু 'এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মন চিরকাল সেই উদ্দেশ্যকে আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে নাই, কাজ করিতে করিতে ভাষার প্রতি প্রীতি আপনিই জন্মিয়াছে।'[৮৯] সজনীকান্ত দাসের এই মন্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়ে মযহারুল ইসলামও এই প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন—

'Apart from religious motives, he had a genuine interest in and love for the Bengali language.'[৯০]

দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) এর সংকলক হিসাবেই উইলিয়ম কেরীর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। কথোপকথন গ্রন্থের আখ্যাপত্রে আছে—

Dialogues/intended to facilitate the acquiring of The Bangalee language/ Sreerampore/ Printed at the Mission Press 1801.[৯১]

গ্রন্থে মোট ৩১টি সংলাপে সমাজ অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য, আচার-ব্যবহার, বিবাহাদি সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, জমিদার ও রায়তের বক্র সম্পর্ক, মহাজন ও ঘাতকের উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়, সাধারণ লোকের দারিদ্র্য, হাটবাজারের বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র সরস ও সজীবতায় উপস্থিত হয়েছে।

প্রচলিত প্রবাদ বাগ্‌ধারা, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতিনীতি— বলা যায় বাঙালীর জীবনাচরণ, তার সমাজ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বাস্তব তথ্যের আকর হিসাবে কথোপকথন গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। যেমন—আমরা সীমিত কটি উদাহরণ দিতে পারি—

স্ত্রীলোকের হাটকরণ

.......কতো নিবি বল,

দেড় কাহন হবে দেখ দিকি কেমন খেই.....

যা আর দশগণ্ডা নিস, না হয় এগার পণ হইল. দিবি তো দে, না দিস নিয়া যা।[৯২]

—এ থেকেই বোঝা যায় যে তখন কাহন, পণ, গণ্ডাই ছিল মাপকাঠি।

'বাঁশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত', অধিকান্ত ন দোষায়' ইত্যাদি বাগ্‌ধারার প্রবেশ যেমন স্বাভাবিক পথেই ঘটেছে তেমনি 'ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেল্যার মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ষাটের বাছা জ্বরে ঝাউরে পড়েছে'[৯৩]—ইত্যাদি সংস্কারও অবাধে বিচরণ করেছে এখানে। খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমেই দুশো বছরের পুরানো বাঙালীর

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি অর্থাৎ লোকজীবনচর্চা অঙ্কিত হয়েছে।

কেরীর জীবনাবসানের পর এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে সংলাপগুলির যথার্থ মূল্যায়নই করা হয়েছে—

........in respect of the graphic power they discover of showing life as it is - its rustic and familiar as well as more polite forms.[৯৪]

উইলিয়ম কেরীর সংকলিত অপর গ্রন্থ ইতিহাসমালা ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

A collection/ of stories/ in the Bengalee Language/collected from various sources/ By W. Carey. D. D./ Teacher of the Sanskrit, Bengalee and Mahratta Languages/ in the College of Fort William/ Serampore/ Printed at the Mission Press 1812.[৯৫]

এই গ্রন্থখানি গল্পের সংকলন। ছোট-বড় বিচিত্র বিষয়ক ও স্বাদের দেড়শোটি গল্প এতে স্থান পেয়েছে। বেতাল পঞ্চবিংশতি, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের গল্প, বিভিন্ন দেশ-বিদেশের গল্প কথা লোককথা, রূপকথা, উপকথা ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন আরবী ফারসী কিস্সার প্রভাবে রচিত গল্প প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত কিছু গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, 'যে বৎসরে গ্রীস ভ্রাতৃদ্বয়, বিশেষত জ্যেষ্ঠ গ্রীস জার্মানীর কৃষকদের মুখ থেকে রূপকথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন, সেই একই বৎসর কেরী সংগৃহীত ইতিহাসমালা প্রকাশিত হয়। এই যোগাযোগ কাকতালীয়বৎ হলেও উল্লেখযোগ্য।'[৯৬]

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কিংবদন্তী ও লোককথার সঙ্গে ইতিহাসমালায় সংগৃহীত কোন কোন গল্পের সাদৃশ্য দেখা যায়। অধিকন্তু এর অনেক গল্পের অন্তরে বহু যুগবাহিত লোকচেতনার ঐতিহ্য সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম মুদ্রিত বাংলা ছড়া এবং বাংলা ধাঁধাটিকেও এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

যদিও খাঁটি লোকসাংস্কৃতিক উপাদান অবিমিশ্রভাবে সংগৃহীত হয়নি গ্রন্থটিতে, তবুও বলা যায় লোকায়ত জীবনের বাণী স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ সম্বলিত ঐতিহ্য সংকলকের প্রাথমিক দায়দায়িত্বটুকু তিনিই পালন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে গবেষক সনৎকুমার মিত্র বলেছেন—

'লোকায়ত জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান আগ্রহ ও সহানুভূতিবোধ সেদিন আর কোনও য়ুরোপীয়ের ছিল না। এই গ্রন্থের সংকলন টেপরেকর্ডারের কাজমাত্র—অর্থাৎ আজকের দিনে যেমন একজন গবেষক টেপরেকর্ডার নিয়ে ক্ষেত্রস্থল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এনে গবেষণাগারে ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি কেরী যেমন যেমন জেনেছেন তেমনিই টুকে দিয়েছেন (Verbatim transcription) মনে করতে দোষ কি? দেশীয় দু-একজন পণ্ডিত তাঁকে এতে সাহায্য করেছেন। অর্থাৎ এই গ্রন্থদ্বয়ের পরিকল্পনা, সংগ্রহ, সংকলন সবই কেরীর এবং দেশীয় পণ্ডিতেরা এর সংযোজক ও সংশোধক। অতএব কেরীকে তাঁর

কৃতিত্ব ও প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করলে ঐতিহাসিক সত্য কুণ্ঠিত হবে।[৯৭]

সর্বোপরি কেরীর স্বীকৃতিতেই ধরা পড়েছে তাঁর বাঙালী প্রাণকে, বাংলার জীবনকে সমীভূত করে নেবার প্রবল আগ্রহকে—

I may say indeed that their manners, customs, habits and sentiments are obvious to me as if I was myself as a native.[৯৮]

পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন উইলিয়াম মর্টন (১৮২৩ খ্রীঃ নাগাদ বাংলায় আসেন)[৯৯] খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই ভারতে আসেন। তিনি 'দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ' বা 'A collection of proverbs' নামে ৮৭৩ টি বাংলা প্রবাদ এবং সত্তরটি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৮৩২)।[১০০] আশরাফ সিদ্দিকী বলেছেন—

'The first collection of oral tradition in Bengal was published in 1832 by Reverend William Morton a senior missionary of the incorporated society for propagating the Gospel in Foreign Parts, Calcutta.'[১০১]

আখ্যাপত্রে, মর্টন নিজেও স্বীকার করেছেন যে দেশীয় জনসমাজে পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই তার উদ্দেশ্য—

'.......to introduce amongst them the light of truth, the power of a holy and spiritual religion.'[১০২]

ধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এইসব প্রবাদমালায় ক্রিয়াশীল থেকেছে সংগ্রাহক মর্টনের প্রচারই তার উদ্দেশ্য—

'........to introduce amongest them the light of truth, truth, the power of a holy and spiritual religion'[১০২]

ধর্মপ্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এইসব প্রবাদমালায় ক্রিয়াশীল থেকেছে সংগ্রাহক মর্টনের অশিক্ষিত পটুত্ব। বাংলা লোকসংস্কৃতির প্রভূত সম্পদ সংরক্ষিত হয়েছে, লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস, লোকজ্ঞান, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা বাক্‌ধারা নীতিবাক্য, ছড়া, ধাঁধা খনার বচন, লোককথা এবং লোককাহিনীর উৎস পৌরাণিক কাহিনীচিত্র, লোকসমাজ-অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন সূত্রে গৃহীত চরিত্র ও ঘটনাবলী ইত্যাদি।[১০৩]

সংকলিত প্রবাদগুলির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন রেভারেণ্ড মর্টন, অবশ্য স্বীকার করেছেন এবিষয়ে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথাও—

'If therefore I have occasionally failed to seize the just intention of a proverty, this circumstance must plead excuse, for me with the candid and considerate reader.'[১০৪]

কিন্তু এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না যে, প্রবাদগুলির ইংরাজী অনুবাদ এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বাংলা প্রবাদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন মর্টন, সে-জন্য বাঙালী মাত্রেই মর্টনের কাছে কৃতজ্ঞ।

'পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত বাঙালী যখন অন্ধ পরানুকরণের মোহে আচ্ছন্ন,

আত্মমর্যাদাহীন বাঙ্গালী জাতির কাছে যখন জাতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ যে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি; তা ছিল অবহেলিত অবজ্ঞাত...তখন বললে অত্যুক্তি হবে না বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার বীজ এইভাবে একজন বিদেশীর দ্বারাই উপ্ত হয় পরবর্তীকালে মহীরূহের আকারে আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায়।'[১০৫]

বাংলা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপর যে বিদেশী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তিনি জেমস্ লঙ (১৮১৪-১৮৭৭)।[১০৬]

রেভারেণ্ড লঙ প্রণীত প্রবাদমালা প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এতে ২৩৫৮টি প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। প্রবাদগুলি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী সাজানো। আখ্যানপত্রে লঙের নাম মুদ্রিত হয়নি। 'প্রবাদমালা' ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এতে ৯৭৯টি প্রবাদ সংকলিত । বাংলা প্রবাদের সঙ্গে যে সব ফরাসী দিনেমার, ওলন্দাজী পর্তুগীজ, ইতালীয়, স্পেনীয় ইত্যাদি প্রবাদের সাদৃশ্য আছে সেইগুলি উল্লিখিত হয়েছে।[১০৭] দ্বিতীয় খণ্ডে লঙের নামে একটি ইংরেজীতে রচিত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে অবশ্য সঙ্কলয়িতার নাম নেই কিন্তু 'ইহা যে J. Long সাহেবের প্রকাশিত প্রথম সংগ্রহ তাহাতে সন্দেহ নাই।[১০৮]

আখ্যাপত্রে বলা হয়েছে—

'Two thousand Bengali proverbs illustrating native life and feeling'[১০৯]।

জীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত এই প্রবাদমালায় ধরা পড়েছে দেশীয় জীবন ও মানসচর্চার যাবতীয় উপাদান।

প্রবাদমালার দ্বিতীয় ভাগে লঙের প্রদত্ত বিবৃতি থেকে এট'ই বোঝা যায় যে বাংলার জনমানসের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিশ্বের মানসিকতার পরিচয় ঘটানোই তাঁর উদ্দেশ্য—

'The object is to introduce to the notice of the Bengali people the wit and wisdom of peasants and women in other parts of the world, the Russian Proverbs 200 in number though last in the series will not be found the least in their wit and keen sarcasm.'[১১০]

'প্রবাদচর্চায় নিবেদিত প্রাণ রেভারেণ্ড লঙ প্রবাদের গুরুত্ব যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তেমনটি সে যুগে অন্য কোন ইউরোপীয় মিশনারীকে অনুধাবন করতে দেখা যায়নি।......

বিশেষ যুগের চিন্তাভাবনা অভিজ্ঞতা প্রবাদে কিভাবে বিশ্বস্তরূপে ধরা পড়ে লঙ্ সে সম্পর্কে তাঁর সুগভীর চিন্তাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেছেন ঃ

Proverb photograph the varying lights of social usages, the experience of an age is crystallized in the pithy aphorism. What a light is shed by them on custo.ns, which shift and change like a camera observe.

প্রাচ্য দেশে যেখানে ইতিহাস চেতনার বড়ই অভাব, বিশেষতঃ হিন্দুরা যেখানে ইতিহাস বিরোধী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে অতীতকে জানতে প্রবাদের যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লঙ্ সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ঃ

The Eastern people especially the Hindus are anti historic......... what an auxiliary, then are proverbs, which give the history, not merely of kings and conquerors, but of the people in their innermost thoughts, in the domestic hearts. For instance, I have on the Bengali proverbs numerous references to old customs, old temples, historical characters which have long since passed away either in MSS or books........ we gain a glimpse in to pre-historic time and proverbs may be the fossils to utilize in the reconstruction of the long-buried past, they give us the facts instead of fancies.

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চাতেও প্রবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন লঙ্—

'In the important domain of comparative philology proverbs exercise an important influence'[১১১]

এভাবে বিদেশী পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক হয়েও বাংলা লোকসংস্কৃতির মূল্যবান রত্নসামগ্রী উদ্ধার ও রক্ষার কাজে গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্। এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণের পদ্ধতি এবং তাদের সাংস্কৃতিক রসক্ষেত্রের উৎসবিন্দুটি কোথায় তা নির্ধারণে তাঁর মহত্ত্ব স্বীকৃত। প্রবাদ-চর্চার নিরিখে অনায়াসে তিনি পেয়ে যান আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি—

'Long was perhaps the first modern sociologist who emphasised the importance of proverbs and did some important pioneering work in this direction'[১১২]

ইতিহাসের পুনর্গঠনে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তিনি; জাতীয়তাবাদের আড়ম্বরপূর্ণ প্রচার না করেও একনিষ্ঠ সাধনায় বাংলার জনজাতির সাংস্কৃতিক গৌরব প্রতিষ্ঠা করার অনলস সাধনা করে গেছেন এই মিশনারী।

Family Literary ক্লাব প্রদত্ত মানপত্রে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ, ২০শে মার্চ) রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙ্ সম্পর্কে উপযুক্ত শ্রদ্ধাই অর্পিত হয়েছে—

'Your intimate knowledge of the Bengali language, your life-long labours to raise its status, yours admirable and exhausted collection of proverbs spoken by the ryots and women of Bengal, embodying their wisdom and practical good sense have brought before the European world a knowledge of our inner life which is the most elaborate works on : India would fail to convey.'[১১৩]

বাংলা লোকসাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহের ইতিহাসে অপর যে বিদেশী উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন তিনি হলেন এডওয়ার্ড টুইটি ডালটন (Edward Tuite Dalton) ১৮১৫-১৮৮০।[১১৪] তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি হল 'Descriptive Ethnology of Bengal (1872)'। উল্লেখ্য যে ডাল্‌টনের এই বই এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলা দেশের জাতিতাত্ত্বিক জরিপ

কার্যের সংগ্রহ। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির কাছে ডঃ ফেয়ার কংগ্রেসের একটি সভা ডাকার প্রস্তাব করেন এবং ঠিক হয় যে বাংলা সরকার এবং ভারত সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জাতি উপজাতির বংশ কুল ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করবেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—

'Early in the year 1866, Fayer C.S.I. submitted to the Asiatic Society of Bengal, a proposal for a great Ethnological Congress in Calcutta, which was to bring together in one exhibition typical examples of the races of the old world, to be made the subject of scientific study, when so collected........

.... But in the meantime the Government of Bengal and the Supreme Government had in compliance with the request of the Society called on all local authorities.'[১১৫]

প্রত্যক্ষভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদানের চর্চার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অপেক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত জাতিতাত্ত্বিক পর্যালোচনাই যে ডালটনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তা তিনি স্বীকার করেছেন অকপটে—

'I have been asked to edit the ethnological information submitted in compliance with this requisition by the Commissioners of Divisions and Provinces under the Bengal Government; and in undertaking the duty my intention was to draw up a descriptive catalogue which might prove a useful guide to the ethnological exhibition'[১১৬]

অবশ্য বিভিন্ন জাতি পর্যালোচনা কালে ডাল্টন যেমন তাদের কুল, বংশ, গোত্র ইত্যাদির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তাদের আচার আচরণ, শিল্পকলা, পাল-পার্বণ, নৃত্যগীত, কুলদেবদেবী, লোকসঙ্গীত, কিংবদন্তী, পুরাণ, লোকসংস্কার প্রবাদ- প্রবচন, ভূত-প্রেত-ডাইনী সংক্রান্ত বিশ্বাস ইত্যাদিরও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ফলে বাংলার বিবিধ জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণের ইতিহাসই প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠেছে গ্রন্থটিতে।

বাংলার জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত কয়েকটি লোককাহিনীও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—'The Story of Two Brothers', 'Karma and Dharma'[১১৭], 'The River Goddess'; The Story of Seven Brothers'[১১৮] এই গল্পগুলি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

'.........they are good specimens of the legends of the tribal people'[১১৯]

গবেষক আর্চার এই সমৃদ্ধ গ্রন্থটির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন—

'It [Descriptive Ethnology] gave for the first time, a general survey of aboriginal life in Eastern India and this laid the foundation of Indian Ethnology.'[১২০]

বাংলা লোককাহিনীকে যিনি পাশ্চাত্যরসিক মহলে পরিচিতি দেন, তিনি হলেন গেবর্ন

হেনরি ডামন্ট '(Guyborn Henry Damant) (১৮৪৬-১৮৭৯)[১২১]

'Damant's collections are the first Bengali, folktales brought to the notice of the West'।[১২২] বিখ্যাত পত্রিকা'Indian Antiquiry' এর বিভিন্ন সংখ্যায় ডামন্টের সংগৃহীত ১৪টি বাংলা লোককথা পাই। অবশ্য ডামন্ট কিংবা ডালটন কেউই বাংলা কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যকে রচনা, ভালোবাসা এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠা সত্যই প্রশংসনীয়—

'Neither Damant nor Dalton made comparative studies of their tales and legends but both were pioneers-one as a Bengali folktales collector, the other as an ethnologist of Bengal.'[১২৩]

লোককাহিনী সংগ্রহ ব্যতীত দিনাজপুর জেলার পলি উপজাতিদের জাতিতত্ত্বের বিষয়ে ডামন্ট বহু মূল্যবান সংবাদ পরিবেশন করেছেন, যা লোকসংস্কৃতি গবেষণায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এছাড়া রংপুর অঞ্চলের কিছু বাঙালী মন্ত্রও সংকলন করেছেন তিনি। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুগত প্রাণ বিদেশী সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন আশরাফ সিদ্দিকী—

'Damant, however, was first collector of Bengali tales and charms from the northern part of Bengal now in Bangladesh. Damant's Bengali tales have a great importance, for hardly any collection in later periods fails to cite his tales. Thompson and Roberts, in their index refer to his tales and similar indexes use his materials repeatedly.'[১২৪]

বাংলার লোককাহিনী সংগ্রহ করেন প্রথম যে বাঙালী তিনি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'Folk Tales of Bengal' (১৮৮৩)[১২৫] অবশ্য ক্যাপ্টেন আর. সি. টেম্পলের অনুরোধেই লালবিহারী এই সংকলন কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন—

'........Captain R.C.Temple, of the Bengal Staff Corps son of the distinguished Indian administrator, Sir Richard Temple wrote to me to say how interesting it would be to get a collection of those unwritten stories.....'[১২৬]

কিন্তু, গ্রন্থটির ভূমিকার প্রতি ছত্রে বাঙালী জনসমাজের প্রতি তাঁর দরদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে লোকমননের সমধর্মিতা যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে আন্তরিক মেলবন্ধন, সে সত্যও নির্দেশ করেছেন তিনি—

'........the swarthy and half-naked peasant on the banks of the Ganges is a Cousin, albeit of the hundredth remove, to the fair skinned and well-dressed Englishman on the banks of the Thames.'[১২৭]

গঙ্গাতীরের কৃষ্ণাঙ্গ চাষীদের সঙ্গে টেমস্ নদীর তীরবর্তী সুবেশ ইংরেজদের মধ্যে

ভ্রাতৃত্বের ভাব খুঁজে পেয়েছেন লালবিহারী, তুলনামূলক লোকসাহিত্য চর্চার বিচারে, বাংলার লোকসংস্কৃতির সম্পদও যে প্রচুর এবং গৌরবজনক, সেই বোধটাই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উক্তিতে।

'Folk Tales of Bengal' গ্রন্থে মোট বাইশটি লোককথা সংগৃহীত হয়েছে। লালবিহারী দে ভূমিকায় স্বীকার করেছেন তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা—

'...........but I had nearly forgotten those stories, at any rate they had all got confused in my head, the tail of one story being joined to the head of another, and the head, of a third to the tail of a fourth.'[১২৮]

অবশ্য লালবিহারী ছেলেবেলায় শোনা গল্পগুলির জটপাকানো স্মৃতির উপর নির্ভর করেন নি। নতুন কথকের সাহায্যে টাটকা অথচ ঐতিহ্যসম্পন্ন লোককাহিনী সংগ্রহ করে, তার থেকেও আবার ঝাড়াই-বাছাই করে মোট বাইশটি গল্প নিয়ে সংকলনটি তৈরী করেছিলেন। ফলে তাঁর পাকা কলমের ডগায় সংগৃহীত হয়েছে লোকসমাজের অন্তঃপুরে রক্ষিত লোকসংস্কৃতির সম্পদগুলি। এ প্রসঙ্গে লীলা মজুমদারের মন্তব্যটি স্মর্তব্য—

'... ....নিরলঙ্কারভাবে গল্পের কাঠামোগুলি ধরে দিয়েছেন, কোথাও কোনো তত্ত্ব কথা আরোপ করেন নি, বর্ণনার বাহুল্য নেই, সংলাপ অনেক জায়গায় অতি নীরস। আশ্চর্যের বিষয় হল, তবু সেই ন্যাড়া বিবৃতির অসম্ভব অবাস্তব অভাবনীয় সব ঘটনার মধ্য দিয়েও সেকালের বাঙালীর চরিত্র তার আশা-নিরাশা সুখ-দুখে মেশা জীবনযাত্রা কেমন ফুটে উঠেছে। ....সেই চিরদিনের লোভ, হিংসা, বিফলতা, ব্যর্থতা, সেই মহত্ত্ব, সেই সার্থকতা গল্পকারের নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতা গল্পের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে।'[১২৯]

যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে সংগ্রাহক লালবিহারী দে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক নির্দেশিকা বা পাদটীকা দিয়েছেন, কিন্তু বহু অসম্পূর্ণতা গ্রন্থটিকে আদর্শ সংকলনের সীমারেখা স্পর্শ করতে দেয়নি। তাসত্ত্বেও গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে বাঙালী লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তরিক টানটি ফুটে উঠেছে।

এই গ্রন্থটি ব্যতীত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ গ্রন্থ 'Bengal Peasant's Life' বা গোবিন্দ সামন্ত।[১৩০] গ্রন্থখানির বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। গ্রাম্য জীবনের এমন বিশ্বস্ত পরিপূর্ণ কথাচিত্র এর পূর্বে বা পরে দেখা যায় নি।

এছাড়া অরুণোদয়, বেঙ্গল ম্যাগাজিন ও ক্যালকাটা রিভিউ[১৩১] এই তিনটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন লালবিহারী। পত্রিকাগুলির বিবিধ সংখ্যায় লোকসংস্কৃতির অজস্র উপাদান লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাংলার জাতিতত্ত্বের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অবদান রাখেন হার্বার্ট হোপ রিসলে (Herbert Hope Risley, (১৮৫১-১৯২২)।[১৩২] ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের দুটি খণ্ড 'Tribes and Castes of Bengal'[১৩৩]

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বহুজাতি ও উপজাতির জাতিতাত্ত্বিক আলোচনা এবং

লোকসংস্কৃতির বহু বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ দুখণ্ডের এই গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইউরোপীয় নৃতত্ত্বে পঠন পাঠনের রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হত, রিসলে তাকেই অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে তাঁর বিবৃতি–

'The following volumes contain the result of what is, I believe, the first attempt, to Indian ethnography the methods of systematic research sanctioned by the authority of European anthropologists.'[১৩৪]

উক্ত গ্রন্থে জাতিতত্ত্বের অনুষঙ্গ হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে লোকসংস্কৃতির প্রভূত উপাদান। প্রধানতঃ লোকপুরাণ বা মিথ এবং কিংবদন্তী। এছাড়াও, বিবিধ জাতির সামাজিক অভিব্যক্তি, ধর্ম বিশ্বাস-সংস্কারের বিশস্ত তথ্য সরবরাহ্ করেছেন রিস্‌লে। একথা যথার্থ যে ডালটনের পর বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসমাজের উপর এত বৃহৎ ও ব্যাপক কাজ করা সম্ভব করে তুলেছেন একমাত্র রিস্‌লেই—

'.........so far as the study of ethnology of Bengal (including Behar) is concerned, none after Dalton have succeeded in making such a comprehensive study as that of Rislay'[১৩৫]

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রথম প্রকাশ পায়—সেটি গীতিকা। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন (George Abraham Grierson) (১৮৫১-১৯৪১)[১৩৬] এই বৎসর উত্তর বাংলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এক গীতিকাহিনী শুনিতে পাইয়া তাহা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন। ......ইহার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র যে ভাষা-তাত্ত্বিক কৌতূহলই নিবৃত্ত হইবার যোগ্য ছিল তাহা নহে– ইহার সাহিত্যগত যে আবেদন ছিল প্রধানতঃ তাহাতেই জনসাধারণের দৃষ্টি বাঙলার লোকসাহিত্যের প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল।[১৩৭]

'এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে দেবনাগরী অক্ষরে গানটি প্রকাশিত হয়। গ্রীয়ারসন গানটির একটি স্বরলিপিও প্রদান করেন। একজন বিদেশীর দ্বারা বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করা এবং সেই উপাদানের সাঙ্গীতিক দিক সম্পর্কে চিন্তা করা ব্যাপারটি বিশেষত্বপূর্ণ।

'গ্রীয়ারসনের অন্য দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'The two versions of the Song of Gopi Chand' এবং 'A Song of Goraknath' নামে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। লোকসংস্কৃতিগত উপাদান ছাড়াও ভাষাতত্ত্ব এবং ইতিহাসের বহু নতুন তথ্য এর থেকে পাওয়া যায়[১৩৮]

অবশ্য এই উপাদান সংগ্রহ সর্বত্র ত্রুটিহীন নয়। আশরাফ সিদ্দিকী সেই অসঙ্গতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন–

'He confuses history with folklore. There might have been a king named Manikchandra and a queen named Mayanamati sometime in the ancient past. The song through innumerable veriation from age to age

and from place to place took such shapes that is futile to trace its historicity from a version collected in 1873.'[১৩৯]

অবশ্য গ্রীয়ারসন নির্দেশিত পদ্ধতি যে পরবর্তী লোকবিজ্ঞানীদের শৃঙ্খলিত বৈজ্ঞানিব বিশ্লেষণের পথ দেখিয়েছে তা অনস্বীকার্য—

'And finally the process which Grierson initiated in studying the Song of Manick Chandra has been followed by Bengali scholars in studying ballads historically, sociologically and linguistically.'[১৪০]

গ্রীয়ারসনের সুদীর্ঘ কর্মবহুলজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'Linguistic Survey of India' ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এটি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে এবং পঁচিশ বছরে কুড়িটি খণ্ড প্রকাশিত হয়।[১৪১] পঞ্চম খণ্ডটিই লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই খণ্ডটিতেই লোকসঙ্গীত, লোককথা, প্রবাদ-ছড়া ইত্যাদি অজস্র উপাদান সঞ্চিত রয়েছে-

'Volume-V devoted to the Bengali language is probably the most valuable one of all for a folklorists viewpoint. Here Grierson cites much folklore material including songs and tales.'[১৪২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অপর যে ধর্মযাজক বাংলায় আসেন তিনি উইলিয়ম ম্যাককুলক ('William Mcculloch')একান্ত ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার লোককথা সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থের নাম 'Bengali Household Tales' যা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।[১৪৩]

এই গ্রন্থে মোট ১৮টি কথা সংগৃহীত হয়েছে। ৩০০টির বেশি পৃষ্ঠায় এই গল্পগুলি সংকলন করা হয়েছে। বাংলার লোককথার বিচিত্র উপাদান ও রসের পরিচয় পাওয়া যায় এই কথাগুলি থেকে। লোককথা সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক রীতিটির অবলম্বন করেছিলেন ম্যাককুলক।

সংগৃহীত কাহিনীগুলির প্রতিটির সঙ্গে পূর্বভারতের সমান্তরাল কাহিনীর উল্লেখ আছে। এর থেকে তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গেই আছে প্রয়োজনীয় পাদটীকা আর গ্রন্থশেষে আট পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট সংযোজন। সেকারণেই বরুণকুমার চক্রবর্তী যথার্থ মন্তব্যই করেছেন—

'সংকলন'টি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সংকলক লোককাহিনীর সংগ্রহ ও সেগুলির আলোচনার জন্য উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত ছিলেন'।[১৪৪]

অর্থাৎ, বিদেশী প্রচেষ্টায়, লোকসংস্কৃতির অজস্র উপকরণ সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে। এই সংগ্রহের পশ্চাতে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা ধর্মযাজক কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন ইত্যাদি তাগিদ তো ছিলই, তাছাড়া ব্যক্তিবিশেষের মানবিক অনুসন্ধিৎসা ও রসাকর্ষণের আবেদনও কম ছিল না। গবেষক মযহারুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

'Most of the missionaries learned the native languages, even including dialects, and passed their times with villagers. They accepted sufferings with smiling faces. They approach the people with love and sympathy.'[১৪৫]

কিন্তু একথা মানতেই হবে যে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার, জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছিল না সেই বিদেশী প্রচেষ্টায় । বস্তুত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত লোকায়তজীবন ও তার সংস্কৃতি অনুশীলনের প্রচেষ্টায় দেশীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়ভাবে যুক্ত ছিল মনে হয় না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেই লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনা হল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই। স্বাধীন হতে গেলে জাতিকে যে দেহ্-মন প্রাণে সজীব ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে, এই সচেতনতাও সেদিন দেশপ্রেমীদের চিন্তার আকাশে উদিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই জাতির হৃত গৌরব ও লুপ্ত মর্যাদাবোধ তার সুদীর্ঘ কালের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক ধারাটিকে পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদও সেদিন অনুভূত হয়েছিল। হিন্দু মেলার (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টার শুভ সূচনা ঘটেছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উক্ত প্রচেষ্টাকেই আমরা আরো পরিকল্পিত ও সুসংহত রূপে প্রকাশিত হতে দেখি[১৪৬] উদ্বোধনী ভাষণে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন---

'সকলের সমবেত চেষ্টায় আমাদের, অর্থাৎ এই নবজীবনের স্পন্দনে স্পন্দমান বাঙালী জাতির জাতীয়তার মূল উৎস আবিষ্কৃত হইবে ও তাহার মূল ভিত্তি প্রকাশিত হইবে।'[১৪৭]

এইভাবে সংগ্রাম আন্দোলনের পাশাপাশি দেশকে জানার আগ্রহ অনিবার্যভাবে দেশের সজীব মানুষের জীবনের গভীরে দৃষ্টি দিতে উৎসাহী করে তোলে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মূলক্‌রাজ আনন্দ-এর ভাষায় বলা যায়,

নৈরাশ্য ও হতাশার দিনে দীঘির জল যখন শুকিয়ে আসে, তখন নতুন করে আবার জীবনের গভীরে মাটি খুঁড়তে হয়, যুগ চেতনায় তাকে সমৃদ্ধ করে নিতে হয়। এই সমৃদ্ধতর মানবিকানুভূতিই রূপান্তরহীন সমাজ জীবনের বুনিয়াদ, সকল সামাজিক মূল্যমানের মূল উৎস।'[১৪৮]

নতুন উৎসের সন্ধানে জীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার আহ্বান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতির সামনে রেখেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যে পরিষদের আয়োজিত সভায় (চৈত্র ১৩১১) রবীন্দ্রনাথ জাতির ভবিষ্যৎ তরুণ বাঙালী ছাত্র সমাজকে বাঙালী সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তি রচনার কাজে উদার আহ্বান জানিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তারি কিছু অংশ উদ্ধৃত হল---

'....... বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুসন্ধান আলোচনার বিষয়। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে এই আলোচনার ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান

করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে.....

.........সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থান ভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া ছেলে ভুলাইবার ছড়া প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত, দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য পরিষদ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

......আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি— ভোগের পথে নহে, কর্মের পথে।.... দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরে ভগ্নাবশেষে কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায় পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ সেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোক কোনোদিন বিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করে না,.... কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্‌মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্য বিশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশ প্রেমকে সার্থক করো।'[১৪৯]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-এর মুখপত্র সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি অনুধাবন করলে বোঝা যায় ঐতিহ্য নির্ভর লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুতপক্ষে ছড়ার রস-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—

—'শুধুমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়াসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।'[১৫০] কিন্তু ছড়াগুলির রসাবেদনের প্রতি আগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কেও তার সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

ক) সমাজতত্ত্বের উপাদান :

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।

অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে[১৫১]

খ) লৌকিক ভাষারীতির লক্ষণ :

ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা লক্ষিত হইবে। [১৫২]

খোকাবাবুর অতিক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোট ঘুণ্টি দেওয়া অতিক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতোজোড়া সেটি হইল জুতুয়া, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা

পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।[১৫৩]

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে আয়োজিত এক সভায় এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—

মেয়েরা এই সভায় সাধারণতঃ রক্ষণশীল স্বভাবের সুতরাং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখা উচিত যে স্ত্রী আচারে কোন্ কোন্ প্রদেশের মিল আছে।.....এইরকম যদি দেখি যে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে স্ত্রী আচারে বাংলাদেশে আরো মিল আছে তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে বাংলাদেশবাসীর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য— দেশবাসীর একটা নিকটতম যোগ আছে।

তাছাড়া ভিন্নপ্রদেশের ঘুমপাড়ানো ছড়া মিলাইয়া দেখিলেও হয়। বাংলাদেশে শ্যালক, শালিকা, নাতি, নাতনি সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা কৌতুকের ক্ষেত্র আছে, এইরূপ অন্যান্য প্রদেশের আছে ইহাও অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এইরকম আরো অন্বেষণের কাজ আমাদের দেশের কারো গ্রহণ করা উচিত।[১৫৪]

জাতীয় সম্পদ

এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারে না। কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।[১৫৫]

শিশুচিত্তে ছড়ার গঠনমূলক প্রভাব

ছড়াগুলিও স্নেহরসের বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিয়াছে।[১৫৬]

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি পরিক্রমা সূত্রে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অলিখিত মৌখিক ধারার সাহিত্য লেখ্য রূপের মধ্যে তার স্বতঃস্ফূর্ত মাধুর্য হারায়, এই সতর্কবাণী শোনাতেও ভোলেননি তিনি—

'এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সবল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মতো মর্যাদাভীরু গম্ভীর স্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে?[১৫৭]

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধটি পরে লোকসাহিত্য গ্রন্থের [১৫৮] অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ গ্রন্থের অপর প্রবন্ধ গ্রাম্যসাহিত্য [১৫৯] রবীন্দ্রনাথের সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণের ফসল।

এই প্রবন্ধে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হলেও লোকসাহিত্যের ফলশ্রুতি হল সমষ্টিগত চেতনার প্রতিপালন। যূথবদ্ধতা লোকায়ত জীবন তথা সাহিত্যের সম্পদ—

'গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে...... তাহার গানের মধ্যে, কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।'[১৬০]

লোকসংস্কৃতি কোষগ্রন্থেও ফুটেছে সেই সমার্থক সুর—

'They are the possessions of social groups not of individual'[১৬১]

লোকসাহিত্য মূলত ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও রক্ষণশীল, সেই বোধটি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে—

—'গ্রামের প্রাণটি যেখানে ঢাকা থাকে কালস্রোতের ঢেউগুলি সেখানে তেমন জোরের সঙ্গে ঘা দিতে পারে না। গ্রামের জীবনযাত্রা এবং সেই জীবনযাত্রার সঙ্গী—সাহিত্য, বহুকাল বিনা পরিবর্তনে একই ধারায় চলিয়া আসে।[১৬২]

এই ঐতিহ্যনির্ভরতাকে সমর্থন করেছেন বহু লোকবিজ্ঞানী—'The essential quality of folklore is that it is traditional'[১৬৩]

আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক জীবনের কৃত্রিম আড়ম্বর জীবনের সরলতাকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তেমনি লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলিরও ঘটেছে চরম দুরবস্থা। সেই সচেতনতাও প্রকট হয়েছে প্রবন্ধে—

'জীবনের আনন্দের মাঠের ফুলের মতো যে সব নৃত্যগীত আপনি বেজে উঠত তারা জীর্ণ হয়ে ধুলায় মিলিয়ে গেল।.... আজ সে গেল বোবা হয়ে। আজ তাকে কলে তৈরী আমোদের আশ্রয় নিতে হচ্ছে— যতই নিচ্ছে ততই নিজের সৃষ্টিশক্তি আরও অসাড় হয়ে যাচ্ছে।'[১৬৪]

আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে লোকসাহিত্যকে উচ্চ সাহিত্যের ভিত্তিমূল হিসাবে বিবেচনা করা হয়—

'......Scholars have established that the sources of much written literature have been the ever renewing springs of folklore'[১৬৫]

সঠিক এই প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন— সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে।'[১৬৬]

বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মূলেই নিহিত ছিল সত্যের নির্মোহ রূপকে প্রত্যক্ষ করার এক প্রকৃষ্ট ইচ্ছা। এই সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁকে বহু ক্ষেত্রেই আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী অধ্যুষিত জ্ঞানের বিশিষ্ট পরিমণ্ডলের অধিবাসী করে তুলেছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে বাংলার বাউলের ধর্মচিন্তা, কর্মের ক্ষেত্রে বাংলার লোকশিল্পের রূপায়ণ এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলার লোকসাহিত্যই তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।'[১৬৭]

রবীন্দ্রনাথের বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের তিনটি দিক। একটি, তিনি স্বয়ং লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেই সঙ্গেই ছিল তাঁর মননশীল চিন্তা প্রভাবিত সমীক্ষা, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, অপর সংগ্রাহকদের উৎসাহ দিয়েছেন, অপরের লোকসাহিত্যবিষয়ক সংগ্রহ-গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন তাঁর মূল্যবান ভূমিকা।

এছাড়া বাংলার লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপকরণ তিনি তাঁর জাতীয় জীবনের সন্নিকটবর্তী

সৃষ্টির মধ্যেও প্রয়োগ করে তাকে জাতীয় জীবনের সন্নিকটবর্তী করে তুলেছিলেন।

সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে[১৬৮] রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা দিয়েছেন। ছড়া, ব্রতকথা, আলপনা, লোককথা, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, পালপার্বণ লৌকিক উৎসব, লোকশিক্ষা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির প্রতিটি কক্ষেই সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ দেখি।

অপরের সংগ্রহ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ কৃত ভূমিকাগুলিতে তাঁর দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবোধ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক টানটিও গোপন থাকেনি।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত 'মেয়েলি ব্রত'-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৩০৩ সালে—

'যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়ত যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গ রূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।'[১৭০]

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত লোককথার সংকলন গ্রন্থ 'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থের[১৭১] দীর্ঘ ভূমিকায় (১৩১৪ সালে) রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের বিবিধ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন—

'ঠাকুরমার ঝুলিটি'র মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? ......এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব; কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলাদেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে; সকলকেই সন্ধ্যায় আকাশের চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই, চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

অতএব বাঙালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।[১৭২]

পরমেশ প্রসন্ন রায়, সংকলিত 'মেয়েলি ব্রতকথা'[১৭৩] (ভাদ্র ১৩১৫) শীর্ষক পূর্ববঙ্গীয় ব্রতকথা সম্বলিত পুস্তকটির মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছে—

'......এই সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের পল্লীজীবনযাত্রার সরল মূলনীতিগুলি যে কোনো

আকারে সন্নিবেশিত আছে এবং কালের পরিবর্তনবশতঃ এগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলে দেশের পরাবৃত্তির একটি প্রধান উপকরণ নষ্ট হইয়া যাইবে— স্বদেশের প্রতি একদা ঔদাসীন্যবশতঃ একথা তখন কেহ চিন্তা করিতেন না এখন যে আমাদের দুর্দিনের অবসান হইয়াছে, দেশকে প্রত্যক্ষতভাবে অনুভব করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছে, বর্তমান গ্রন্থ তাহারই সূচনা করিতেছে। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ গুপ্তের লোককথার সংকলন গ্রন্থ 'বেড়াল ঠাকুরঝি'র একটি ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

রূপকথা মেয়েদের মুখে যেমন শোনা যায় ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।..... তাছাড়া ইহার মধ্যে মানবমনের যে প্রকৃতি পরিচয় পাওয়া যায় তাহারও আধার এই বাংলাদেশের গ্রামের অন্তঃপুরে। এই গল্পগুলির ভিতরে যে চেহারা পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস আছে এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। একটি কথা বলা আবশ্যক, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এই গল্পগুলিরই কিছু কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে।'[১৭৪]

দেখা যাচ্ছে, আধুনিক গবেষকদের মতোই রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছিলেন যে, স্থানভেদে গল্পগুলির রূপভেদ বিষয়ে সচেতন থাকা আবশ্যক। লোককথায় যে বিশেষ রসের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, সেই রসের স্বরূপ ছেলেভুলানো ছড়া প্রসঙ্গে নিজেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন।

কারিগরী লোকশিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ রচিত 'কাঠের কাজ' (১৩৩২) গ্রন্থটির ভূমিকায়—

'সংসার সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সঙ্কটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে-কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে।'[১৭৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শক্তি, সামর্থ্য, উদ্যম ও পরিকল্পনা নিয়ে এই অবহেলিত লোকশিল্পকলার সৃষ্টিশীল ধারাটিকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। চারু ও কারুশিল্পের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সারটুকুই যেন আমরা খুঁজে পাই মহাত্মা গান্ধীর কাছে কবির প্রদত্ত বিবৃতিতে—

'Please tell Mahatmaji that, I appeal to him since he is endeavouring to found a Museum for the nation, not to limit it to crafts. Crafts have been the media of artists in all ages, and our artists, as painters,as architects, as decorators, have helped our folks, to get finer satisfaction out of the same material......

If Mahatmaji's men go round collecting specimens of village industries, why may they not also look for a collect specimens of the various indigenous arts spread all over our land and waiting to be richerised? A section of the Museum may be devoted to it which will show us how our

peoples have lived and are living, and how indeverse ways with what material means at their disposal, they have tried to create some ras in their life.'[১৭৬]

এই শিল্পবোধ দ্বারা চালিত হয়ে কবি আলপনা সংগ্রহে উৎসাহী হন, মেয়েলি ব্রত উৎসবের সংকীর্ণ চতুঃসীমায় যে আলপনা কর্ম আবদ্ধ হয়েছিল তাকে উদ্ধার করে জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে উৎসাহী হন। এই প্রসঙ্গে শ্রী ক্ষিতিশ রায় 'Alpana of Santiniketan School' গ্রন্থে বলেন—

'To his nephew Abanindranath Tagore, he assigned the task of collecting the Vrata-Kathas (Ritual narratives) as also the Alpana designs which were their symbolic representation, Bangalar Vrata incorporates the result of Abanindranath's study and research of the subject'[১৭৭]

হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ কবিকে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের অপরূপ প্রাণসম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, 'An Indian Folk Religion'[১৭৮] প্রবন্ধে বাউল গানের মাধুর্য, ভাবার্থ ও গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'It gives each man trust in his own possibilities, and pride in his humanity........

......The dignity of man, in his eternal right of Truth, finds expression in those songs.'[১৭৯]

শিলাইদহ জমিদারী অঞ্চলের কর্মচারী শচীন অধিকারী 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থে কবির লোক সঙ্গীত প্রিয়তা প্রসঙ্গে বলেছেন—

পল্লীর কীর্তন, জারী-তরজা, ভাসান যাত্রার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, গ্রাম্য উৎসবাদি তুচ্ছ, অসভ্য বা অশ্রাব্য মনে করে দু-পাঁচ মিনিট শুনেই চলে আসতেন না।

'স্বদেশী যুগের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে লোকসঙ্গীতের সুর বসাতে শুরু করেন। শ্রী শান্তিদেব ঘোষের মতে, কবির সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত গানে সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত রামপ্রসাদী, কীর্তন প্রভৃতির সুরারোপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শিলাইদহের পল্লী অঞ্চলে লোকসঙ্গীত শোনার অভিজ্ঞতা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অভিঘাত তাঁর সঙ্গীত রচনায় এনে দিল এক স্বকীয়ত্ব ও মৌলিকত্ব।'[১৮১]

মহম্মদ মনসুরউদ্দীন কর্তৃক সংগৃহীত বাউল গানের সংকলন 'হারামণি'-এর ভূমিকায় কবি বলেছেন—

'তবু তার (বাউলগানের) ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়।...

আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতম গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে

বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি— এ জিনিস হিন্দুমুসলমান উভয়েরই অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা।'[১৮৩]

রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা ও কম প্রচেষ্টার সুদীর্ঘ পরিক্রমা বহু আয়াসসাধ্য ইতিহাস পরিক্রমান্তে এই কথাই মনে আসে যে রসবাদিতা, দেশপ্রেম প্রভৃতির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার এমন এক সম্মিলন এ ক্ষেত্রে ঘটেছে যা তাঁর মননশীল প্রতিভার একটি নতুন দিককে উন্মোচিত করে দিয়েছে।

লোকসংস্কৃতির মধ্যে যে নতুন স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার ঔজ্জ্বল্য আকৃষ্ট করেছে বহু অনুরাগী সংগ্রাহককে। সেই সকল অনুরাগী অন্বেষণকারীদের প্রচেষ্টা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রতিষ্ঠা পর্বের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)। মূলতঃ লোকসংস্কৃতি গবেষক ছিলেন না তিনি, ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক, ছিলেন ধ্রুপদী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর মত স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিত্বের পক্ষে লোকসংস্কৃতি উপেক্ষা করা অসম্ভব। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রচনায় লোকসংস্কৃতির নির্যাস মেলে।'[১৮৪]

১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সরকারী ঘোষণায় বিচলিত রামেন্দ্রসুন্দর ভাঙ্গা বাঙলাকে এক করার জন্য কলম ধরেন। তারই ফল—'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'(এপ্রিল ১৯০৬)।[১৮৫] ব্রতকথার গঠন ও রীতির মাধ্যমে পরিবেশিত এই রচনায় নারীর উক্তির সহজ সরল ভঙ্গিটিই বেছে নেওয়া হয়েছে—

'১৩১২ সাল আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাঙলা দুভাগ হবে, দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাক্‌তে লাগল— মা তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেও না।....

আমরা ভাই-ভাই-ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা তুমি কৃপা কর, আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব, আর পুতুলখেলা করব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না; মা তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া করলেন।.......

.... তিরিশে আশ্বিন কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐদিন বাঙলা ছাড়ছিলেন, ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলার অচলা হলেন। বাঙলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন।

......বছর বছর ঐদিন বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐদিন উনুন জ্বলবে না। হাতে-হাতে হলদে সুতোর রাখী বাঁধবে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম করে বাতাসা পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন।

বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকবেন।' [১৮৬]

এভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কাঠামোয় দেশপ্রেমকথা পরিবেশন করে স্বদেশচেতনাকে সাধারণ মানুষের মননের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন রামেন্দ্রসুন্দর।

১৩১৪ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 'গ্রামদেবতা' রচনাটি। রুদ্রদেবকে অবলম্বন করে রচিত প্রবন্ধটিতে লেখকের ইতিহাসচর্চা নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব ফোকলোর চর্চার দিকটি ধরা পড়েছে।'[১৮৭]

সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু গবেষক মনটি ব্যাপক আকারে ধরা পড়েছে 'খুকুমণির ছড়া' পুস্তকের ভূমিকারূপে লিখিত প্রবন্ধটিতে।[১৮৮] ছড়ার মধ্যস্থ অর্থগত অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতাকে শিশুর জগতের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিবাদ বলেই মনে করেছেন লেখক—

'শিশুবুদ্ধি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক দেখে না।...... এই শৃঙ্খলাহীন নিয়মহীন বিপর্যস্ত জগতের মধ্যে সে পরিপূর্ণ উল্লাস ও আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়।'

বাঙালীর সামাজিক ঐতিহাসিক জীবনের দলিল স্বরূপ ছড়াগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য—

'এই সাহিত্যে কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব না থাকিলেও দুই একটা সামাজিক তত্ত্ব সঙ্গোপনে লুক্কাইত থাকিতে না পারে এমন নহে।

......মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন।—মনুষ্যজীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।[১৮৯]

কেবল বাংলা ছড়াই নয়, সমগ্র লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাসেই রামেন্দ্রসুন্দরের এই দিকনির্দেশ এক গভীর ও স্থায়ী প্রভাব হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)[১৯০] লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলার ব্রত' ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়।[১৯১] প্রখর ইতিহাসবোধের সঙ্গে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তার যথার্থ রূপায়ণ—শিল্পী ও বিজ্ঞানীর আশ্চর্য মিলন ঘটেছে উক্ত গ্রন্থে—

সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখা যাচ্ছে আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু সূর্য চন্দ্র এঁরা উপাসিত হচ্ছেন ভারতবর্ষে ইজিপ্টে, মেক্সিকোতে। সুতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালির ঘরের জিনিস বলে ধরা যেতে পারে। এটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে ব্রতগুলির সম্পূর্ণ চেহারাটি আমরা যখন দেখব। একদিকে ভারতে প্রবাসী আর্যদের অনুষ্ঠান, আর এক দিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, এক দল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন, আর এক দল নদীমাতৃক পল্লীগ্রামের নিভৃত নীড়ে বসতি করছেন। এই প্রবাসী এবং নিবাসী দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মূর্তিতে এবং তারাই বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে কর্মের উপরে—তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফূর্তি সবলে নিষ্পেষিত করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ ও পুরাণের চেয়েও যা পুরোনো এইসব লৌকিক ব্রত, অনুষ্ঠান, এদের

ইতিহাস এইতেই প্রমাণ করছে—দুই দিকে দুটো বড় জাতির প্রাণের কথা মাঝে একটি দল বিশেষের স্বপ্ন।[১৯২]

বিভিন্ন ব্রতের অনুষঙ্গে রচিত হয় যে আলপনা, তার উৎপত্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন—

'কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এদুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠেছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায় নানাভাবে, নানারসে, মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে।'[১৯৩]

আলপনার মধ্যে শিল্পের একরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, আবার এই শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অন্যভাবে 'ছেলে ভোলানো ছড়া' প্রবন্ধটিতে।[১৯৪] এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বাংলা ছড়াকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। ছড়ার চিত্রধর্মিতা সম্পর্কে শিল্পগুরুর সার্থক আলোকপাত ঘটেছে—

খুব বড় বড় পেন্টারের হাতে আঁকা 'Sunset', 'The Evening Lamp' এমনি কত-কি অনড় অচল ছবি মাসিক পত্রিকায় তিনবর্ণে মুদ্রিত দেখেছি, তারা এতটুকু একটা ছড়ার কাছে হেরে যায়—সায়মণির কোলে রতনমণি দোলে, দুগ্‌গো পিদিম জ্বলে।[১৯৫]

লেখক বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ছড়াগুলিকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী—

একদিক হচ্ছে প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে ছোটখাট সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে তার বাঁধন, আর এক দিকে হল ছড়াটা সম্পূর্ণ মুক্ত, কল্পনা ও অবাস্তবের রাজ্যে।[১৯৬]

অতীত দিনের বহু উল্লেখ্য ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় ছড়ার বৃহৎ জগৎ থেকে। সেই কারণে অবনীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

'মিশরের রাজাদের কবর থেকে হাজার হাজার বছরের রাজা রানীর জীবনের কাহিনী, তাদের নানা ব্যবহারের জিনিসের মধ্যে থেকে প্রকাশ হচ্ছে কতক ভাঙ্গা অবস্থার কতক পুরোপুরিভাবে। এই ছড়া নিয়ে নাড়াচাড়ার কাজও ঠিক তাই। ভাঙ্গা, আধ-ভাঙ্গা সব ছড়া; এর সাহায্যে গড়ে তুলতে হবে শিশুসাহিত্যের ও বাঙ্গালীর জীবনের একটা অধ্যায়।'[১৯৭]

এছাড়া প্রবন্ধটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ছড়ার সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া দুষ্কর। 'যেহেতু কালে কালে নানা বিস্মৃতির ফলে একটি ছড়া আদিতে যখন সম্পূর্ণ অখণ্ড পরিপূর্ণ ছিল, তখন তা নানা ছড়ার মধ্যে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে—এইভাবে অর্থানুসারে সৃষ্টিশীল মন নিয়ে আবার তাকে সাজানো হোক। ইউরোপের ফিনল্যাণ্ডের গবেষকেরা যেমন 'Historic-Geographic Method' অবলম্বনে একটা লোককথার আদিস্তরে পৌঁছতে চেষ্টা করেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ তেমনি এই পুনর্নির্মাণের পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি ছড়ার পূর্ণ সমগ্র অখণ্ড রূপকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন।'[১৯৮]

'লোককথাকেও অবনীন্দ্রনাথ নানাভাবে গ্রহণ ও স্বীকার করেছেন। কখনো কোনো প্রচলিত ও ঐতিহ্যমূলক লোককথাকে তিনি পুনর্কথনের জন্য নিয়েছেন, কখনো নিজেরই

কোন কল্পিত কাহিনীকে বলেছেন লোককথার ঢঙে। কখনো বা ঘটিয়েছেন নানা রীতির মিশ্রণ।.....

......ভাবে ও ভাষায় 'শকুন্তলা' তাই শেষে একটি রূপকথা হয়ে উঠেছে। 'রাজকাহিনী' বা 'নানক' প্রভৃতি রচনাতে রাজস্থান বা বৌদ্ধ প্রতিবেশের অতীত ইতিহাস তাঁকে এই রূপকথার ভঙ্গি গ্রহণে সাহায্য করেছে।

একে তিন, তিনে এক, বইতে আছে একাধিক রূপকথা বা রূপকথাধর্মী রচনা। যেমন—'কনকলতা', 'বড়রাজা ছোট রাজার গল্প', কাঁচায় পাকায়', 'ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা', 'রতাশেয়ালের কথা', 'সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক' প্রভৃতি।'[১৯৯]

রূপকথার সঙ্গে রোমান্স, অসঙ্গতির জগতের সঙ্গে সৌন্দর্যজগৎ একসঙ্গে ভিয়েনে চাপিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে স্বাদু মানস ভোজ তৈরী করলেন; তা বাংলা লোকমানসের এক অভিনব উপাদানকে অমরত্ব দান করল।

এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য সংকলক হলেন 'অবনীন্দ্র-সুহৃদ্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১২৭৮-১৩২৯)। তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দ। সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর পূর্বে ছড়ার সংকলক পাঠ্যান্তরকে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত বিবেচনা না করে উপযুক্ত মর্যাদায় সংকলনে স্থান দিয়েছেন। এতে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশিত।[২০০]

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দুটি লোককথার সংকলন প্রকাশ করেন, 'রাক্ষস খোক্কস' (১৩০৪), ও 'ভূত পেত্নী' (১৩০৯)।[২০১] রাক্ষস খোক্কসের ভূমিকায় লেখক বলেন—

'আমাদের দেশের প্রচলিত সুমধুর ছেলে ভুলানো গল্পগুলির উদ্ধার সাধন করা বাঙালীর একটি কর্তব্য ও পুণ্যকর্ম। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে উদ্যোগী হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহোদয় তাঁহার ফোক্ টেলস অফ বেঙ্গল (Folk Tales of Bengal) গ্রন্থে প্রাচীনকালের এই গল্পগুলির পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বোধহয়, তিনি সভ্যতাভিমানী বঙ্গবাসীর নিকট আদর পাইবে না ভাবিয়া বিজাতীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ আমাদের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গভাষার প্রতি আর নাসিকা কুঞ্চিত করি না, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আর ভয় নাই, তাই সাহসে ভর করিয়া লুপ্তরত্নের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইলাম।'[২০২]

এই বিবৃতি স্বাদেশিক চেতনামণ্ডিত তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এছাড়া সংকলকের একনিষ্ঠ বিশ্বস্ততা থেকেই তাঁর চ্যুতি ঘটেনি তা বোঝা যায় সুকুমার সেনের মন্তব্যে—

গল্পগুলি মেয়েদের মুখ থেকে যেন টাট্‌কা ধরা হয়েছে। ভাষার আঞ্চলিক রূপ পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান।[২০৩]

ঠিক এই প্রকার স্বাদুমাধুর্য ফুটেছে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)[২০৪]

সংকলিত টুনটুনির বই গ্রন্থে। গ্রাহক স্বয়ং বলেছেন সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ, শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।[২০৫]

অর্থাৎ লোককথাগুলির অনুভববেদ্য রসমাধুর্য সম্পর্কে সংগ্রাহকের সচেতনতার পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।

স্বদেশ চেতনার নির্যাস ঘনীভূত হয়ে দেখা দিয়েছে অপর যে গ্রন্থে সেটি 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), সংকলক হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭) এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন—

'The book has marked out an epoch in our literature.'[২০৬]

স্বয়ং দক্ষিণারঞ্জন গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙ্গালীকে এক অতি মহাব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, হারানো সুরের মণিরত্ন মাতৃভাষার ভাণ্ডারে উপহার দিবার যে অতুল প্রেরণা তাহার মূল ঝরণা হইতেই জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে দেশ জননীর স্নেহধারা—এই—বাঙ্গালার রূপকথা।[২০৭]

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জনের বাক্‌রীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন—

'তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ; তেমনি তাজাই রহিয়াছে, রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।'[২০৮]

এরপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে ঠাকুরদাদার ঝুলি (১৯০৮), ঠানদিদির থলে (১৯০৯), দাদা মহাশয়ের থলে (১৯৪৩)।[২০৯]

ঠাকুরদার ঝুলি গ্রন্থের ভূমিকাটি পাঠ করলেও দক্ষিণারঞ্জনের দেশ-প্রেম নিষিক্ত মনটি অনুভব করা যায়—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংশ্লেষে বাঙ্গলা ভাষার যে সকল শাশ্বত বস্তুর সন্ধান আমরা পাই তার মধ্যে বাঙ্গলার পল্লীর এই শ্রুতি-সাহিত্য (বা লোক সাহিত্য) দেশ মর্ম্মেব—অধিকাংশের অধিকারী। ইহার নিরক্ষরা ভাষা, লিখিত ভাষার ন্যায় সুরীতিতে শ্রেণী বিভাগ করিয়া বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তক্ষেত্রের উপর সাহিত্যের এক বিরাট মন্দির গড়িয়াছিল। দেশের ছেলে-মেয়েদের সহজ কল্পনার পূর্ণ বিকাশে, গৃহলক্ষ্মীদের প্রাণটিকে অতি কোমলভাবে গৃহকর্ম্মে তন্ময় করিতে যুব-প্রৌঢ়-বৃদ্ধের বহির্বাটীতে নিত্য কথোপকথনছলে জ্ঞান, নীতি, ক্রিয়াসূত্রকে হাস্যতরল পথে চিত্তপ্রবেশের প্রিয় সুযোগ দিতে......এই দেশের সর্বত্র সর্বজনের হৃদয়মন আমোদে বিহ্বল করিয়া উচ্চতম আদর্শে শিক্ষার ও রসৈশ্বর্য্যের অমেয় সৌন্দর্যে সুগঠিত করিতে বাঙ্গলার অমৃতের কলস ইহার কেন্দ্রবেদিতে সংরক্ষিত।[২১০]

এছাড়া দক্ষিণারঞ্জন লোককথার শ্রেণীবিভাগ করেছেন—রূপকথা, ব্রতকথা, রসকথা এবং গীতকথা এই চারটি বিভাগে, লোককথার শিক্ষামূল্য উল্লেখ তো করেইছেন, আবার সংস্কৃত হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর ইত্যাদির সঙ্গে লোকগল্পের সম্পর্ক নির্ণয় করে সিদ্ধান্ত করেছেন—

'জাতির বহুদীর্ঘ ইতিহাসের ছাপ ইহার উচ্চতর কাব্য-কলা-কৌশলে।[২১১]

তাঁর এই বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার প্রশংসা করে শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন—

'He is in love with the tales as they are related by the rural people of the lower gangetic valley, and gives a faithful version of what he has heard.[২১২]

দক্ষিণারঞ্জন লোককথার যে আলোচনার সংকেতমাত্র দেন তাঁর সংগ্রহগ্রন্থের মুখবন্ধে, তাই ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে দীনেশচন্দ্র সেনের Folk Literature of Bengal গ্রন্থে (১৯২০)। জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিতে বাংলার লোককথাগুলির যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রাথমিক প্রচেষ্টার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে এই গ্রন্থেই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা পুঁথি ও লোকসাহিত্য সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে একটি আন্দোলন ও বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একটি প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি করেন দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)[২১৩] তাদের প্রধানতম। বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একান্ত শ্রদ্ধাশীল গবেষক বাংলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সম্পাদনা, প্রকাশনা সমালোচনার দিকে দৃষ্টি দেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'[২১৪] প্রকাশিত হয়, সেখানেই লোকসাহিত্যের, বিশেষত লোককথার সৌন্দর্য প্রাচীনত্ব, ভাষার ছাঁদ নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন—

বাঙ্গালার কতকগুলি নিজস্ব ব্রতকথা ও রূপকথা আছে যাহা বহু প্রাচীন। এতৎ সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রমাণের উল্লেখ করিব।

'প্রথম প্রমাণ ভাষা। ভাষা রূপান্তরিত হইলেও মাঝে মাঝে প্রাচীন যুগের নিদর্শন এখনও রহিয়া গিয়াছে। যথা প্রাচীন যুগে এবং ভাদালি ব্রতকথায়।

দ্বিতীয় প্রমাণ—এই সকল কথা ও গাথার মধ্যে অতীতের একটা সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়াছে। পৌরাণিক যুগে হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়া গেল, বলিয়া আসন অনেক নিম্নে নামিয়া পড়িল। ....কিন্তু এই সকল ব্রতকথা এবং রূপকথার মধ্যে আমরা সমুদ্র যাত্রার সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পাই।

তৃতীয় প্রমাণ মুসলমানী বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশের মুসলমানগণের পূর্ব-পুরুষেরা অধিকাংশ হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল। তাঁহাদের অনেকেই ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী কিংবা তাহার অব্যবহিত পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু মুসলমান

ধর্ম্ম গ্রহণ করার পরেও অনেকে তাহাদের জাতীয় বৃত্তি ছাড়িতে পারেন নাই। এখনও পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণীর মুসলমানেরা লক্ষ্মীর পাঁচালী গাহিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে হিন্দু বা বৌদ্ধরাজার সময় তাহার চর্চা এখনও কতক পরিমাণে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এ সমস্ত রূপকথা পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্ত্তী সুতরাং তাহারা এ সমস্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।[২১৫]

দীনেশচন্দ্র লোককথার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সাহিত্যরস, রোমাণ্টিক সৌন্দর্য—

সাহিত্যিক লিপিকুশলতা এই সকল গল্পে অত্যন্ত আশ্চর্যরূপে দৃষ্ট হয়। রচয়িতা শুধু ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই চরিত্রগুলি এরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কোন সমাসের ঘটা, রূপবর্ণনার আতিশয্য বা লেখকের বক্তৃতায় তাহা হইতে পারিত না।

.....ইহারা শিশুর আমোদের উৎস, যুবকের প্রেম-পিপাসার অমৃত এবং বৃদ্ধের শাস্ত্র, ইহা মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েরই তুল্যরূপ উপভোগ্য।[২১৬]

পরবর্তীকালে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হল 'The Folk Literature of Bengal'[২১৭]—লোকসংস্কৃতির মনননিষ্ঠ আলোচনার আকর। ১৯১৭ সালের প্রদত্ত রামতনু লাহিড়ী ফেলোশিপ বক্তৃতামালার গ্রন্থনাই আত্মপ্রকাশ করে গ্রন্থটিতে।[২১৮]

এই বইটির প্রস্তাবনা রচনা করেছেন প্রখ্যাত পণ্ডিত W. R. Gourlay. মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলা লোককথার সেই শক্তির সন্ধান পাই যা একদিকে বাংলার দৈনন্দিন জীবনচিত্রকে ফুটিয়ে তোলে, তেমনি জাতীয় মূল্যবোধের আবেগদীপ্ত ঐশ্বর্যকেও প্রকাশ করে—

It is a tale of which a nation might well be proud, if has all the attributes of a beautiful lyric : it cantain a conception of purity and love which evince a high state of civilization the rural scenes are full of the joy of life.[২১৯]

এই গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র বাংলার সুপ্রাচীন লোককথাগুলির সঙ্গে গ্রীস সঙ্কলিত য়ুরোপপ্রচলিত প্রাচীন গল্পগুলির তুলনা করে সাদৃশ্য নির্ধারণ করেন—

The tale of 'Sukhu ar Dukhu' has an almost exact parrallel in that of Mo.her Holle in Grimn brother's collection.[২২০]

এছাড়া গল্পগুলির উদ্ভবকাল যে প্রাক-পৌরাণিকযুগ, সে সম্পর্কে যুক্তিসহ তথ্য উপস্থিত করেন,-পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য সমুদ্রযাত্রার উপর আরোপিত বিধিনিষেধ, নারী সৌন্দর্যের আলংকারিক বর্ণনার অস্তিত্ব এব কোনটাই খুঁজে পাওয়া যায় না সেই সব লোকগল্পে।

লোকগল্পগুলির রোমান্টিক কাব্যিক সৌন্দর্য সম্পর্কে মনোগ্রাহী মত পরিবেশন করেছেন—

'The stories are like epic poem in Bengal with many exquisite lyrical

notes, and the language is so forcible brief and colloquial that it is not in the power of any Bengali writer to change a word, without marring its native simplicity and effect.[২২১]

দীনেশচন্দ্রের আলোচনার মধ্যেই সর্বপ্রথম আমরা বাংলা লোককথা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাবলীর নির্ভরযোগ্য উপাদান পাই, যা পরবর্তীকালের গবেষকবৃন্দের কাছে আদর্শ নির্দেশিকা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এছাড়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন গ্রীয়ারসন-সংগৃহীত গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত ও আলোচনা করেন।[২২২] ফলেই, গোপীচন্দ্রের গানের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের পরিচয় স্থাপিত হয়। এছাড়া পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলা থেকে লোক সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ গীতিকা সংগ্রহ করে প্রকাশ করলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এগুলি 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এবং ময়মনসিংহ গীতিকা নাম নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকলো। দীনেশচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন চন্দ্রকুমার দে[২২৩]

দীনেশচন্দ্রের এই নিরলস প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি জানিয়ে অধ্যাপক Heinz Mode বলেছেন—

'If Bengali folk literature is known all over the world as high-lightmerit within the realm of Indian folk-literature this knowledge is based on efforts and publication of the great Bengali Scholar Dinesh Chandra Sen.'[২২৪]

ইংরাজ আমলের প্রখ্যাত আই. সি. এস গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১)[২২৫] নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধে সাড়া না দিয়ে পারেননি। 'ভজার বাঁশী' (১৯২২), 'চাঁদের বুড়ি' (১৯৩৩) এই দুই ছড়ার বই প্রকাশনার পর ভারতীয় লোকনৃত্য সম্পর্কিত একটি আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেটি হল Indian Folk Dance and Folklore movement (১৯৩৩)।[২২৬] বাংলার নিজস্ব সম্পদ ব্রতচারী নৃত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। পটুয়া সঙ্গীত (১৯৩৯) গ্রন্থটির মাধ্যমে পটুয়া চিত্রকর সম্প্রদায়ের নানা তথ্যের আলোর উপর আলোকপাত করেছেন।[২২৭]

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'The Folk Dance and Song Society' এবং এর থেকে সৃষ্ট ব্রতচারী আন্দোলন পরাধীন বাংলায় প্রচণ্ড আবেগ সৃষ্টি করেছে।[২২৮] তাঁর মৃত্যুর পর অশোক মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে লোকনৃত্য বিষয়ক গ্রন্থ 'The Folk Dance of Bengal' (১৯৫৪) প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবনায় অশোক মিত্র যথার্থই বলেছেন—

'By 1934 the Bratachari Movement still an infant was strong and had spread tenacious roots. In his The Bratachari Synthesis, Gurusadaya Datta has outlined the genesis and carrear of this great movement which has come to stay as a most joyous purposeful and vigorous institution through out the union.'[২২৯]

রবীন্দ্রনাথের মহৎ উৎসাহ ও আন্তরিক উদ্যমের স্পর্শ নিয়ে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭) প্রকাশ করেছিলেন দশ খণ্ডের লোকগীতির সংকলন হারামণি, (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) রূপকথার সংকলন শিরণী (১৯৩২) লালন ফকিরের গান (১৯৪৮)।[২৩০] রবীন্দ্রনাথ মনসুরউদ্দীনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন—

'মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মহাশয় যে উদ্যোগ করেছেন, আমি তার অভিনন্দন করি,— সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করে নয়, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানবচিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা করি।'[২৩১]

লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা 'প্রবাদ'। বাংলা প্রবাদের আলোচনায় সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮)[২৩২] একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর সম্পাদিত 'বাংলা প্রবাদ' (বাং. ১৩৫২) গ্রন্থটি এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা প্রবাদ সঙ্কলন সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থের ভূমিকাংশটি গ্রন্থের এক অমূল্য সংযোজন।

'ভূমিকায় লেখক প্রবাদের উৎপত্তি প্রবাদের শ্রেণীবিভাগ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ ব্যবহারের বিপুল নিদর্শন, প্রবাদের সমাদর ও জনপ্রিয়তা অর্জনের কারণ, একই প্রবাদের লেখক পরম্পরায় পুনরুক্তি হওয়ার পরিচয় বর্তমান নব্য আধুনিক যুগে প্রবাদ ব্যবহারে বাঙ্গালীর অনীহার কারণ, বাংলা প্রবাদের বিশিষ্ট রূপ ও রস, প্রবাদে নিহিত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব প্রবাদে প্রতিফলিত বাঙ্গালী মানসিকতা ও সামাজিক জীবনের পরিচয় বিস্তৃত পরিসরে দান করেছেন।'[২৩৩]

বাংলা ভাষার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ও লোকসাহিত্যকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা সাহিত্য বিভাগে পঠনপাঠনের বিশেষ পত্ররূপে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও কৃতিত্বের জন্য আশুতোষ ভট্টাচার্যের (১৯০৯-১৯৮৪)[২৩৪] নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে সংগ্রহ, সংগঠন, ক্ষেত্র পরিচালনা এবং বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা—লোকসংস্কৃতির আলোচনার এই প্রতিটি পর্যায়ে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

তাঁর সংগৃহীত ও আলোচিত বাংলার লোকসাহিত্য পর্যায়ের ছয় খণ্ড গ্রন্থ (১৯৫৪ খৃ. থেকে ১৯৭২ খৃ. এর মধ্যে) লোকসংস্কৃতির অভিধানরূপেই চিহ্নিত হতে পারে।[২৩৫] লোকসাহিত্যের সামাজিক ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সচেতন এই মনীষী তাঁর সংকলন গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড 'কথা' এর ভূমিকা অংশে 'জাতীয় চরিত্র ও লোককথা' নামক পৃথক অধ্যায়ও রচনা করেছেন—

লোককথার মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রের পরিবর্তে জাতীয় চরিত্রেরই বিকাশ হইয়া থাকে।'[২৩৬]

তাঁর মধ্যে জাতীয় জীবনাচরণের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধর্ম-সংস্কার বীরত্ব ও উদ্যমের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নেয়।

লোকসাহিত্যের নানান উপাদান সংগ্রহ ও সমীক্ষা ছাড়াও আশুতোষ ভট্টাচার্যের

উল্লেখযোগ্য কীর্তি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বাংলার লোকসঙ্গীতের কোষগ্রন্থ স্বরূপ চার খণ্ড, বাংলার লোকসঙ্গীত 'রত্নাকর' প্রকাশনা।[২৩৭]

মনীষী ভট্টাচার্যের সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় আছে ক্ষেত্র-সমীক্ষা পরিচালনে, বিভিন্ন লোক উৎসবে এবং সর্বোপরি পুরুলিয়া ছৌ নৃত্য নিয়ে এশিয়া ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পর্যটনে ও সার্থক প্রদর্শনীতে।[২৩৮] সুবিস্তৃত কর্মবহুল জীবনে লোকসংস্কৃতির প্রতি যে নিষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করেছেন, তার মধ্যে আলোচকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমাজ বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি রসবোধ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও সর্বোপরি বিরল শ্রমশীলতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে ছিলেন মনীষী বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০)।[২৩৯] দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুধাবন করে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রবাহমান ধারাটির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার গভীরে বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক বোধ তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' একটি আকর গ্রন্থ বিশেষ। শঙ্কর সেনগুপ্ত গ্রন্থটিকে বলেছেন, 'বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও মানচিত্র স্বরূপ।'[২৪০] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক পরিচিতির এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—লোকাচার কিংবদন্তী, লৌকিক দেবতা, স্থানের ঐতিহাসিক পরিচিতি ইত্যাদি বহুমূল্যবান উপকরণ।

অপর উল্লেখ্য গ্রন্থ বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব (১৯৭৯)।[২৪১]এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চার সতর্ক বিশ্লেষণ যেমন রয়েছে, তেমনি আছে বাংলার সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রসঙ্গে গবেষণাধর্মী আলোচনা—

'সাংস্কৃতিক লেনদেন খুব বেশি পরিমাণে বাংলাদেশে হয়েছে বলে এখানে জাতিবর্ণগত সামাজিক দূরত্ব মানুষকে তেমন অনুদার ও সঙ্কীর্ণ চিত্ত করতে পারেনি। সামাজিক দূরত্বের জন্য অবশ্যই বিভিন্ন জাতিবর্ণের মানসিক প্রসার অনেকটা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু অ্যাকালচারেশনের' বৈচিত্র্য সেই দূরত্বাবসানে বা স্যোশাল ডি-ডিস্ট্যান্টিয়েশনে বেশ খানিকটা সাহায্যও করেছে। অ্যাকালচারেশনের ধর্মই তাই।[২৪২]

'ধর্ম দেবতা উৎসব-পার্বণ' অধ্যায়ে কেবল লৌকিক দেবতা ধর্মাচারণা নিয়েই আলোচনা করেননি, ধর্মীয় উৎসবের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন—

'উৎসবের দায়িত্ব হল সামাজিক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীজীবনের চেতনা ও সংহতি দৃঢ় করা।'[২৪৩]

এই গ্রন্থেই লোকসংস্কৃতির ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন চণ্ডীমণ্ডপকে। গ্রাম্যসমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে চণ্ডীমণ্ডপের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

'বাঙালীর লৌকিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিচিত্র উৎস থেকে প্রবাহিত

হয়ে এসে বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে মিলিত হয়েছিল একদিন।

চণ্ডীমণ্ডপের ইতিহাস তাই একটা ইনস্টিটিউশনের ইতিহাস, একটা যুগের ইতিহাস, বাংলার সেকালের গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতির ইতিহাস, লোকোৎসব ও লোকসংস্কৃতির ইতিহাস।'[২৪৪]

'এককথায় বলা যায় লোকসংস্কৃতি চর্চায় তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান স্বরূপ, যার সাহায্যে বাংলার লোক সংস্কৃতির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত অফুরন্ত সম্পদরাজিকে উদ্ধার করে লোকসম্মুখে তুলে ধরেছেন।'[২৪৫]—অধ্যাপক তিমির বরণ চক্রবর্তীর এই মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনকারীদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন অরুণকুমার রায় (১৯২২-১৯৮২)।[২৪৬] বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চাকে সংকলন ও সংরক্ষণের সীমাবদ্ধতা থেকে বিস্তৃত করেন বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও বর্গীকরণের ক্ষেত্রে। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ বেঙ্গলিশ্ ম্যাশেন (১ম, ১৯৬৫ ২য় ১৯৭২) এবং ব্রতকথাজ (১৯৬৪)[২৪৭]

'লেখা ও রেখা' পত্রিকায় ১৩৭৩ থেকে ১৩৭৯ সালের বিভিন্ন সময়ে অরুণকুমারের লেখা মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত।[২৪৮]

'লোকায়নচর্চা ও ইতিহাস' রূপকথাচর্চ্চার সমস্যা ও বাংলা রূপকথার প্রাচীনত্ব ঃ প্রবন্ধে বলেছেন লেখক—

'চার হাজার বছর আগের সামাজিক পরিবর্তনসমূহ ভারতীয় রূপকথাকে সামাজিক অগ্রগতির এই বিশিষ্টতা দান করেছে, যা বাংলার রূপকথায় সবচেয়ে সার্থকভাবে পরিস্ফুট। এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই বাংলার রূপকথা এক গভীর বৈপ্লবিক মানসিকতায় ভরপুর হয়ে রয়েছে।

......বাংলা রূপকথাগুলির ঐতিহাসিক অবস্থানের নির্দেশ মেলে, এরা হল আদিম বাংলা কৌম-স্তর ও সুস্পষ্ট পৌরাণিক ও ধর্মীয় গণ্ডী দ্বারা সুনির্দিষ্ট পূর্ণবিকশিত শ্রেণী সমাজের মাঝামাঝি সময়ের.......লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বাংলা রূপকথা একদিকে যেমন উচ্চতর শ্রেণীর উন্নত সাহিত্য ধারণার প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত, তেমন অন্যদিকে তার চারিপাশের সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের রূপকথা জগতের সঙ্গে গভীর শ্রেণীসম্পর্কে একাত্ম।[২৪৯]

ফোকলোর এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে তিনি ব্যবহার করেছেন লোকায়ন শব্দটি। এই লোকায়নের তত্ত্ব বিন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'লৌকিক সংস্কৃতি শাসকদের সংস্কৃতি থেকে চিরকালই পৃথক,' অথচ বিশ্বের সব মহৎ নগরসভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এরা দেদীপ্যমান।"[২৫০]

এছাড়া তিনি সভ্যতার অগ্রগতিকে দেখেছেন 'লোকায়ন সমবেত কর্মপ্রয়াসের ফল[২৫১] হিসাবে, যে প্রয়াসের চিহ্ন 'রূপকথা উপকথা গীতকথা বীরগাথা, পুরাণ ইত্যাদির মাঝে

নীলকান্ত মণির ন্যায় দীপ্তিমান হয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এসবই যৌথ মানুষের বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার অভিব্যক্তি'।[২৫২]

তিনি আশা করেছেন—

'আদিম গুহাবাসী ও শিকারী জীবন থেকে শুরু করে পুঁজিবাদী সমাজপর্যন্ত সর্ব অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে সমবেত সৃজন প্রয়াসে একদিন যে সর্বজন গ্রাহ্য সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ে উঠবে, তাই হবে লোকয়নের শিখর বিন্দু।'[২৫৩]

উগ্রজাতীয়তাবাদী মনোভাব যে লৌকিক সংস্কৃতির চর্চার পরিপন্থি, এই সতর্কবাণীও পাওয়া যায় তার রচনাতেই—

'একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী উগ্রজাতীয়তাবাদ লোকায়নের সাধনা ও প্রসারে বাধাস্বরূপ। এই বিজ্ঞানের গবেষককে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্র সম্যক উপলব্ধি করতে হবে, অর্জন করতে হবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী চেনা এবং ধীর পদক্ষেপ অগ্রসর হতে হবে প্রসারিত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী কঠোর পরিশ্রম ও যুক্তিসিদ্ধ পথ অনুসরণ করে।'[২৫৪]

মূলতঃ লোককাহিনীর বিশ্লেষণে তিনি নিমগ্ন ছিলেন বটে তবে লোকায়ন চর্চার ঐতিহাসিক পুনর্গঠন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়েও গবেষণা করেছে দেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তার রচনাকে বিশেষভাবে পরিশীলিত করেছিলেন।[২৫৫]

বাংলা লোকসাহিত্য তথা সংস্কৃতি আলোচনায় যেমন একনিষ্ঠ লোকসংস্কৃতি প্রেমিক আছেন, তেমনি মূলতঃ পরিশীলিত সাহিত্য আলোচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিরাও নিষ্ক্রিয় থাকেননি। আমরা তাঁদের মধ্যে দুইজন সাহিত্যিকের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করছি।

'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৩৪৫) খ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯২-১৯৭০)[২৫৬] মননশীল বোদ্ধাকেও দেখা গেছে রূপকথা বিষয়ক প্রবন্ধটি রচনা করতে (বাং ১৩৩৩)।[২৫৭]

রূপকথা প্রবন্ধটি মোট চারটি বিভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে লেখকের রসপিপাসুর দৃষ্টি 'রূপকথা' নামটিই নির্বাচন করেছে, কারণ—

'রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপনকক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়।[২৫৮]

দ্বিতীয় পর্যায়ে, লেখক লোকসাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত জনের দৃষ্টিপাতের কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'প্রথম এবং প্রধান কারণ বর্তমানের তীক্ষ্ণ জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপর আবিষ্কার..........দ্বিতীয়তঃ আমাদের মত রক্ষণশীল জাতির পক্ষে জাতীয়ত্বের গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে, সুতরাং এই নবজাগরণের দিনে, যখন আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তখন এই অতীতেরই কোন অন্ধকার কক্ষে সেই বিস্মৃত রত্নের অন্বেষণের বিবরণ......একটা পবিত্র

কর্তব্যও বটে।[২৫৯]

পরবর্তী পর্যায়ে লোকসাহিত্যের আকর্ষণ যে পরিবেশনকারীর ভঙ্গী ও কণ্ঠ মাধুর্যে এই সত্য উপলব্ধি করেছেন।

এর পরের ধাপে লেখক প্রতিপন্ন করেছেন যে আপাত অলীকতার অন্তরালে রূপকথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিদ্যমান---

'বাস্তব জগতে যে ব্যক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে যে আদর্শের সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানবমনের আদিম সনাতন নীতির আধিপত্য।'[২৬০]

রূপকথায় প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক জীবন---

'আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নীবিরোধ সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়।'[২৬১]

শেষ পর্যায়ে শিশুর মনোজাগতের পরিপুষ্টিত রূপকথার প্রভাব উল্লেখ করে প্রবন্ধের ইতি করেছেন। আদর্শ উপস্থাপনা, চমকপদ বিশ্লেষণ ভঙ্গী ও সর্বোপরি অনবদ্য ভাষা প্রবন্ধটিকে রসোত্তীর্ণ সৃষ্টিতে পরিণত করেছে স্বীকার করতে হয়।

অপর মনীষী হলেন প্রখ্যাত ভাষাবিদ সাহিত্যিক সমালোচক সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২)[২৬২] লোকসংস্কৃতি বিষয়ে সুকুমার বাবুর কোনো গ্রন্থ নেই ঠিকই, কিন্তু তিনি যে দীর্ঘকাল ধরে লোকসংস্কৃতির চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন এ সত্য অনস্বীকার্য।[২৬৩]

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডে[২৬৪] সুকুমার সেন গ্রামবাংলার লৌকিক দেবদেবীর মন্দিরের আলোচনা করেছেন, পরিচয় দিয়েছেন নানা লোক উৎসবের[২৬৫]।

ঝুমুরের উৎপত্তি সম্পর্কে আচার্য সেন অভিমত প্রকাশ করেছেন এই বলে-- 'জন্তলিকা নাচ হইতে আসিয়াছে রাজস্থানী ঝামান গান। বাঙ্গালায় ইহা একদিকে ধামালীতে অপরদিকে ঝুমুর-এ পরিণত।'[২৬৫]

ছড়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে আচার্য সেনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে--

শব্দটির দুই প্রতিষ্ঠিত অর্থ (১) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত ছড়ানো (২) গ্রথিত, গাঁথা মালা ছড়া পরে অর্থ হল ছুটকো ছন্দময় রচনা।[২৬৭]

'গল্পের গাঁটছড়া'[২৬৮] গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে বাংলা লোককথার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে শিশু, শিশুর সাহিত্য' প্রবন্ধে[২৬৯] যেমন গল্প ও কথা শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত শিশু সংক্রান্ত তথ্যগুলিরও উল্লেখ করেছেন, আবার বাংলা গল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশস্থ লোকগল্পগুলির সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করেছেন।[২৭০]

গল্পের ভূত [২৭১] নামক রম্যরচনা সংকলন গ্রন্থে প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিদেশী আত্মাদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রচলিত নানা

ভূতের গল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের রচিত ভূতের গল্প বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

এইভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ডঃ সুকুমার সেন পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে যথার্থ আস্বাদযোগ্য রস লোকসাহিত্যেও বিদ্যমান। এই সাহিত্যে যেমন অতীত সমাজ তথা জাতীয় জীবনের সন্ধান লাভ সম্ভব তেমনি, উচ্চসংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হয়েছে আমাদের দীর্ঘকালের অবহেলিত লোকসংস্কৃতির মধ্যে।

রাজনীতিক কারণে বাংলা-ভাষী এলাকা আজ দ্বিখণ্ডিত, বাংলার একটি অংশ আজ স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু ভাষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছি। তাই লোকসংস্কৃতির আলোচনা কখনই খণ্ডিত বাংলাকে নিয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এই পূর্ববাংলার একজন প্রথিতযশা লোকসংস্কৃতিবিদ মযহারুল ইসলাম। (১৯২৮)[২৭২] লোকসংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ বিচরণ ঘটেছে। 'ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন' গ্রন্থে[২৭৩] মযহারুল ইসলাম তুলনা-মূলক, নৃতত্ত্বমূলক মনোসমীক্ষণগত, নান্দনিক, রূপতত্ত্ব বা আঙ্গিক সংস্থানগত মতবাদের প্রয়োগে যত্নশীল হবার পরামর্শ দিয়েছেন, 'ফোকলোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি' গ্রন্থে নোয়াম চমস্কি ও লেভিস্ট্রসের মতাদর্শের অনুসরণে বিশ্লেষণ করেছেন বাংলা লোকসাহিত্যকে, সমাজ পরিবর্তনের অভিক্ষেপ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে লোককথায় তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন'Social Change and Folklore'[২৭৪] গ্রন্থে, ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা নিয়ে লোককথার ধারাবাহিক চর্চার বিবরণ দিয়েছেন;'A History of Folktales Collection in India Bangladesh and Pakistan 'গ্রন্থে।[২৭৫]

এছাড়া অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত বিবিধ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে গবেষক মযহারুল ইসলাম প্রেরণা যুগিয়েছেন উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু গবেষককুলকে।

অপর উৎসাহী গবেষক আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭—)[২৭৬] ঢাকা বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী[২৭৭] গ্রন্থটির লোকগল্পগুলির সংকলক ও সম্পাদক তিনি। ভূমিকায় কাহিনীগুলির কথক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

স্বপ্ন দেখা মানুষের চিরদিনের স্বভাব। বাস্তব চিরদিনই বেদনাময়। তাই এই রূপকথাগুলির মধ্য দিয়ে মানুষ চিরদিন অবসর খুঁজে পায় এই জন্যই গল্পগুলি অগ্রসর হয়ে চলে যুগ থেকে যুগে—কাল থেকে কালান্তরে —মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে অনায়াসে।[২৭৮]

এছাড়াও ক্ষয়িষ্ণু অবক্ষয়ী সমাজের কাছে আদর্শমূল্যবোধ সরবরাহ করেছে এই লোককথাগুলি—

—'বর্তমান যুগেও রূপকথা ও লোককথার চর্চা করার মনস্তত্ত্বগত প্রয়োজনীয়তা আছে এই অর্থে যে— যে পৃথিবীতে সতত প্রবঞ্চনা ও অবিশ্বাস, ধর্মহীনতা ও শঠতা

সেখান থেকে ক্ষণিকের জন্য হলেও এই রূপকথার রাজ্যে অবস্থান করে কিছু আশা, কিছু আত্মবিশ্বাস, কিছু ধর্ম-বিশ্বাস নিয়েও যদি ধূলি-ধূসরিত সংসার পথে আবার যাত্রা করার প্রেরণা পাই তার তো মূল্য কম নয়।'[২৭৯]

লোকসংস্কৃতির প্রতিটি কক্ষে তাঁর গতাগতি ছিল অবাধ-- বহুখ্যাত 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের খণ্ড দুটি তার প্রমাণ বহন করে।

কথকের ব্যক্তিগত মেজাজ ও রুচির উপর লোককথার বিবৃতি নির্ভরশীল। এই সত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন আশরাফ সিদ্দিকী। সেই কারণে তাঁর সংগৃহীত কাহিনীগুলির প্রতিটির কথকের বিস্তৃত পরিচয় দান করেছেন তিনি।[২৮০]

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে[২৮১] গীতিকা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। গীতিকার চমৎকারিত্ব ঐতিহাসিকতা এবং বাংলা গীতিকা সম্পর্কে বিদেশী মনীষীদের মতামত উল্লেখ করেছেন। গীতিকা সম্পর্কে লেখকের একটি মন্তব্য উল্লেখের দাবী রাখে—

'প্রাচীন সংস্কৃতকাব্য সাহিত্যকে যদি বলা যায় সাহিত্যের aristocracy তবে যাত্রা ও পালাগানকে বলতে হয় সাহিত্যের feudalism এবং গানগুলো একেবারেই সাহিত্যের democracy.'[২৮২]

এইভাবে একনিষ্ঠ গবেষকদের মননসমৃদ্ধ আলোচনার সূত্র ধরে অধুনা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি চর্চা এগিয়ে চলেছে।

পূর্ব বাংলার লোকসংস্কৃতিচর্চা প্রসঙ্গে দুলাল চৌধুরী মন্তব্য করছেন--

'১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক নতুন উদ্দীপনা, স্বাজাত্যবোধ এক কথায় পূর্ব-বাঙলার নবজাগরণ ঘটে, বাংলা ভাষা জাতীয় ভাষার গৌরব অর্জন করে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার বাঙলা একাডেমী বাংলাভাষা-সাহিত্য সংগ্রহ চর্চা প্রকাশনার সঙ্গে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও আলোচনার প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়েছিল। তখন থেকেই আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান আপন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।'[২৮৩]

এটি অবশ্যস্বীকার্য যে লোকসমাজের মন কখনও রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজনকে স্বীকার করে না। সেই কারণে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রও বিস্তারিত হয়েছে উভয় বাংলার মধ্যেই। এই অখণ্ড বাংলার লোকসংস্কৃতির সম্পদ বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। অবশ্য বাংলা লোক সংস্কৃতির প্রতিটি শাখার সংকলন অজস্র। তুলনামূলকভাবে ক্ষীণ বিশ্লেষণের অধিপত্য। অবশ্য সৌভাগ্যের বিষয় বাংলার লোকবিদ্‌গণ, উৎসাহী গবেষকগণ স্বাজাত্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু উগ্রজাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণতা তাদের দৃষ্টি ও মননকে আচ্ছন্ন করেনি। লোকবিদের সতর্কবাণী মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে—

'..........folklife studies can do much to foster a proper pride in national heritage but we must guard against any tendency to become nar-

rowly nationalistic in our outlook.'[২৮৪]

বাংলার লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ জাতীয়তাবোধের উদার ঐতিহ্যদ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সুস্থ জাতীয়তাবাদী পদ্ধতিও সেই আদর্শ দ্বারাই পরিচালিত। নিজ দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর এই পদ্ধতি আলোকপাত করে কিন্তু সেই সঙ্গে অপর দেশের সংস্কৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা বজায় থাকে। সেই আদর্শকে সামনে রেখেই বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়গুলির পটভূমিতে বাংলা লোককথার আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। Tung Tse Mao, Talks at the Yenan Forum, On Literature and Art, Peking, 1965, P.5

২। Clarke Kenneth and Mary, Introducing Folklore U.S.A. 1965, P.123

৩। Dorson, R.M. The question of Folklore in a Nation, Journal of The Folklore Institute. Vol.3, 1966, P.276

৪। Webster's Seventh (Ed) New Collegiate Dictionary, Scientific Book Agency. Indian Edition, Second Reprint April 1971, P. 563

৫। Cocchiara Guseppe, The History of Folklore in Europe, Institute for the Study of Human Issues, 1981, P. 167

৬। চট্টোপাধ্যায় তুষার, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, পঞ্চম অধ্যায়, লোকসংস্কৃতিচর্চা : প্রয়োজন পরিবর্তন ভবিষ্যৎ, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলা ১৪০১, পৃ. ২৪০

৭। Dorson R. M. Current Folklore Theoris, Current Anthropology, U.S.A. Vol. 4, N.O.I. 1963, P. 96

৮। Buchochiv Octavian, Folklore and Ethnography, in Russia, Current Anthropology, USA, Voll.I, No.3 Hune, 1966, P. 295.

৯। Leach Maria, (Ed) Standard Distinary of Folklore Mythology and Legend, Vol. I. New York, 1949, P.380

১০। ঐ

১১। ঐ

১২। ঐ P. 381

১৩। ঐ

১৪। ঐ

১৫। Hautala Jouka, Finnish Folklore Research, 1828-1981, Finnish Literary Society of Sciences, Helsinki, 1969, P. 26

১৬। Leach Maria ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক), P. 382.

১৭। ঐ P. 381

১৮। ঐ

১৯। পোদ্দার সুস্মিতা, বহির্বিশ্বে লোকসংস্কৃতিচর্চা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১২ই মার্চ, ১৯৯৮, পৃ.৩৬
২০। Leach Maria ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) P. 38.
২১। ঐ
২২। ঐ
২৩। ঐ P. 383
২৪। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ.৩৮
২৫। Leach Maria ed পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) P. 380
২৬। সিদ্দিকী আশরাফ, লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, ঢাকা মল্লিকবাজার, পরিমার্জিত সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৪, পৃ.৩৮
২৭। Thompson Stith, The Folktale, California Press, Reprint, 1977, P, 399
২৮। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৬ সংখ্যক) পৃ. ৩৮
২৯। Dorson R. M. Folklore Research Around the World, Indian University Press, Bloomington U.S.A. 1961, P. 8.
৩০। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ. ১৭
৩১। Leach Maria, ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) P.448
৩২। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ. ১৮
৩৩। Leach Maria ed পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) P. 446
৩৪। Dorson R. M. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) P. 9
৩৫। Cocchiara Guseppe পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) P. 219
৩৬। Dorson R. M. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) P. 9
৩৭। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৭ সংখ্যক) P. 370
৩৮। ঐ
৩৯। ঐ P. 371.
৪০। ঐ P.371.
৪১। ঐ P. 372
৪২। ইসলাম মযহারুল, ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ পৃ. ১৫১
৪৩। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৭ সংখ্যক) পৃ. ৪৪৬
৪৪। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ. ৪৭
৪৫। Morse Ronald A. Folklore Studies Kodansha Encyclopaedia, 1990, P. 179
৪৬। ঐ P. 183
৪৭। ঐ P. 296
৪৮। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ.৪৯
৪৯। Dorson R. M. Studies in Japanese folklore, Indiana University Press, Bloomington 1963 P.1
৫০। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ. ৪৯
৫১। ঐ পৃ. ৫৫
৫২। Dorson R. M.পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) P. 117
৫৩। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ. ৫৬
৫৪। ঐ

৫৫। ঐ পৃ. ৬১
৫৬। ঐ
৫৭। Dorson R. M. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৯ সংখ্যক) P. 53
৫৮। Dorson R. M. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) P. 125
৫৯। পোদ্দার সুস্মিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯ সংখ্যক) পৃ. ৩৮
৬০। Flanagan John. T. and Arthur Palmer Hudson, Folklore in American Literature University Pennsylvania Press. 1958 P. XII
৬১। Leach Maria ed,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) P. 44
৬২। ঐ
৬৩। ঐ
৬৪। ঐ
৬৫। ইসলাম মযহারুল পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক) পৃ. ১৫৭
৬৬। Leach Maria পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) P. 45
৬৭। Dorson R. M. American Folklore, U.S.A. 1962. P. 4
৬৮। Leach Maria, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) P 403
৬৯। ঐ P. 44
৭০। ঐ P. 45
৭১। Encyclopaedia American U.S.A. 1983 Vol III. P. 503
৭২। Dorson R. M. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখাক) পৃ. ৪০
৭৩। ঐ পৃ. ৪৩
৭৪। ঐ পৃ. ৪২
৭৫। ঐ পৃ ৪৪
৭৬। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৬ সংখ্যক) পৃ. ৪০
৭৭। ইসলাম মযহারুল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক) পৃ. ১৫২
৭৮। Gorky Maxim, On Literature, Moscow No date P. 243
৭৯। ইসলাম মযহারুল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক) পৃ. ১৫৩
৮০। Sokolov; Y. M. Russian Folklore, U.S.A. 1950, P. 405
৮১। চক্রবর্তী পবিত্র, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬ পৃ. ২-৬
৮২। ঐ পৃ ৭
৮৩। Islam Mazharul. A History of Folktale Collection in India. Bangladesh and Pakistan, Panchali Prakasan, Second, Enlarged edition. No date. P. 131
৮৪। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৬ সংখ্যক) পৃ. ১১০
৮৫। চক্রবর্তী পবিত্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮১ সংখ্যক) পৃ. ৮
৮৬। Zulmar M. Samued How much rich the harvest New York. 1948. P. 10
৮৭। মজুমদার দিব্যজ্যোতি, আভাষে ইঙ্গিতে নয় সত্য কথা স্পষ্ট করে বলা চাই, আনন্দবাজার পত্রিকা, পুস্তক পরিচয় বিভাগ, ১৩ই এপ্রিল ১৯৮৭
৮৮। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, বাংলা, লোকসংস্কৃতি চর্চার আদিযুগ, মায়া পাব্লিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯ পৃ. ১

৮৯। ঐ পৃ. ২
৯০। Islam Mazharul, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮২ সংখ্যক) P. 23
৯১। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ. ৩
৯২। ঐ পৃ. ৫
৯৩। ঐ
৯৪। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ৪বর্ষ ১ সংখ্যা, কার্ত্তিক পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ১৯৮
৯৫। Carrey W. ইতিহাসমালা, আখ্যাপত্র দ্রষ্টব্য।
৯৬। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ. ২২
৯৮। De. S.K. Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857), Cal cutta 1962,P.125
৯৯। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ.২৪-২৫
১০০। ঐ
১০১। Siddiqui Ashraf, Bangla Academy Journal of Folklore Collections and Studies (1800-1947) Vol XIII Bangla Academy Dacca-Bangladesh P.35
১০২। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ.২৪-২৫
১০৩। ঐ পৃ. ২৮
১০৪। ঐ পৃ. ৩৭
১০৫। চক্রবর্তী বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৯ পৃ. ১৪৭
১০৭। ঐ
১০৮। দে সুশীল কুমার, বাংলার প্রবাদ, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৯ পৃ. ৮৩৯
১০৯। বসু প্রসূন সম্পাদনা, প্রবাদমালা ১ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন ১৯৮০, আখ্যাপত্র দ্রষ্টব্য।
১১০। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮১ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১১১। চক্রবর্তী বরুণকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৫ সংখ্যক) পৃ. ২৪-২৫
১১২। Saha Mahadev Prasad Ed. Oriental Proverbs in their relation to folklore, History, Sociology with suggestions etc. Jatiya Sahitya Parisad, Calcutta 1956, Biographical Sketch.
১১৩। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ.৬৭
১১৪। ঐ,
১১৫। Dalton Edward Tutic, Descriptive Ethnology of Bengal, Indian Studies, Past and Present 1960, Reprint, Preface.
১১৬। ঐ
১১৭। ঐ P. 259
১১৮। ঐ P. 265
১১৯। Islam Mazharul, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৩ সংখ্যক) পৃ. ৪৪
১২০। Archer W.G.Dove and Leopard, More Oraon Poetry, London, 1948, P.3
১২১। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ. ৯৭

১২২। Islam Mazharul, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৩ সংখ্যক) পৃ. ৪৪
১২৩। ঐ
১২৪। Siddiqui Ashraf, Bengali Falklore, Collections and Studies, 1800-1947 Bengala Academy Journal Vol.VII Number XIII 1979-1980, P51
১২৫। চক্রবর্তী পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৯সংখ্যক) পৃ. ৩৭৬
১২৬। Dey Rev.Lal Behari, Folk Tales of Bengal Uccharan, 1993, Perface
১২৭। ঐ
১২৮। ঐ,
১২৯। মজুমদার লীলা, বাংলার উপকথা, মনোমোহন প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৌষ ১৩৮৪, অনুবাদকের নিবেদন দ্রষ্টব্য।
১৩০। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ.৮০
১৩১। ঐ
১৩২। ঐ, পৃ. ১০৮
১৩৩। ঐ
১৩৪। Risley Herbert Hope, Tribes and Castes of Bengal, Frima Mukhopaddhyay, reprint, 1981, Preface
১৩৫। Islam Mazharul, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৩ সংখ্যক) পৃ. ৬৭
১৩৬। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ. ১১৮
১৩৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড আলোচনা ক্যালকাটা বুক হাউস, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, পৃ. ১২৫
১৩৮। চক্রবর্তী তিমিরবরণ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ. ১২৫
১৩৯। Siddiqui Ashraf, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৪ সংখ্যক) পৃ. ৫৬
১৪০। ঐ
১৪১। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) পৃ. ১২০
১৪২। Siddiqui Ashraf, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৪ সংখ্যক) পৃ. ৭৭
১৪৩। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৯সংখ্যক) পৃ. ১৩৫
১৪৪। চক্রবর্তী তিমিরবরণ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক)
১৪৫। Islam Mazharul, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৩ সংখ্যক) পৃ. ২৬
১৪৬। চক্রবর্তী পবিত্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮১ সংখ্যক) পৃ. ৩০-৩১
১৪৭। ঐ, পৃ. ৩০
১৪৮। আনন্দ মূলক রাজ, রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, ক্রান্তি, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ,১৩৬১, পৃ.১৬৩
১৪৯। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০১, পৃ; ২১-৩০
১৫০। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৩৯৯ পৃ. ৪৯
১৫১। ঐ পৃ. ২৪
১৫২। ঐ পৃ. ৫০
১৫৩। ঐ পৃ. ৪৬
১৫৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সলিলকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পৃ.৩২৫
১৫৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫০ সংখ্যক) পৃ. ৫০
১৫৬। ঐ পৃ. ৪৯
১৫৭। ঐ পৃ. ৪৮

১৫৮। ঐ পৃ.
১৫৯। ঐ পৃ. ৮৭-১২০
১৬০। ঐ পৃ. ৯০
১৬১। Leach Maria ed. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯ সংখ্যক) পৃ. ৪০৬
১৬২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫০ সংখ্যক) পৃ.৯২
১৬৩। চট্টোপাধ্যায় তুষার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক) পৃ. ২৬১
১৬৪। ঐ
১৬৫। Clarke Kenneth and Mary ed. A Folklore Reader, New York, 1965, P. 101-102
১৬৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫০ সংখ্যক) পৃ. ৯০
১৬৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, বৈশাখ আষাঢ়, ১৪০২ পৃ. ১
১৬৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সলিলকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫৫ সংখ্যক) পৃ. ৩২৫
১৬৯। ঐ পৃ. ৩৪৪
১৭০। ঐ পৃ. ৩৪৪
১৭১। ঐ পৃ. ৩৪৬
১৭২। ঐ পৃ. ৩৪৭
১৭৩। ঐ পৃ.
১৭৪। ঐ পৃ. ৩৪৮
১৭৫। ঐ পৃ. ৩৪৯
১৭৬। Kripalani K.R. (Ed.) Visva Bharati Quarterly Vo. 1 part 1 May 1935, P.111-112
১৭৭। বন্দ্যোপাধ্যায় সলিলকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫৫ সংখ্যক) পৃ. ২২৯
১৭৮। Tagore Rabindranath, An Indian Folk Religion, Macmillan India Limited Reprint, 1988, P. 67, P. 90
১৭৯। ঐ পৃ. ৮০-৮১
১৮০। বন্দ্যোপাধ্যায় সলিলকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫৪ সংখ্যক) পৃ. ১৬৪
১৮১। ঐ পৃ. ১৮৪
১৮২। ঐ পৃ. ৩৫০- পৃ.৩৫২
১৮৩। ঐ পৃ. ৩৫২
১৮৪। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, বাঙলা লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যযুগ, সাহিত্যপ্রকাশ প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৮৩-৮৬
১৮৫। চক্রবর্তী বরুণকুমার, মজুমদার দিব্যজ্যোতি সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১০৫-১০৮
১৮৬। ঐ
১৮৭। চক্রবর্তী তিমিরবরণ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ৮৩-৮৬
১৮৮। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, ছড়া পর্যালোচনা, শতবার্ষিকী সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০০ পৃ. ২৫০-২৫৯
১৮৯। ঐ
১৯০। চক্রবর্তী তিমিরবরণ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ৯৩

১৯১। ঐ
১৯২। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৪০২, পৃ. ৮৯
১৯৩। ঐ পৃ. ৭১
১৯৪। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, ভারতী, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ.৪-১৫
১৯৫। ঐ পৃ. ৬
১৯৬। ঐ পৃ. ১২
১৯৭। ঐ পৃ. ১১
১৯৮। ভৌমিক নির্মলেন্দু, লোকশিল্প ও সাহিত্য : অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রভারতী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ২৩
১৯৯। ঐ পৃ. ৩০
২০০। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৪ সংখ্যক) পৃ. ১০০
২০১। ঐ
২০২। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, ভূত-পেত্নী মডার্ন বুক এজেন্সী, পঞ্চদশ সংস্করণ প্রকাশ কাল অনুল্লিখিত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২০৩। সেন সুকুমার, গল্পের গাঁটছড়া, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৯২, পৃ. ১০০
২০৪। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ৮৭
২০৫। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, টুনটুনির বই, ভূমিকা, পাত্র'জ পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৩০৫
২০৬। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ৮৯
২০৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরমার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সুলভ সংস্করণ, ১৩৯৩, মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য
২০৮। ঐ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য
২০৯। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ৮৯
২১০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরদাদার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ, ষোড়শ সংস্করণ ১৩৯৩, পৃ. ১২
২১১। ঐ পৃ. ১৬
২১২। Sen Dinesh Chandra, Folk Litereture of Bengal, Calcutta, University 1920, P. 195
২১৩। চক্রবর্তী তিমিরবরণ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ১২৬
২১৪। ঐ
২১৫। সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম ভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৭৮-৭৯
২১৬। ঐ পৃ. ৮১-৮৩
২১৭। Sen Dinesh Chandra, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১৪ সংখ্যক) পৃ. ১৯৫
২১৮। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ.১২৬
২১৯। Sen Dinesh Chandra,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১৪ সংখ্যক) P. 57-73
২২০। ঐ পৃ. ৩৫
২২১। ঐ পৃ. ৩৩৯
২২২। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১৭ সংখ্যক) পৃ. ৫৭-৭৩
২২৩। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ১৩১
২২৪। ঐ
২২৫। ঐ পৃ. ১০৩-১০৬

২২৬। ঐ
২২৭। ঐ
২২৮। ঐ
২২৯। মিত্র সনৎকুমার, রবীন্দ্রনাথের লোক সাহিত্য, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৭৮, পৃ. ৩৭
২৩০। চক্রবর্তী বরুণকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৯ সংখ্যক) পৃ. ৩২২-৩২৩
২৩১। হারামণি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, ১৯৪২, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, পৃ
২৩২। চক্রবর্তী বরুণকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৫ সংখ্যক) পৃ. ২৪৯
২৩৩। ঐ
২৩৪। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ১৪৩
২৩৫। ঐ
২৩৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬ পৃ.১৩
২৩৭। চক্রবর্তী তিমিরবরণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮৪ সংখ্যক) পৃ. ১৪৩
২৩৮। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা , বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৫, পৃ.১৪
২৩৯। ঐ পৃ. ২৩৮
২৪০। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৮ সংখ্যক) পৃ.২৩৯
২৪১। ঘোষ বিনয়, বাংলা লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, সিগনেট বুকশপ, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮৬
২৪২। ঐ পৃ. ৭৪
২৪৩। ঐ পৃ. ১৪৩
২৪৪। ঐ পৃ ৫৭-৫৮
২৪৫। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৪০ সংখ্যক) পৃ. ৩০
২৪৬। ঐ পৃ. ৭
২৪৭। রায় অরুণকুমার, লোকায়নচর্চার ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ১৩১
২৪৮। ঐ
২৪৯। ঐ পৃ. ৯৯
২৫০। ঐ পৃ. ১৬
২৫১। ঐ পৃ. ২১
২৫২। ঐ পৃ.
২৫৩। ঐ পৃ. ২২
২৫৪। ঐ পৃ. ৫
২৫৫। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৪০ সংখ্যক) পৃ. ৬
২৫৬। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৭৬, পৃ. ৫৩৭
২৫৭। চক্রবর্তী বরুণকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৫ সংখ্যক) পৃ. ৪০-৪৪
২৫৮। ঐ
২৫৯। ঐ
২৬০। ঐ
২৬১। ঐ
২৬২। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ঃ আনন্দ, ডিসেম্বর ১৯৯৩
২৬৩। ঐ

২৬৪। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ১৯৯৩
২৬৫। ঐ পৃ. ১৫
২৬৬। ঐ
২৬৭। ঐ
২৬৮। সেন সুকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২০৫ সংখ্যক) পৃ. ১০০
২৬৯। ঐ পৃ. ৭৭ — পৃ. ১১৪
২৭০। ঐ
২৭১। সেন সুকুমার, 'গল্পের ভূত' আনন্দ পাবলিশার্স দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ১৯৯৯
২৭২। বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭-৯৮, পৃ. ১২২
২৭৩। ইসলাম মযহারুল , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক) পৃ. ১৫১
২৭৪। Islam Mazharul, Social Change and Folklore, Rabindra Bharati University First Published in 1985
২৭৫। Islam Mazharul, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৫ সংখ্যক) পৃ. ৬১১
২৭৬। বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৭২ সংখ্যক) পৃ.৪০
২৭৭। চক্রবর্তী বরুণকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৫ সংখ্যক) পৃ. ৬১১
২৭৮। সিদ্দিকী আশরাফ, কিশোর গঞ্জের লোককাহিনী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন ১৯৯৫ পৃ. ২২
২৭৯। ঐ পৃ. ২৩
২৮০। ঐ পৃ. ৩-৮
২৮১। সিদ্দিকী আশরাফ, লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খণ্ড, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, জুলাই ১৯৯৫
২৮২। ঐ পৃ. ৪৪
২৮৩। চৌধুরী দুলাল, সম্পাদিত, পূর্ববাংলার লোকসংস্কৃতি, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সম্প্রীতি সমিতি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১, প্রসঙ্গ কথা দ্রষ্টব্য।
২৮৪। Buchanan Boueld, H, Geography and Folklife. Vol 1, Wales, 1963, P. 9

তৃতীয় অধ্যায়

লোককথায় সমাজজীবনের উপাদান

সামাজিক বাস্তবতাই সাহিত্য ইমারতের ভিত। তাই সামাজিক কর্ম ও চিন্তাধারার নানা ঘাত প্রতিঘাত সাহিত্যে প্রতিফলিত। লোকসংস্কৃতির গবেষক বলেন— "Folklore can play in the building up of the general history of a nation."[১]

অর্থাৎ, জাতির ইতিহাস গঠনে লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতরাং সংহত সমাজমানস যেখানে সজীব সক্রিয়, সেখানেই লোকসাহিত্য তথা লোককথার উৎস।

বাংলা লোককথার লঘু-তরল কল্পনা বিলাস, দৈবিক, আধিভৌতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও রোমান্সের বর্ণাঢ্যতার আশেপাশে উঁকি দেয় বাংলারই সমাজমানস। অতীত উপাদানের সঙ্গে চলমান পারিপার্শ্বিক গ্রথিত হয়। তাই, লোকবিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেন—

'Currency and traditions constitute the acid test of folktale materials.'[২]

সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণীবৈচিত্র্য ও পরিবারগঠন

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্যপূর্ব এবং অনার্য সংস্কার ও সংস্কৃতি সমন্বিত আর সমীকৃত হয়ে গতিদান করেছে বাংলার সমাজকে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে বিবৃতি দিয়েছেন—

"বাঙালীর সভ্যতা আর্যপূর্ব ও আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। ...

... লিপি প্রমাণ হইতে মনে হয় গুপ্ত আমলে আর্যব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস ধর্ম ও সংস্কার সংস্কৃতি এদেশে সম্যক স্বীকৃতই হয় নাই। সেন-বর্মন আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্ণসমাজের উচ্চস্তরে আর্যপূর্ব লোকসংস্কৃতির পরাভব প্রায় সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙালী সমাজের অন্তঃপুরে, দৈনন্দিন জীবনে ধর্মে, লোকাচারে ব্যবহারিক আদর্শে আজও সেখানে আর্যপূর্ব সমাজের বিচিত্র স্মৃতি ও অভ্যাস সুস্পষ্ট।"[৩]

লোককথার সমাজগঠনেও সেই সংমিশ্রিত রূপটিই ফুটে উঠেছে। সামাজিক স্তর বিন্যাসের রীতিটি কোন নির্দিষ্ট পথ ধরেনি। প্রধানত বৃত্তি ও বিত্তের মানদণ্ডেই শ্রেণীবিভাগ ঘটেছে। প্রচুর ভূমির অধিকারীরূপে, উৎপাদিত সম্পত্তির সিংহভাগের মালিক রূপে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে রাজার অধিষ্ঠান—

'রাজার মস্ত বড় রাজ্য, প্রকাণ্ড রাজবাড়ি। হাতীশালে হাতী ঘোড়াশালে ঘোড়া। ভাণ্ডারে মাণিক কুঠরি ভরা মোহর, সব ছিল।'[৪]

—ঐশ্বর্যের এই সমারোহই রাজার শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা। সম্পদের তৌলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও আদায় করেছে উচ্চমান। "কাঞ্চনমালা"[৫] গল্পে রাজকন্যা কাঞ্চনের যোগ্য স্বামী হিসেবে সওদাগর পুত্র রূপলালকেই নির্বাচন করা হয়েছে। 'শঙ্খমালা' গল্পে ধনগর্বজনিত

সূক্ষ্ম রেষারেষি প্রকট। পুত্রকে কর্মোদ্যোগী করার জন্য শঙ্খমণির মা বলেছে—"রাজার ঘরনা রাজা টুটায়। সওদাগরের কি?"[৬]

রাজা, সওদাগরের পরবর্তী স্তরে আছে মন্ত্রী সেনাপতি কোটাল প্রমুখ রাজকর্মচারীগণ, এরাই রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়ক ও পরিচালক। ক্ষেত্র বিশেষে রাজা অপেক্ষাও অধিক প্রতাপশালী। 'মালঞ্চমালা' গল্পে রাজা প্রদত্ত শাল মুড়ি দিয়ে কোটাল হাঁক পেড়েছে।—

হেই হেই পড়শি ফল পাড়িলাম আমি।
তাই আজ কন্যার আমার রাজপুত্রস্বামী।
রাজার বেহাই হতে চললাম, নজর খাজনা দে।[৭]

রাজতুল্য মর্যাদালাভের জন্য এই প্রচেষ্টা একদিকে যেমন কোটালের উচ্চাশাকে প্রকট করেছে, তেমনি রাজানুগৃহীত কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারের অস্বস্তিকর চিত্রটিকেও ফুটিয়ে তুলেছে।

সাধারণ গৃহস্থ সম্প্রদায়, পুরোহিত, সম্পন্ন কৃষক দোকানদার অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শ্রেণী উচ্চ ক্ষমতার স্বাদ না পেলেও উপভোগ করেছে স্বাধীনতা। লোককথায় এরা সচ্ছলতা ও কায়ক্লেশে দিনযাপনের গ্লানি— উভয় অভিজ্ঞতারই সম্মুখীন হয়েছে। বলা যায়, এরাই মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

সমাজের নিম্নপ্রান্তে শ্রমজীবীদের অবস্থান। জেলে, মালী ঝাড়ুদার, কামার, কুমোর এইসব বিচিত্র বৃত্তিধারী সম্প্রদায়, যারা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর উৎপাদনে অংশ নেয়।

সমাজসদস্যের শ্রেণীভেদ প্রাথমিক পর্যায়ে বৃত্তি নির্ভর, জাতিগত নয়। স্মরণ করি কুমোর জাতির উৎপত্তি বিষয়ক পুরাকথাটি। শিবের বিবাহ উপলক্ষে প্রয়োজন হলো মৃৎপাত্রের। পাত্র তৈরীর কৌশল সকলের অজ্ঞাত। স্বয়ং শিব তখন গলার মালা থেকে একটি পুঁতি নিয়ে সেটি থেকে তৈরি করলেন কুমোরকে—

'The God Siva therefore took a bead from his necklace and with it created a potter while with a second he made a woman who became potter's wife. This man was the father of all those who work in pottery.'[৮]

এই কাহিনী কুম্ভকারের গৌরবই বৃদ্ধি করেছে, জাতিগত হীনম্মন্যতা প্রকট করেনি। তাই, এটাও বলতে পারি, মালঞ্চমালা গল্পে যে 'ঢাকী শহর'[৯] ঢুলী শহর[১০] এর প্রসঙ্গ এসেছে কিংবা 'কাঞ্চনমালা' গল্পে কুমোর পাড়ার ঘাট অথবা ধোপাবাড়ির ঘাট[১১] এর উল্লেখ পাওয়া গেছে, তা সম্ভবত জীবিকার সুবিধার্থেই পৃথকীকৃত হয়েছে, জাতি বৈষম্যের কারণে নয়।

বিশেষ কর্ম সম্পাদনের জন্যই এক বিশেষ গোষ্ঠীর আবির্ভাব এই তথ্যের প্রমাণ তুলে ধরেছে নাপিত সম্প্রদায়ের জন্মবৃত্তান্ত।[১২] পত্নী দুর্গাকে স্বয়ং আপন ক্ষৌরীকরণ থেকে নিবৃত্ত করার জন্যই যে পরিচারক সৃষ্টি করলেন মহাদেব, সেই পরিচারকই ক্ষৌরকার বংশের আদিপুরুষ। এইভাবে জন্মলগ্ন থেকেই নির্দিষ্ট বিশেষ বৃত্তিই জাতির পৃথক শ্রেণীকরণের

জন্য দায়ী হয়েছে। লোককথায় অবশ্য আপন বৃত্তিসীমা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও দেখা গেছে, মনীষী কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত একটি গল্পেই দেখি —

"The Brahman had a young servant who was a barber by caste but not by profession."[১৩]

অবশ্য এটা স্বীকার করতেই হবে ঐশ্বর্যের নিক্তিতে সামাজিক মর্যাদা ও স্তরভেদের পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার। 'সম্পদের বার ভাই বিপদের কেহই নাই'[১৪]— ব্রতকথায় উচ্চারিত এই দীর্ঘশ্বাস নিদারুণভাবে সত্য হয়ে উঠেছে।

'The Match Making Jackal'[১৫] গল্পে তাঁতী যখন হত দরিদ্র অবস্থা থেকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে তখনই রাজকন্যার পিতা মাতা তাকে জামাতার স্বীকৃতি দিয়েছে—

The king and queen arrived in state and were infinitely delighted at the apparently boundless riches of their Son-in-law.[১৬]

সম্পদের আধিক্যই উন্নাসিক আভিজাত্যের স্মারক। সম্পদ ঘাটতি বংশ পরম্পরায় ডেকে আনে হীনম্মন্যতাবোধ, যা সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচের বিভাজন রেখাটি এঁকে দেয়। ফলে তাঁতী, জেলে, ঝাড়ুদার, কাঠুরিয়া স্থায়ী ভাবেই অন্ত্যজ গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়ে—

"চেতন পাইয়া রাজা কবাট ঘুচাইতেই দেখেন ঝাড়ুদার খোলার মালী—রামঃ।"[১৭]

এইভাবেই জাতিগত বিভেদ পৌঁছে গেছে অস্পৃশ্যতার পর্যায়ে, যেখানে কায়িক শ্রমজীবীদের একাংশ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার পাত্র। ইতিহাসের সমর্থন উল্লেখ করি—

'পঞ্চম শতকের পর হইতেই এই ভেদ বিন্যাস ক্রমশ বিস্তৃত হইতেই আরম্ভ করে এবং সেন-বর্মন পর্বে তাহা দৃঢ় ও অনমনীয় হইয়া সমগ্র সমাজকে স্তরে উপস্তরে বিভক্ত করিয়া সমগ্র সমাজ বিন্যাস গড়িয়া তোলে।... বহুদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি আর্যমানসের একটা উন্নাসিক ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব ছিল। জাত-ভেদ, বর্ণভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তাহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।'[১৮]

ইতিহাস অবশ্য এ তথ্যটিও ঘোষণা করেছে—"বাংলার আদিম কৌমমানবসমাজও বহুদিন পর্যন্ত আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি খুব সশ্রদ্ধ ছিল না বরং সক্রিয় বিরোধিতাও করিয়াছে।"[১৯]

এই বিরোধিতার প্রমাণ পাই ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি প্রদর্শিত মনোভাবে। The story of the Rakshasas, The Ghost Brahman,[২০] The story of a Brahmadaitya[২১] ইত্যাদি অসংখ্য লোককথা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সেই প্রভাবহীন নিস্তেজ জীবনের দলিল—

Brahmans and beggars were going from different parts with the expectation of receiving rich presents.[২২]

দারিদ্র্যের কশাঘাত দুঃস্থ শীর্ণকায় ব্রাহ্মণের শরীর থেকে জাতি গৌরবের অবশেষটুকু বিলুপ্ত করেছে, ভিক্ষুকের সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছে তার নাম। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের

মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

The Brahmin is not an important figure in folktales. In the Pauranic tales his blessing or curses bring about their inevitable result of good fortunes or calameties to the characters concerned; ... but here nothing of the sort in met with ... the Brahmin who appears very seldom as an astrologer ...the astrologers of the folktales are those scythian Brahman. Those scythian Brahmeins held high position during the ascendancy of the Buddhists in this land."[২৩]

কুলীন বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে সম্মান পাননি লোককথায়, তা পুরোমাত্রায় আদায় করেছেন জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ। 'মালঞ্চমালা' গল্পেই প্রভাদৃপ্ত ব্রাহ্মণের উপস্থিতি—

ব্রাহ্মণের শরীরে জ্যোতি, রাজ্যের সকল লোক ছুটিয়া আসে, —'সোনার অঙ্গে জ্যোতি জ্বলে, ওগো ঠাকুর। কে আপনি। যে হন সে হন, আঁতুড়ে রাজপুত্র মরে, তার কপালের লেখা আপনি খণ্ডাইয়া দিয়া যান।[২৪]

কান্তিমান ও ক্ষমতাবান পুরুষের এই প্রতিপত্তি পৌরাণিক যুগে ক্ষীণ, গণক অবজ্ঞার পাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই সমাদৃত।—

... reference is made to the Brahmans who were degarded as ganakas for their neglegence to the Vedic Dharma as evidence by their constant study of astrology and astronomy and acceptance of fees for their Calculations.[২৫]

গণকের প্রতি এই অবজ্ঞার রেশ রয়ে গেছে ঠাকুরমার ঝুলিতে, ব্যঙ্গ করা হয়েছে গণকবৃত্তিকেও —

কান নড়বড় বুড়ো বামুন ... মাথার চুলে তেল নাই ..
টিকি নড়ে মন্ত্র পড়ে ভঙ্গী চবঙ্গী কত।
এ পুঁথি ও পুঁথি খোলে পুঁথি শতশত।[২৬]

বর্ণবিভাগের প্রাথমিক পর্যায়ে, ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী জোরদার নয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এর পক্ষে বলেছেন —

The mutual relations between the different castes in ancient days cannot be precisely defined but they had not developed into the strictly rigid system such as prevailed in the nineteenth century A.D. The Brahmans were more closely releted to their non-Brahman neighbours. The marriage of a Brahman male and Sudra female was not always even condemned and the issue of the marriage did not occupy a low status"[২৭]

এই তথ্যের সত্যতা পাই ব্রতকথায় ব্রাহ্মণী ও গোয়ালিনীর বন্ধুত্বে।[২৮] গোয়ালিনীর প্ররোচনায় অব্রাহ্মণের ব্রত ব্রাহ্মণ সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে। শূদ্রাণীকে বিবাহ করার উদাহরণও পাই লোককথায়— কোচবিহারের দায়ো বায়োর ব্রতকথাটিতে।[২৯]

নিয়ম ও আচারের চক্রব্যূহ ক্রমশ জটিল হয়েছে। ঐতিহাসিক বলেন—

"ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ প্রভাব ও ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদের কড়াকড়ি ভারতে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সেনগোষ্ঠী নব ব্রাহ্মণ সমাজকে পূজা করিয়া লইলেন। ক্ষত্রিয় শক্তি ও বৈশ্যপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নব ব্রাহ্মণ তাহার অপ্রতিহত বৈজয়ন্তী সমস্ত বঙ্গ দেশের উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিলেন।"[৩০]

সেই ইস্পাত কঠোর নিয়মাবলী চিহ্ন রেখে গেছে লোককথায়। The Barber Brahman[৩১] এমনই এক গল্প। সেখানে পৈতা তৈরির জটিল তথ্য উপস্থিত। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ কন্যারাই তৈরি করতে পারবে পৈতা। বিক্রিও করবে একমাত্র তারাই।

সাধারণ লোকজন এই বাড়াবাড়ি খুব একটা মেনে নেয়নি। অবশ্য The story of the Rakshasas,[৩২] কিংবা কিরণমালার[৩৩] গল্পে সমাজ পরিত্যক্ত অজ্ঞাতকুলশীল শিশুদের যখন বুকে তুলে নিচ্ছে কোন এক ব্রাহ্মণ, তখন তার বিরাটত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে —'তপঃ কৃত্বা সর্ব্বস্য জগতো রক্ষায়েচ'[৩৪] তপস্যার দ্বারাই জগতের রক্ষক হবেন ব্রাহ্মণ। লোক গল্পে ও ভবিষ্যৎ সমাজসদস্যকে রক্ষা করার সুমহান দায়িত্ব পালন করেছে ব্রাহ্মণ।

তবুও অন্যান্য জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রায়ই বিবাদ লেগেছে। সুযোগ পেলেই ব্রাহ্মণের প্রতি তাচ্ছিল্য বিদ্রূপ প্রদর্শিত। মনীষী উইলিয়ম ম্যাককুলকের সংগ্রহে যে গল্পগুলি আছে, সেখানে কায়স্থের গর্বিত আত্মপ্রচারই তার প্রতিপত্তির স্মারক —

"See here, you Brahman, your life is most holy and pious, and yet today, you have all but met your death, and yet can get nothing to eat, while I drink and do all kinds of wicked deeds and yet I have found this bag of gold coins. Which way of life is the more profitable, then yours or mine?"[৩৫]

লোককথাগুলি কখনোই জাতি বর্ণ ভেদের ঘূর্ণাবর্তে আলোড়িত হয়নি। বিশেষ জাতি সম্প্রদায়ের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থনও দেখায়নি। আদ্বিজচণ্ডালকেই প্রাধান্য দিয়েছে। গল্পগুলিতে সংসারের মধ্যে আছে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলে। আবার আছে সংসার বিমুখ, আরণ্যক জীবনাভিলাষী সন্ন্যাসী-তান্ত্রিক বা (শীতবসন্ত,[৩৬] সঙ্কটার ব্রতকথা,[৩৭] The man who wished to be perfect"[৩৮] ইত্যাদি উল্লেখ্য)। কালের অগ্রগতিতে এসেছে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, পীর শাহ্‌জালাল[৩৯] পীর গোরাচাঁদ[৪০] প্রমুখ ফকির দরবেশরা। এঁদের ঘিরে যে-সব অলৌকিক গল্প গড়ে উঠেছে তা স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়—The legendary account of the Muslim conquest in quarter of the fourteenth century[৪১] চোর ডাকাতেরাও রম্‌রমা আসর জমিয়েছে গল্পে— 'তের নদীর পারে আছে সাত চোরের থানা, আর সেই খান থেকে নায়ে নায়ে ভরা দিয়া যত রাজ্যের চোর আসিয়া রাজার রাজপুরীময় চুরি আরম্ভ করিল।'[৪২]

—দেড় আঙুলে গল্পে এমনই এক ছবি ফুটেছে। পুষ্পমালা,[৪৩] বেণুবতী[৪৪] এইসব গল্পেও দেখছি, নাগরিক স্বাভাবিক জীবন থেকে একটু দূরে পৃথক আস্তানা গেড়েছে চোর ডাকাতেরা আর প্রায়ই নগর আক্রমণ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করেছে।

এই বিচিত্র বর্ণিল সমাজের একক পরিবার পারিবারিক গঠন সম্পর্কেও নানা তথ্য দিয়েছে লোকগল্পগুলি।

পরিবার গঠন ও সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক

সাধারণ গৃহস্থ থেকে রাজপ্রতিভূ, বণিক থেকে কাঠুরিয়া বা গরীব ব্রাহ্মণ—সর্বত্রই একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতি। 'শঙ্খমালা' গল্পে অবিবাহিত ননদের দাপটে ফুটেছে—

কুঁজী কন্যার আর বিয়ে হইল না। ছেলের বিয়ে করাইয়াই সওদাগর মারা গেলেন।
.......মেয়ে পাত কাটেন ভাত খান, মাকে জিজ্ঞাসাও করেন না।[৪৫]

পারিবারিক সদস্যের মধ্যে আত্মিক বন্ধনীটি মজবুত। The story of the Rakshasas গল্পে নিরীহ প্রজাবৃন্দের প্রত্যেকের পরিবার থেকে একজন সদস্যকে প্রতিদিন ভেট পাঠাত রাজা, রাক্ষসের কাছে। সেই প্রসঙ্গেই তুলে ধরা হয়েছে এক পরিবারের ছবি। গৃহকর্তা প্রিয়জনদের বাঁচাতে আত্মবলিদানে উন্মুখ, তখনই সর্বকনিষ্ঠ সদস্যটি বলেছে—

'You are the main prop and pillar of the family, if you go the whole family is ruined. It is not reasonable that you should go, let me go and I shall not be much missed.[৪৬]

নির্দ্বিধায় নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে পরিবারকে রক্ষা করার এই দুর্লভ ছবিটি প্রশংসার্হ।

হারাই ডোরাই,[৪৭] কিরণমালা[৪৮] এইসব গল্পে ভাইবোনের প্রীতি-মধুর সম্পর্কটি উজ্জ্বল। আবার 'পুনকাবতী' গল্পে ছোট ভাই জেদ ধরেছে বোনকে বিয়ে করার জন্য। 'চম্পা' গল্পে পাঁচভাই মনে করেছে, 'চাঁপার রক্ত এত মিষ্টি, নিশ্চয়ই ওর মাংস আরও মিষ্টি হবে।'[৪৯]

এইসব জটিল মনোভাব সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—

'ভাই ভগিনীর সম্পর্কের আরও একটি দিক আছে। শৈশবের সম্পর্কের মধ্য দিয়া যৌবন উত্তীর্ণ হইয়া যখন তাহারা প্রত্যেকেই যৌন সুচেতনতা লাভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে একটু জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। লোককথায় তাহার নানা প্রতিক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।'[৫০]

ভাই-বোনের অস্বস্তিকর মনোভাবই পরিবারের সবটুকু নয়, নতুন জামাই ইত্যাদি গল্পে জামাতার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের রঙ্গ-কৌতুক, বাঘ মামার সঙ্গে শেয়াল ভাগ্নের অম্ল মধুর সম্পর্কও অন্য মেজাজ এনেছে বহু ক্ষেত্রে।

সতীন পুত্রকন্যার প্রতি সাধারণ বিমুখতার নজির আছে ভূরি ভূরি। অভিজাত রাজপরিবারও ব্যতিক্রমী নয়—'রাণীর মন-ভরা জ্বালা, পেট ভরা হিংসা—আপনার ছেলেদের থালে পাঁচ পরমান্ন ঘিয়ে পোস্ত পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া দেন, শীত-বসন্তের পাতে আলুন আতেল কড়কড়া

ভাত সড়্সড়া চাল শাকের উপর ছাইয়ের তাল ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান।[১১]

ব্যতিক্রমও আছে। সপত্নী পুত্রকে বুকে আঁকড়ে অতিশয় সতর্কতায় নদী পার করেছে এক নারী। দুর্ভাগ্য, আপন গর্ভজাত সন্তানই তলিয়ে গেছে অতলে। মাতৃস্নেহের এই করুণ মধুর ছবিটি ধবল ঘুঘুর জন্মবৃত্তান্তেই[৫২] আঁকা হয়েছে।

দক্ষ পরিচারক, পরিচারিকাও পরিবারে মর্যাদা পেয়েছে। The story of the Rakshasas গল্পে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বর্ণনা করেছেন এমনই একজন পরিচারিকাকে —

A maid servant was the most useful domestic in the palace. She was a woman of immense activity and energy. Hence her service were highly valued by the queen mother and all the ladies of the palace.[৫৩]

সাংসারিক অশান্তিও লোককথার নজর এড়ায়নি। শাশুড়ী বধূ এবং ননদিনীর মধ্যে অহরহই দেখি কটূক্তি; কলহমুখর বাগ্‌বিনিময়। যমপুকুরের একটি ব্রতকথায় মুমূর্ষু শাশুড়ীও বউয়ের হাতে সংসারের অধিকার ছাড়তে পারেনি—

উদ্ধবের মাকে নিতে যমদূত এসেছে। উদ্ধবের মা বললেন যে — বৌ! যদি তুমি কিছু কর, ঝিনুক ফুটানো থাকলো চোখ, ঝাঁটা বাড়ন থাকল হাত পা, ছুঁতো হাড়ি থাকল মাথা, কুলো থাকল বুক, পাটি থাকল পিঠ, এই সকল দিয়ে আমি দেখব।[৫৪]

বধূ কর্তৃক নির্যাতিতা হবার আশঙ্কায় স্বয়ং দেবী দুর্গাও দশহাত বার করে ছেলে গণেশের বিয়ের আগেই আশ মিটিয়ে আহার করতে বসেন।[৫৫] অবশ্য শাশুড়ী বউয়ের আন্তরিক মেলবন্ধনের নিদর্শনও একাধিক। শঙ্খমালা গল্পে কুঁজী ননদ তাড়না করেছে ভাজ শক্তি সুন্দরকে আর নিজের মাকেও। মা কিন্তু যাবতীয় ঝড়-ঝাপটা থেকে আগলে রেখেছে পুত্রবধূকে—

'বাছা এক বছর ভাত কাপড় দিয়া রাখিলাম। ভাত-কাপড়ের দুঃখ হইলে সঙ্গ নিয়া রাখিলাম, মা লক্ষ্মী কুলের বৌ কুলনারীকে এমনি করিয়া পালিলাম।'[৫৬]

পরিবারের ভগ্নদশার সূত্রপাত গৃহকর্তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। সুখু আর দুখু[৫৭] গল্পে তাঁতী মারা যাওয়ার পর সব টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে তাঁতীর বড় বৌ দুখু আর দুখুর মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই নির্মম ভাঙ্গন আক্রমণ করেছে রাজপরিবারকে—

There was a certain king who died leaving four sons behind him with his queen. The other three princes became exceedingly jealous of their youngest brother and conspiring against his and their mother, made them live in a separate house, and took possession of the estate.[৫৮]

সম্পন্ন পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান নিজের খেয়াল খুশিতে আলাদা বাড়িতে থাকছে, ভোগ করছে স্বাধীন জীবন—এরকম দৃশ্যের দেখা মিলেছে The story of Swet Basanta গল্পে[৫৯]

বিচ্ছিন্ন সদস্যদের উচ্ছ্বসিত পারিবারিক মিলনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছি 'শীত-বসন্ত' গল্পে—

.....'সকল শুনিয়া বনবাস ছাড়িয়া রাজা আসিয়া শীত বসন্তকে বুকে লইলেন। তখন রাজার রাজ্য ফিরিয়া আসিল, সকল রাজ্য এক হইল....রাজা দুয়োরানী, শীত-বসন্ত, সুয়োরানীর তিন ছেলে রূপবতী রাজকন্যা সকলে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।'[৬০]

কবীর চৌধুরী কর্তৃক সংকলিত 'The story of Sona and Sakhi' গল্পে সোনা ও সখী নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে। তীব্র শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে দু-তরফেরই অভিভাবকবৃন্দ। সমব্যথী পরিবার দুটি একত্রে দিন যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে—

With broken heart the parents of Sona and Sakhi decided to live close to each other. The Zamindar dismalted his own home and went to the hunter's place. There they both built new buildings added extension to the old structure and live together.[৬১]

সন্তান বিচ্ছেদের তীব্র শোক দুটি পরিবারের মধ্যে মিলন সেতু রচনা করেছে।

এইভাবেই লোককথার পরিবার ভাঙ্গে গড়ে। কখনো বিচ্ছিন্ন হয় সদস্যরা, কখনো ভিন্‌দেশী নারী পুরুষই হয়ে ওঠে পরিবারের আপনজন। 'মালঞ্চমালা' গল্পের মালিনী স্নেহে বিগলিত হয়ে মালঞ্চকে ঠাঁই দিয়েছে নিজের ঘরে। কারণটি তার কথাতেই পাই—

'আমার এক বোনঝি ছিল বারো বছর হইল গেছে—দিনরাত কাঁদিয়া মরি, আহা মা। তুই বা আমার সেই বোনঝিই হোস।'[৬২]

বৃদ্ধা চরিত্র লোককথায় উল্লেখের দাবি রাখে। চরিত্রটি একটি আন্তর্জাতিক অভিপ্রায়। বাংলাতেও পাচ্ছি পান্তা বুড়ির কথা,[৬৩] কুঁজো বুড়ির কথা,[৬৪] উকুনে বুড়ির গল্প।[৬৫]

এই বুড়ি যখন সহায়ক চরিত্র তখন তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা লক্ষ্য করছি। চাঁদের মা বুড়ি সাহায্য করেছে দুখুকে, তার মায়া শক্তি দিয়ে। দেড় আঙুলের জন্মের মূলেও তারই কৃতিত্ব। কাঠুরে বৌকে মন্ত্রপূত শশা খেতে দিয়েছে এক বুড়ি-ই।

আবার অলৌকিক শক্তির অপপ্রয়োগ করছে বুড়ি পাতাল কন্যা মণিমালা, The story of the Rakshasas এই সব গল্পে। কলাবতী রাজকন্যা গল্পে একশ বছরে বুড়ি কাঁথা বুনে চলে আর সেই সঙ্গে বোনে তার নষ্টবুদ্ধির জাল—

'বুদ্ধুকে দেখিয়াই হাতের কাঁথা বুদ্ধুর গায়ে ছুঁড়িয়া মারিল। অমনি হাজার-হাজার সিপাই আসিয়া বুদ্ধুকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাজপুরীর মধ্যে লইয়া গেল।'[৬৬]

এই বুড়ীরাই স্টীথ থম্পসন বর্ণিত Witch– Sometimes Witch is simply a human old woman who has by some foul means, acquired mystic powers of evil.[৬৭]

থম্পসন আরো বলেন যে এরা তিন বোনও হতে পারে। কলাবতী রাজকন্যা গল্পেই দেখেছি যে তিন বুড়ি এক জাহাজ মাঝিমাল্লা, লোকলস্কর আর রাজকুমারদের দিয়ে তিন সন্ধ্যা জলযোগ করে অকাতরে নিদ্রা যায়।

বুড়ি চরিত্র যখন নরমাংসলোভী তখনই সে ডাইনি। পিঠে গাছের গল্পে[৬৮] বুড়ি রাখাল ছেলের নধর মাংস খাবার জন্য লালায়িত। থালু-মালুর গল্পেও ডাইনি বুড়ি

ক্রমাগত তাড়া করেছে থালু-মালুকে। অবশ্য সেখানে ডাইনির সংহারও ঘটেছে অপর এক বৃদ্ধার কৃতিত্বে—সে থালু-মালুর ঠাকুমা।

এইভাবে অলৌকিক শক্তিবিরহিত বুড়ি চরিত্র লোককথায় উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়েছে। বয়সোচিত অভিজ্ঞতার গূঢ় কৌশল প্রয়োগে সমস্যার সমাধান করেছে। 'The story of Prince Sabur,'[৭০] মালঞ্চমালা এই সব অসংখ্য গল্পে বুড়ি চরিত্রটি রক্ষাকর্ত্রী সাহায্যকারী। সমস্যা সমাধানের কৃতিত্ব বুড়ি চরিত্রের উপরই আরোপ করে বর্ষীয়ান সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই করেছে লোককথা।

সমাজে নারীর স্থান

'মেয়ে হয় মারবো, ছেলে হয় রাখবো'[৭১]— কন্যাসন্তানের প্রতি তীব্র এই জিঘাংসা এক নারীরই, 'শঙ্খমালা' গল্পের কাঠুরানী চরিত্রটির। সমাজের উপরতলাতেও একই অবজ্ঞা আর বিদ্বেষ—

কি হইল কি হইল?
—ক্ষীরের পুতুল কন্যা।[৭২]

মুখ নীচু করিয়া রাজা রাজসভায় চলিয়া গেলেন।

সমাজ রূপান্তরের ধারায় বিভিন্ন স্তরে নানা যুগ ভাবনার পলি পড়েছে লোককথায়। ফলে, নারীর ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, আত্মবোধ সম্পর্কে কোন অনড় মূল্যবোধ প্রোথিত হয়নি সমাজ চৈতন্যে। একদিকে নারীর অবমূল্যায়নের অজস্র নিদর্শন, অপরদিকে নারীর নির্ভীকতা, বীর্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে শ্রী ও মাধুর্যের মিশ্রণ পরিপূর্ণ করেছে রমণীত্বকে। আদায় করেছে সমাজের স্বীকৃতি, শ্রদ্ধা। লোককথার বিচিত্র ভাণ্ডারটি পর্যালোচনা করে নারীর গুরুত্ব, মনন ও প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা যাক।

নারীর তনুশ্রী বিনা দ্বিধায় বন্দিত সর্বযুগেই। নারী সৌন্দর্যের মাদকতায় রূপলাল স্থির চোখের তারায় স্তব্ধ হয়ে যায়।[৭৩] রূপমোহের প্রচণ্ড তেজে রাজপুত্র মদনকুমার স্বাভাবিক বুদ্ধি হারায়। পরিচিত হয় 'মধুমালা-জপ্না'[৭৪] রাজকুমার রূপে।

দেহজ সৌষ্ঠবের ঘেরাটোপেই বন্দী পুরুষের প্রেম, তাই কর্মনিপুণা হয়েও কেবল অসৌন্দর্যের কারণেই নারী ধিকৃত হয়েছে বহুবার। সুকীর্তি ব্রতের অন্যতম ব্রতকথায় নম্র, শান্ত বধূটি কুদর্শন, তাই শুধু স্বামী নয়, শাশুড়ীও তার প্রতি অভিশাপ উচ্চারণ করেছে।

খাগ ভেঙে শাস খেয়ো, নল ভেঙ্গে জল খেয়ো। মাছ রেখে কাঁচা খেয়ো, আর ননদের ঘরে দাসী হয়ে থেকো।[৭৫] বিদ্বেষটি বিস্তৃত হয়ে সমগ্র নারী জাতিকেই আক্রমণ করেছে— কোচবিহারের সাটপূজার ব্রতকথায় এমনই এক অবমূল্যায়নের নজির —

স্ত্রী জাতি চঞ্চলমতি, যেইটে সেঁইটে করে রতি, তার সাথে পথ বাওয়া যায় না।[৭৬]

প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধতার অভাব পুরুষের নিজেরই অন্তরে। নারী তাদের কাছে অর্জনের বস্তু, তা সে যে কোন স্তরেরই হোক না কেন, তাই 'শীত-বসন্ত' গল্পে রূপবতী রাজকন্যার

ন্যায্য পথে জয়লাভকেও অন্যায় মনে করে শীত রাজা—

'কি! রাজকন্যার এত তেজ, রাজপুত্রদিগকে নফর করিয়া রাখে। রাজকন্যার রাজ্য আটক কর।'[৭৭]

অথচ বিপরীতক্রমে, বহু লোককথাতেই আমরা দেখছি যে কোন নারীকে বিবাহ করে পুরুষ স্ত্রীর রাজ্যেই স্থিতিলাভ করেছে। The Origin of Rubies[৭৮] গল্পে নিঃস্ব রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিবাহ করে কন্যার পিতৃরাজ্যের অধীশ্বর হয়েছে। হারাই ডোরাই গল্পে[৭৯] ভ্রাতা বিবাহিতা ভগিনীর গৃহে পাকাপাকিভাবে বাস করছে। এই ঘটনাগুলি মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অস্পষ্ট আভাসই সূচিত করে। এই চেতনাটির উৎস সম্ভবত অতীতেই নিহিত।

সভ্যতার প্রাক্ পর্যায়ে মানুষ জমির উর্বরাশক্তি ও নারীর সন্তান প্রদায়িনী শক্তিকে অবিচ্ছেদ্য মনে করেছে। নারীর কাছে তখন পুরুষ প্রণত হয়েছে প্রয়োজনে। পরবর্তীকালে পিতৃশাসিত সমাজব্যবস্থায়, নারীর অধিকার ক্রমশই সীমিত হয়েছে। অধিকারের এই সংকোচন মর্যাদা পেয়েছে অন্যভাবে, প্রজননার্থ মহাভাগ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।[৮০] লোককথার মধ্যেও নারীর কল্যাণী মূর্তিটি, শুচিস্নিগ্ধা মাতৃত্বের স্তুতি। বিশ্বকরম ব্রতের অন্যতম কথায় কন্যা নলপাতার আচরণ—

গলা কেটে ঘর দিলেন
মাথা কেটে ডাবর দিলেন
নাক কেটে বাঁশী দিলেন
দাঁত কেটে আর্শী দিলেন
জিহ্বা কেটে অর্ঘ্য দিলেন
বুক কেটে শ্রীফল দিলেন
পিঠ কেটে পিঁড়ি দিলেন
দশ নখ কেটে পলতে দিলেন
দুই হাত কেটে খঁরতাল দিলেন
পা কেটে খড়ম দিলেন[৮১]

অর্থাৎ নারী, অস্তিত্বের প্রতিটি অণুর প্রতিক্ষণ পারিবারিক কল্যাণ কামনায় উৎসর্গীকৃত। এই আত্মত্যাগকে পুরুষ ব্যবহার করেছে অন্যভাবে। বশ্যতা, মুগ্ধতা আর নতশির দাসত্বের প্রত্যাশী তারা। নারী জড়বস্তুর মতোই বিনিময় দ্রব্য। ঠাকুরমার ঝুলির শেয়াল পণ্ডিত অনায়াসে উচ্চারণ করেছে—

হাঁড়ীর বদলে কনে পেলাম—তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
কনে গিয়ে ঢোল পেয়েছি—তাক্ ডুমাডুম ডুম্।[৮২]
—হাড়ী ঢোলের মতো রমণী পণ্যমাত্র।

এই অবমাননাকর বোধটি থেকেই কিন্তু নারীর সংঘাতও শুরু। পুরুষের পীড়ন যতই

তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে, নারীর স্বভাবদীনতা, ভীরুতা ও সঙ্কোচের নির্মোকটি অপসৃত আত্মসম্মান বজায় রাখার দুরন্ত তাগিদই নারীকে করে তুলেছে উন্নতগ্রীব, তেজস্বিনী ও স্পষ্টবাক্। মালঞ্চমালার জোরালো ঘোষণা, স্বামী চন্দ্রমাণিকের প্রতি তীব্র অধিকার চেতনারই স্মারক— 'স্বামী যে আমার স্বামী।'[৮৩]

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজাত নারী স্বাধীন ভাবনার প্রমাণ রেখেছে। 'মধুমালা' গল্পে কেবল মধুমালাই নয়, পঞ্চকলা চম্পকলা প্রমুখ রাজকন্যাও নিজ পিতার কাছে অসঙ্কোচে বলেছে—

'ফুলচন্দন স্বস্তি, হাঁ বাবা ইনিই আমার বর, আজই আমার বিয়ে দাও।'[৮৪]

পতি নির্বাচনের এই স্বাধীন ভাবনা নারীর মানসমুক্তিরই ইঙ্গিত দেয়। অপরিসীম ধৈর্য, স্থির প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর দীর্ঘ সময়কালীন অধ্যবসায়ের সাহচর্যে নারী শুধু মানসিক দিক থেকেই নয় শারীরিক দক্ষতায় হয়ে উঠেছে দৃপ্ত বলশালী আর কুশলী। পুষ্পমালা গল্পে নায়িকা পুষ্প নিপুণা অসিচালিকা—'রাজকন্যা চমকিলেন। পক্ষিরাজের মুখ ফিরাইয়া আপনার শান তরোয়াল চক্র দিলেন—মুহূর্তেই ডাকাত কাটা পড়ল।'[৮৫]

কিশোরগঞ্জের একটি লোককাহিনীতে দেখছি বাদশা ফৈলন খাঁ নায়িকা হরণ শুনাই এর প্রতি প্রেমমুগ্ধ কারণ 'জামাল বাদশার কন্যা হরণের গায়ে সাত হাতীর জোর।'[৮৬]

দেহের এই বীর্য নারীকে নিশ্চিত সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারে নি। গৃহ এবং বহির্জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই কামুক পুরুষের উৎপাত নারীকে উত্যক্ত করেছে। পুষ্পমালা, The story of the Bull,[৮৭] Adi's wife[৮৮] এই সব গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় অভূতপূর্ব সাহস আব প্রশংসনীয় উপস্থিত বুদ্ধিই নারীকে সুরক্ষা দিয়েছে। যাবতীয় বিপত্তির মোকাবিলা করে একাধিক পুরুষের আক্রমণ থেকে নিজের শুচিতা রক্ষা করেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, সমাজ পরিত্যক্তা নারী বহু ক্ষেত্রেই সাহায্য পেয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে। The Story of Prince Sobur গল্পে ঘন বনের মধ্যে পিতা কর্তৃক নির্বাসিতা অসহায়া মেয়েটির সুরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব স্বেচ্ছায় পালন করেছে বটগাছ—

'Unhappy girl! I must pity you. In a short time wild beasts of the forests will come out of their lairs and roam about for their prey, and thus are sure to devour you and your companion......I will make an opening for you in my trunk.....You will remain safe inside nor can wild beasts touch you.'[৮৯]

পরিচিত সুখু আর দুখুর গল্পেও প্রকৃতি আর্থিক নিরাপত্তা দিয়েছে। দুখুকে মালঞ্চমালা গল্পে আবার বাঘ-বাঘিনী একাধারে মালঞ্চের দেহরক্ষী আর তার শিশু স্বামীর প্রতিপালক। সন্তানহারা শক্তি সুন্দরকে সাহায্য করেছে কাঠুরিয়া। আর পুত্রের সন্ধান সে পেয়েছে সাগররানীর কাছে।

সাগররানী বলেন,—" মা আর দেখিস্ না, আর চা'স না—উনকোটি বাতাস সঙ্গে

দিলাম চোক বুজিস সোজা উত্তরমুখে যাবি—তোর পুত্র সেইদিকে পাবি।"[৯০] এই ভাবে বহির্জগতে এক অদৃশ্য ঘেরাটোপের মধ্য দিয়েই নারী পথ চলেছে। নারীর অন্তর্নিহিত শক্তিমাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছে পুরুষ। সোহাগের ট্যাপারি গল্পে স্বয়ং নারায়ণ দুখিনী রানীকে সান্ত্বনা দেবারছলে ব্যক্ত করেছে নিজের আশঙ্কাকেই—

"কাঁদিস না, চোখের জল পড়লে পৃথিবী শস্য হরণ করবে, গাভী দুগ্ধ হরণ করবে।"[৯১]

অর্থাৎ নারীর প্রতি অবমাননার ফল মারাত্মক। মালঞ্চমালার গল্পেও দেখেছি জাতির ও দেশের সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তাও নারীর অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। তাই মালঞ্চের নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে বিপর্যয়।

"মালঞ্চ গেলেন,— রাজপুরীর আজ দেউড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাল চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, আজ এ তারা খসে, কাল ও তারা খসে। বারো বৎসর গেল। রাজপুত্রের সাত ছেলে হইল। সকল ছেলে মরিয়া গেল।"[৯২]

গল্পের শেষে এই মালঞ্চেরই তপঃপ্রভার পুণ্যে রাজপুরীর মৃত নাগরিকেরা পুনর্জীবন পেয়েছে। কিরণমালা গল্পেও কিরণমালা নারীশক্তির উদ্দাম গতির প্রতীক। যাবতীয় প্রতিকূলতা অবনত হয়েছে তার কাছে। পুনরুজ্জীবনের সুস্থ পরিমণ্ডল সেই রচনা করেছে—

"কিরণমালা সোনার ঝারি ঢালিয়া জল ছিটাইলেন চারদিকে পাহাড় মড়্মড়্ করিয়া উঠিল ... যেখানে জলের ছিটা ফোঁটা পড়ে, যত যুগের যত রাজপুত্র আসিয়া পাথর হইয়াছিলেন, চক্ষের পলকে গা মোড়া দিয়া উঠিয়া বসেন।"[৯৩]

মাঙ্গলিক নারীশক্তিই যেন কিরণের রূপে দীর্ঘকালীন অচল সংস্কার থেকে পুরুষকে উদ্ধার করেছে, এগিয়ে দিয়েছে শুভ বোধের পথে। কৃতজ্ঞ রাজপুত্রেরা তাই আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে কিরণমালাকে —

"সাত যুগের ধন্য বীর তুমি"[৯৪]

—এই স্বীকৃতিই আত্মপ্রতিষ্ঠার যাত্রাপথে সামাজিক নারীর ললাটে জয়টীকা এঁকে দিয়েছে।

সমাজ-মনস্তত্ত্ব

সামাজিক ও লৌকিক সংস্কারের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের পথ অতিক্রম করেছে লোককথা। বহুমানবের চেতনার স্পর্শবাহী এরা। তাই, লোককথার জীবনস্রোতে মনের নানামুখী গতির ঘূর্ণাবর্ত—ন্যায়-অন্যায়, সততা-কাপট্য অমৃত আর ক্লেদের সহাবস্থান। বিজ্ঞানী আরনেষ্ট জোনস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

The materials studied in folklores are the products of dynamic mental process the response of the folksoul to either outer or inner needs, the expression of various longings fears, desires etc.[৯৫]

সমষ্টি জীবনের নানা মানস বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যাক।

বাৎসল্য—লোককথায় পরিচিত অভিব্যক্তি। পুত্র স্নেহে রাজা রানী অন্ধ, অপুত্রক রাজার মন সন্তান আকাঙ্ক্ষায় হাহাকার করে—

"রাজা অপুত্র।

রাজত্ব আর থাকে না।

রাজ-রাজত্ব বিচার-আচার পালন-পাট সব বন্ধ। রাজার মুখে এক কথা— লোকসমাজে আর মুখ দেখাইব না। প্রাণ আর রাখিব না।"[৯৬]

সন্তানের জন্য সর্বদাই পিতা মাতার উৎকণ্ঠা —"দণ্ডেক না দেখে তোরে মদন রে! হারাই পরাণ,

বাৎসল্যের রস দেবত্বের অলৌকিক মহিমা ভেদ করে স্পর্শ করেছে দেবী দুর্গার মনকে।—

"দুর্গা বলেন— মানুষের ছেলে মেয়ে ধুলো মেখে মার কাপড়ে মুছলে দাগ হয়, সেই দাগওলা কাপড় ভালোবাসি। ছেলেপুলে তো নেই। নিজের কাপড়ে নিজেই ধুলো মাখাই।"[৯৭]

এই স্নিগ্ধ আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিকৃত পীড়নের চিত্রও পাচ্ছি নীলকমল আর লালকমলের গল্পে, রাক্ষসী রাণীর আচরণে—

—"রাণী মনের আগুনে জ্ঞান দিশা হারাইয়া আপনার ছেলেকে মুড়মুড় করিয়া চিবাইয়া খাইল।"[৯৮]

আত্মলালসা পরিতৃপ্তির জন্য পিতা কর্তৃক আপন সন্তান হত্যার নির্মম চিত্রটি কানাকুয়া পাখির জন্ম কথায় ধরা পড়েছে।[৯৯]

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলি বাদ দিলে অবশ্য স্নেহের টানটাই চোখে পড়ে। বিবাহিতা কন্যাকে দীর্ঘদিন না দেখে দুঃখে কাতর বাবা হয়েছে হলুদ পাখি। এমনকি বুড়ো রাক্ষসও পালিতা কন্যাটিকে রজপুত্র বরের হাতে তুলে দেবার পর মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে।

প্রতিবাৎসল্যের হৃদয়গ্রাহী চিত্র আঁকা হয়েছে কলাবতী রাজকন্যার গল্পে—

বুদ্ধু মায়ের ঘুঁটে কুড়াইয়া দেয়, ভুতুম চিড়িয়াখানার পাখির ছানাগুলিকে আহার খাওয়াইয়া দেয়। বুদ্ধু দুই মায়ের জন্য বন-জঙ্গল হইতে কত রকমের ফল আনে। ভুতুম ঠোঁটে করিয়া দুই মায়ের পান খাইবার সুপারী আনে।[১০০]

এইভাবে মাতা পিতা আর সন্তানের পারস্পরিক প্রীতি মাধুর্য চিহ্ন রেখেছে লোকগল্পে।

—মাতৃত্ব—

"আল ডিঙাইয়া কে খায় ঘাস—মায়ের কথার প্রত্যয় চাস—"[১০১] মা বিশ্বাসের ধ্রুবতারা, চিরসত্যের প্রতীক, আস্থার নিশ্চিত আশ্রয়স্থল। পিতার অবর্তমানে সন্তান মার কাছ থেকেই পেয়েছে সৎ পরামর্শ, কর্মে উৎসাহ—

'শঙ্খবাবা । মানিক—এমন সওদাগরের পুত্র তুই তোর ভরা ডুবে একবার চাহিয়া

দেখ্—এই কি তুই ব্যাণিজ্যের বণিক' [১০২]

মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভেসেছে বন্ধ্যা কাঠুরানী' ঐ শঙ্খমনি গল্পেই। সে সদ্যোজাত নীলমাণিককে চুরি করতেও দ্বিধা করেনি। তার অতৃপ্ত মাতৃত্ব নীলমণিকে ঘিরেই উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ছেলেচুরির অপরাধভারে পীড়িত অথচ সদা শঙ্কিত উগ্র বাৎসল্যে মাতৃত্বের দাবীও পরিত্যাগ করতে পারেনি—

ভাবিয়া চিন্তিয়া পথ না পাইয়া কাঠুরাণী গর্জিয়া উঠিল—"জন্ম হইল গহন বনে আজ বসেছিস সিংহাসনে। আমি পেটে ধরিলাম না তো কে ধরিল? আবার একটু নরম হইয়া কাঠুরানী বলে, ষাট, ষাট কোন সে ডাইনি চাঁদের গা ছুঁইল দাসী লো বাঁদী লো ওঝা ডাক্ বোঝা ডাক্ আমার দুধের ধারে বেটে চাঁদকে ওষুধ খাওয়াই। [১০৩]

গল্পের শেষে কৃতকর্মের শাস্তি পেয়েছে কাঠুরানী। নির্মমভাবে মারা পড়েছে, তার মৃতদেহ শেয়াল কুকুরে টানাটানি করছে। কিন্তু নীল রাজা যথার্থই মাতৃশোক অনুভব করেছে।—

"নীলের বুক ভাসিয়া দুই চক্ষুর জল পড়িল।" [১০৪]

—এই অশ্রুপাতেই কাঠুরানী পরিশুদ্ধ হয়েছে। ধন্য হয়েছে তার মমতা। যে মাতৃত্ব অনুপম লোককথায় সন্তান সহ মায়ের উপমা 'চাঁদের কোলে চাঁদ, " [১০৫] সেই মাতৃত্বকেও সামাজিক বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে শঙ্খমালা গল্পেই। আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছে—

পরখ আর কিছু নয়, পরখ দুধের ধারে। রাজসভায় বারো ধনুক জমি মাপিয়া দিব, মা-রাণী আর জননী-মা দুজনে সেইখান হইতে দাঁড়াইয়া আপন আপন বুকের দুধ টিপিয়া দিবেন— যার দুধের ধার না হেলিয়া না টলিয়া তোমার মুখে আসিয়া পড়িবে, জানিবে তিনিই তোমার গর্ভধারিণী। " [১০৬]

নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও স্নেহময় লালনে পুষ্ট মাতৃত্ব মালঞ্চমালাকে আচ্ছন্ন করেছে। শিশু স্বামী চন্দ্রমানিকের প্রতিবার ব্যবহারে ফুটেছে চিরায়ত মুগ্ধ জননী রূপ—

"পতি হাসে, মালঞ্চ হাসেন পতি কাঁদে মালঞ্চ কাঁদেন। পতি হাত পা নাড়ে , মালঞ্চ বসিয়া খেলা দেন। ... আঁচল খান দিয়া বেড়িয়া পতিকে বুকের মধ্যে করিয়া বসিয়া থাকেন।" [১০৭]

প্রেমিকার সত্তাকে প্রচ্ছন্ন করেই বিকশিত মাতৃত্বের রূপ। কাঞ্চনমালা গল্পে মাতৃত্বই আত্মস্বার্থের নিরেট কারাগারে বন্দী। সওদাগর পুত্র রূপলালকে আক্রমণ করেছে অকাল বার্ধক্য। মুক্তির উপায় একটি নিঃস্বার্থ চুম্বন, যা কিনা মায়ের কাছেই প্রত্যাশিত। যে চুমু খাবে সে হবে তালবৃক্ষ। মার কথায় সেই অপমৃত্যুর আশংকাই প্রকট—

'পুত্র! তীর্থ করাইবে না, স্বর্গ করাইবে না, শেষকালে অপঘাতে মৃত্যু, তালবৃক্ষ হইয়া থাকিব।'

মা জরা নিলেন না। [১০৮]

রূপলাল যার সাহায্য পেয়েছে সেও নারী, কিন্তু প্রেমিকা। লোককথার জগতে প্রেম, বিশেষত আত্মত্যাগী নিরপেক্ষ ভালোবাসারই জয়জয়কার।

প্রেম

লোককথায় নারীর প্রেম বিষাদ মধুর। কাঞ্চনমালা গল্পে মালিনীর বোনঝি ভালোবেসে রূপলালের জরা নিজ অঙ্গে ধারণ করেছে—

মালিনীর বোনঝি সেঁউতি ফুলের একগাছি মালা গাঁথিয়া মালা সওদাগরের পায়ের উপর দিল। দিয়া সওদাগরের থক্থক গলিত কুষ্ঠমুখ সেই মুখে এ জন্মের মতন দেখা — দেখিয়া- দেখিয়া- দেখিয়া চুমা খাইল। [১০৯]

— ঘৃণা বিদ্বেষ বিসর্জিত এই চুম্বনেই বোনঝি দেহাতীত প্রেমের সর্বোৎকৃষ্ট পাঠটি শিখিয়ে দিয়েছে পুরুষকে। পবিত্র প্রেমের নির্মলতাকে কলুষিত করেছে কামসর্বস্ব উত্তেজক আকর্ষণ, প্রধানত বিবাহিতা রমণীরাই সেই দূষণের শিকার। সিঁদুর, Nephew Kanai[১১০] এইসব গল্পে পরপুরুষের প্রতি অস্বাস্থ্যকর টানও দেখা গেছে। অবশ্য গল্প শেষে প্রত্যেক নারীই অসততার শাস্তি পেয়েছে। লোককথার জনগণ কখনই অন্যায্য কামনাকে প্রশ্রয় দেয়নি। প্রেম সম্পর্কে তাদের ধারণা উঁচুদরের। প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকারের পাল্টা ঝুঁকেছে নারীর দিকেই। 'চোখ গেল' পাখির জন্মকথায় দেখি পরমা সুন্দরী কন্যা আপন দৃষ্টি দিয়েছে দয়িতকে, সামান্য দধিয়ালকে ভালবেসে রাজার মেয়ে হয়েছে উদাসী দোয়েল পাখি। [১১১] এই যে দুখঃশীলারূপ, রবীন্দ্রনাথের ধারণা অনুযায়ী একে বলা যায়, 'প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের দেশ হইতে মঙ্গল সৌন্দর্যের অক্ষর স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া।'[১১২]

—সতীত্ব—

একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্গেই মর্যাদা পেয়েছে সতীত্ব। সতী মালঞ্চমালা তাই শুধু রাণী নয়। তার অভিধা 'ঠাকুরানী।' [১১৩]

সতীত্বের দীপ্ত তেজই বহু ক্ষেত্রে সতী সাধ্বীকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেছে। কাঞ্চনমালা বিনা অগ্নিতে স্বাদু ভোজ্য রন্ধনে সক্ষম হয়েছে—

"... সতীর সিঁদূর দিয়া কাঞ্চন খুদকুঁড়া চাহিয়া আনেন, আনিয়া কোথায় কি পাইবেন, হাতের তেলোতে করিয়া রাঁধেন।

সওদাগর দেখে—ফুলফুটন্ত অন্ন!—সপ্তব্যঞ্জনের গন্ধ, অষ্টসম্ভার মাংস!— পদ্মপাতে ভাসিয়া আসে। সতীর স্পর্শে খুদ-কুঁড়াই এমন হইয়াছে।[১৪৪]

সতীত্ব মর্ত্যবাসিনী নারীকে অলৌকিক প্রভা এনে দিয়েছে—মালিনী ফুঁ দিয়া বিনি-সূতার আধগাঁথা মালাগাছি ছাড়িয়া দিল।

সতীর তেজ পুষ্পের কিছুই হইল না। পলকে চন্দন মস্ত দাড়ি ছাগল হইয়া মালিনীর পিছু নিলেন। [১১৫]

আশ্চর্যের বিষয়, যুগভেদে সতীত্ব সম্পর্কে সংস্কার ভেদ দেখা যায়। "মালঞ্চমালা"

গল্পে বিবাহিতা মালঞ্চ বারো বৎসর সমাজ পরিত্যক্ত জীবনযাপন করেছে। সমাজ কিন্তু অকলঙ্ক সতীত্বের প্রমাণ দাবী করেনি তার কাছে। অথচ, শঙ্খমালা গল্পে শক্তিসুন্দরের নৈতিক চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাতেই গল্পের সূচনা—

"আ-লো আ-লো ... দেব ধর্ম্ম তো গেল!—কুলুবুলুনী শঙ্খমালা ঢুলানী—ওগো,—পরের ঝিয়ারীর গুণে সাধুর ভিটা কাল না —যুয়াতে অস্ত গেল।"[১১৬]

সমাজের কাছে আপন চারিত্রিক শুদ্ধতা প্রমাণ দায়ে নারী দায়বদ্ধ—এই ধারণাটিও পরিবর্তিত হয়েছে কুলুই মঙ্গলবারের ব্রতকথায়।[১১৭] ব্রাহ্মণ কন্যা জোড়া কলা খেয়ে গর্ভবতী হলে সাময়িক ভাবে সমাজ-পরিত্যক্ত হয়। দেবী মঙ্গলচণ্ডীর ক্রোধান্ধ আদেশে দেশের রাজাই স্বয়ং বিবাহ করেন কন্যাটিকে। পুত্রেরাও রাজপুত্রের মর্যাদা পায়। এইভাবে কানীন পুত্রদেরও সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করেছে নারী।

দেখছি সতীত্বের বোধটি যুগমানসিকতা ভেদে কোথাও দৃঢ়বদ্ধ, কোথাও শিথিল। আরো যে মজবুত বাঁধনটি লোকমননে কাজ করে সেটি বন্ধুত্বের।

বন্ধুত্ব

লোককথায় সখ্যের মাধুর্য শ্রোতার মনকে আবিষ্ট করে। সখ্য জাতিভেদ, কর্মভেদ স্বীকার করে না—

এক রাজপুত্র, এক মন্ত্রীপুত্র, এক সওদাগরের পুত্র আর এক কোটালের পুত্র — চারজনে খুব ভাব।[১১৮]

কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা, মধুমালা এই সব গল্পে সখ্যের দায়িত্ব, পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পালিত হয়েছে।

বন্ধুত্বের অমর্যাদা বিপদ ডেকে এনেছে Phakirchand[১১৯] গল্পে। মন্ত্রীপুত্রের কৌশলী তৎপরতায় রাজপুত্র যাবতীয় বিপদ এড়াতে সক্ষম হয়েছে অথচ তীব্র সন্দেহের বাণে জর্জরিত করেছে বন্ধুকে। অভিমানী মন্ত্রীপুত্র শোকস্তব্ধ হয়ে পরিণত হয়েছে পাথরের মূর্তিতে। তখনই অনুতপ্ত রাজপুত্র নিজ শিশুসন্তানদের হত্যা করে সেই রক্তে পুনর্জীবিত করেছে সখাকে। পরিণামে অবশ্য সকলেই জীবন ফিরে পেয়েছে। সমস্ত গরল মিলন অমৃত লীন হয়েছে।

'সোনার কাটি রূপার কাটি'[১১৯] গল্পে প্রাণদায়িনী জেলে-বৌকে রাজপুত্র হাসন সখীর মর্যাদা দিয়েছে। সম্পদ নারায়ণের এক ব্রতকথায় রাজরাণী তার বামুন সখির মঙ্গলকামনা মহৎ স্বার্থত্যাগ করেছে—

> আপনার সম্পদ পরকে দিলে
> পরের বিপত্তি ঘারে নিলে [১২১]

এইভাবেই লোকমানসে প্রীতি, নির্ভরতা, ত্যাগ আর প্রত্যাশাহীন কর্তব্যবোধেই সখ্যের বোধটি উজ্জ্বল।

বীরত্ব, শ্রম, অধ্যবসায়, দান চাতুর্য, উপস্থিত বুদ্ধি এই সব গুণগুলিরও যথেষ্ট কদর।

সাংসারিক লোককাহিনীগুলিই তার প্রমাণ। মহৎ প্রবৃত্তির বিপরীতে নানা অসদাচরণ কলুষিত করেছে পরিবেশকে। পুরাকথাগুলি এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। আতিথ্যের অবমাননার ফল কাক ও বাদুড়ের জন্মকথায়,[১২২] বর্ণিত, লোভের পরিণাম ও কর্তব্যে অবহেলা ঢোঁড়া সাপকে নির্বিষ করেছে।[১২৩] শাশুড়ীর অকারণ অত্যাচারে বৌ হয়েছে হাঁড়িচাচা পাখি।[১২৪] মানবিক কল্যাণকামী নীতিগুলিও এখানে পরিবেশিত। মাতৃভক্তি আর কর্তব্যপরায়ণতার পুরস্কার হিসাবেই চন্দ্র লাভ করেছে স্নিগ্ধ কিরণ ছটা,[১২৫] একনিষ্ঠ অনাড়ম্বর জীবনই বুলবুলিকে পুরস্কৃত করেছে।

উল্লেখ্য, প্রতারণা অর্থাৎ লোক-ঠকানো ব্যাপারটি সম্পর্কে লোককথার নিয়ম কিছু শিথিল। যখন দরিদ্র বঞ্চিত হয়েছে ন্যায্য দাবী থেকে, সমাজ তখন প্রতারকের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু। কিন্তু প্রতারণা যখন বৃহত্তর অন্যায়কারী শক্তির বিরুদ্ধে, প্রতারক সেখানে লাভ করেছে সমাজের সহানুভূতি, প্রতারণা সেখানে প্রতিবাদেরই অন্য নাম।

প্রতিবাদী চেতনা

জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তিতে দুর্বল প্রাণ প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত যে শ্রেণী চিরকাল অত্যাচারের জোয়াল বয়েছে, তাদের অবদমিত ক্ষোভ লোকগল্পে নানা প্রতিবাদের বিচিত্র রূপে প্রকাশিত।

ক্ষুদ্র ও দুর্বলের প্রতি করুণাঘন সহানুভূতি লোককথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়। পশুকথায় এর প্রতিভাস অনেক সহজ ও সরল। সেখানে প্রায়ই ক্ষমতাবান বা প্রকৃতিগতভাবে হিংস্র নিষ্ঠুর শক্তিশালী প্রাণীগুলিকে ক্ষুদ্র দুর্বল অসহায় প্রাণীর কাছে হার মানানো হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সংকলিত টুনটুনির বইটির[১২৬] গল্পগুলিই তার প্রমাণ। সামান্য নিরীহ ছাগল সিংহের মামা নরহরিদাস সেজে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কৌশলে পরাস্ত করেছে তার অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী বাঘ অথবা শিয়ালকে। আবার ক্ষুদ্র বেড়াল মজন্তালি সরকার[১২৭] এই রাশভারি নামের আড়াল থেকেই প্রভুত্ব বিস্তার করেছে শক্তিশালী বাঘ-বাঘিনীর ওপর। ঐ বিড়ালই ধনী স্বার্থপর গোষ্ঠীর প্রতিভূ হয়ে টুনটুনির ছানাদের প্রতি তার লোভ করেছে। ধৈর্য, অধ্যবসায়ের সঙ্গে বিপদের মোকাবিলা করেছে টুনি। ছানাদের নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দেবার পর উচ্চারিত তার প্রতিবাদ—

দূর হ লক্ষ্মীছাড়ি বিড়ালনী[১২৮]

—এই ধিক্কার আকাঙ্ক্ষিত জয়ের সাফল্যে মুখর।

শ্রেণীসংগ্রামের আঁচটাও টের পাওয়া যায় পুষ্পমালা গল্পে। গর্বিতা পুষ্প যখন কোটালের ছেলেকে বলে—

"দেখ কোটালপুত্র! আমার বাপের রাজ্যে বাস এমন কথা বল প্রাণে ডর নাই?[১২৯]

তখন কোটালপুত্রের নির্ভীক প্রতিক্রিয়া—

"ডর কি রাজকন্যা? আমার চৌদ্দ পুরুষের প্রাণে তোমার বাপের রাজ্য।"[১৩০]

ঐ গল্পেরই পরিণতিতে দেখা যায় হতশ্রী রাজ্যের লুপ্ত সম্মান উদ্ধার করেছে

কোটালপুত্র চন্দনই। শ্রমজীবী শ্রেণীর সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর মধুর সন্ধি ঘটেছে।

একক সংগ্রাম যখন প্রতিরোধে ব্যর্থ, তখনই অন্যায়ের রোধজনিত তৃতীয় একটি শক্তি গড়ে উঠেছে। টুনটুনির ফোড়া কাটতে অস্বীকার করেছে নাপিত, কারণ— "ঈস! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোড়া কাটতে গেলুম আর কি।"[১৩১]

দাম্ভিক উন্নাসিকতার বিপক্ষে প্রতিবাদ জানানোর আর্জি নিয়ে টুনি একে একে হাজির হয়েছে সাগর, হাতি লাঠি প্রমুখের কাছে যারা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রত্যেকেই স্বার্থমগ্ন, সবাই প্রত্যাখ্যান করে টুনটুনিকে। সাহায্য সে পেয়েছে সংঘবদ্ধ মশার কাছে।

"অমনি? পিন পিন পিন্ পিন করে যত রাজ্যের মশা বাপবেটি ভাই বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল, তাদের পাখায় ঝড় বইতে লাগল।"[১৩২]

এই প্রতিক্রিয়া নিপীড়িত মানুষেরই পাল্টা প্রতিবাদ। সংঘশক্তির প্রবল মূর্ছনায় ঘটেছে পালাবদল—

"হাতি বলে সাগর শুষি।
সাগর বলে আগুন নেবাই
আগুন বলে, লাঠি পোড়াই।
লাঠি বলে বিড়াল ঠেঙাই।
বিড়াল বলে ইঁদুর মারি।
ইঁদুর বলে রাজার ভুঁড়ি কাটি।
রাজা বলে নাপতে বেটার মাথা কাটি

নাপিত হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, রক্ষে কর টুনিদাদা, এসো তোমার ফোড়া কাটি।[১৩৩]

সৎ বোধগুলি অর্থাৎ বন্ধুত্ব, মমতা, বিশ্বাস যখন আহত হয়েছে তখনও নৈতিক প্রতিবাদের দণ্ড নেমে এসেছে অপরাধীর উপর। ক্ষমতার গর্বে রাজপুত্র যখন রাখাল ছেলের গভীর বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করেছে তখনই নির্মম যন্ত্রণার শিকার হয়েছে—

'রাজার মুখ-ময় সূঁচ গা-ময় সূঁচ মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ হইয়া গিয়াছে।

রাজা খাইতে পারেন না, শুইতে পারেন না... মনে মনে বুঝিলেন, রাখাল বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়াছি, সেই পাপে এ দশা হইল।'[১৩৪]

সূচবিদ্ধ রাজার এই যন্ত্রণা তারই অপরাধী মনের সৃষ্টি। রাখাল সক্রিয় প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু নিয়তির দণ্ড নেমে এসেছে রাজার ওপর, আর অনুশোচনা দগ্ধ উপলব্ধির মধ্য দিয়েই প্রতিবাদের চরম সার্থকতা ফুটে উঠেছে।

বিশ্বাসভঙ্গ জনিত ক্ষোভে আক্রান্ত তিতির পাখির জন্ম বৃত্তান্ত। শেখ ফরিদ বারাঙ্গনা রমনীকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কলঙ্কিত বৃত্তি পরিত্যাগ করে গণিকা শরণাপন্ন

হয় ফরিদের। তখন, আপন পবিত্রতা রক্ষার অজুহাতে নারীকে ত্যাগ করেন শেখ। আশাভঙ্গে মেয়েটির মৃত্যু ঘটে অনাদরে। পরজন্মে সে হয় তিতির পাখি। পুরুষের অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তার আহত লাঞ্ছিত নারীত্ব কেঁদে কেঁদে প্রতিবাদ করে—

শেখ ফরিদ বড় বেদরদ[১৩৫]

বঞ্চনাজাত এই ধিক্কার ছড়িয়ে পড়ে কাল থেকে কালান্তরে।

ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে ভাগ্যের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছে লোকমানস। উইলিয়ম ম্যাককুলক সংগৃহীত একটি গল্পেই[১৩৬] এর নজির মেলে।

এক বুড়ো বামুন। কপালের লিখনে সে আধপেটা খায়। বিধাতার ব্যবস্থায় অর্ধেক খাওয়ার পরই তার পাতে টিকটিকি পড়ে। সাবধানী বামুন আর কোন উপায় না দেখে বন্ধ ঘরে খাওয়া দাওয়া শুরু করল। বিধাতাও নিজের লিখন রক্ষার তাগিদে ছোট ব্যাঙ হয়ে লাফিয়ে পড়ল পাতে। ব্যাঙ সমেতই খাবার চলে গেল বামুনের পেটে। তারপরই শুরু হলো বিপর্যয়। বিধাতা বিহনে কালের গতি রুদ্ধ হয়, চতুর্দিকে ত্রাহি রব ওঠে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, জীব আর জড়ের জগতে এলাহি বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ লোকসমাজ বুঝিয়ে দিয়েছে দৈব উৎপীড়নে ক্লান্ত মানুষের মরিয়া পাল্টা আক্রমণও বড় তীব্র জ্বালাময়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বামুন বিধাতার কাতর অনুনয়ে মুক্তি দিয়েছে তাঁকে। মুক্তি অবশ্য শর্তসাপেক্ষ। বিধাতা বর দিয়েছেন বামুনের বাকি জীবন সুখে কাটবে আর মৃত্যুর পর ঘটবে অনন্ত স্বর্গবাস।

এইভাবেই প্রজন্ম ভেদে প্রতিবাদী চেতনা বিস্তৃত হয়েছে, নিপীড়িত জনমানস একে অপরকে সান্ত্বনা জুগিয়েছে রূপকের আবরণে, অত্যাচারিতেরাও প্রেরণা পেয়েছে প্রতিরোধে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে ধাপে ধাপে উন্নতির পথ ধরেছে মানুষ। গ্রহণ বর্জন, পরিশোধন বিবর্তনেই তার মননটি ঋদ্ধ হয়েছে। ঘটমান জীবন-প্রবাহের কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতীতি যখন লোকমননে দৃঢ় স্বীকৃতি পায় তখনই জন্ম হয় লোক-বিশ্বাসের। বিশ্বাস যতক্ষণ ব্যক্তি মনে অবস্থান করে ততক্ষণ সেটি ধারণা, কিন্তু এই বিশ্বাসই যখন মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা সমর্থিত হয়ে স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ করে, সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপে যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে, তখন তা পরিণত হয় লোকসংস্কারে।

লোককথায় যে বিশ্বাস ছিল প্রচলিত, সেটি সর্বপ্রাণবাদ। নৃতাত্ত্বিক টেলর বলেছেন—

Thus Animatism in its full development includes the belief in souls.[১৩৭]

অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে শুধুমাত্র চেতনার সঞ্চার করে যে মতবাদটি চালু সেটি Animatism আর আত্মার অস্তিত্ব যুগ হয়ে মতটি Animism নামে পরিচিত।

লোককথায় এই সর্বপ্রাণবাদের প্রভাবেই বৃক্ষ ফুল পাথর নদী কথা বলে। টুনটুনি আপ্যায়ন করে লাঠির মতো নির্জীব কাঠও—

কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই। বস ভাই। খাট পেতে দিই ভাত বেড়ে দিই খাবে ভাই?[১৩৮]

সর্বপ্রাণবাদের প্রথম ভূমিকাটি নিঃশেষিত হয়েছে আত্মার আবিষ্কারে। আত্মা সম্পর্কিত বিচিত্র ধারণার আভাস মেলে নানা লোকগল্পে।

প্রথমত, আত্মা বাহ্যরূপে অবস্থিত, আত্মার আধাররূপে বৃক্ষ-ফুল-প্রাণী, গলার হার ইত্যাদি জীবন প্রতীকরূপে ব্যবহৃত —

'The soul (heart life) conceived a dwelling apart from the living body, often in a tree or plant, animal, bird, egg, stone or other inanimate object and usually in a secret place for safe keeping.'[১৩৯]

বাংলার বিখ্যাত ডালিমকুমারের গল্পে আছে, সোনার হারের মধ্যেই ডালিমের জীবন।[১৪০] রাক্ষসীর প্রাণ-ভোমরাও থাকে সাপের মধ্যে, কখনো পাখীর মধ্যে—

'শুকের গলা ছিঁড়িল—রাক্ষসী গ্যাঁ গ্যাঁ করিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল।'[১৪১]

বিচ্ছিন্ন আত্মার ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সদৃশমূলক ও সংক্রামক (Contagious) যাদু। যে সব বস্তু, ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ। সেই ব্যক্তি বা বস্তু শারীরিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও উভয় উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম—

In Widespread Asiatic folk belief folktale and of objects (or animal plant etc) either chosen by or from with a person which manifests in some way the fact that he is in danger, may die or is dead.[১৪২]

The Man who wished to be perfect[১৪৩] গল্পে দেখা যায় যে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র গৃহত্যাগ করার আগে নিজের হাতে যে গাছ লাগিয়েছিল, সেটির সঙ্গে তার জীবনস্পন্দনও জড়িয়ে গেছে। এই গাছটি রাজপুত্রের জীবন প্রতীক।

আর একটি ধারণা ও আধিপত্য বিস্তার করেছে লোককথায়। সেটি আত্মার পৃথকীকরণ। জীবন প্রতীক থেকে এ ধারণাটি পৃথক। ফ্রেজার বলেন—

The departure of the soul is not always voluntary. It may be extracted from the body against its will by ghosts, demons or sorcerers.[১৪৪]

বাংলা লোকগল্পে সাধারণত অনিষ্টকারী মানুষই এই আত্মা স্থানান্তরিত করেছে। ডালিমকুমারের গল্পে তিনফুঁয়ে রাক্ষসীরাণীর আয়ু পাশা ভিন রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।[১৪৫]

'কচুপাতায়' প্রাণ গল্পেও রাগত সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রাণ কচু পাতায় মুড়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছে।[১৪৬]

মৃতের আত্মাও পরে জীবন্ত মানুষের উপর ভর করতে। 'A ghostly wife' গল্পে ব্রাহ্মণ বধূর উপর ভর করেছে আত্মা। জড় বস্তুকেও সে অধিকার করতে পারে। আশুতোষ ভট্টাচার্য সংকলিত লোকগল্পে দুষ্ট আত্মা ভাঁড়কে আশ্রয় করে বলে উঠেছে 'খেয়ে দেয়ে তেল বাঁধুক, এখন তো হাড়'।[১৪৭] আরো যে লোকবিশ্বাসের ঘনঘটা লোককথায় বারবার চোখে পড়েছে তা হলো জন্মান্তরবাদ ও রূপান্তরবাদ। স্টীথ থম্পসন বলেছেন—

A person or animal or object changes its form and appears in a new guise and we call that it transformation, but if the living being dies between the two stages we have reincarnation.[১৪৮]

অর্থাৎ, আকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমেই রূপান্তরবাদ স্বীকৃতি লাভ করে, আর যদি অন্যরূপ ধারণের পূর্বে প্রাণীটির মৃত্যু ঘটে, তাহলে ঘটে জন্মান্তর।

লোককথায় জন্মান্তর ঘটেছে নানা কারণে। পুরাকথায় পাই হতাশা, বেদনা, ক্ষোভ ও আত্মগ্লানিতে জর্জর মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর পর সে হয়েছে ইষ্টিকুটুম পাখি। কখনো বা বউ কথা কও। সাত ভাই চম্পা আর তাদের বোন পারুলও ছিল আটটি দেবতুল্য শিশু। সৎমায়েরাই চক্রান্ত করে তাদের মেরে পুঁতে দিয়েছিল পাঁশগাদায়। পরজন্মে তারাই ফুলগাছ হয়ে জন্মাল।[১৪৯]

পূর্বজন্মের কৃতকর্মের প্রভাবই পরজন্মে কার্যকর। ব্রাহ্মণ আর কায়স্থের গল্পে সংযত জীবনযাপন করেও ব্রাহ্মণ দুর্ভাগা। কারণ প্রাক্তনের ফলভোগ—

Brahman, in a former life, you were a great sinner......Accordingly it was marked in your desting that today you should be impaled.[১৫০]

অত্যাচারিত মানুষও পরজন্মে অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছে। 'চড়া চড়ী' গল্পে রাজার অবিচারে আপন শাবক হারা হল চড়ী। মনের দুঃখে তার মৃত্যু হলো। পরজন্মে সে হলো মন্ত্রীকন্যা। রাজা তাকে বিয়ে করলেন। নানা কূটবুদ্ধির জাল ফেলে রাজাকে অপদস্থ করেছে চড়ী।[১৫১]

অন্যায়ের প্রতিবিধানে বারংবার জন্ম গ্রহণের হদিশও মিলেছে। নীলকমল আর লালকমল প্রথমে ছিল অজিত আর কুসুম দুই ভাই। হিংস্র রাক্ষসী রাণী ভক্ষণ করেছে তাদের। উদ্‌গীরণ করেছে লোহার আর সোনার ডিম—'সেই ডিম ভাঙ্গিয়া লাল নীল রাজপুত্র বাহির হইয়া মুকুট মাথে খোলা তলোয়ার হাতে জোড়া রাজপুত্র শন্‌শন্ করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল।'[১৫২]

জন্মান্তরবাদের এই ক্রম অন্য গল্পেও পাই। পুষ্পমালা গল্পেই অনুতপ্তা রানী কন্যা পুষ্পকে বলেছে—আপনি তিনসত্য করিলাম। আপনসত্য ভেঙেছিলাম কোটালিনীর সাথে। মালিনী হইয়া জন্ম নিলাম সাপ হইয়া রাজ্য খেলাম, আজ মুক্ত তোমার হাতে।[১৫৩]

এখানে রূপান্তরবাদ আর জন্মান্তর বা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে। অভিধানে পাই—

A common incident of folktale combining the transformation group of motifs with punishment motives.[১৫৪]

রানীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের দীর্ঘ সফর শেষে বহু জন্ম ও রূপপরিবর্তনের পরই আপন কন্যার স্পর্শে তার শাপমুক্তি ঘটেছে।

রূপান্তরবাদ ব্যাপক প্রচারিত লোককথায় পুরাকথায় এর আধিপত্য বেশি। অতিথির অবমাননা করার ফল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী রূপান্তরিত কাক আর বাদুড়ে[১৫৫] মামাশ্বশুরের সামনে সিক্ত দেহের লজ্জা ঢাকতে বৌ হয়েছে শুশুক। কলাবতী রাজ্যকন্যা গল্পে বানর

বুদ্ধু হলো বুধকুমার, পেঁচা ভুতুম হলো রূপকুমার। শীত বসন্ত গল্পে দুয়োরানী যাদুপ্রভাবে টিয়াপাখিতে রূপান্তরিত। সুয়োরানীর ছেলেরা মাছে রূপান্তরিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাদু অবসানে মানবীমূর্তিতে দুয়োরানীর পুনঃ রূপান্তর ঘটে। মাছেরাও মানবদেহ ফিরে পায়।

The Origin of opium[১৫৬] গল্পে একরত্তি ইঁদুরটি ক্রমশ বলশালী আর দীপ্তিমান হয়েছে। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদেই তার ক্রমরূপান্তর ঘটেছে। ইঁদুর থেকে ক্রমে বেড়াল, কুকুর, শুয়োর, বাঁদর, হাতি আর সুন্দরী রমণীতে পরিণত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর প্রতিটি পর্যায়ের রূপধারণকারী প্রাণীগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে পোস্তগাছ।

যাদুবিশ্বাস আর মন্ত্রের জোরটাও খুবই বেশি। মন্ত্রপূত ডালিম, পাখির মাংস কিংবা ঐন্দ্রজালিক শেকড় খেয়ে গর্ভধারণ বাংলা লোককথার অতি পরিচিত অভিপ্রায়। সোনার কাঠি রূপার কাঠির স্পর্শে জাগরণ নিদ্রার ঘটনাও সুলভ।

মন্ত্র আর ইন্দ্রজালক বস্তুর উদ্দেশ্য দুটি। শুভকারক ও ক্ষতিকারক। বিদেহী আত্মা গরীব বামুনকে দিয়েছে মন্ত্রঃপূত হাঁড়ি, যাতার খাদ্যাভাব দূর করবে। সাত মায়ের এক ছেলে যাদু দড়ির লাঠির সাহায্যে সাগর পার হয়েছে—

O Stout Club! O strong rope. Take me at once to the other side.

Then immediately the club and the rope took him to the other side the ocean.[১৫৭]

দৃষ্টান্ত অজস্র। অমঙ্গলকারী যাদুপ্রভাবের প্রকোপ যত্রতত্র। কাঞ্চনমালা গল্পে হিংসায় উন্মত্ত মালিনী কাঞ্চনের অপূর্ব প্রতিকৃতিকে নষ্ট করতে চেয়েছে—

—মালিনী বাম পায়ের তলে ছুতো হাঁড়ির কালি মাখিয়া পটচিত্রের মুখের উপর রাখিয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়ে—যা পটচিত্রের চোক নাক বর্ণ সব গেল।[১৫৮]

পাতালকন্যা মণিমালাকেও বুড়ি অপহরণ করে। যাদু নৌকায় মন্ত্র পড়েছে—

ঘ্যাঘর চরকা ঘ্যাঘর
রাজপুত্র পাগল।
হটর হটর পবনের না
রাজপুত্রের কাছে যা[১৫৯]

সংস্পর্শমূলক যাদুভাবনার মঙ্গলকারী প্রভাব দেখতে পাই কিরণমালা গল্পে। যাদুজল ছিটিয়েছে কিরণ সব পাথরের উপর। পাথর পুনঃরূপান্তরিত হয়েছে রাজপুত্রে।[১৬০]

'The Man who wished to be perfect'[১৬১] গল্পে সন্ন্যাসী নিজ সিদ্ধিলাভের আশায় একের পর এক হত্যা করেছে নিরীহ মানুষকে। গল্পের নায়ক রাজপুত্র শেষে সন্ন্যাসীকে হত্যা করে, তখনই জীবন ফিরে পায় মৃতদেহগুলি। ফ্রেজার এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

A curious application of the doctrine of contagious magic is the relation commonly believed to exist between a wounded man and the agent of the wound, so that what ever is subsequently done by or to the

agent of must correspondingly affect the patient either for good or evil.[১৬২]

গল্পটিতেও দেখছি সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে তার ব্রত অসম্পূর্ণ থেকে গেছে আর জীবন ফিরে পেয়েছে মৃতেরা।

বিবিধ বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা সংস্কার।

'মধুমালা' গল্পে রাজা ভোর বেলা অস্পৃশ্য ঝাড়ুদারকে দেখে অমঙ্গল চিন্তায় আঁতকে ওঠে। অপরদিকে ঝাড়ুদার অপুত্রক রাজাকে দেখে বলে ওঠে—

'রাত না পোহাতে দেখিলাম আঁটকুড়ের মুখ
ভোজনে নাই সুখ, কপালে আজ অনেক দুখ।'[১৬৩]

ঐ গল্পেই জীবনে প্রথমবার শিকারে এসে বিফল রাজকুমার মদনমণি বন্ধু উজীর পুত্রকে বলেছে—

এ যে অলক্ষণ বড়, বড়ই অপমান
প্রথম মৃগয়া আসি আমার, বৃথা গেল বাণ।[১৬৪]

অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের মধ্যেও সংস্কারের প্রসার। 'Adventures of two thieves and their sons' গল্পে ডাকাত সর্দার বলেছে যে ডাকাতির পূর্বমূহূর্তে শব দর্শন মঙ্গলজনক—

Brahmans and Pandits say that if on starting on a journey one sees a corpse it is a good omen[১৬৫]

সংস্কারকে অনুসরণ করেছে নানা নিষেধ। বহির্জগতের সম্ভাব্য বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আগাম সতর্কবাণী বয়ে এনেছে এই সব নিষেধ। ফ্রেজার বলেছেন—

These taboos act, so to say as electrical insulators to preserve the spiritual force with which those persons are charged from suffering or inflicting harm by contact with the outer world.[১৬৬]

নিষেধভঙ্গজনিত নানা দুর্ঘটনার সূত্র ধরে লোকগল্প বিচিত্র মোড় ঘুরেছে। খোক্কসদের কাছে লালকমলের নাম আগে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। সেই নিষেধভঙ্গ করেছে লালকমল। ফলে—

মুখের কথা মুখে—দুয়ার কপাট ভাঙ্গিয়া সকল খোক্কস লালকমলের উপর আসিয়া পড়িল। ঘিয়ের দীপ উল্টিয়া গেল। লালের মাথার মুকুট পড়িয়া গেল।

The story of a Hiraman[১৬৭] গল্পেও পক্ষীরাজকে একবার কোড়া মারার নিয়মটি অমান্য করেছে রাজা। তখনই ঘোড়াও নিশ্চল, শক্তিহীন। নিষেধ অমান্য করলে হতে পারে ব্যাধি, এমন কি মৃত্যু—

'A violated tabu avenges itself and need not be punished by man. Disease and death overtake the breaker of tabu.[১৬৮]

এমনটিই ঘটেছে সুখুর ভাগ্যে। তিনডুব দিতে বারণ করেছিল চাঁদের মা বুড়ি। সুখু শোনেনি—

'তিন ডুব দিয়া উঠিয়া সুখু দেখে—গা-ভরা আঁচিল ঘা পাঁচড়া এই নখ, শনের গোছা চুল—কত কদর্য্য সুখুর কপালে।'[১৬৯]

ইতু দেবীর নিষেধ অমান্য করেছে উমনো, ফলে দৈব অভিশাপে আক্রান্ত বৃহত্তর লোকসমাজ—

উমনো যে পথ দিয়ে যায়, সেই পথে লোক মরতে লাগলো, ঘরে আগুন লাগতে লাগলো, চুরি ডাকাতি হতে লাগলো।[১৭০]

ট্যাবুর পশ্চাতে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাই কার্যকর। দেড় আঙুলে গল্পে কাঠুরে বৌ-এর অনুচিত তৎপরতার ফসলই দেড় আঙুল পরিমাপের সন্তান—'না-বলতে শশা খেলি, বুড়ীর শাপে পাতাল গেলি সাত দিন পর খেলে হাতির মতন ছেলে হইত, বোঁটটা হাতির শুঁড় হইত!–তা নয়–হয়েছেন এক টিকটিকি।—অর্থাৎ অবিমৃষ্যকারিতার কুফল সম্পর্কে ট্যাবুটি সতর্ক।

ট্যাবু সরবরাহ করেছে কিছু স্বাস্থ্যবিধি। যেমন, নবজাতকের সুরক্ষার জন্য সূতিকাগৃহ অপরিচ্ছন্ন রাখা চলে না। কিন্তু পেঁচো ভূতের গল্পে ময়রা বৌ সেটি করেছে। ফলে সদ্যোজাত সন্তানকে ভর করেছে পেঁচো—

'ময়রানী বড় নোঙরা, ঘরের কোণে ময়লা জড়ো করে রাখতো, তাই তো এখানে এসেছি, খেয়েছি ওর ছেলেকে।'[১৭২]

The Story of the Rakshasas গল্পে কেশবতী রাজকন্যা তার সাত হাত লম্বা চুল ঝিনুকের খোলায় জড়িয়ে ফেলেছে; কারণ—

".....it is the custom with women never to throw away hair, unaccompanied with something else. She tied the hair to a shell which was floating on the water.[১৭৩]

কেশ লঘুভার, যত্রতত্র উড়ে মালিন্য সৃষ্টি করতে পারে, তাই এই সতর্কতা। সংস্পর্শমূলক যাদুভাবনাও ক্রিয়াশীল, ঐ চুলটির দ্বারা যাতে অনিষ্টকারী ব্যক্তি কেশবতীর কোন ক্ষতি না করতে পারে তারই প্রতিবন্ধক ঝিনুকের খোলা।

শারীরিক শুচিতা রক্ষার তাগিদে নারী বহুক্ষেত্রে স্বেচ্ছাট্যাবু আরোপ করেছে নিজের উপর। ফকিরচাঁদ, পাতালকন্যা মণিমালা এই সব গল্পেই শত্রুরাজার হাতে বন্দী রাজকন্যারা ব্রতপালনের কবচ ধারণ করেছে—

At last she saw that she was a captive.She told that the ladies of the palace that she had taken a vow that she would not see the face of any strange man for six months.[১৭৪]

কুলপ্রতীক তথা Totemism — লোককথার জগতে এই বিশ্বাসটি দৃঢ় প্রোথিত। আদিম মানব তার গোষ্ঠী তথা কৌমের পরিচয় দিয়েছে পশু বা গাছের নামে। তারা মনে করত সেই পশু, গাছ বা পাথর থেকেই তাদের পূর্বজদের উৎপত্তি। তাই সেগুলি তাদের কুলপ্রতীক। বিশ্বাসটিই Totemism–

Totemism is the belief that a mystical relationship exists between a group of human beings who make up a kinship unit and a specis of plant or animal or less commonly some natural phenomenon.[১৭৫]

টোটেম ধারণার বশবর্তী হয়েই নারী কর্তৃক পশুপাখীর জন্ম বিপরীতে পশু কর্তৃক মানব সন্তান প্রসবের ঘটনাগুলি ঘটেছে।

কলাবতী রাজকন্যা গল্পে বুদ্ধু ন'রানীর, ভুতুম ছোটরানীর সন্তান। শীতবসন্তের গল্পেও বণিক পুত্র আলমারীতে যে টুনি পাখীর ডিম রেখেছে, তার থেকেই জন্ম নিয়েছে সুন্দরী কন্যা।[১৭৬]

বিপরীতক্রমে অশোকষষ্ঠীর ব্রতকথায় হরিণী প্রসব করেছে কন্যাকে।[১৭৭]

টোটেম প্রতীক অবয়বে চিরস্থায়ী হয়েছে The Boy with the Moon of on his Forehead[১৭৮] গল্পে। সেখানে সপ্তম রানী যে সন্তান প্রসব করেছে, জন্ম থেকেই তার কপালে চন্দ্র আর হাতে তারা চিহ্ন।

টোটেমের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের একাত্ম করার প্রবণতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন হার্বার্ট স্পেন্সার—

Savages first named themselves after natural of objects and then confvsing these objects with their ancstors of the same names, reverenced them as they already reverenced their ancestors.[১৭৯]

বাঘেড়া বংশের উৎপত্তি বিষয়ক পুরাকথাটি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখি যে এক ব্যক্তি মন্ত্রবলে বাঘে পরিণত হতো। বাঘ হবার পর, যে মন্ত্রপুত জলের সাহায্যে তাঁর পুনঃরূপান্তর ঘটত, একবার অসাবধানে সেই জলের কলসিটি গেল ভেঙে। তার আর মানুষ হওয়া হলো না। চিরটাকাল সে বাঘই রয়ে গেল। এইভাবে নিজেদের বংশের একটি বাঘ হইয়া গেল বলিয়াই পরিবারের অন্যান্য সকলে তাহার স্মৃতি টিকাইয়া রাখিবার জন্য বাঘ বলিয়া পরিচিত হইল, পুরুষানুক্রমে নামের সঙ্গে বাঘ উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিল। এইভাবে বাঘেড়া বংশের উৎপত্তি হইল।[১৮০]

অদৃষ্টবাদ — অদৃষ্টের প্রতি লোকসমাজের বিশ্বাস অটল। গবেষক স্টীথ থম্পসন সিদ্ধান্ত করেছেন—

......it is no wonder that folktales should concern themselves with the working of luck. Sometimes they are interested in examples of persons pursued by misfortune and sometines of those whose lucky star taves them from every adversity.[১৮১]

এই বক্তব্য লোককথায় প্রতি মুহূর্তে সত্য। The Brahaman's Luck[১৮২] গল্পে ভাগ্য যখন প্রতিকূল তখন অতি উৎকৃষ্ট রাজপ্রশস্তি রচনা করেও ব্রাহ্মণের দক্ষিণা জোটে দুটি মাটির পাত্র, আবার সেই ব্রাহ্মণই অনুকূল ভাগ্যের সহায়তায় রাজার মাথায় লাঠি মেরে লাভ করে অঢেল উপহার। কারণ, প্রহৃত রাজা যেই স্থানচ্যুত হলো, অমনি

সেই পূর্বস্থানে ভেঙ্গে পড়ল ছাদের অংশ। রাজা তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণকে রাজ জ্যোতিষীর সম্মান দিল।

ভাগ্য 'অদৃষ্ট পুরুষ' বেশে আবির্ভূত। তার সঙ্গে প্রায়ই উদ্যোগ আর বুদ্ধির সংঘাত লেগেছে। 'তাঁতির ভাগ্য' জাতীয় সাংসারিক গল্পগুলি এর উদাহরণ। ভাগ্যের সঙ্গে পুরুষকারের লড়াই একটি আন্তর্জাতিক অভিপ্রায়—

A good example is the tale of Luck and intelligence in which a test is made as to which of these qualities is most powerful.[১৮৩]

অদৃষ্ট পুরুষের অভিধা অনেক। তিনি বিধাতা তিনিই নিয়তি। মালঞ্চমালা গল্পে ধারা-তারা বিধাতা তিনজন উপস্থিত। তাঁরা সদ্যোজাত রাজপুত্রের জীবনে বিদ্যা, বুদ্ধি ঐশ্বর্যের পরিমাণ চিহ্নিত করে দিয়েছেন তার কপালে। কিন্তু আয়ুর বেলায়—

রাজপুত্রের আয়ু মাত্র বারো দিন। কলম নিয়া ধারা লেখেন। যত আঁক দেন সেই বারো [১৮৪] —দেখছি, বিধাতা নিমিত্ত মাত্র। বিধিলিপি মানুষের জন্মমুহূর্তেই নির্ধারিত। বিধাতা তাকে চিহ্নিত করেন মাত্র তাই রাজপুত্রের আয়ু বৃদ্ধিও হয় না—

ধারা বারো পিঠে শূন্য বসান, শূন্য কতো শূন্য। মুছিয়া মুছিয়া যায়।[১৮৫]

বিধাতাপুরুষ একই সঙ্গে রক্ষক ও ভক্ষক। 'কর্মসূত্র' গল্পে সাপ হয়ে কেটেছেন বামুনের বৌ আর তিন ছেলেকে। আবার সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে উপকার করেছেন ভিক্ষুকের। ঐ বিধাতা গল্প শেষে নিজেই কুমীর হয়ে বামুনকে গিলে ফেলেছে—

Thakur I am no prince I am Karmasutra! Still saying this he took the form of an allegator and seezing the Brahman, went off with him in a moment.[১৮৬]

পাদটীকায় সংগ্রাহক ম্যাক্‌কুলক মন্তব্য করেছেন—

'however well guarded what is said by Fate perishes' [১৮৭] একটি সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধার করেছেন—নিয়তি কেন বাধ্যতে।[১৮৮]

এই নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহও জমে উঠেছে। The Prince and the Sages[১৮৯] গল্পে। বারো বছরে রাজপুত্রের মৃত্যু হবে বজ্রাঘাতে এই নিশ্চিত ভবিতব্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে একদল সন্ন্যাসী। এমনভাবে সুরক্ষা দিয়েছে রাজপুত্রকে যে বিধাতা স্বয়ং, আপোসে বাধ্য হয়েছেন—

If you will not allow his life to be taken at all events, let one finger of his left hand remain unprotected so that the lightning struck it and he shall not die.[১৯০]

বিধাতার এই কাতরোক্তির মধ্য দিয়ে নিজ সম্মান রক্ষার কুণ্ঠিত প্রয়াস ফুটে উঠেছে। এই গল্পে ভাগ্যদেবতা একই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা এবং বিধাতারূপে সম্বোধিত হয়েছেন। এই শ্রদ্ধা শ্রোতার মনে ধর্মচর্চা সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে।

অধ্যাত্মচেতনা

লোককথায়, সংস্কৃতির ক্রমানুসারী রূপের সঙ্গেই দেবতত্ত্বের অনির্বার অগ্রসৃতি বৈচিত্র্য ও জটিলতার সন্ধান মেলে। গবেষক বলেন—

When a country is successfully invaded by a new religion, the old Gods are not immediately dismissed from being. For those of them who are rooted too deeply in the affection of the people to be dethroned entirely, some position in new religion is found by accommodation.[১৯১]

লোককথার ধর্মভাবনার মধ্যেও এই সমীকরণের উদ্ভাস। জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধির সঙ্গেই ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। অবনঠাকুরের বিশ্লেষণ—

আর্য এবং আর্যপূর্ব দুজনেরই সম্পর্ক যে পৃথিবীতে ওরা জন্মেছে তাকেই নিয়ে এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস।[১৯২]

আদিমতম সামাজিক ধর্ম বিশ্বাসের মূল রূপটা মাতৃকা উপাসনা। পরে এর সঙ্গেই যুক্ত উর্বরতাতন্ত্র। নারী ও পৃথিবী সমার্থক। পৃথিবী হলেন বসুমাতা। সুবারিষ ঠাকুরাণির ব্রতকথায় কামনা করা হয়েছে প্রচুর বর্ষণ সিক্ত উর্বরতা। ষাটাই মঙ্গলবারের ব্রতকথায় লোকমনের সন্তান-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়েছে গৃহস্থের ষাট হাজার পুত্রলাভের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ মাতৃকা শক্তির কাছে সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধিই কাম্য।

পরবর্তীকালে, আর্যদের দেবীর সঙ্গে অভিন্ন হয়েছে অনার্য দেবদেবী। শাস্ত্রীয় আশ্রয় পেয়েছেন। কিন্তু লোকায়ত ধারণা দমিত হয়নি। যেমন রালদুর্গার ব্রতমাহাত্ম্য। দুর্গা নামটি শাস্ত্রীয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সূর্যপূজা। বৈদিক সূর্যদেব নন মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যেই সূর্যের কৃপালাভ ব্রতের উদ্দেশ্য। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

There is a general tendency among women to metamorphosise male deties into female ones and it is probable that Durga is none other than the Sun God. The word Ral has been derived from the Sanskrit word Ratula meaning reddish. In mediaval Bengali the word raul means the sun directly.[১৯৩]

কালক্রমে মাতৃকাতন্ত্র নির্ভর সংস্কৃতির সঙ্গে পিতৃদেবতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতির যোগ ঘটলে অনিবার্যভাবে ব্যবহারিক জীবনে পুরুষ প্রাধান্য বাড়ল, আর মানস জগতে বিস্তৃত হল পিতৃদেবতার আধিপত্য। সূর্যদেব পূজিত হলেন পুরুষ রূপেই, কৃষকের শস্যক্ষেত্রের রক্ষক হলেন দেবতা ক্ষেত্রপাল আর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনার বরাভয় প্রদান করলেন নীলকুল-বাসুদেব।

আর্য-অনার্য সম্মিলিত ধর্মায়নের প্রক্ষেপ পড়েছে দেবকল্পনায়, এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি আগেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই।

যেমন দেবতা শিব। শিব স্বরূপে দুটি লক্ষণ রুদ্রত্ব আর শিবত্ব। গবেষক মতে, তা

আর্য ও অনার্যের শান্ত ও অশান্ত দ্বিবিধরূপের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা। লোককথায় এই সম্মিলিত রূপের প্রকাশ। The Origin of Rubies[১৯৪] গল্পে শিব ত্রিনেত্রধারী, ধ্যানী, যোগী। ঋগ্‌বেদে বর্ণিত রুদ্রদেবের মতো তিনি সর্বসংহারক—

When Siva finishes his meditations he will turn you to ashes by single glance of his eyes.[১৯৫]

The indigint Brahman গল্পে এই শিব কৈলাসের অধীশ্বর। এ গল্পেই তাঁর আর্যেতর মূর্তি।

He is as lord of the ghosts, revered by the Non-Aryan aborigines under one designation on another all over the country.[১৯৬]

পুষ্পমালা গল্পে এই শিবই ধন্বন্তরি জীবিত করেছেন মৃত চন্দনকে।

অথর্ববেদে রুদ্র কিরাত রূপী। শিবরাত্রির ব্রতকথাতেও দেখি শিব প্রসন্ন হয়েছেন ব্যাধের প্রতি, তার মাধ্যমেই শিবরাত্রির ব্রতটি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়েছে।

শিবের সঙ্গে উপস্থিত আছেন দুর্গা, কখনো তিনি পার্বতী (পুষ্পমালা), লোককথায় এর পরিচিতি দিয়েছেন লালবিহারী—

.......Goddess Durga, the consort of Siva the creative Energy of the Universe.[১৯৭]

লোককথার বুড়ো বামন দারিদ্র্যের ভার সহ্য করতে না পেরে তাঁর নামেরই শরণ নেয়—

Whenever he felt anxious on account of his poverty and his inability to support his wife and children, he groaned out–Durga Durga Durga.[১৯৮]

এই দুর্গার পুত্র কার্তিক, গণেশ। এঁরাও এসেছেন লোককথায়। আরও আছেন ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, প্রমুখ দেবগণ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—

In addition to the Saiva deities like Kartika, Ganesa and form of Durga, we find images of Indra. Kuvera Ganga Yamuna and Matrikas from the sixth century A.D-onwards.[১৯৯]

অর্থাৎ অসংখ্য দেব-দেবী সম্বলিত হিন্দু ভাবনার অগ্রগতি ষষ্ঠ শতক থেকেই।

'কাঞ্চনমালা' গল্পেই নাচে গানে গম্‌গম্‌ ইন্দ্রের সভার উপস্থিতি, সোহাগের ট্যাপারি গল্পে এসেছেন কুবের। আরও এলেন লক্ষ্মী। ভাদ্র-লক্ষ্মী, কোজাগরী-লক্ষ্মী, কার্ত্তিক-লক্ষ্মী, পৌষ-লক্ষ্মী, চৈত্র-লক্ষ্মী প্রমুখ বিচিত্র তাঁর রূপ। ব্রতকথাও অসংখ্য। ঐতিহাসিক গবেষক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "এই লক্ষ্মী কৃষি সমাজের মানস কল্পনার সৃষ্টি, শস্য প্রাচুর্যের এবং সমৃদ্ধির তিনি দেবী।.....এই পূজাব্রতের যে-সব ব্রতকথা এবং পৌরাণিক কাহিনী জড়িত তাহা একত্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে লক্ষ্মীর এই লৌকিক মানস কল্পনাই ক্রমশ পৌরাণিক লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।[২০০]

ষষ্ঠী এবং চণ্ডীর যে অসংখ্য রূপ কল্পনা তার মূলেও প্রজনন শক্তিতে এবং মারী

নিবারক যাদু বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন।

ব্রতকথায় মনসা দেবীও প্রভাব বিস্তার করেছেন। প্রাক্-আর্য কৌম বাঙ্গালী সমাজে মনসার উদ্ভব লৌকিক সর্পপূজা, বাস্তু আরোপ, বৃক্ষদেবতার ভাবনার সঙ্গে বৈদিক লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ঐতিহ্য জাঙ্গুলী দেবীর কল্পনা ও তৎসহ নানা উপাখ্যানের সমবায়ে মনসা পূজার সৃষ্টি। এই মিশ্র নির্যাস ব্রতকথাগুলিতেও পাওয়া যায়।

অষ্টনাগ পরিবৃতা মনসা নাচছেন একটি গল্পে। সেই অষ্টনাগের নাম — আড়োন, পাড়োন, ঢোঁড়া, বোড়া, পুঁয়ে, আরুল, পারুল, কেউটে।[২০১]

অষ্টনাগের ধারণাটি পৌরাণিক, নামগুলি লোকমানসের স্ব-কল্পিত।

মিশ্ররূপের প্রভাবেই—

'মা মনসা সোনার খাটে শুয়ে আছেন—বাপ জরুৎকারু রূপার সিংহাসনে বসে আছেন। ঐ গল্পে মনসার ভিন্ন ভয়ঙ্করী রূপ—'মা মনসা পড়ে আছেন ঢেঁকির মতো পেট করেছেন, কুলোর মতো বেত করেছেন কেঁচো ঘুঘরে ব্যাঙ পোকা মাকড় মুখের মধ্যে যাচ্ছে।[২০২]

শক্তি দেবী কালিকার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে নানা গল্পে। ইতিহাসের বক্তব্য,—

খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম অষ্টম শতকের পূর্বেই বাঙলাদেশের নানা জায়গায় শক্তিপূজা প্রবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।....শাক্তধর্মের প্রাক তান্ত্রিক রূপের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তোত্তর পর্বে জয়দ্রথ যামল গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ঈশানকালী রক্ষাকালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী প্রভৃতি নানারূপের সাধনা বর্ণিত আছে।[২০৩]

কালীর বিচিত্র রূপের দৃষ্টান্ত লোকগল্প তুলে ধরেছে। Phakir Chand[২০৪] গল্পে কালী প্রাণদায়িনী। শঙ্খমালা গল্পেও দেবীকালী সাগরের অধিষ্ঠাত্রী, বাণিজ্য তরীর রক্ষাকর্ত্রী। তিনি ষোড়কালী। পূজায় তুষ্ট হলে তিনি নৌকাদান করেন—দোহাই দোহাই কালী মাগো! সওদাগর আইল তোর ঘাটে। চৌদ্দডিঙ্গায় উঠে বৈস মা তোমার যোড় আসনের পাটে।[২০৫]

এই ঘটনার বিপরীত দৃশ্য লোটনষষ্ঠীর ব্রতকথায়। সেখানে সংহারকালী নিজ অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন—'আমি সংহার করি জীবন দিতে পারি না।'

কালী সাধনার অন্যতম অঙ্গ তন্ত্রাচার ও নরবলি। 'The Man who wished to be perfect' গল্পে এইরকমই এক তান্ত্রিকের দেখা মেলে—

"the medicant was a worshipper of the goddess Kali, he belonged to that sect of Hindus who seek perfection from intercourse with the spirit of departed man."[২০৬]

দেবতাদের বাহনরাও অবহেলিত নয়। এরা দৈব-বার্তাবাহক, কখনো বা দেব প্রতিভূ। লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায় বাহন পেঁচাপেঁচীর শাবকগুলির পরিচর্যা করেছে ব্রাহ্মণ সন্তান, পরিণামে সে পেয়েছে লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য সমৃদ্ধ জীবন। ষষ্ঠীপূজার ব্রতকথায় গৃহস্থরা স্বকৃত পাপের দায় আরোপ করেছে বেড়ালের উপর। ষষ্ঠীর বাহনকে দোষারোপ করার

অপরাধে সে নির্বংশ হয়েছে। বাহনকুলের এই প্রতিপত্তির মূলে আছে সংস্কার ও শ্রদ্ধাবোধে সম্পৃক্ত টোটেম গোষ্ঠীর আত্মীয়তা। আদিতে যে পশু বা পক্ষী ছিল কুলদেবতা, লোকায়ত মানবকল্পনার বিস্তার আঞ্চলিক রূপমণ্ডলে অভিঘাতে তারাই বাহন-এ পর্যবসিত—

With the political and relegious progress in the country anthropomorphs gradually replaced the theriomorphs thus converting the animal into mere clan symbols now known as vehicles or vahans ?[২০৭]

টোটেম সংস্কারের একটি পরিণতি বাহন অর্চনায় লীন হয়েছে। আবার পশুপক্ষীর দেবতারূপেও আবির্ভূত নানা ঐশ্বরিক সত্তা। তাঁদের উদ্ভবমূলে প্রধানত আঞ্চলিক প্রয়োজনই প্রকট। সুন্দরবনের দক্ষিণরায়, বাবা ঠাকুর বড়-খাঁ গাজী, বনবিধি কালুরায় প্রমুখ অসংখ্য দেবীমাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুরাকথাগুলি এর স্মারক।

ধর্মচেতনায় সংঘাত ও সমন্বয় দুর্লক্ষ্য নয়। গবেষক মতে 'বড় খাঁ গাজী স্বয়ং ব্যাঘ্র দেবতা ও প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্র দেবতা। দক্ষিণরায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভাঁটি অঞ্চলে দক্ষিণারায়ের সঙ্গে গাজী সাহেবের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর হলো সন্ধি। এ সন্ধি শুধু দেবতাদের নয়, হিন্দু মুসলমানেরও সন্ধি।

সত্যনারায়ণ যখন সত্যপীর হলেন তখনও সমন্বয়ের বাণীই শ্রুত হলো—

The Fakir said that Pir is the same name as Narayan and there is no difference between Vedas and Koran. Presently the Fakir assumed the form of Vishnu Narayan.[২০৮]

ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই উদারতা নিঃসন্দেহে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

ধর্মচারণার সঙ্গে জড়িত মন্দির নির্মাণ। Indian Antiquiry পত্রিকায় সংগৃহীত একটি লোকগল্পে গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত গনেশ-মন্দির, সেখানে শিব-পার্বতীও পুজো পেয়েছেন প্রত্যহ—

"At the extremity of the village was a temple of Ganesa, where he used to worship Siva and Durga."[২০৯]

গণেশ এখনে শিব-পার্বতীর অনুগত সন্তান, তিনি বাঞ্ছাপূরক, ঐশ্বর্যদানকারী। এই ধারণাটির সর্মথন করেছেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার—

According to popular belief, Ganesa is the God who removes obstacle (Vighnahara) and bestows success (Siddhidata)[২১০]

স্মরণীয়, লোককথায় মন্দির প্রসঙ্গ এসেছে, গল্পের অগ্রগতিতে, ঘটনার অনুষঙ্গ হিসেবে, ধর্মের তাগিদে নয়। The story of the Rakshasas গল্পের নায়ক চম্পাদল রক্ষপুরীতে আত্মগোপনের জায়গা খুঁজে পেয়েছে শিবমন্দিরে, বেলপাতার স্তূপের আড়ালে বোঝা যাচ্ছে রক্ষ সমাজে অর্থাৎ অনার্যজীবনচর্যাতেও শৈব বন্দনা প্রচলিত। আর মন্দিরটিও রক্ষপুরীর মধ্যস্থলে। শিব এখানে গৃহদেবতা।[২১১]

নীল রাজার অর্থানুকূল্যে মন্দির নির্মিত হয়েছে শঙ্খমালা গল্পে এই মন্দির মাতৃক্রোড়ের

স্মারক, বাৎসল্যের প্রতীক, সেখানে কোন দেবতা নেই, কারণ—

মা জননী ভোগবতী সেই পাথরের নীচে
ঘুমিয়ে যেন আছেন আপন চোখের জলে ভিজে।[২১২]

মন্দির ধ্বংসের মতো নির্মম কাজটিও ঘটেছে—

The Kotwal's Daughter গল্পে। ইন্দ্রের অভিশাপে কোটালকন্যা রূপান্তরিত হয়েছে বাদুড়ে। অভিশাপ মুক্তির পথটি এইরূপ—

"When someone will break down the temple where you must abide in the form of a bat, plough the land on which it is built plant rice and vegetables, there and with these feed ten thousand Brahmans all this in a single night then you will obtain deleverence and be permitted to enter heaven again."[২১৩]

মন্দির ধ্বংসের মতো বৈপ্লবিক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন ইন্দ্র। তিনি আর্যদেবতা। বাদুড়মূর্তির অধিষ্ঠান টোটেম গোষ্ঠীর স্মারক। প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতিটির মধ্য দিয়ে অনার্য দেবতার অবলুপ্তি কৃষি এবং আর্যসভ্যতাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ভোজনের উল্লেখ আর্যব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকেই চিহ্নিত করে অর্থাৎ, মন্দির মারফৎ ধর্ম ও সভ্যতার পালাবদলই সূচিত করা হয়েছে।

বহু কিংবদন্তী মন্দিরকে আশ্রয় করেই বেড়ে উঠেছে। যেমন মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলে অবস্থিত বর্গভীমার মন্দিরটি। কথিত, এই মন্দিরের দেবীর কাছে নতি স্বীকার করেছিল দুর্দান্ত দস্যু কালাপাহাড়। দরজায় নিজের পাঞ্জার ছাপ রেখেই সে ফিরে যায়। এখন কালাপাহাড়ের সঙ্গে এই মন্দিরের যোগসূত্রটি কেমন করে গ্রথিত হলো, তা জানা দরকার।

কালাপাহাড় সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মতগুলি একত্র করলে জানা যায়—

ক) সুলেমান করোনারী ১৫৬৩-১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। তিনি সেনাপতি কালাপাহাড়ের সাহায্যে উড়িষ্যা বিজয় সম্পূর্ণ করেন।[২১৪]

খ) কালাপাহাড় জনৈক মুসলমান ললনার প্রেমে পড়েন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ভীষণ হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে পড়েন। কাশী, কামরূপ, পুরীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশে অসংখ্য দেবমন্দির ভঙ্গ আর দেবমূর্তি চূর্ণ করেন।[২১৫]

গ) From the neighbourhood of Jaipur the invading Afghan army sent off a strong detachment under Kalapahar to raid the temple of Jagannath which was famous for the wealth accumulated in it.[২১৬]

অর্থাৎ কালাপাহাড় ধ্বংসাত্মক মাতনে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়েছে সুলেমান করোনারীরই আদেশে, লক্ষ্য মন্দিরের অতুল ঐশ্বর্য। অপরদিকে তমলুক প্রদেশটি উড়িষ্যা সংলগ্ন অঞ্চলে—

"তমলুকের উত্তরে, বর্ধমান, কালনা, পূর্বে দক্ষিণের সমুদ্র, পশ্চিম-দক্ষিণে কলিঙ্গ

রাজ্য উড়িষ্যা, প্রাচীন কাল থেকেই কলিঙ্গ উড়িষ্যা তমলুকের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ।"[২১৭]

কালাপাহাড় তমলুকের দেবমন্দিরগুলির কতটা ক্ষতিসাধন করেছেন বা আদৌ করেছেন কি না সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট মত নেই, মনীষী দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "উড়িষ্যা হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন কালে তিনি শত শত হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া দেবমূর্ত্তি সমূহ অপবিত্র স্থানে ফেলিয়া দেন।... গৌড়ে ফিরিয়া আসিয়া কালাপাহাড় অভিযানের মুখ ফিরাইয়া কামরূপ, আসাম, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবিহারের কতকাংশে ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন।[২১৮]

তাহলে দেখা যাচ্ছে তমলুক ও কলিঙ্গের মধ্যে প্রাচীনকালে নৈকট্য ছিল, অথচ কালাপাহাড় তমলুকের বর্গভীমার মূর্তিটির কোন ক্ষতিসাধন করে নি। বর্গভীমার মূর্তিটি একখণ্ড পাথরে খোদাই করে রূপায়িত করা। সেটি আবির্ভূত হয় ধীবরের গৃহে। সম্ভবত উড়িষ্যার প্রতিবেশী তমলুক প্রদেশের অধিবাসী ধীবরগণ, বৃহত্তর সমাজে যাতে তাদের দৈবী মাহাত্ম্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্যই পরিচিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব কালাপাহাড়ের সঙ্গে দেবীমূর্তির সম্পর্ক স্থাপন সূচক কিংবদন্তী গড়ে তুলেছে।

ধর্ম নিয়ে বিভেদ সঙ্কীর্ণতা, অধিকারের লড়াই দেব মর্যাদাকে কলুষিত করেছে। The Evil Eye of sani[২১৯] গল্পে সৌভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে দুর্ভাগ্য দেবতা শনির আত্মসম্মানের লড়াই শুরু হয়েছে। বলি হয়েছেন রাজা শ্রীবৎস। পক্ষান্তরে প্রকৃত ধর্মচেতনার উপস্থিতি পার্থিব মানুষেরই মধ্যে। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর ব্রতকথায়, রাজা সন্তানসম প্রজাকেই আর্থিক সাহায্যের উদ্দেশ্যে কিনেছে অলক্ষ্মীমূর্তি। স্পর্শ দোষের আশঙ্কায় একে একে তাকে পরিত্যাগ করেছেন কুললক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী। সবশেষে ধর্ম যখন রাজপুরী ত্যাগের উপক্রম করেছেন তখন রাজা ধর্মকেই কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করেছে। ধর্মের পুনঃস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছে ঐশ্বর্য, রাজমহিমা। সেই সঙ্গেই আদর্শ মনুষ্যত্বের বিজয় মহিমা ঘোষিত।

মানসশুদ্ধিই ধর্মের মূলমন্ত্র সেই বোধ উচ্চারিত হয়েছে দেবপরামর্শে ও নীলপূজার ব্রতকথাতে। ষষ্ঠী উচ্চারণ করেছেন সতর্কবাণী—

শুধু কি বারব্রত করলেই হয়, ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকা চাই, মন পবিত্র রাখা চাই। সকলের কাছে নীচু হওয়া চাই, তবেই সব হবে।

রবীন্দ্রবাণীতেও অধ্যাত্মচেতনার এই স্বরূপটি ফুটেছে—

True emancipation from suffering which is the inalienable condition of the limited life of the self, can never be attained by fleeing from it, but rather by changing its value in the realm of truth– the truth of the higher life of love.[২২০]

অর্থাৎ পলায়নী মনোবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনকে আলিঙ্গন করলে তবেই শুদ্ধতর অধ্যাত্মলোকে উত্তরণ সম্ভব। লোককথার বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় প্রসারিত অধ্যাত্মচেতনার এটাই সার কথা।

শিক্ষা

"দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্ন মহাধনম্"— দান করলেও ক্ষয় হয় না, বিদ্যারত্ন এমনই মহাধন। লোককথায় উৎসাহী বিদ্যার্থী বা শিক্ষাগুরু, কারোরই অভাব নেই—

"বড় পড়ুয়া পণ্ডিত বামুন বাড়ী একটা টোল খুলিয়া কতগুলি ছাত্র জোগাড় করিয়া ছাত্র পড়ানো আরম্ভ করিল।"[২২১]

রাজপ্রাসাদে, রাজার উৎসাহে বসত পাঠশালা। পরিবেশ ছাত্রছাত্রীর কলকাকলিতে মুখর—

দিনরাত হিলিমিলি কিলিমিলি কাক বকের হাট।[২২২]

পুষ্পমালা গল্পে নারী পুরুষের সহশিক্ষার প্রসঙ্গ এসেছে—

একই গুরুর কাছে পড়ে দুইজন
পুষ্পের প্রতিমা কন্যা, কোটালের চন্দন নন্দন।[২২৩]

পুষ্পমালা রাজপুত্রী। তাই আভিজাত্য অনুযায়ী তার আসনটি পৃথক —

গুরু পড়ান ! রাজকন্যা বসেন সিংহাসনে আর কোটালের ছেলে সেই সিংহাসনের নীচে মাটিতে বসিয়া লেখেন।

অধ্যয়ন শুরু পাঁচবছর থেকে —

পঞ্চম বছর হ'তে কন্যা পুষ্পমালা
রাজা দিল পাঠশালা।[২২৪]

গুরুকে ছাত্রছাত্রীরা মান্য করত, প্রয়োজনে জটিল সমস্যার সমাধানে শরণ নিত এই গুরুর কাছে। পুষ্পমালা গল্পে উদভ্রান্ত পুষ্প আর চন্দন গুরুর উপদেশ শিরোধার্য করেছে—

"রাজকন্যা কোটালপুত্র, দুজন বলিলেন—"গুরু! পিতা মাতার সত্য রাখি কি না রাখি।"

অনেকক্ষণ পড়িয়া শুনিয়া গুরু বলিলেন,—"পুষ্প, চন্দন ... দেখ সত্য রাখিলে স্বরগ, না রাখিলে পাতাল।"

শুনিয়া গুরুর চরণে তিন সত্য শপথ করিয়া বাপ মাকে মুক্তি দিয়া পুষ্প বসিল নীচে, কোটাল সিংহাসনে।"[২২৫]

গুরুদক্ষিণার প্রসঙ্গটিও ঐ গল্পে পাই। পুষ্প গুরুকে "গলার হার, হাতের কাঁকন, আর চন্দন হাতের তাজ, বাজবন্ধ দক্ষিণা দিয়েছে।"[২২৬]

গুরুর ইচ্ছাপূরণ করতে ছাত্র পাড়ি দিয়েছে দুর্গম প্রদেশে, পরশপাথরের সন্ধানে— The Story of the Touchstone গল্পে। [২২৭]

আবার শিয়াল পণ্ডিত যখন একটির পর একটি কুমীর শাবক আত্মসাৎ করেছে, তখন সম্ভবত গুরুর তীব্র লালসার কাছে অসহায় ছাত্র আর অভিভাবকের সঙ্কটেরই অস্পষ্ট দ্যোতনা মেলে।[২২৮]

বিদ্যাশিক্ষার উপকরণ " পাটপুঁথি কলমদান, দোয়াত কলম" আর শিক্ষণীয় বিষয়

অজস্র।[২২৯]

ঐতিহাসিক বলেন, "আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় ছিল বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণ।[২৩০] বেদ ও পুরাণ পাঠ একাধিক লোককথার পরিচিত অধীত বিষয়—

"রাজপুত্র মদনকুমার আঁধারপাতাল পুরে হাসেন, খেলেন, লেখেন, পড়েন। বারো বেদ, অষ্টপাঠসাঙ্গ"—[২৩১]

শঙ্খমালা গল্পে সওদাগর শঙ্খমণির ও প্রবল অনুরাগ ভারত-পুরাণ পাঠে।

বিবিধ শ্লোকার্চনায় মুগ্ধ রাজারা প্রায়শই সম্মান দক্ষিণা দিয়েছে ব্রাহ্মণদের। The Brahman's Verse[২৩২] The Brahman's Luck[২৩৩] এই গল্পটি তার স্মারক The Lucky Rascal গল্পে পুঁথিগত বিদ্যার নীরস একঘেঁয়েমি কাটাতে ব্রাহ্মণ পুত্র শিখেছে জ্যোতিষবিদ্যা। The Two Footed Cattle একটি উল্লেখ্য গল্প। তিন বামুন না বুঝে মুখস্থ করেছে রাশি রাশি সংস্কৃত শ্লোক। রাজদর্শনে ইচ্ছুক চার ব্যক্তি মধ্যরাত্রে রাজকীয় বিশ্রামাগারে প্রবেশ করেছে। রাজদম্পতিকে নিদ্রিত দেখে তাদের সিদ্ধান্ত—

In my book it is written that a woman is like a river. Then here is the Ram. Come, let us go to the Rani and Bathe.[২৩৪]

এই উদ্ভট চিন্তার ফলেই নেমেছে বিপর্যয়। প্রমাণিত হয়েছে ঐ মূর্খের দলই দু'পেয়ে মানবেতর প্রাণীর প্রতিরূপ।

সুতরাং পুঁথিগত বিদ্যা আত্মস্থ করার জন্য প্রয়োজন বিশ্লেষণী চিন্তা শক্তি। জীবনকে অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণই প্রকৃত শিক্ষাবৃদ্ধির সহায়ক। চূড়ামণির কিস্‌সা গুলিতে জীবনের প্রতিটি বাঁক থেকে উঠে এসেছে শিক্ষণীয় তথ্যাবলী।

শিক্ষার একটি দিক বৈজ্ঞানিক চেতনা। জলদানী রাজকন্যার গল্পে এসেছে প্রতিফলনের সূত্র —

এই কুয়োর গায়ে আয়না বসিয়ে দিয়ে কুয়োতে অল্প কিছু সোনা ফেলে দিলেই কুয়ো সোনায় ভর্তি হয়ে যাবে।[২৩৫]

চুম্বকের আকর্ষণী ক্ষমতাটি লোকপ্রতিভার অবগত ছিল। 'একতোলা কন্যা' গল্পে কামারের ছেলে বলেছে—

"আমি লোহা দিয়ে বক তৈরি করতে পারি, সে বক জল থেকে মাছ ধরে খেতে পারে। মাছও তৈরী করতে পারি।"[২৩৬]

চৌর্যবৃত্তিও শিক্ষণীয় বিষয়।

The adventure of two thieves and their sons" গল্পে চোর চক্রবর্তী এই সব গল্পে চুরি বিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা উপস্থিত। বহু গল্পে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের বুদ্ধিদীপ্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছে চোরেরাই। লোককথায় The Adventures of two thieves গল্পে চোরের অভিনব কৌশলের দেখা মেলে। রাজপ্রাসাদের সিংদরজায়

প্রতি প্রহরে ৩২ জন নিরাপত্তাকর্মীর বদল হয়। সেই রক্ষীদলে মিশে একের পর এক ফটক পার হয়েছে চোর। তারপর ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার তালে তালে দেওয়ালে পেরেক পুঁতে পৌছে গেছে রাজ-শয়ন কক্ষে। তাই লোককথায় চোরের অভিধা erratic genius আর চুরিবিদ্যাও শিল্পকর্মেরই সামিল।[২৩৭]

ব্রতকথা, পুরাকথাগুলি নীতিবোধের আকর। অন্যায়ের প্রতিফল, লোভের পরিণাম ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়েছে সেখানে। মৌনী অমাবস্যার ব্রতকথায় পাপমুক্তির নির্দেশটি এই প্রকার —

এই বলের ভিতর এক কুটে রোগী আছে, তার মাথায় এক ভাঁড় দই ঢেলে দিয়ে সেই সমস্ত দই আবার জিভ দিয়ে চেটে সেই ভাঁড়েতে তুলবে, তার অমঙ্গল কেটে গিয়ে আবার মঙ্গল"।

এই নির্দেশটি পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয়জয়েরই শিক্ষা দেয়। আবার 'বধূর লোভ' গল্পে দেবতার বিরুদ্ধে মানসিক সংগ্রাম শুরু করেছে গৃহস্থ-বৌ। সম্বল শুধু তার ধৈর্য আর নিষ্ঠা।[২৩৮]

অরণ্যষষ্ঠীর মন্ত্রণায় আপন সন্তান যত পীড়নই করুক না কেন, বধূর মুখে সর্বদাই মধুর বুলি—

"ষাট্ ষাট্ ষাটের পুৎ গোবিন্দ। তুমি বেঁচে থাক। গৃহস্থ বধূর আচরণই সমগ্র লোকসমাজকে শিক্ষা দিয়েছে। হ্যাভেল যথার্থ্যই বলেছেন—

"The root of Indian religion is to be found in the daily life of the people rather than in dogmas or religious feast."[২৪০]

এইভাবেই পবিত্র ধর্ম ও নীতিশিক্ষা লোকজীবনে সমার্থক হয়ে গেছে। হরিষে, মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতকথার মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা গৌণ হয়ে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে জীবনদর্শন — সুখের প্রকৃত মূল্য তখন অনুভব করা যায়, যদি তা দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন—

Spiritual education was a part of spiritual life itself, which comprehend all life.[২৪১]

লোককথায় প্রদত্ত শিক্ষা সম্পর্কেও সেই জের টেনেই বলতে পারি—

It must Co-operate with the village round it cultivate land, breed cattle, spen cloths, press oil from oil seeds, it must produce all the necessaries, devising the best means, using the best materials and calling science to its aid. [২৪২]

লোককথাতেও তাই জীবন থেকেই উঠেছে শিক্ষণীয় নিয়ম নীতি উপদেশ, ঠাকুর ও তার ভৃত্য মধুসূদন গল্পে[২৪৩] বামুন ঠাকুর পথ্চলতি উদাহরণের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছে ভৃত্যকে। এছাড়া বহু লোকগল্পের (যেমন ইতিহাসমালার গল্পগুলি) অন্তে বিবৃত নীতি বোধক উদ্ধৃতি। শ্রোতা সেই নীতিগুলির সাহায্যে আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে জীবনে প্রয়োগ

করতে পারে।

লিখন

বর্ণমালা পরিচয় শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ। লোককথার সদস্যরা শুধু অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নই ছিল না ঘটনার অগ্রগতিতে, তাদের রচিত লিখন বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছে।

মালঞ্চমালা গল্পেই লিখনের প্রয়োজনীয় ভূমিকা—সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে। নিরুদ্দিষ্ট পুত্র, বারো বছর পরেও বহাল তাবিয়তে আছে, এই শুভ খবরটি মালঞ্চ লিখেছে চিঠিতে—

আমার শ্বশুর মহারাজ—

বারো দিন ছিল আয়ু, আজ পূর্ণ বারো হি বছর

দুধবর্ণ রাজার ঘরে চন্দ্রমাণিক পাবে রাজবর।।

ডাকহরকরার কাজটি করেছে হরিকালী,[২৪৪]একটি ঘোড়া উল্লেখ্য সোনাফার বাদশা গল্পেও অশ্বের দ্রুতগামিতা তাকে হাওয়াবাজ-দরিয়াবাজ [২৪৫] অভিধায় ভূষিত করেছে।

অঙ্গীকার-পত্র হিসাবেও লিখনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। "পুষ্পমালা" গল্পে রাজা ভবিষ্যতের অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করেছে।

কোটালের ছেলে হয়, আমার মেয়ে হয়—
বিবাহ দিব।
কোটালের মেয়ে হয়, আমার ছেলে হয়,
কোটালের গর্দ্দান নিব।
কোটালের ছেলে হয়, আমার ছেলে হয়—
কোটালকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব।[২৪৬]

—পুত্রকন্যা জন্মের পূর্বেই রচিত হয়েছে এই অভিনব চুক্তিপত্র।

বিবাহের অঙ্গীকারকেও লিখিত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে 'কাঞ্চনমালা' গল্পে। দেশে দেশে অনুসন্ধানী ভাটেরা উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর খোঁজ পেয়েছে। পরের প্রতিক্রিয়া—

ভাইরে কোলাকুলি দাও, এই ঠাঁই সত্য হইল।

এইখানে পত্র কর......

লিখন লিখিল তারা যুগল বটপাতে!

দুই পত্র মিলাইলে—

মিলিল রূপ-কাঞ্চন যেন দুজনায়, হাতে হাতে।[২৪৭]

আসন্ন বিপদের আভাসও লিখনের মাধ্যমেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শ্বেত ও বসন্তের ধাত্রী ছেলে দুটিকে আগাম সতর্কবাণী পাঠিয়েছে লিখনের মাধ্যমে। তেমনি সতীনের ছেলেকেও হত্যার ষড়যন্ত্র বয়ে এনেছে লিখিত চিঠি। সাত মেয়ের এক ছেলের গল্পে বিমাতার কার্যকলাপ—

She gave him a letter of introduction to her mother, in which she

requested her to devour the boy the moment he put the letter into her hands.[২৪৮]

চূড়ামনির কিস্সাগুলির একটি গল্পে জনসমক্ষে প্রচারের জন্য শ্বেতপাথরে সংবাদ খোদাই-এর প্রসঙ্গটি পাই।—লিখন।

"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা এই কথা তুমি বা তোমার পুত্র বা কন্যা প্রমাণ করতে পারলে সেই হবে দেশের রাজা।"

—দেখাই প্রতিপক্ষের কাছে প্রতিযোগিতার শর্তাবলী এই লিখনের মাধ্যমেই প্রচারিত।[২৪৯]

সমগোত্রীয় সদস্যদের কাছে পরিচিতি দানের প্রসঙ্গ এসেছে ডালিমকুমারের গল্পে—

পাশাবতী লিখন দেখিতে পাইল—'দানব যক্ষ রক্ষ হইলে লিখন থাকিবে।'[২৫০]

ঐ গল্পেই পত্রবাহক সূতাশঙ্খ—

যাও ওরে সূতাশঙ্খ বাতাসে করি ভর—

যম-যমুনার রাজ্য শেষে পাশাবতীর ঘর

এই লিখন দিও নিয়া পাশাবতীর ঠাঁই[২৫১]

ব্যবসায়িক জমা খরচের ক্ষেত্রে লিখনের থেকেও নৈতিক বিশ্বাসের মর্যাদা অনেক বেশি, এমন নজিরও আছে—

The good Brahman could not made up his mind to ask for a receipt in the face of this display of moral rectitude on the part of the barber.[২৫২]

বিভিন্ন প্রথা

লোককথার বহতা স্রোতে সাঙ্গীকৃত হয়েছে সমাজের বহু রীতি নানা প্রথা। কয়েকটি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়, কয়েকটি সমসাময়িক কালের সঙ্গেই বোঝাপড়া করে নিয়েছে।

নরমাংসভক্ষণ — পরিচিত আন্তর্জাতিক অভিপ্রায় রাক্ষসের ভয়াল পদচারণার সঙ্গেই তীব্র লালসা প্রকট—

How mow khow
A human being I smell[২৫৩]

অভিধান বলেছে—

Some tribes eat only enemies and never eat their totem or Kinsome, others do eat only relatives......fathers do not eat own children, but mothers do.[২৫৪]

নীলকমল আর লালকমল গল্পে শত্রুভক্ষণের ইচ্ছাটিই উচ্চারিত—

হাউ মাউ খাউ
সাত শত্রুর খাঁউ

এ গল্পেই মাতা কর্তৃক পুত্র ভক্ষণের বীভৎসাচারটি ফুটেছে।—

রানী মনের আগুনে জ্ঞান দিশা হারাইয়া আপনার ছেলেকে মুড়্‌মুড়্‌ করিয়া চিবাইয়া খাইল।[২৫৫]

নিতান্ত নিরুপায় পরিস্থিতিতে ক্ষুধার্ত জৈব সত্তার কাছে জননীত্ব হার মেনেছে। The Boy whom seven Mothers suckled গল্পে—

'now that we are blind and are dying for want of food. Let me kill the child and let us all eat off its flesh.'[২৫৬]

'কাঞ্চনী কিংবা চম্পা' এই সব গল্পে ভ্রাতারা ভগ্নীর মাংস খেতে উৎসুক, কারণ শুধুমাত্র তীব্র লালসা—

'চাঁপার রক্ত এত মিষ্টি নিশ্চয়ই ওর মাংস আরও মিষ্টি হবে।'

এখানে সমগোত্রীয় আত্মীয়েরই মাংস ভক্ষণেরই ইচ্ছার প্রকাশ।[২৫৭]

নরমাংস ভক্ষণের এক অভূতপূর্ব অভিপ্রায়ের সাক্ষাৎ মেলে ইতিহাসমালার একটি গল্পে। একজন খল্‌ হিংস্র পশুর আহার্য হয়েছে স্বেচ্ছার কারণ

হিংস্র জন্তু সকল আমার মাংস ভোজন করিলে মনুষ্য মাংস স্বাদু জানিয়া নিজেদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য অন্য মনুষ্যসকলকে খাইবেক।[২৫৮]

মানব কুপ্রবৃত্তির জটিলতা যে সময় বিশেষে নরমাংস-ভক্ষণ অপেক্ষাও মারাত্মক তারই প্রমাণ ঐ চিন্তা।

অবশ্য নরমাংসাহার যে সভ্য সমাজে ক্রমেই দূষণীয় হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ মেলে দেবী কল্যাণেশ্বরীর সঙ্গে যুক্ত পুরাকথাটির মধ্য দিয়ে—'দেবীর রক্তপিপাসা এতই প্রবল যে তিনি একবার নিত্য বলির অভাবে তাঁহার পুরোহিতের কন্যাকেই চিবাইয়া খাইতে থাকেন। সেই অবস্থায় পুরোহিত আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন। তদাবধি দেবী লজ্জায় বিমুখ হইয়াছেন।[২৫৯]

দাসপ্রথা — সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের কর্মসহায়ক দাসীবাঁদী। লোককথায় দাস-দাসী প্রায়শই পণ্যদ্রব্য। দায়ো বায়োর ব্রতকথায় হাট থেকে ব্রাহ্মণ কিনে এনেছে অল্পবয়স্ক পরিচারিকা কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা গল্পে স্বেচ্ছায় দাসীবৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী কাঁকনমালা—

.... রানী যদি দাসী কিনেন তো আমি দাসী হইঁব।

তখন রানী হাতের কাঁকন দিয়া দাসী কিনিলেন।[২৬০]

পুরনারীদের প্রসাধনপর্বে তারাই সরোবরের পাড়ে ক্ষার গামছা নিয়ে সারি দেয়।[২৬১]

বহির্জগতের সংবাদ তারাই বয়ে আনে অন্তঃপুরে—

এক দাসী আসিয়া খবর দিল, নদীর ঘাটে যে শুকপঙ্খী নৌকা আসিয়াছে তাহার রূপার বৈঠা হীরার হাল।[২৬২]

রাজ অন্তঃপুরে এটাই ঘুম পাড়ানি গল্প গান শোনায়—

A drowsy maid servant drowsily reciting a story, and the king and queen apparently asleep.[২৬৩]

মালকিনের হুকুমে মল ঝমঝম পদক্ষেপে এরাই তড়িৎ গতিতে হুকুম তামিল করে—

শক্তি কথা কহিতে না কহিতে যত দাসী বাঁদী গিয়া শক্তিসুন্দরের পাটকাপড় কাড়িয়া মালা, চুল ছিঁড়িয়া এক ছাঁকানি পরাইয়া ঘাটলার কাছে এক গর্তের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল।[২৬৪]

দাসীর প্রতি গৃহস্থের হতশ্রদ্ধাও গোপন নেই—বাঁদী হয়ে থাকত, দিনে এক মুঠা খেতে দিতাম।[২৬৫] বাঁ পা ধুয়ে জল দিতাম।

সুযোগ পেলে অবশ্য এরাও সদ্ব্যবহার করেছে পূর্ণমাত্রায়—

দাসী চক্ষের পলকে রানীর কাপড় পরিয়া রানীর গহনা গায়ে দিয়া ঘাটের উপরে উঠিয়া ডাকিল।[২৬৬]

কোচবিহারের এক গল্পে অবশ্য দাসীর গর্ভেই অবৈধ জারজ-ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্ম হয়েছে।[২৬৭]

পারিবারিক ষড়যন্ত্রে আপন রাজ্যেই দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে কলাবতী রাজকন্যা গল্পের ন'রানী ছোট রানী।[২৬৮]

বিপরীত দৃষ্টান্তও দেখি পরিচিত শীত-বসন্ত গল্পে, রূপবতী প্রদত্ত শর্ত পূরণে অক্ষম রাজপুত্রেরা রাজকন্যার নফর হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে।

দাসত্বের বন্দীদশার অন্তরেও থাকে স্নেহের ফল্গু। The Story of Prince Sabur গল্পে বৃদ্ধা পরিচারিকার কাছে প্রভুকন্যা আত্মজার সামিল নির্বাসিতা কন্যার সঙ্গে সেও বনগমনে প্রস্তুত। I must go where my daughter goes.[২৬৯]

এই মধুরতাই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের স্থূলতাকে অতিক্রম করেছে।

বিবাহ — গার্হস্থ্য আশ্রম সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করতে হলে প্রয়োজন বিবাহের—

......Socially sanctioned mating entired into with the assumption of permanency[২৭০] সমাজ অনুমোদিত মিলন যা স্থায়িত্বের প্রত্যাশা রাখে, তাই বিবাহ।

বাংলা রূপকথাগুলির অন্তে বিবাহের আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য সর্বদাই চোখে পড়ে—

....."তাহার পর ফুটফুটে আলোয় আগুন পুরুত সম্মুখে গুয়া পান, রাজ-রাজত্ব যৌতুক দিয়া রাজা পঞ্চরত্ন মুকুট পরাইয়া রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।"[২৭১]

অগ্নিসাক্ষী করে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

লোকচক্ষুর অন্তরালে মালা বদল করে গান্ধর্ব বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে Life's Secret গল্পে—

As priests were out of the question the hymeneal rites were performed a la Gandharava.[২৭২]

বহুবিবাহের অজস্র নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। রাজপরিবারে 'এক যে রাজা। রাজার সাতরানী।' আবার তাঁতি গৃহস্থেরও দুই স্ত্রী (সুখু আর দুখু)[২৭৩]

কৌলিন্য রক্ষার জন্য বহুপত্নীক স্বামীর হাতে কন্যা অর্পিত হয়েছে। স্বামী সব স্ত্রীদের

মুখ মনেও রাখতে পারে না। 'The Story of the Rakshasas' গল্পে দেখছি এমনই এক ব্রাহ্মণকে—

But being a Kulin Brahman he thought it was quite possible that his father had got him marrie when he was a little child though the fact had made no impression on his mind.[২৭৪]

'মালঞ্চমালা' গল্পে বারো বৎসরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে সদ্যোজাত রাজপুত্রের। রাজকন্যারা প্রায়শই স্বয়ম্বরা হয়েছে। আবার দৈবনির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক বিবাহ ঘটেছে জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথায়।

পরাজিত দায়িত ভক্ষণের নিদর্শন পাচ্ছি ডালিমকুমারের গল্পে, পাশাবতীর উক্তিতে—

যে নিবে সে মালা পায়
হারিলে মোদের পেটে যায়।[২৭৫]

সহমরণ অগ্রণী হয়েছে কুমোরনী The Boy with the Moon on his Forehead গল্পে।

Like all good and faithful wives, I am determind to die along with you. You and I will burn together on the same funeral pyre.[২৭৬]

ঘটকের দাপটও কিছু কম নয়। শেয়াল-ঘটকের চতুরালিতেই The Match Making Jackal গল্পে তাঁতির সঙ্গে রাজার মেয়ের বিয়ে সম্ভব হয়েছে। মহিলারাও পিছিয়ে নেই—

বড় দেখি চটকী, কোন রাজ্যের ঘটকী[২৭৭] —মহিলা ঘটকের সপ্রতিভ প্রতিপত্তিই জাহির করছে উক্তিটি।

বিবাহে অনিচ্ছুক পাত্র চোখে কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ জানিয়েছে—

বাসর ঘরে, সেই সাত-পরত কাপড় চোকে বাঁধা রূপলাল কথা কইলেন না, বার্ত্তা কইলেন না, বাসর পোহাইতে না পোহাইতে বাসর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন।[২৭৮]

কন্যা বিদায় এবং বধূবরণ দুই-ই আড়ম্বরপূর্ণ—

উৎসব রাজা ধন-রত্ন মণিমাণিক্য, জলা-জাঙ্গাল পাটপাটন বারো বায়ান্ন সত্তর-কুড়ি রাজত্ব রাজগী যৌতুক দিয়া ঝালঝাঁপি সিঁদুর বাত্তি সাত-বেসাতি একত্র রানীরা চোখের জলে শুভক্ষণ উষায় জামাই কন্যা তুলিয়া দিলেন।[২৭৯]

জয়জয় করিয়া জল-স্থল ভরিয়া লোকজন দিকে দিকে চলিল।

বধূবরণেও উৎসাহের ঘাটতি নেই—

চূড়ায় চূড়ায় নিশান উড়িল, দুয়ারে দুয়ারে ঘটপল্লব, রাজপথে মালির বালির চাঁদোর সারি। থরে থরে ফুল। লোকজন সিঁদুরের জাঙ্গাল বিছাইয়া আমার ছেলে বৌ রাজ্যে নিয়ে এস।[২৮০]

অন্যান্য উৎসব — পুত্র সন্তান লাভের আনন্দেও রাজারা উৎসবের জোয়ার বইয়ে দিতেন—

রাজা ঢাকী শহর থেকে ঢাক আনাইলেন, ঢুলী শহর থেকে ঢোল আনাইলেন, কানা নাকাড়া শানাই ছকড়া ডান, মৃদঙ্গ ঘাগর বাদ্যে দশদিন আগে হইতে পশুপক্ষী আর মাটিতে পড়ে না।[২৮১]

ছয় ষষ্ঠীর রাতে সন্তানের ভাগ্য লিপি নির্ধারিত হয়। এই রাতে বিধাতা পুরুষের স্বাগত জানানোর রেওয়াজ এইরকম—

ছয় ষষ্ঠীর রাতে রাজা আঙ্গিনা ঘিরিয়া সোনার ঝালর সারি সারি চাঁদোয়া উঠাইলেন, চাঁদোয়ার নীচে ঘিয়ের বাতির সার দেওয়াইলেন। আঁতুড়ঘর অবধি ফুল পুজোর পথ ফুলের আর চন্দন সিঁদুরের আঁকা।[২৮২]

পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন, চূড়া উপনয়নের রেওয়াজ পাওয়া যায় ডালিমকুমারের গল্পে।

উৎসব উপলক্ষে শঙ্খধ্বনি শুভসূচক। দিনের শুভারম্ভও শাঁখের আওয়াজে—

'দুধবর্ণ রাজার দেশে রাত প্রভাতে শাঁখে শাঁখে ফুঁ পড়িল। যত পড়ুয়া পড়ায় মন দিল।[২৮৩]

জাঁক জমকপূর্ণ অভিষেক প্রথার চল ছিল সমাজে। শাঁখ বেজে উঠত সে অনুষ্ঠানে—

রানী আসিয়া তেল চুবুচুবু করিয়া রত্নচাঁদকে নাওয়াইয়া দিলেন, তেল-চন্দনের আভা মদনকুমারের বাপের সাথে পঞ্চপায়েস অষ্টব্যঞ্জন রাজার রাজভোগ খাইয়া চৌদ্দপরণ মণিমাণিক্যে সোনার অঙ্গ আবরিয়া ভুরুর কোণে কাজল টান সভা আলো করিয়া বসিল।

........রাজপুরীর যত শাঁখ শাঁখে রব উঠিল।[২৮৪]

আতিথ্য — অতিথিসেবা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। 'যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্'।[২৮৫] মনুর এই নির্দেশটি লোককথায় অবশ্য মান্য। 'অতিথি আগতজন মাথার মণি'[২৮৬] তাদের 'তিয়াসের জল' 'আসনের পিঁড়ী' দেওয়া বাধ্যতামূলক।

অতিথির আহার্য তাঁর স্বেচ্ছামতো—

'শুকন্' কি রন্ধন?

'শুকন্ হইলে আঁকড় ধানের চিঁড়ে দিত, ইঁট পাটকেল গুড় দিত, আটকলাই আধভাজা-আধকাঁচা—ইহারই নাম শুকন্।[২৮৭]

অতিথির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কাক ও বাদুড়ের জন্মকথায়। অতিথি স্বয়ং আতিথেয়তার অন্যায় সুযোগ নিয়েছে। বারোমেসে অমাবস্যার ব্রতকথায়। অতিথি গৃহস্থের নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের বসন-ভূষণ ব্যবহার করেছে। শোকগ্রস্তা বধূ ও মাতার অনুরোধ উপেক্ষা করে আতিথ্যের সেবাটুকু পূর্ণমাত্রায় আদায় করেছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত বলেছে—

'মা তোমার বউকে পাঠিয়ে দাও। আমার পা টিপে দেবে।[২৮৮]

অবশ্য গল্পটিতে দেখানো হয়েছে অতিথিই স্বয়ং সূর্যদেব। দেবতা শাশুড়ী ও বধূকে আশীর্বাদ করে উপহার প্রদান করেছেন।

মূল্যের বিনিময়ে আশ্রয় স্থান অর্থাৎ পান্থশালার প্রসঙ্গ এসেছে The Indigent Brahman গল্পে।[২৮৯]

বিবিধ রোগ ও চিকিৎসা

শরীর ব্যাধির মন্দির—'ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নম্'।[২৯০] নানা রোগের আক্রমণে কাবু হয়েছে লোককথার সদস্য। কুটুমপাখির জন্মকথায়, গৃহস্থ বধূ জ্বরাক্রান্ত।[২৯১] চাতক পাখির জন্মকথায় শাশুড়ির পিঠে ফুটে উঠেছে চর্মরোগ।[২৯২] ধবল ঘুঘুর জন্মবৃত্তান্তে সারা দেশকে আক্রমণ করেছে মহামারী। ঐ গল্পেই ব্যাধির রূপ—মূর্তিমতী জরা। বৃদ্ধার মাথায় আছে অতিরিক্ত চোখ।[২৯৩]

নীরোগ পৃথিবীতে অসুস্থতার জীবাণু ছড়িয়েছে সাতবিবি। এরা খোদা প্রেরিত।

অবিশ্বাসী বা অসৎ ব্যক্তিদের রোগগ্রস্ত করলে যখন তারা ব্যাকুল হবে দেবীরা তখন তাদের কেরামতি দেখিয়ে নিরাময় করে দেবেন। লোকেরা এইভাবে তাদের ভক্তি করতে শিখবে।[২৯৪]

নিষেধ ভঙ্গের অপরাধে কুৎসিত 'গা-ভরা আঁচিল, ঘা-প্যাঁচড়া'[২৯৫] আক্রমণ করেছে দুষ্টু সুখুকে। নীলকমল আর লালকমলের গল্পে রাক্ষসীর শ্যেনদৃষ্টি শুষে নিয়েছে জীবনীশক্তি—

চোকের দৃষ্টি দিয়া সতীনের রক্ত শোষে। দিন দণ্ড যাইতে না যাইতে লক্ষ্মীরানী শয্যা নিলেন।[২৯৬]

দৈব অভিশাপ নিদারুণ রোগের মূর্তিতে আক্রমণ করেছে মানবদেহ—রালদুর্গার ব্রতকথায়[২৯৭] ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ রূপলাল যখন দেখেছে স্বর্গের অপ্সরার সৌন্দর্য, তখনই জরা আর গলিত কুষ্ঠ অধিকার করেছে রূপলালের শরীর।

গলিত অঙ্গ, ঝাঁকর চুল ত্রিকালের অথর্ব বুড়া সওদাগর। কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুক্তি ঘটেছে সূর্যের আর্শীবাদে, এমন দৃষ্টান্ত অঢেল।[২৯৮] এ প্রসঙ্গে মনীষী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—

The association of the sun with leprosy is very ancient. Since, leprosy is a tropical disease its association with the Sun may have originated among the inhabitants of a tropical country [২৯৯]

সূর্যের আরাধনায় ব্যাধিমুক্তি দৈব চিকিৎসার দিকেই ইঙ্গিত করে। বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করি।

ঐন্দ্রজালিক চিকিৎসার অঢেল প্রতিপত্তি লোককথায় নারীর বন্ধ্যাত্ব মোচনে সন্ন্যাসী দেন মন্ত্রপূত ডালিম—

ডালিম রতি বাসনার উদ্দীপক বলেই বিবেচিত—আর তাই ডালিম নারীর যৌনজীবনের সঙ্গে যুক্ত। প্রাচীন কল্পনা অনুসারে নারীর উৎপাদিকা শক্তির মূলে সংযুক্ত ঋতুরজ এবং ঋতুরজের সঙ্গে সাদৃশ্যের দিক থেকেই ডালিম উর্ব্বরতার প্রতীক। [৩০০]

সন্ন্যাসীরাই লোককথার চিকিৎসকের ভূমিকায় উপস্থিত —A religious medicant[৩০১] তাঁরা গর্ভধারণের ঔষুধ দেন। The fieldy of Bones গল্পে সন্ন্যাসী

জানেন মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা।

পশুপাখীর মাংসওরেচক পদার্থ। নির্ভরযোগ্য ওষুধ। পথ্য হিসেবে উটের মাংস ভক্ষণের কথাও আসছে—

My son is dying and the doctors say, eating camel's meat can save his life. [৩০২]

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর রেচক পদার্থ রাজার দৃষ্টি ফিরিয়েছে The story of a Hiraman গল্পে। [৩০৩]

বিপরীত ক্রমে নীলকমল আর লালকমলের আঙ্গুলের এক ফোঁটা রক্তে পক্ষী শাবকদের চোখ ফুটেছে। [৩০৪]

হাড়্মুড়্মুড়ীর ব্যারামের' ভান করেছে রাক্ষসী রানী। সেই অসুখের প্রতিষেধকও অভিনব—

বনের একটি আমগাছ কাটিয়া তাহার তক্তার ধোঁয়া দিলে তবে আমার ব্যারাম সারিবে।[৩০৫]

ভূতে পাওয়া রোগীর চিকিৎসা করেছে—ওঝা, কখনো সরষে বাণ ছুঁড়েছে কখনো রোগীর নাকে ধরেছে হলুদ পোড়া, কারণ—

...No ghost whether male or female can put up with the smell of burnt turmerk[৩০৬] উৎকোচের লোভে চিকিৎসক ভুল ওষুধ দিয়েছে life's Secret গল্পে। [৩০৭]

অভিজ্ঞতার দাম চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। Madarchand, The cracked quack গল্পে পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখিত—

In our practice we shall be minute observors and no facts however triffling in themselves should be neglected [৩০৮]

হাতুড়ে চিকিৎসার হাস্যকর রূপও ঐ গল্পেই উদঘাটিত, হাতীর গলার ফোলা কমাতে, ফোলা জায়গার উপরে নীচে দুটি থান ইঁট রেখে জোরে চাপ দেওয়া হয়েছে। [৩০৯]

কুনো ব্যাঙের থুথুতে রাজকন্যার কানা চোখ ভালো হয়েছে দেড়-আঙ্গুলে গল্পে। [৩১০]

"চোখ গেল" পাখিকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পগুলির একটিতে চোখের অসুখটি বিনিময় করা হয়েছে—

দিনে দিনে পুতি যতই অন্ধ হতে থাকল রাজপুত্রের চোখও তেমনি ভালো হতে থাকল। [৩১১]

নিদুলি রোগেব চিকিৎসা করতে লোকসমাজ অক্ষম। এই রোগের লক্ষণ—ঘুমোলো তো ঘুমোলোই ছমাস ধরে ঘুমোলো। রোগিনী নিদুলি রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে। যাদুকরী চিকিৎসক রোগীর দেহের প্রাণসঞ্চারে অক্ষম। প্রাণকণিকা সঞ্চারিত করেছে ছোট্ট পাখির দেহে।[৩১২]

• জাতীয়তা. ১৩

এইভাবেই বিভিন্ন প্রতিবিধান সদাজাগ্রত প্রহরায় লোকজীবনে আরোগ্যের প্রচেষ্টা করে চলেছে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

কর্মব্যস্ত লোকজীবন বিনোদনের অবসর খুঁজে পেয়েছে বিবিধ ক্রীড়া ও প্রতিযোগিতার আনন্দের মধ্যে। উচ্চবিত্ত সমাজের একটি প্রিয় ব্যসম পায়রা ওড়ানো—

'Of all sports he was most addicted to playing with pigeon"[৩১৩]

মার্বেলগুলি খেলার জমাটি আসর চোখে পড়ে The Origin of Rubies গল্পে—

As the prime was yet a boy he was fond of playing at marbles. [৩১৪]

জুয়াড়িরাও হাজির The Finding of Dreamsগল্পে।[৩১৫]

সাধারণ প্রজারাও রাজকীয় জীবনচর্যার অনুকরণ করে তাদের ক্রীড়ার মধ্যে নাট্যরসের সঞ্চার করেছে, The Ghost Brahman গল্পে।—

And they played at royalty, One cow boy was elected king, another prime minister, another kotwal or perfect of the police and others.[৩১৬]

শ্বেত ও বসন্ত গল্পের প্রারম্ভে দেখছি রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ লেখাপড়ার পরিবর্তে গুলতি দিয়ে পাখি মারতে শিখেছে। [৩১৭]

ঘোড়-দৌড়ের টান টান উত্তেজনা মালঞ্চমালা গল্পে ফুটে উঠেছে। অন্যান্য রাজপুত্রেরা ক্ষমতার অন্যায় প্রয়োগ করেছে—

"আগে গেলে গর্দ্দান! সাত দণ্ডের পথ পিছনে যাক্।"[৩১৮]

এসব সত্ত্বেও জয়ী হয়েছে রাজপুত্র চন্দ্রমানিক। অন্যায় কারচুপি পাশাখেলার ক্ষেত্রেও বজায় থেকেছে অক্ষক্রীড়ার সময় লক্ষ্য করেছে রাজপুত্র ডালিম—

"এক ইঁদুর পাশা উল্টাইয়া দেয়।[৩১৯]

পুরুষকে আক্কেল পরীক্ষার খেলায় পরাজিত করেছে আয়রাবাইজি— সোনাফর বাদশা গল্পে পরাজিত বাদশা সে বলেছে—

খালি বিছানায় উঠিতে তুমি জুতা খুলিয়াছিলে অথচ আমার এই সুন্দর বিছানায় তুমি কি করিয়া পায়ে কাদা মাখিয়া উঠিলেঁ? আমার খেলা তো পুরুষের আক্কেল পরীক্ষার খেলা, তুমি খেলায় হারিয়াছ।[৩২০]

কলহে পরস্পরের মোকাবিলা করেছে দুই নারী পাড়াকুঁদুলী গল্পে। প্রতিযোগিতার শর্তটি এইরূপ, একটি মুখরা মেয়েকে ঝগড়ায় হারাতে হবে। পরিবর্তে জয়ী মেয়েটি অনেক টাকা পাবে। শান্ত বুদ্ধিমতী একটি বউ সফল হয়েছে। গলার উচ্চ স্বরগ্রামের পরিবর্তে চটকদার বুদ্ধির অভিনবত্ব ফুটেছে—

এমনি করে সমস্ত দিন চীৎকার করে পাড়াকুঁদুলী হাঁপিয়ে পড়ল। আর বউটি তখনও ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে নৌকার ওপর থেকে একবার জুতো আর একবার ঝাঁটা দেখাতে লাগল। [৩২১]

অর্থাৎ প্রতিযোগিতা সাফল্যের জন্য দক্ষতা আর কূটবুদ্ধির সমান প্রয়োজন।

দণ্ডনীতি

সামাজিক স্থিতি, সংহতি ও সুরক্ষার জন্যই দণ্ডের প্রয়োজন।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বাদণ্ড এবাভিরক্ষতি।

দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ।। [৩২২]

—"দন্ডই সমুদয় প্রজাকে শাসন করিয়া থাকেন, দণ্ডই রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সকলে নিদ্রিত থাকিলে একমাত্র দণ্ডই জাগরিত থাকেন, পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্মের মূল বলিয়া অবগত আছেন।'

বাংলা লোককথায় আছে অপরাধ, অপরাধী, পাপকর্মের ভারে অবক্ষয়িত রুগ্ন সমাজচিত্র। আইনভঙ্গ ও অন্যান্য অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে দণ্ড বলবৎ থেকেছে। রূপকথাগুলিতে শাসনব্যবস্থায় সর্ব্বোচ্চ পদে আছে রাজা, তারই নির্দেশে পেয়াদা দোষীকে কখনো পঞ্চাশ ঘা জুতো মেরেছে[৩২৩] কখনো বা পাকা দেওয়ালে অপরাধীদের জীবন্ত কবরস্থ করেছে, কখনো বা শূলে চড়িয়েছে। [৩২৪]

ব্যক্তিগত আক্রোশ বাড়িয়েছে শাস্তির মাত্রা— "রাজা বাসরঘরের দুয়ার ভাঙ্গিয়া গাইয়ের বদলে গাধা দিলেন ... ভাঙা হাঁড়ি নারিকেলের মালা মালঞ্চের গলায় গাঁথিয়া দিলেন, দিয়া ঘুঁটের ঝাঁকা পিঠে বাঁধিয়া কাটারীর বদল কুড়াল, চিতার বালিশ চিতার কাথা এক দর্পণ হাতে দিয়া কোটালের কন্যাকে সারা শহর ঘুরাইয়া আনিলেন। মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া জল্লাদকে হুকুম দিলেন "কোটালকন্যা ডাইনী, বনে নিয়া বনবাস দে।"[৩২৫]

অপরাধ প্রমাণিত হলে একান্ত প্রিয়তমা মহিষীদেরও শাস্তি দিতেও দ্বিধা করেন নি রাজা—

"রাজা তখনি বড়রানীদিগে হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। [৩২৬]

প্রকাশ্য রাজপথেও অপরাধীর শাস্তি হয়েছে; এমন শাস্তি, যা পাপের কুপরিণতিকে জনতার সামনে তুলে ধরবে। সখী সোনা গল্পে দুষ্টমতি যাদুকরী বুড়িকে সিংদরজার সামনে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। [৩২৭]

চূড়ামণির কিস্‌সার অন্যতম গল্পে খল সওদাগরকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে।[৩২৮]

স্বয়ং নিয়তি বিচারকের ভূমিকা নিয়েছে শঙ্খনাথ গল্পে। ছোটরানীকে প্রতারণার শাস্তি স্বরূপ সকল রানীই অসুস্থ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মদান করেছে। [৩২৯] ডালিমকুমারের গল্পের শেষে সাত পাশাবতী কেঁচো হয়ে মরে গেছে। [৩৩০] স্বার্থপর লোভী সুখু অজগর সাপের কামড়ে প্রাণ দিয়েছে। [৩৩১] আর "শঙ্খমালা"গল্পের কুঁজী কালিদহে করাল গ্রাসে নিহত হয়েছে।[৩৩২]

এক জন্মের কৃত পাপের ফলে পরজন্মে অধোগতি ঘটেছে "জীরেবতী" গল্পে। ষড়যন্ত্রকারিণী ছয় রানীর পাপ প্রকাশিত হয়েছে। রাজার আদেশে জল্লাদ সাজাও দিয়েছে বধ্যভূমিতে। কিন্তু সেই মনুষ্য নির্ধারিত দণ্ডেও তাদের পাপস্খালন হয়নি। ফলে ছয়

রানীর রক্তে পচা পুকুর হয়েছে। দেহ হয়েছে কাঁটা গাছ, তাঁদের চোখ হল দাঁড়কাক। কাঁটা গাছে বসে দাঁড়কাকেরা নিজেদের পাপের কথাই ঘোষণা করেছে। [৩৩৩]

দৈবক্রোধ বহু ক্ষেত্রে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ বলেন—

Kings are so in the habit of assuming command that they sometimes lose all humility and need to be given a lesson.[৩৩৪]

সম্পদলক্ষ্মীর একটি ব্রতকথায় অহঙ্কারী রাজা অবহেলা করেছে লক্ষ্মীকে। ফলে—

রাজার লোকজন, ধন দৌলত যত আছে সব বিনাশ হইল। রাজার হাতে গোদ, পায়ে গোদ, চোখে ঢেলা, কানে ঘা হইল। পুরীতে খস্ খইসা লতের ঝাড়, গুণা লতের ভার বাঁধল। [৩৩৫]

অপরাধের জন্য শাস্তি আছে। তারই সমান্তরালে আছে ক্ষমা, অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত। মালঞ্চমালা গল্পে রাজা দুই চোখের জলে ভাসেন— "মা না বুঝিয়া তোরে বড় কষ্ট দিয়াছি"— সে সব সম্বরিয়া, মা! আজ আমার মুখ চাহিয়া আমার ঘরে চল্। ... আমাকে ক্ষমা দে ঘর চল্।[৩৩৬]

আত্মগ্লানিতে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে The Prince and his two Wives গল্পে। [৩৩৭] রাজপুত্রের অসৎ প্রথম পক্ষের স্ত্রী কুটিলা সুখুর মার মাথায় চেলা কাঠ মেরে আত্মহত্যা করেছে।[৩৩৮] হিংসুক স্বার্থপর সুয়োরানীর তিন ছেলেকে প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন করেছে আর সুয়োরানী কপাল চাপড়ে নিজের মাথায় পাথর মেরে জীবন শেষ করেছে।[৩৩৯]

পাপের বীভৎস চেহারা যখন পাপীর সামনে ফুটে ওঠে তখন তা যে কোন দন্ডের অপেক্ষাও গভীর প্রতিক্রিয়াশীল। ইতিহাসমালার গল্প তার সাক্ষী। ক্রমাগত ব্যাভিচার রানীর দেহমনে এনে দিয়েছে অবসাদ-খিন্ন নির্লিপ্তি। উন্মত্ততাই চরম পরিণতি। তাই গৃহকর্মের অনিষ্ট সাধনে তার বিকৃত অট্টহাসি—

আমি রাজাকে মারিয়াছি, উপপতিকে সর্পাঘাত হইল, তাহা দেখিয়া বেশ্যাধর্ম গ্রহণ করিলাম আপন পুত্রেতে রত হইয়া চিতা প্রবেশ করিতে গেলাম, সেখান হইতে পলাইয়া গোপ গৃহিণী হইলাম তথাপি কিঞ্চিৎ ঘোল নষ্ট হইল এজন্যে শোক করিব।[৩৪০]

শুদ্ধ জীবনের স্পর্শে মৃত্যুলোকের মুক্তির ঘটনা দেখছি দস্যু ভূত[৩৪১] প্রেতলোক[৩৪২] ইত্যাদি গল্পে।

বিপর্যয়

দণ্ডের সতর্ক প্রহরা উপেক্ষা করে প্রকৃতির রুদ্ররোষ বহু সময় বিপর্যস্ত করেছে সামাজিক জীবনকে। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব বহু প্রাণহানি ও ক্ষয় ক্ষতির উল্লেখ পাই বাউশ পাখির জন্মকথায়।[৩৪৩]

চাতক পাখির জন্মকথায় কঠিন অনাবৃষ্টির রুদ্র রূপ ফুটেছে, [৩৪৪] বারোমেসে অমাবস্যার ব্রতকথায় মাতা পুত্র সূর্যকে গৃহবন্দী করেছে, ফলে পৃথিবী ডুবে গেছে অন্ধকারে।

কাঞ্চনমালার মালিনী কুমন্ত্রের প্রভাবে দিনরাত্রির গতি স্তব্ধ করে দিয়েছে—

মালিনী মন্ত্র পড়ে।

মন্ত্রে রাত আর পোহায় না।

পোহায় না, — কাক চিল সাতবার জাগিল। সাতবার ঘুমাইল, শেষে ভাবে—এ কি! লোকজন জীবজন্তু খিদেয় মরে,—জলজঙ্গলে টুঁ শব্দটি নাই। এ কি! দেব দেবতা পবন স্তব্ধ হইয়া আছে।[৩৪৫]

উদ্দাম সামুদ্রিক ঝড় মদনকুমারের তরী ছিন্ন ভিন্ন করেছে—

লোক গেল, লস্কর গেল, মাঝি মাল্লা চোদ্দ ডিঙ্গা সমস্ত গেল, মদন প্রলয় ঝড়ে মাঝসমুদ্রে ভাসিলেন।[৩৪৬]

প্রকৃতির দৌরাত্ম্যও নষ্টবুদ্ধি মানুষের কাছে স্তিমিত হয়ে গেছে। অসদাচরণ বহু ক্ষেত্রে ভয়াবহ সর্বনাশ ডেকে এনেছে। রাজবল্লভী দেবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত পুরাকাহিনীটিতে The Evil Eye of sani গল্পে দেখছি অবলা নারীকে কামলোলুপ বণিক জোর করে অপহরণ করেছে—

বণিক শ্রেণীর চিরস্থায়ী কলঙ্ক এ ঘটনা।[৩৪৭]

পথিমধ্যে ডাকাতের আক্রমণ জীবনহানি ও সম্পদহানি ঘটাত। The Story of the Rakshasas গল্প শেষে স্বামী বিচ্ছিন্না ব্রাহ্মণ পত্নী বহুদিন স্বামীর অপেক্ষা শেষে সিদ্ধান্ত করেছে—

The woman therefore concluded that he must have been murdered on the road by high way man.[৩৪৮]

টুনটুনির বই[৩৪৯] গল্পগ্রন্থের একাধিক গল্পে হিংস্র পশুর উৎপাতে গ্রাম্যজীবন বিপর্যস্ত। আবার বাঘ যখন বলপূর্বক গ্রাম্যবালিকাকে অপহরণ করে তখন তা স্বেচ্ছাচারী শ্রেণীর শোষণের সমার্থক হয়ে পড়ে।

বৃদ্ধা চরিত্রের প্রতি লোকসমাজ সশ্রদ্ধায় নত হয় । তাই বৃদ্ধার অবমাননায় সামাজিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে জনগণ। উকুনে বুড়ির মৃত্যুর করুণ কাহিনীটি যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রাহ্য হয়নি সমাজসদস্যের কাছে। তারই ফলে —

নদীর জল শুকিয়ে গেল
হাতির লেজ খসে পড়ল
গাছের পাতা ঝরে পড়ল
ঘুঘুর চোখ কানা হল
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল
দাসীর হাতে কুলো আটকাল
রানীর হাতে থালা আটকাল
পিঁড়িতে রাজা আটকাল।[৩৫০]

এইভাবেই বয়ে চলেছে জীবনচক্র। স্তবকিত হয়েছে নানা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রূপান্তরের ক্রিয়াশীল দ্বন্দ্ব—

All societies are constantly in a state of relative tension ... the struggle between the forces for change and the forces for stability found in all cultures.[৩৫১]

এই দ্বন্দ্ব, সমাজ পরিবর্তনের ধারণাটি ছাপ ফেলেছে নানা লোক গল্পে। যমপুকুরের ব্রকথায় শাশুড়ি বধূর কলহে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠী সংঘাতের ইঙ্গিত। বধূর উপাস্য যম, স্বীকৃতি পাননি শাশুড়ির কাছে। শাশুড়ির অনুযোগ—

কি হিলবিলাছিস কি বিড়বিড়াছিস্, বলি আমায় খাবি— না আমার মেয়েকে খাবি[৩৫২]

মনসার ব্রতিনীও আদৃত নয়। শ্বশুর তাই বধূকে ভর্ৎসনা করেছে—

'কে বেদের মেয়ে তৈলেঙ্গির মেয়ে সাপ পুষিস' অর্থাৎ অন্যব্রত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হলেও তলে তলে বিরোধের আঁচটা ফুটেছে ঠিকই।[৩৫৩]

কৃষিজীবী গোষ্ঠীর সঙ্গে বণিক গোষ্ঠীর সংঘাতের প্রমাণ কাঞ্চনমালার গল্প। প্রচন্ড খরায় আক্রান্ত প্রকৃতি। চাষীর বিভীষিকা মুক্তির জন্য "কাটন-কাটারি" দেবতার পূজা করে। দেবতা চান নরবলি— "যে সে নরবলি নয়,.বলির মানুষ সওদাগর হওয়া চাই।[৩৫৪]

নদীমাতৃক সভ্যতার স্মৃতিবাহিত হয়েই লোককথায় এসেছে শঙ্খবলয়—

Daughter, take these shells, but them on your wrists and when ever you shake either of them you will get ornaments you wish to obtain.[৩৫৪]

গঙ্গাস্নান করে সাগররানী পালন করেছে শাঁখমঙ্গল ব্রত। মৎস্যজীবীদের তীব্র জীবনসংকট মশার জন্মকথায় ব্যক্ত।[৩৫৫]

রাক্ষস বনাম সভ্য নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত এসেছে অজস্র রূপকথায়। আবার এদের মধ্যেই যখন বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, তখনও আর্য-অনার্য সমন্বয়ের সুর স্পষ্ট —

এক রাজার দুই রানী, তাহার এক রানী যে রাক্ষসী।[৩৫৬]

বৈষ্ণব চেতনার স্পর্শ পাই কাকের জন্মকথায়। শ্রীরাধা নয়নের কাজল থেকে তৈরি করলেন কাককে, কাক তাঁর বেদনার দূতী। শ্রীকৃষ্ণকে রাধার সংবাদ পৌছে দেবে। বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহ মূর্ছনা প্রভাব বিস্তার করেছে।[৩৫৭]

বাদশা হরণশুনাই খাঁ গল্পে কলফিরিঙ্গীর সঙ্গে বাদশার যুদ্ধ বাধে। অনুমান করি কলফিরিঙ্গী সোফেদ মাঝি "White man Portuguese ছাড়া কিছুই নয়।[৩৫৮]

এইভাবেই লোককথার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কোমবদ্ধ জীবনধারা থেকে উন্নততর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য কেন্দ্রিক জীবনধারার স্তরভেদ। লক্ষ্য করি বিবর্তিত সংস্কৃতির যে বিচিত্র অভিব্যক্তি তার মূল চালিকা শক্তিই অর্থনীতি। সুতরাং আর্থনীতিক সম্পদের মূল্য অসীম। চতুর্থ অধ্যায়ে লোককথায় নানাভাবে পাওয়া অর্থ সম্পৃক্ত টুকরো টুকরো তথ্যাবলী প্রসঙ্গেই আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। Rionex Marcel, Folk and Folklore, Journal of American Folklore, Vol 63. No. 248, 1950, P194

২। Leach Maria (ed) Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend, Vol II New York, 1950, P690.

৩। রায় নীহাররঞ্জন; বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দেজ পাবলিশিং; প্রথম দেজ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০, পৃ ২১৬-২১৭

৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র, প্রথম ভাগ, ঠাকুরমা'র ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৪০০ পৃ. ৩

৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরদাদার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ষোড়শ সংস্করণ, বাং১৩৯৩, পৃ. ২২১-২৭৩

৬। ঐ, পৃ ২৭৯

৭। ঐ পৃ ১৬৬

৮। Rishley, H H The Tribes and Castes of Bengal, Vol 1. Firma Mukhopadhayay, Reprint 1981, P518

৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ ১৫৮

১০। ঐ

১১। ঐ, পৃ.২৫৪

১২। Rishley, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮ সংখ্যক) P 295

১৩। Banerjee Kasindranath, Popular Tales of Bengal, Calcutta 1905

১৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, বাং ১৩৭৩, পৃ. ৩২৯

১৫। Dey Rev Lalbehari, Folk Tales of Bengal, Uccharan, 1993 P 194-204

১৬। ঐ P 204

১৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, মধুমালা (৬ সংখ্যক) পৃ. ৩৪

১৮। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক) পৃ. ৭১২

১৯। ঐ পৃ. ১

২০। dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P. 159-162

২১। ঐ P 175-181

২২। ঐ P 57

২৩। Sen Dinesh Chandra, The Folk Literature of Bengal, Calcutta 1920, P 61

২৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ. ১৫১-২২০

২৫। Majumdar R.C History of Ancient Bengal C. Bharadwaj and Co Reprinted 1974, P 421

২৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ১২৮

২৭। Majumdar R.C পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক)

২৮। বসাক শীলা, বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৮, পৃ. ১৭০

২৯। ভট্টাচার্য হিমাদ্রি শঙ্কর, সম্পাদিত কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৬-১১

৩০। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ৪৮৪
৩১। Banerjee Kasindranath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩ সংখ্যক) P. 32-49
৩২। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P. 57-81
৩৩। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ৫০-৬৩
৩৪। মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ. ১৫
৩৫। Mcculloch William, Bengali Houschold Tales London, 1912, P 7-8
৩৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ৩৫-৫০
৩৭। মজুমদার আশুতোষ , মেয়েদের ব্রতকথা, দেব সাহিত্য কুটীর, জুলাই ১৯৯০, পৃ. ৩৫-৫০
৩৮। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত টীকা (১৫ সংখ্যক) P. 163-171
৩৯। দাস গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা, ১৯৯৮, পৃ ৩২২-৩২৬
৪০। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ কাহিনী কিংবদন্তী, তিতির পাখির জন্মকথা, টীকা বাংলা একাডেমি, নভেম্বর ১৯৮৬ পৃ. ৩৯-৪৫
৪১। Sarkar Jadunath, The History of Bengal, Volume II The University of Dacca, Third impression, 1976 P 79
৪২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ১৩৫
৪৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ. ১০১-১৫০
৪৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ. ৬৩৫-৬৩৯
৪৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ. ৫০-৬৩
৪৬। Dey Lalbehari: Folktales of Bengal P. 65
৪৭। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, বেড়াল ঠাকুরঝি, বিশ্বভারতী, পৃ ১১-১৪
৪৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ৫০-৬৩
৪৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ. ৬৫৯
৫০। ঐ
৫১। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ৩৬
৫২। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪০সংখ্যক) পৃ. ৪৬-৫৩
৫৩। Dey Lalbehari,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 69
৫৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ৩৫০-৩৫৪
৫৫। চক্রবর্তী বরুণকুমার, প্রসঙ্গ লোকপুরাণ, জানুয়ারী ১৯৯১, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, পৃ. ৫৪-৫৫
৫৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ. ২৯০
৫৭। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ১১৬
৫৮। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 192
৫৯। ঐ P 82-95
৬০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ৪৯
৬১। Chowdhury Kabir, Folktales of Bangladesh, Dacca Bangla Academy 1972, P 42-59
৬২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ১৮৪
৬৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোব, টুনটুনির বই, পাত্রজ পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ ৩১৪-৩১৫
৬৪। ঐ পৃ ৩২৮-৩৩৩
৬৫। ঐ পৃ ৩২৮
৬৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণাবঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যাক) পৃ ১৩

৬৭। Thompson Stith The Folktale, University of California Press. 1977. P. 250
৬৮। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক) পৃ ৩৫-৩৯
৬৯। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, ভূতপেত্নী. মডার্ন বুক এজেন্সী, জানুয়ারী, ১৯৯৫, পৃ ১৯-২১
৭০। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 111-121
৭১। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩২০
৭২। ঐ পৃ ১০৯
৭৩। ঐ পৃ ২৫৫
৭৪। ঐ পৃ ৭৩
৭৫। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ২১
৭৬। ভট্টাচার্য হিমাদ্রিশঙ্কর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) পৃ ৬০
৭৭। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৪২
৭৮। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 192-196
৭৯। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক)
৮০। মনুসংহিতা , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৪ সংখ্যক) পৃ ২৫১
৮১। বসাক শীলা পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৮ সংখ্যক) পৃ ১৮৮
৮২। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্তগ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ১৭১
৮৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২৫৪-২৭০
৮৪। ঐ পৃ ৭৮
৮৫। ঐ পৃ ৫৮
৮৬। সিদ্দিকী আশরাফ, কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, ঢাকা বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫, পৃ ২৬-৩৩
৮৭। Chowdhury Kabir, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৩ সংখ্যক) P 78-110
৮৮। Damant, G H Indian Antiquiry. Bengali Folklore. Legend From Dinajpur Volume IV. January 1880 P 2
৮৯। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 112
৯০। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩৩৮
৯১। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ৫৬১
৯২। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২০৩
৯৩। ঐ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৫৯
৯৪। ঐ
৯৫। Jones Ernest, Psycho, Analysis and Folklore Jubilee Congress London, 1930, P 220
৯৬। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩৪
৯৭। মজুমদার আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ৩৮
৯৮। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৬৫-৭৮
৯৯। ভৌমিক নির্মলেন্দু বিহঙ্গচারণা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৮৫, পৃ ৫৯১ ৯২
১০০। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪সংখ্যক) পৃ ৫
১০১। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৩৫৩
১০২। ঐ পৃ ২৭৬
১০৩। ঐ, (৫ সংখ্যক) পৃ ৩৫৪
১০৪। ঐ পৃ ৩৫৯

১০৫। ঐ পৃ ৩২৩
১০৬। ঐ পৃ ৩৫৫
১০৭। ঐ পৃ ১৭৯-১৮০
১০৮। ঐ পৃ ২৫৭
১০৯। ঐ পৃ ২৫৮
১১০। Mcculloch William, Bengali Household Tales, London 1912, P 62-72
১১১। ভৌমিক নির্মলেন্দু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৯ সংখ্যক) পৃ ৫৬১-৫৬২
১১২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য শকুন্তলা, বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৩৯৯ পৃ ৩৪
১১৩। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২১৩
১১৪। ঐ পৃ ২৫৩
১১৫। ঐ পৃ ১৩৭
১১৬। ঐ পৃ ৩০১
১১৭। মজুমদার আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ৬৪-৬৬
১১৮। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৯৫
১১৯। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 15-46
১২০। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৯৯
১২১। বসাক শীলা পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৮ সংখ্যক) পৃ ১৮২
১২২। চক্রবর্তী বরুণকুমার, প্রসঙ্গ লোকপুরাণ, জানুয়ারী ১৯৯১, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, পৃ ৫৩
১২৩। ঐ পৃ ৫৫-৫৬
১২৪। ঐ
১২৫। ঐ পৃ ৭৬-৭৯
১২৬। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৩ সংখ্যক) পৃ ২১৭-৩১৯
১২৭। ঐ পৃ ৩৮১-৩৮৫
১২৮। ঐ পৃ ৩০৭
১২৯। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১১৬
১৩০। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১১৩
১৩১। রায় চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৩ সংখ্যক) পৃ ৩০
১৩২। ঐ পৃ ৩১০
১৩৩। ঐ পৃ ৩১০
১৩৪। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২৬
১৩৫। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪০ সংখ্যক) পৃ ৩৯-৪৫
১৩৬। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১০ সংখ্যক) P 23-29
১৩৭। Tylor E B Primitive Culture, Vol I New York, 1874, P 424
১৩৮। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৩ সংখ্যক) পৃ ৩০৯
১৩৯। Leach Maria edited, Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend Vol II Funk and Wagnalls, New York, 1950, P 996
১৪০। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 1-14
১৪১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ১০৫
১৪২। Leach Maria ed SDFML পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৯ সংখ্যক) P 619
১৪৩। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 163-177

১৪৪। Frazer, James George, The Golden Bough, New York. 1951 P. 214
১৪৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৭৯
১৪৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ১৪১-১৪২
১৪৭। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 172-174
১৪৮। Thompson Stith পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৭ সংখ্যক) P 258
১৪৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৩১-৩৪
১৫০। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১০ সংখ্যক) P 7-8
১৫১। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক) পৃ ৭০-৭৮
১৫২। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৬৮
১৫৩। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১৪১
১৫৪। Leach Maria পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৯ সংখ্যক) P 1122
১৫৫। চক্রবর্তী বরুণকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২২ সংখ্যক) পৃ ৫৪-৫৫
১৫৬। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 127-128
১৫৭। ঐ P 108
১৫৮। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২৩৯
১৫৯। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৯১
১৬০। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৫৯
১৬১। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 163-171
১৬২। Frazer James, The Golden Bough, New York, 1951, P 47
১৬৩। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩০
১৬৪। ঐ পৃ ৫২
১৬৫। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 139-159
১৬৬। Frazer, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬২ সংখ্যক) P 261
১৬৭। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ ২৬৫
১৬৮। Leach Maria, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৯ সংখ্যক) P 1098
১৬৯। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ১১৯
১৭০। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ১৭৫
১৭১। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪সংখ্যক) পৃ ১২৯-১৪০
১৭২। ঐ পৃ ৩৯৫-৩৯৮
১৭৩। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 77
১৭৪। ঐ P 79
১৭৫। Herskovits Melvelte, J .Cultural Anthropology, Chapter Twelve, Religion Man and the Universe, Oxford. 1974 P 175
১৭৬। Dey Lalbehari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 82-95
১৭৭। মজুমদার আশুতোষ পূর্বোক্তগ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ৪৬-৪৮
১৭৮। Dey Lal Behari, পূর্বোক্তগ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 205-222
১৭৯। Spencer Herbert. the Principles of Sociology, New York, 1896, P 367
১৮০। ফজলে রাব্বী সম্পাদিত, লোকসাহিত্য ১০ম খণ্ড, কিংবদন্তী সংকলন, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৭০, পৃ ১৩৬
১৮১। Thompson Stith. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৭ সংখ্যক) P 142

১৮২। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৫ সংখ্যক) P 922
১৮৩। ঐ Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৭ সংখ্যক) P 143
১৮৪। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১৬০-১৬১
১৮৫। ঐ
১৮৬। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১০ সংখ্যক) P 6
১৮৭। ঐ
১৮৮। ঐ
১৮৯। Damant, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) P 218-219
১৯০। ঐ P 219
১৯১। Jevons F.B Compcrative Religion, Cambridge University Press, 1913, P 92
১৯২। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২, পৃ. ৯
১৯৩। Mukhopadhyay Asutosh, The Sun and the Serpent Lore of Bengal, Firm K.L First Edition 1977, P 29
১৯৪। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 192-196
১৯৫। ঐ P 195
১৯৬। ঐ P 47-56
১৯৭। ঐ P 47
১৯৮। ঐ
১৯৯। Mazumdar R C পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) P 5180
২০০। রায় নীহাররঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ ৪৩১
২০১। ভট্টাচার্য আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ৫৯৫
২০২। ঐ পৃ ৫৮৬
২০৩। রায় নীহাররঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ ৫১৬
২০৪। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 15-46
২০৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ৪২৯
২০৬। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 168
২০৭। Roy S K The Ritual Art of the Bratas of Bengal, Calcutta, 1961 P 56
২০৮। Sur A. K. Folk Life of Bengal, Best Books, First Edition 1999, P 102
২০৯। Damant, পূর্বোক্তগ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) P 1
২১০। Majumdar R C. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৫ সংখ্যক) P 548
২১১। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক)
২১২। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩৫০
২১৩। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১০ সংখ্যক) P 283
২১৪। মিত্র সতীশচন্দ্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী, জুন ১৯৬৫, পৃ ১৩
২১৫। ঐ
২১৬। Sarkar Jadunath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪১ সংখ্যক) P 183
২১৭। ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, খণ্ড ২, প্রকাশ ভবন, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৮ পৃ ৩৬
২১৮। ঐ
২১৯। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 96-103

২২০। Tagore Rabindranath, Creative Unity, An Indian Folk Religion, Macmillan and Co. 1988 P 7
২২১। ভট্টাচার্য হিমাদ্রিশঙ্কর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) পৃ ৭৮
২২২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১১০
২২৩। ঐ
২২৪। ঐ
২২৫। ঐ পৃ ১২২
২২৬। ঐ
২২৭। Damant, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮সংখ্যক) P 357
২২৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক)
২২৯। ঐ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১৮৬
২৩০। রায় ত্রিদিবনাথ প্রবন্ধ মঞ্জুষা, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী। বাং ১৩৯০, পৃ ৭৪
২৩১। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ. ৪৮
২৩২। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১০ সংখ্যক) P 1-6
২৩৩। ঐ P 30-35
২৩৪। ঐ P 110
২৩৫। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব সম্পাদিত, বাংলার লোককথা, একাডেমী অব ফোকলোর, ১৪০৮ হিজরী, প ৫০-৫১
২৩৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 703
২৩৭। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 153
২৩৮। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ১৫৮
২৩৯। ঐ পৃ ৫৫৯
২৪০। Havell E B. A Study of Indo Aryan Civilization London, 1915, P 35
২৪১। Tagore Rabindranath, An Eastern University, Creative Unity, an Indian Folk Religion, Macmillan and Co. 1988 P 200
২৪২। ঐ
২৪৩। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১৯৭-১৯৮
২৪৪। ঐ পৃ ১৯৭
২৪৫। সিদ্দিকী আশরাফ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬ সংখ্যক) পৃ ১০৮-১৩৯
২৪৬। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১০৯
২৪৭। ঐ পৃ ২৩২
২৪৮। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 106
২৪৯। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্তগ্রন্থ (২৩৫ সংখ্যক) পৃ ১২৯
২৫০। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৮০
২৫১। ঐ
২৫২। Banerjee Kasindranath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩১ সংখ্যক) P 20
২৫৩। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 66
২৫৪। Leach Maria, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৯ সংখ্যক) P 187
২৫৫। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৭৬-৭৭
২৫৬। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৪ সংখ্যক) P 106

২৫৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ৬৫৬-৫৭
২৫৮। দ্যাতিয়েন ফাদার সম্পাদিত ইতিহাসমালা শান্তি সদন পৃ ২
২৫৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকশ্রুতি, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯২ পৃ ১৩৯
২৬০। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ২৭
২৬১। ঐ , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১১৪
২৬২। ঐ, পূর্বোক্তগ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৭
২৬৩। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 155
২৬৪। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩৪৫
২৬৫। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩৪৫
২৬৬। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ২৭
২৬৭। ভট্টাচার্য হিমাদ্রিশঙ্কর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯ সংখ্যক) পৃ ৬-১১
২৬৮। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৫
২৬৯। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 11
২৭০। Herskovits Melvette. J. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৭৫ সংখ্যক) P 171
২৭১। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ২৪
২৭২। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 10
২৭৩। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৩
২৭৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 58
২৭৫। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৮০
২৭৬। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 212
২৭৭। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ৩৪৩
২৭৮। ঐ পৃ ২৪১
২৭৯। ঐ পৃ ৯২-৯৩
২৮০। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 208
২৮১। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১৫৮
২৮২। ঐ পৃ ১৫২
২৮৩। ঐ পৃ ১৪৯
২৮৪। ঐ পৃ ৪৯
২৮৫। মনুসংহিতা , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৫ সংখ্যক) পৃ ৩৯৯
২৮৬। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১২৪
২৮৭। ঐ
২৮৮। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ১৬৩
২৮৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 47-56
২৯০। ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রকাশ ভবন, চতুর্থ ভবন, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ ৫৩
২৯১। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪০ সংখ্যক) পৃ ৭০-৭১
২৯২। ঐ পৃ. ৬২-৬৩
২৯৩। ঐ পৃ ৫১
২৯৪। বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দ্বিতীয় দেজ সংস্করণ, জুন ১৯৮৭, পৃ ১১৯
২৯৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ১১৯

২৯৬। ঐ পৃ ৬৫
২৯৭। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ১১৯
২৯৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২৫৬
২৯৯। Mukhapadhya Asutosh, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৯৩ সংখ্যক) P 35
৩০০। চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, লোকায়ত দর্শন, নিউ এজ, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ ৩৩৪
৩০১। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 156
৩০২। ঐ P 157
৩০৩। ঐ P 191
৩০৪। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৭৩
৩০৫। ঐ পৃ ৯৮
৩০৬। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 173
৩০৭। ঐ P 1-14
৩০৮। Banerjee Kasindranath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩১ সংখ্যক) P 127
৩০৯। ঐ P 139
৩১০। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ১৪৩
৩১১। ভৌমিক নির্মলেন্দু , বিহঙ্গচারণা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স ১৯৮৫, পৃ ৩৩
৩১২। ঐ পৃ ৫৭১
৩১৩। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৪ সংখ্যক) P 2
৩১৪। ঐ P 193
৩১৫। Damant G.H. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক) P 53-59
৩১৬। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 161
৩১৭। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৫ সংখ্যক) পৃ ১২
৩১৮। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১৯৪
৩১৯। পৃ ৮৫
৩২০। সিদ্দিকী আশরাফ , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬সংখ্যক) পৃ ১২৬
৩২১। গুপ্ত বিভূতিভূষণ , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক) পৃ ৪৮-৫০
৩২২। মনুসংহিতা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৪ সংখ্যক) পৃ ১৬৯
৩২৩। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৩ সংখ্যক) পৃ ৩৭৫
৩২৪। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৫ সংখ্যক) পৃ ১৯৮
৩২৫। দক্ষিণারঞ্জন , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ১৭১
৩২৬। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৩৪
৩২৭। মুহম্মদ আয়ুব , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৫ সংখ্যক) পৃ ২৩২-২৪৫
৩২৮। মণিরুজ্জমান মোহাম্মাদ ঢাকার লোককাহিনী, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ ১৯
৩২৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ১১৮-১২৯
৩৩০। দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৮০
৩৩১। ঐ পৃ ১১৫
৩৩২। দক্ষিণারঞ্জন , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২৩৮
৩৩৩। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব . পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৫ সংখ্যক) পৃ ৪৭
৩৩৪। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৩৩৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ২৫৭-২৬২
৩৩৬। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২১৭
৩৩৭। Damant G H পূর্বোক্তগ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক)
৩৩৮। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ২১৭
৩৩৯। ঐ পৃ ৪০
৩৪০। দ্যতিয়েন ফাদার . পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫৮ সংখ্যক) পৃ ২৬
৩৪১। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক) পৃ ১৯৯-২০০
৩৪২। ঐ
৩৪৩। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪০সংখ্যক) পৃ ১৬৩-১৬৪
৩৪৪। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৭ সংখ্যক) পৃ ১৬৩ ।
৩৪৫। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ ২৪৬
৩৪৬। ঐ পৃ ৭২
৩৪৭। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 96-103
৩৪৮। ঐ P 246
৩৪৯। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৩ সংখ্যক)
৩৫০। ঐ পৃ ৩৩৩
৩৫১। Foster G.M The Dynamics of Change, Japan 1965, P 58-59
৩৫২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) পৃ ৫৮১
৩৫৩। ঐ পৃ ৫৮
৩৫৪। Dey Lalbehari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) P 246
৩৫৫। চক্রবর্তী বরুণকুমার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২২ সংখ্যক) পৃ ৫৪
৩৫৬। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ ৩৪৮
৩৫৭। ভৌমিক নির্মলেন্দু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৯ সংখ্যক) পৃ ১৩১
৩৫৮। সিদ্দিকী আশরাফ , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬ সংখ্যক) পৃ ৮

চতুর্থ অধ্যায়
অর্থনৈতিক অবস্থা

সমাজের মূল বনিয়াদ অর্থনীতি। লোকসমাজ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে ক্রমবিবর্তিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াপ্রক্রিযাই লোকসমাজ ও ইতিহাসের পরম্পরিত স্তরগুলিকে নির্দিষ্ট করে এবং তারই ফলে গড়ে ওঠে ব্যবহারিক ও মানসিক সমস্ত ঋক্থ।

অর্থনীতির এই ক্রমবিবর্তনে উৎপাদন পদ্ধতি, ক্রমবিভাজন ও জীবিকা অর্জনের চিরন্তন তাগিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। জীবিকা নির্বাহ ও উৎপাদন পদ্ধতির পারস্পরিক টানাপোড়েনে যে সামাজিক পরিবর্তন, তার বিচিত্র রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাংলার লোককথায়। যুগ যুগ ধরে বস্তুময় জীবন পরিবেশের চাহিদা অনুসারে লোকসমাজ যে উৎপাদন প্রণালী উদ্‌ভাবন করেছে, সেটাই তাদের সমকালীন সামাজিক পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। লোককথাগুলি বিশ্লেষণ করে সেই অর্থনৈতিক উপাদানগুলি অনুসন্ধান করা যাক্।

সম্পদ উৎপাদনের বিবিধ পন্থা

কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি বিবিধ খাতে উৎপাদনী গতিশীলতা প্রবাহিত।

কৃষি — কৃষির আবিষ্কার যুগান্তর ঘটিয়েছে মানুষের জীবনে। নদীর নিকটবর্তী স্থানে স্থায়ী জনপদের পত্তনী ঘটেছে কৃষির স্বার্থে। বলা চলে, মানবসভ্যতার অরুণোদয় হল কৃষির মাধ্যমে। এই কৃষিজ গোষ্ঠী চেতনাকে রক্ষা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে বাংলা লোককথাতেও।

ষড়ঋতুর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, উর্ব্বর পলিমাটির অকৃপণ দাক্ষিণ্য, অসংখ্য নদনদীর দান বঙ্গদেশে কৃষির সমৃদ্ধি অনিবার্য করে তুলেছে, যার প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠেছে 'কিরণমালা' গল্পে—

"............চাটিমাটির দুঃখ নাই, কলস কলস গঙ্গাজল, ডোল ভরা মুগ, কাজললতা গাইয়ের দুধ, গোলাগঞ্জের অভাব নাই— ব্রাহ্মণের টাকা পেটরায় ধরে না।"[১]— সত্যই লোকায়ত আর্থিক নিরাপত্তা বহুলাংশে কৃষিজ ফসলের উপরই নির্ভরশীল।

উৎপন্ন শস্যাদি— ধান, ডাল, পান, গুবাক তামাক নারিকেল ইত্যাদি অজস্র ফসলের সন্ধান পাওয়া যায় লোককথায়। পুনকাবতী,[২] পোস্তমনি,[৩] তিলভুসুকী, চালভুসকী[৪]— এইসব নামকরণ দৈনন্দিন জীবনছন্দের সঙ্গে কৃষির যোগসূত্রটিকে চিনিয়ে দেয়। এমন কি রাজবাড়ির রসুইখানায় যে সব খাদ্য তালিকা পাওয়া যায়, অর্থাৎ পুলি পিঠে পায়েস তার অধিকাংশই আসে ক্ষেতজ ফসল থেকে। ঠিক তেমনি, অশোক ষষ্ঠী[৫] চাপড়া ষষ্ঠী[৬] মূলাষষ্ঠী[৭] কিংবা লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায়[৮] দেখা যায় যে ফল-ফসলই পূজার পবিত্র উপকরণ।

কৃষি-মাহাত্ম্য সম্পর্কে লোকমানসের সচেতনতা— বাংলা লোককথার সমাজ-মন কৃষিজ

ফসলের অর্থকরী গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সেই কারণেই একদিকে যেমন ঐশ্বর্যের সূচক হিসাবে 'গোলা ভরা ধান'[৯] বারংবার উল্লিখিত হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায়[১০] দেখি যে স্বর্ণ, মণিমাণিক্য ইত্যাদি মহার্ঘ রত্ন সম্ভারের আকর্ষণ উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণবালক প্রার্থনা করেছে 'তিলধুবড়ী' যা শস্য সম্পদেরই প্রতীক। মুহম্মদ আয়ুব হোসেন সঙ্কলিত 'বাংলার লোককথা'[১১] গ্রন্থে রত্নমালা,[১২] ভাগ্যধর[১৩] ইত্যাদি গল্পে ধান পুড়ে সোনার উদ্ভব কৃষিজ শস্যের অর্থকারী মূল্যের দিকেই ইঙ্গিত করে।

কৃষিজ সম্পদের অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে লোকসমাজ যে কত স্পর্শকাতর তার প্রমাণ স্বরূপ চৈত্রমাসের লক্ষ্মী পূজার ব্রতকথাটি[১৪] অবশ্যই উল্লেখ করতে পারি। বিনা অনুমতিতে অন্যের তিল ক্ষেত্রে প্রবেশ করার অপরাধে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী বাধ্য হয়েছেন তিল-সন খাটতে। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে লক্ষ্মীর তিল-সন খাটার দরুণই ব্রাহ্মণ পরিবারে এসেছে পর্যাপ্ত আর্থিক নিরাপত্তা। এইভাবে তিলফুলগুলি হয়ে উঠেছে সমগ্র কৃষিজাত শস্যেরই প্রতীক, যেগুলির আকর্ষণে দেবীর মর্ত্যে আগমন ঘটেছে। সেক্ষেত্রে কৃষিজাত শস্যের সঙ্গে সম্পদদাত্রী দেবীর প্রত্যক্ষ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষির আনুষঙ্গিক বস্তু দ্রব্যগুলিও গুরুত্ব হারায়নি। সোহাগের ট্যাপারী গল্পে[১৫] সোহাগ ঠাকুরাণীর সোহাগ বর্ষিত হয়েছে কৃষকের হালের উপর। কুলুই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথায়[১৬] পূজার উপচারে সোনার (অভাবে মাটির) কুলো নির্মাণ আবশ্যিক। কোচবিহার জেলার বহু প্রচলিত সাটপূজাব্রতের অন্যতম কথা হল 'দায়োবায়োর উপাখ্যান'[১৭]। সেখানে সর্বমঙ্গলদায়িনী পুলি কাটারি-মাহাত্ম্য-কথা বর্ণিত হয়েছে। এই সাটপূজার সাতদিন পুলিকাটারিটি থাকে শস্যক্ষেত্রে। অর্থাৎ শস্য-ক্ষেত্র ও পুলি কাটারির অর্চনা প্রকৃতপক্ষে কৃষির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে বৃষ্টি ও সূর্যের গুরুত্ব অস্বীকার করেনি লোকঅভিজ্ঞতা। সে কারণেই সুবারিষ ঠাকুরাণীর ব্রতকথায়[১৮] ব্রতীর ক্ষেত্র অঝোর ধারায় বৃষ্টিস্নাত হয়েছে। রালদুর্গার ব্রতমাহাত্ম্য[১৯] কিংবা বারমেসে অমাবস্যার ব্রতকথায়[২০] শস্যসম্পদ উৎপাদনে সূর্যের অনিবার্য ভূমিকাটি বন্দিত হয়েছে। অবশ্য সম্পদ উৎপাদনে সর্বাধিক অবদান উর্বর ভূমির। ভূমির সেই অপরিহার্যতাকে বারংবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মান প্রদর্শন করেছে লোকসমাজ।

ভূমি-মাহাত্ম্য— উর্বর মৃত্তিকা অর্থাৎ সুফলা জমির মালিক হওয়া ছিল গৌরবের, দর্পের ও দাপটের উৎস। 'পুষ্পমালা'[২১] গল্পে রাজকন্যা পুষ্প কোটালপুত্র চন্দনকে পতিত্বে বরণ করেছে, তার একমাত্র কারণ ' পৃথিবীর মাটি কোটালের হইয়াছে'।[২২] ক্ষেত্রপূজার ব্রতকথাতে [২৩] সোনার ধানের ক্ষেত অর্থাৎ সুফলা ধান্যজমিই বিবাহের যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হয়েছে।

উর্বরা ভূমির বিনিময়ে হাট থেকে দ্রব্য ক্রয়ের দুর্লভচিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে 'কচুপাতায় প্রাণ'[২৪] গল্পটিতে। আবার ঐ একই গল্পে মন্ত্রপুতঃ মাটির সাহায্যে আরোগ্যলাভের ঘটনাটিও

ভূমি বন্দনারই নামান্তর। জীবনদায়ী ফসলের উৎপাদক উর্বরমৃত্তিকা তথা ভূমি লোকসমাজে পবিত্র সম্মান ও অর্চনার আসন অলঙ্কৃত করেছে। ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রতকথাটি[২৫] সম্পূর্ণরূপে ভূমিরই বন্দনা। স্বর্ণ অলঙ্কারের বিষমপাশে আবদ্ধ কাঁকন-রাজার রাজ্যে যখন 'ত্রাহিত্রাহি' রব উঠেছে, তখন মাখন ও রাখালের সুখী গৃহস্থালী 'ধানে কলাইয়ে, তরি তরকারিতে গাছালীতে ভরে উঠল।'[২৬] রাজা মিডাসের মতোই কাঁকন-রাজা বুঝেছেন প্রকৃতিমাহাত্ম্য, স্বর্ণ অলঙ্কারে নয়, 'লক্ষ্মীর হাতের ক্ষীর অলঙ্কারেই'[২৭] প্রকৃতজীবন। নিষ্ঠাবতী ব্রতিনী মাখন বলেছে যে এই ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রতপালন করলে, 'সুখে স্বচ্ছন্দে খাবেন ঘি দিয়ে মাটির প্রদীপ জ্বালবেন, হাল্ চলবে, গাই চলবে, লক্ষ্মীর হাতের ক্ষীর অলঙ্কারে ক্ষেত ভরে উঠবে।'[২৮]

মৃত্তিকাজননী বসুন্ধরার এই সমাজব্যাপী পূজাতেই ভূমি মাহাত্ম্য থেমে থাকেনি। লোককথায় দেখা যায় ন্যায়-অন্যায় পাপপুণ্যের সর্বোচ্চ বিচারক এই ভূমিই। Indian Antiquiry পত্রিকায় D.H.Damant সঙ্কলিত লোককথাগুলির একটি 'The Prince and his two wives'[২৯] সেখানে দেখা যায় রাজপুত্রের পত্নী অভিশপ্তা রাজকুমারী বাদুড় জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পত্নীর অভিশাপ-মুক্তির যে দৈববাণীটি, সেটি হল-কর্ষণ এবং এক বৎসর ব্যাপী কৃষক জীবনগ্রহণ। 'মালঞ্চমালা'[৩০] গল্পেও স্বার্থপর রাজা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনবার মাটি ভক্ষণ করেছেন। 'শঙ্খমালা'[৩১] কথাটিতে পুত্র নীলরাজার কাছে মাতৃত্বের পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐ ভূমির উপর। উজীর পুত্র বারোধনুকজমি মেপেছে। তারই উপর দাঁড়িয়ে শক্তিসুন্দর আপন সতীত্ব ও মাতৃত্বের তেজে পরীক্ষায় সফল হয়েছে। উইলিয়ম কেরী সঙ্কলিত ইতিহাসমালা (১৮০১) গ্রন্থে অবস্থা বৈগুণ্যে হৃতসর্বস্ব রাজার শোক প্রকাশেও সেই ভূমির প্রতি শ্রদ্ধাই পরিস্ফুট। বিশাল সাম্রাজ্য তার কাছে পদরেণুতুল্য, তাঁর আক্ষেপের কারণ এটাই—

"আধুনিক নব্য ধনিগণের দরিদ্র গণনার সময় আমার নাম লইয়া ভূমিতে অঙ্কপাত করিবে।"[৩২]—পবিত্র ভূমিতে এই কলঙ্ক লেপনই রাজার আত্মগ্লানির কারণ। এইভাবে কৃষির মহিমা, ভূমি তথা ক্ষেত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিবর্ধিত হয়েছে।

সমাজ রূপান্তরের ধারায় যুগ পরিবর্তনের নানা সঙ্কেত দ্যোতিত লোককথায়, রূপকের ছদ্মবেশে। পশুচারণজীবী বিনন্দ রাখালের ক্ষেত্রপালের কৃপায় কৃষকে পরিণত হওয়া'[৩৩] কৃষিজীবী পত্তনেরই দ্যোতক। ভৈমী একাদশীর ব্রতকথাতেও[৩৪] পাই একই ভাবনা। সেখানে ভীম ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙ্গল তৈয়ারী করলেন। ফলমূল কুড়িয়ে অথবা শিকার ভিত্তিক খাদ্যসংগ্রহ সার্বিক খাদ্যের নিরাপত্তা দিতে পারে না— এই বোধটিকে দেবতা শিবই ভীমের মারফৎ প্রতিষ্ঠা করলেন।

ক্ষেত্রপালের অপর একটি ব্রতকথাতে[৩৫] দেখি কৃষির পত্তন করেছে এক ব্রাহ্মণকুমার, বিষ্ণুপদ। ক্ষুদের জাউ মাটিতে পুঁতে মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে পাকা ফসলে তার ক্ষেত ভরে উঠেছে।

কৃষিজ ফসলের পবিত্রতা রক্ষার প্রসঙ্গটি রূপকে আভাসিত হয়েছে ধানের উদ্ভব

প্রসঙ্গে।[৩৬] পূর্বে যে চাল সরাসরি ক্ষেতে উৎপন্ন হতো অশুচি অবস্থায় মানুষ তাকে স্পর্শ করায় তুষে ঢাকা পড়ল ধান। ঠিক তেমনি ধানের সৃষ্টি সম্পর্কে অপর একটি পুরাকথায়[৩৭] কৌশলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে পরিপক্ক ধান্য কর্তনের উপযুক্ত সময়টিকে। পশুপালক রাখালকে ধানের বীজ ছড়িয়ে দেবার আদেশ দিয়ে দেবী লক্ষ্মী সচেতন করে দেন যে গাছের বর্ণ যখন হবে আমার দেহবর্ণের মত, আমার গায়ের গন্ধের মত গন্ধে যখন তা ভরে উঠবে, তখন সেগুলি কেটে ঘরে তুলবে।"[৩৮]

কৃষিজীবনের প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা লোককথায় ফুটে উঠেছে সত্য, কিন্তু পশু সম্পদের মর্যাদাটিকেও অক্ষুণ্ণ রেখেছে সেই সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে বিবর্তিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাল রেখে সংস্কৃতির বহিরাঙ্গিক রূপটি বদলালেও তার মানস কাঠামোয় সঞ্চিত থাকে ধারাবাহিক স্মৃতিগুলি। তাই পশুকেন্দ্রিক অর্থনীতির ইঙ্গিত ধারণ করে চলেছে বাংলার বেশ কিছু লোককথা।

পশু সম্পদ—কৃষির পূর্বে পশুপালন পশুচারণই ছিল আদিম মানুষের জীবনধারণের অবলম্বন। সেই স্মৃতি পুনর্জীবিত হয়েছে 'শঙ্খমালা' গল্পে। সেখানে রাজার বেটা মোহনলালের সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল।[৩৯] পশুচারক এই রাখাল রাজার শিকারজীবনের কথাও পাই— " সেই রাজার বেটা পক্ষী মারে, এক এক তীরে ষোলশ গণ্ডা পক্ষী ঝুরে।"[৪০] শিকারজীবী সভ্যতার স্মৃতি বহন করে চলেছে শিবরাত্রির ব্রতকথাটি।[৪১] সেখানে শিকারজীবী ব্যাধ, দেবতা শিবের কৃপালাভে ধন্য আর সখী সোনার গল্পে[৪২] সখীর পিতাও ছিলেন এক বর্ধিষ্ণু শিকারী।

বাংলা লোককথার অর্থনীতির অনেকখানি নির্ভরশীল গোধনের উপর। পল্লী সমাজজীবনের আদর্শ সংসার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে কবি শুভাঙ্ক বলেছেন— 'বিষয়পতিরলুব্ধ ধেনুভির্ধাম পূতং'[৪৩]—অর্থাৎ বিষয় পতি বা স্থানীয় শাসনকর্তা লোভহীন ও ধেনু দ্বারা গৃহ পবিত্র। বাংলা লোককথাতেও কৃষিজীবী বাঙালীর জীবনের পরিপূর্ণতা গোধনব্যতীত অসম্পূর্ণ। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের সচ্ছলতার চিহ্ন অঙ্কন করতে গিয়ে মরাই ভরা ধানের সঙ্গে সর্বদাই উল্লিখিত হয়েছে গোয়ালভরা গরুর[৪৪] প্রসঙ্গ।

বর্তমান বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত 'Gafoor and his Cow'[৪৫] গল্পটিতে গফুরের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী গরুটি গফুরকে কেবল অফুরন্ত দুগ্ধই সরবরাহ করেছে এমন নয়; দরিদ্র গফুরের জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণতার সহায়ক প্রয়োজনীয় কলাকৌশল সরবরাহ করে গফুরকে যাবতীয় কঠিন জীবন পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ করার মহান দায়িত্ব পালন করেছে এই গরুটিই।

সুখু-দুখুর গল্পে [৪৬] ও The Bald Wife'[৪৭] কাহিনীটিতে দুখিনী দুখু ও ছোট বৌ একটি করে 'কপিলা-লক্ষণ বক্‌না' তাদের মহৎ কর্মের পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছে। 'কিরণমালা' গল্পটিতেও কিরণমালার সদাসঙ্গী কাজললতা গাই।[৪৮]

গোধনের পবিত্রতা রক্ষা প্রসঙ্গেও লোকসমাজ সদাসতর্ক। 'চাতক পাখীর

জন্মকথা'[৪৯] গল্পে এই পবিত্রতা অবমাননা করার অপরাধে রাখালকে অভিশপ্ত পক্ষীজীবন গ্রহণ করতে হয়েছে।

অবশ্য, পশু সম্পদের অনুষঙ্গে পশুচারক রাখাল বহু লোককথাতেই সম্মানার্হ। 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা'[৫০] গল্পে রাজপুত্র ও রাখাল ছেলের কেবল বন্ধুত্বই হয়নি, অভিশপ্ত রাজপুত্রের আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়েছে রাখাল পুত্রেরই বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে, সৌভগ্য চতুর্থীর ব্রতকথায়[৫১] ব্রতের উদ্‌যাপন করানো হয়েছে এক রাখালকে দিয়ে আর মৌনী অমাবস্যার ব্রতফল সঞ্চয় করেছে পুণ্যাত্মা গয়লানী।[৫২]

বাঘ ও শেয়াল সম্পদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থেকেছে। বহু পরিচিত সেই লোককথাটি স্মর্তব্য যেখানে বাঘের একটি কড়িগাছ ছিল এবং ছোট খুকু সেই কড়ি চয়নের অপরাধে বাঘের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।[৫৩] আবার 'বাঘের দয়া'[৫৪] নামক গল্পে বাঘের বন্দিদশা মোচনকারী ব্রাহ্মণটিকে অঢেল মণি-মুক্তার উপঢৌকন দিয়েছে কৃতজ্ঞ ব্যাঘ্রটি।

পরিচিত 'শেয়াল ঘটক' বা 'The Match Making Jackal'[৫৫] গল্পে শিয়াল, দরিদ্র তাঁতির সার্থক মন্ত্রণাদাতা। তারই প্রচেষ্টায় ধাপে ধাপে তাঁতি উন্নতির সোপান বেয়ে রাজার জামাতার পদলাভ করেছে। এইভাবে ঐশ্বর্য প্রাপ্তিতে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছে শেয়ালটি।

দেড় আঙুলের গল্পেও[৫৬] ব্যাঙ রাজপুত্র তার স্ত্রী কুনোরানীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয় দেড় আঙুলের সহায়তায়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একমাত্র সম্বল কানাকড়িটি দান করে—"ভাই ভাই আমার কানা কড়িটি নাও। এইটি দিয়ে তোমার বাপকে কিনে নিও।"[৫৭]

কয়েকটি কথায় সর্পজাতীয় সরীসৃপেরাও যুক্ত থেকেছে সম্পদের সঙ্গে। মনসা পূজার অন্যতম ব্রতকথায় অনাথা ছোট বধূকে অলঙ্কারে মণি, মাণিক্যে পরিপূর্ণা করে তুলেছে তার আড়োশ-পাড়োশ,[৫৮] এয়োরাজ-মুণিরাজ প্রভৃতি নাগ ভ্রাতাগণ।[৫৯]

'শীত-বসন্ত'[৬০] গল্পে জলচর প্রাণী মৎস্য এনেছে জেলে, যে মাছটি খেলে হাসলে মাণিক ঝরবে, আর কাঁদলে ঝরবে মুক্তো।

অবশ্য সোনা দানা হীরা মাণিক্য জহরৎ ইত্যাদি, যাবতীয় সম্পদের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক সংযোগ ঘটেছে পক্ষীকুলের। ঐশ্বর্য ও পক্ষীর প্রসঙ্গটি এবার আলোচনা করা যাক্।

একাধির বাংলা লোককথায় পাখি সৌভাগ্য ও সম্পদের কারণরূপে আবির্ভূত হয়েছে। পাখি প্রত্যক্ষভাবে ঐশ্বর্যের উৎস হয়ে উঠেছে। 'কণ্ঠকমল পাখী' গল্পটিতে পাখি পরামর্শ দিয়েছে 'আমি যত তোলা ঘি খাব তত তোলা সোনা লাদব।[৬১] 'সাদ ও সাইদ' গল্পটিতে কথক বলেছেন, যে সী মোরগের কবিলা খাবে রাজা হবে আর মাথাটি খেলে প্রতিদিন শিয়রে লাভ করবে হাজার টাকা।[৬২]

'The Story of Prince Sabur'[৬৩] গল্পে দেখি যে নির্বাসিতা রাজকন্যা বন্য পাখির পালক দিয়ে পাখা তৈরী করে অল্পকালের মধ্যে নিঃস্ব অবস্থা থেকে বিপুল সম্পদের অধীশ্বরী হয়েছে।

একাধিক লোককথায় ঐশ্বর্যলাভের সার্থক দিশারী পাখি। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায়[৬৪] দেখা যায় যে, পেঁচা-পেঁচীই ব্রাহ্মণ বালককে পরামর্শ দিয়েছে দেবলক্ষ্মীর নিকট 'তিল ধুবড়ী' প্রার্থনা করার, যা কিনা সম্পদেরই সূচক। 'The Story of Hiraman'[৬৫] 'কণ্ঠকমল পাখি'[৬৬] ভাগ্যধর[৬৭] ইতিহাসমালা গ্রন্থের ১৪৪[৬৮] সংখ্যক গল্প ইত্যাদি অসংখ্য লোককথায় দেখা যায় যে পাখির পরামর্শেই কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে।

প্রসঙ্গতঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সঙ্কলিত 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে চতুর্থ খণ্ডের পক্ষীমাতা গল্পটি[৬৯] স্মর্তব্য। একটা চিল মনুষ্যকন্যাকে কেবল লালনই করেনি, তার বিবাহ পরবর্তী জীবনের সকল সুখ সুবিধার দায়িত্বও বহন করেছে। শেষে এমন এক অফুরান ডোল পালিতা কন্যাকে দান করেছে যে ডোলটি মহার্ঘ বস্ত্রসম্ভারে সর্বদাই পরিপূর্ণ।

বিবিধ পুরাকথায় একাধিক পাখির জন্মেতিহাস থেকে ভেসে আসে অর্থের ঘ্রাণ। সম্পদ বিচ্ছেদের কাতরতায় (ডাহুক পক্ষীর জন্মকথা)[৭০] অথবা ঋণশোধের অপারগতায় মানুষ মৃত্যু বরণ করে অপেক্ষাকৃত হীন পক্ষীজন্মগ্রহণ করেছে (চৈতার বৌ)।[৭১] পাপিয়ার জন্মকথায় [৭২] সম্ভবত, সম্পদের প্রতি আত্যন্তিক মোহ থেকেই যে এই মানবেতর অবনতি, তার ইঙ্গিতও ফুটে উঠেছে।

বস্তুত, সম্পদের সঙ্গে পশুপাখির এই যে যোগসূত্র তার মূল নিহিত আদিম জীবন-অভিজ্ঞতায়। আরণ্যক মানুষ যাযাবর জীবন থেকেই পশুর উপর নির্ভরশীল। একদিকে তারা আদিম কল্পনায় পশুর সঙ্গে একাত্মবোধ করেছে, আবার পূজা স্তুতি, প্রার্থনা দ্বারা পশু দেবতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, তেমনি অপর দিকে শিকার প্রার্থনায় প্রজননের উদ্দেশ্যে গুহার গায়ে পশুর প্রতীকী ছবি এঁকে মানুষ ব্যক্ত করেছে তার কামনা। চিন্তাধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই উর্বরতা-তন্ত্রের প্রতীক হয়ে উঠেছে সাপ,গরু,পাখি ইত্যাদি প্রাণিকুল। সম্পদ উৎপাদনে পাখির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানটিকেই লোককথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। ফসল উৎপাদনে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রদানে, ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণে পশুপাখির প্রত্যক্ষ ভূমিকাটি যেমন চর্চিত হয়েছে তেমনি অর্থনীতিতে পরোক্ষ অবদানও প্রতীকী-রূপান্তরের (Symbolic Transformation) মাধ্যমেই ব্যক্ত করা হয়েছে। 'শঙ্খমালা' গল্পে শিশু নীলমানিকের প্রতি প্রণাম জানিয়েছে বনের যাবৎ পশুপাখি—

'ময়ূরে পাখা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে; তাহার উপর মোহর। হাতী দাঁত বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার উপর মোহর, হরিণ শিং তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহার উপর মোহর, গাছ যে ফুল পাতা ছড়াইয়াছে, তাহার উপর মোহর।'[৭৩]

— মোহর যাবতীয় পশুসম্পদেরই প্রতীক। অর্থাৎ পশুপাখির প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্যের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে কৃতজ্ঞ মানবেরই ঋণস্বীকার।

বনজ সম্পদ

একাধিক লোককথায় বনজ সম্পদ সংগ্রহের বিবরণ চিত্রায়িত হয়েছে। 'শঙ্খমালা' গল্পে দেখি মোম, মধুর জন্য মৌচাক সংগ্রহের দৃশ্য—

'রাতের বাতাস ছাড়ে, মশাল হাতে নিয়া কাঠুরিয়া মৌচাক কাটিতে যায়। ....জন্মকাল কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটে— মৌ লোটে।'[৭৪]

ঐ গল্পেই চন্দনকাঠ বিক্রয়ের প্রসঙ্গও এসেছে। শক্তিসুন্দর চন্দনগাছের ডাল কেটে উপযুক্ত মূল্যে সেটি বিক্রয় করার জন্য অনুরোধ করেছে কাঠুরিয়াকে—

'বেণের মতো বেণে পাও, শাঁখ বাজাইয়া ডাল তাঁর হাতে দিও।'[৭৫] — দেখা যাচ্ছে উপযুক্ত সমঝদার ব্যতীত চন্দনকাঠের গুণগত মান নির্ণয় অসুবিধাজনক। চন্দনকাঠের মহার্ঘতা অনুধাবনে যে দক্ষতা অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন সে প্রসঙ্গ পাই 'The Evil Eye of Sani'[৭৬] গল্পটিতে।

সেখানে ভাগ্যের বিমুখতায় বনবাসী হয়েছেন রাজা শ্রীবৎস, আশ্রয় পেয়েছেন কাঠুরিয়াদের গ্রামে। কিন্তু কাঠুরিয়াদের পেশাগত দক্ষতাও হার মেনেছে মহারাজ শ্রীবৎসের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কাছে। ফলে—

'The wood cutters used to bring to market large loads of common woods and Sribatsa only a few pieces of sandal woods for which he got more money than other'[৭৭]

বাংলার লোককথার কিয়দংশে দেখা গেছে যে বৃক্ষ ধন উপার্জনের পথে প্রধান সহায়ক ও সার্থক উপদেষ্টা। 'The Story of Prince Sabur'[৭৮] গল্পে বণিক নন্দিনী নির্বাসিতা হলেন গভীর অরণ্যে। সেখানে এক বটবৃক্ষ মাতৃস্নেহে কেবল যে তার নিজকাণ্ডে আশ্রয়ই দিল, তাই নয়, তারই চতুর পরামর্শে বণিক পুত্রী গাছের গুঁড়ির চারিধারে ছড়িয়ে রাখল খই। সেই খই খেতে এসে ময়ূর ফেলে গেল তার পেখম। মনোহর সেই কলাপের পাখা তৈরী করেই বণিকপুত্রী অল্প সময়েই প্রচুর ধন উপার্জন করল।

'The Bald Wife'[৭৯] গল্পে দুখিনী বিরলকেশা নারীটি যখন কলাগাছের পরিচর্যা করেছে, কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ গাছ তাকে দিয়েছে অক্ষয় কদলী পত্র।

'Take child this leaf, and when you move it, you will get not only all sorts of delicious plantains but all kind of agreeable food.'[৮০]

ঠিক সেইরকম কার্পাস বস্ত্র সম্ভারের অফুরাণ বৃষ্টি হবে—

'......and when you shake it, you will get not only all sorts of cotton clothes but also of silk and purple.'[৮১]

'সুখু আর দুখু'[৮২] গল্পেও কৃতজ্ঞ সেওড়া গাছ সুশীলা দুখুকে দিয়েছে একঘড়া মোহর, কলাগাছ দিয়েছে একছড়া সোনার কলা। এইভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়— জীবনের এই তিনটি প্রাথমিক চাহিদা পূরণের প্রধান সহায়ক হয়েছে অরণ্য তথা বৃক্ষরাজি।

লোকায়ত মানুষের বিশ্বাসে, শ্রদ্ধায়, স্মৃতিতে লালিত হয়েছে যে আরণ্যক চেতনা, তা প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ মানবেরই স্মরণিকা। আদিমকাল থেকেই বৃক্ষ মানবের আশ্রয়স্থল, বৃক্ষের ফল-মূল তাদের আহার্য, বৃক্ষ-বাকল তাদের পরিচ্ছদ। লিখিত সাহিত্যের কবি গোবর্ধন আচার্য সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে বটবৃক্ষের প্রশস্তি গেয়েছেন—

ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবনো বসতু বা লক্ষ্মৌঃ

কুগ্রামে বটগাছ, তোমার মধ্যে বৈশ্রবর্ণের (কুবের) অথবা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান।[৮৩]

— আর এই বিশ্বাসই লোককথায় প্রকাশিত হয়েছে প্রতীকী চিত্রে, কখনো বা সরাসরি। 'মধুমালা' 'পুষ্পমালা', 'কোটাল পুত্র চন্দন', 'রাজকন্যা কলাবতী'— এইসব নামকরণে তাই প্রকৃতিজ সৌরভ মাখানো, আর আরণ্যক সম্পদের বিপুল অবদানের উদ্দেশ্যে প্রায়শই লোকায়ত কণ্ঠে বেজে উঠেছে শ্রদ্ধা মেশানো নম্র কৃতজ্ঞতাবোধ—

'Good Mother you are truely good to give us shelter at such a fearful cost.'[৮৪]

এই 'Shelter' তথা সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিধানের রূপকার হিসাবে এই স্বীকৃতিদান নিঃসন্দেহে যথার্থ।

বাণিজ্য

সমুদ্র সিকতাভূমি বঙ্গদেশ। প্রাচীন বাংলার অর্থাগমের অন্যতম উপায়ই ছিল বাণিজ্য। সমতট বাংলার দুরন্ত নাবিকগণ সমৃদ্ধ নৌবহর নিয়ে পাড়ি দিয়েছে সুমাত্রা, জাভা, রোম, চীন, মৌখরীরাজ ঈশান বর্মার হড়াহা লিপিতে (ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ) বাংলার অধিবাসিগণ 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন। [৮৫]

সংস্কৃত প্রবচন তো সোচ্চারে ঘোষণাই করেছে—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্ধনং কৃষি কর্মানি।
তদর্ধনং রাজ সেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।[৮৬]

—বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধনাগম হয়, কৃষিকার্যের দ্বারা তার অর্ধেক, রাজসেবায় তারও অর্ধেক, কিন্তু ভিক্ষায় প্রাপ্তির ঘরে শূন্য।[৮৭]

বাংলার বেশ কিছু লোককথা বাণিজ্যিক স্বর্ণযুগের উজ্জ্বল চিত্রের ধারক।

লোককথায় দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে ' চৌদ্দ পুরুষের চৌদ্দভরা লক্ষ্মীর বাসর মধুকর।'[৮৮] কখনো বলা হয়েছে সওদাগরের সওদাগরী...দিলে নিলে লক্ষ্মীর বর।'[৮৯]

সত্যই সম্পদের সিংহভাগের নিয়ন্ত্রক সওদাগর শ্রেণী। আয়-বেণে,[৯০] সায়-বেণে,[৯১] মস্ত-বেণে,[৯২] গস্ত-বেণে,[৯৩] এই নামকরণগুলি সমৃদ্ধির পরিচায়ক। নামকরণেই নয়, স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন তাদের সর্বাঙ্গেই আঁকা—

'লাল টোপর, লাল পাগড়ী, চৌদ্দ ডিঙ্গার অধিকারী পরম সুখী এক ভারী সওদাগর।'[৯৪]

অতুল বৈভবের অধিকারী সওদাগরের সম্মানও রাজ তুল্য কখনো বা রাজা অপেক্ষাও শক্তিশালী। ইতিহাসমালা গ্রন্থের একটি গল্পে সওদাগরপুত্রের কাছ থেকে রাজপুত্রের অর্থ কর্জ নেওয়ার প্রসঙ্গটি এসেছে।[৯৫] অন্যত্র শঙ্খমালার গল্পে শ্রমবিমুখ শঙ্খমণি যখন নিজের নিষ্কর্মা জীবনের পক্ষে দুর্বল যুক্তি খাড়া করেছে—

' সেই রাজার বেটা পক্ষ্মী মারে, আমার ঘরে, না হয় লক্ষ্মীই ছাড়ে, রাজারও যা, সওদাগরেরও তা',[৯৬] তখনই বণিক পত্নী তথা শঙ্খমণির মাতা তীব্র প্রতিবাদ করেছে।

—'রাজার ঘরণা রাজা টুটায়, সওদাগরের কি?'[৯৭]

বাণিজ্য যাত্রার আড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তুতি দৃশ্য বহু লোককথাতেই দেখা যায়। বাণিজ্য, সওদাগরের বংশানুক্রমিক কর্ম। সওদাগরী তাই, পূজারই সমান শ্রদ্ধার্হ। পূজার পূর্বে মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার যেমন আবাহনী মন্ত্র, ঠিক তেমনি বাণিজ্যতরী পূজার মন্ত্র—

'চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে উঠে বৈস মা আমার যোড় আসনের পাটে।'[৯৮]

একনিষ্ঠ প্রার্থনায় মধুকর ভেসে উঠল, তারপরই মধুকর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ ঘোষণা করে 'তিনকুড়ি ডঙ্কায় কাটী পড়িল। কালী কালী রব উঠিল। সাত সন্তান মাঝি কর্ণধার সওদাগর পুত্রের সঙ্গে দহের জল মাথায় গলুইয়ে ছিটাইয়া, ধলো কালো চামর পরাইয়া তিন- চৌদ্দ- তের কাছিতে চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর আনিয়া ঘাটে বাঁধিল।'[৯৯] বাণিজ্য যাত্রার শুভারম্ভে এই সগর্ব ঘোষণার পর শুরু হয় চৌদ্দ ডিঙ্গা সুসজ্জা ও অঙ্গরাগ চর্চা।

'নতুন পালের দড়ি হালের মাথার কড়ি'[১০০] ঝালর মোতি পতাকায় সুসজ্জিত হল। তৈলচিক্কন ডিঙাগুলিতে দিবারাত্র জ্বেলে রাখার জন্য পঞ্চপ্রদীপ, মণির ঝালর, বণিকের নামাঙ্কিত পতাকা— কথকের এই অনুপুঙ্খ বর্ণনা শ্রোতার মনকে এক লহমায় নিয়ে যায় সেই প্রাচীন যুগে, যেখানে কোলাহলমুখর সাগরের ঘাটে ভারে ভারে বেসাতিপূর্ণ ডিঙ্গাগুলি সমুদ্র অভিযানের অপেক্ষা করছে—

জয়কালী ডিঙ্গা সাধু পাছে ফালাইল।
লক্ষ্মী ডিঙ্গায় সাধু উঠিয়া বসিল
বারকাহন চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসাইয়া দিল।
লক্ষ্মী ডিঙ্গা আগে আগে বাউনি করিল।[১০১]

অবশ্য যাত্রার শুভমুহূর্ত স্থির করেন অভিজ্ঞ কর্ণধার—' যে দিন তারা নড়িবে না, দিক নড়িবে না, উজান ভাটির বাতাস ঠিক, সেই দিন দিক্ পবন খেলিলেই ডিঙ্গা ছাড়িবে।[১০২]

বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্মুহূর্তের করণীয়গুলি একে একে বর্ণিত হয়েছে 'কাঞ্চনমালা' গল্পে—

মায়ের কাছে তো বিদায় নিয়াছ?
নিয়াছি।
ভোগ প্রসাদ মুখে দিয়াছ?
দিয়াছি।
সান সিনান বাকী নাই? পঞ্চদীপ বাদ নাই?

দেবমন্দিরের অষ্টচূড়া ধনকাহন উরা পূরা
যার যার খোরাক বাঁটিয়া দিয়াছ?
দেব-দেবতা সকলের কাছে গড় প্রণাম বিদায় নেও নাই?[১০৩]

এই দীর্ঘ তালিকার কোন একটি অকৃত থাকলেই যাত্রায় বিঘ্ন ঘটতে বাধ্য—এই দৃঢ় বিশ্বাসটিই এখানে ফুটে উঠেছে। তদুপরি দায়িত্ব সচেতন সমাজ মনের পরিচয়টিও অস্পষ্ট থাকেনি। বাণিজ্য যাত্রা বড় দীর্ঘ সময়ের মুখাপেক্ষী, শঙ্খমণির উক্তিতেই সে তথ্য পরিস্ফুট 'নায়ের পসরা নায়ে বরণ হইয়াছে। বারো বৎসরের মত চলিলাম।'[১০৪]

এই দীর্ঘ প্রবাসী জীবন অতিক্রম করে প্রত্যাবর্তন বড় অনিশ্চিত। সেকারণেই যাত্রার পূর্বে ভরণীয় বর্গের প্রয়োজনীয় অর্থ অন্ন সংস্থান বণিকের আবশ্যিক কর্তব্য। তাই শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা বজায় রাখা দেবমন্দিরে দান-ধ্যান করে বাণিজ্যরূপ তীর্থযাত্রার পথ সুগম করা যেমন আবশ্যিক, তেমনি যাত্রায় সিদ্ধিলাভের জন্য 'যার যার খোরাক বাঁটিয়া', দেওয়াও অপরিহার্য কর্তব্য।

অন্যান্য পালনীয় কৃত্যগুলির অন্যতম হল পরিবারের প্রতিটি সদ্যস্যের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। শুধু তাই নয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জনের বাঞ্ছিত বস্তুটি নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এ কেবল স্নেহের তাগিদই নয়, বণিকসম্প্রদায়ের বদ্ধমূল বিশ্বাসই ছিল যে দ্বিধাশূন্য মনে বিদায় না নিলে এবং চাহিদা মতো দ্রব্য আনয়নের প্রতিজ্ঞার ব্যত্যয় ঘটলে 'হাল ভাঙ্গিয়া যায় মাস্তুল ছিঁড়িয়া যায়'।[১০৫] নৌকা'এক বিশও'[১০৬] যায় না। বিধিবদ্ধ আরও কিছু সংস্কার নিয়ন্ত্রণ করেছে বহির্বাণিজ্য রীতিকে। বেসাতিপূর্ণ বাণিজ্যতরী যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত, তখন সেই যাত্রা স্থগিত রাখা কোনমতেই সম্ভব ছিল না—

দেখ নায়ের পসরা নায়ে বরণ হইয়াছে, তখন আর আমি ফিরিব না।'[১০৭]

এমনকি, বণিক শ্রেণীর বিবাহের প্রথম বৎসর বাণিজ্য ছিল নিষিদ্ধ (Tabooed) 'মদন-সাধু'[১০৮] লোককথাটিতে স্ত্রী সমলা পতি মদনকে সতর্ক করে দেয়—' বিয়ের বৎসর বাণিজ্যে যাইতে কুযাত্রা যে লাগে'[১০৯] এমনকি কর্ণধার পঞ্চামাঝিও ঐ একই সতর্কবাণী শুনিয়েছে মদনসাধুকে। গল্পের অগ্রগতিতে দেখা গেছে এই নিষেধ ভঙ্গজনিত নানা বিপত্তি বাণিজ্যকে পদে পদে ব্যাহত করেছে।

সতীনারীর পুণ্যহস্তের পবিত্র স্পর্শে অচল বাণিজ্য তরী সচল হয়েছে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 'The Evil Eye of Sani'[১১০] গল্পটি। যেখানে মহাজনী নৌকাটি বালির চড়ায় বহু বৎসর যাবৎ আটকা পড়ে ছিল। চিন্তামণির আকস্মিক স্পর্শে তা সচল হল।

'The boatman astonished at the event, thought that the women had uncommon power and might be useful on similar occassions in future, they therefore caught hold of her, and rowed off.'[১১১]

ঠিক একইভাবে, 'কাঞ্চনমালা' গল্পটিতে সতী কাঞ্চনকে বাণিজ্য যাত্রার সঙ্গিনী না করলে রূপলালের নৌকা এক বিশও যায় না। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'তিনশ যাট বছরের

ভাঙ্গা নায়ে'[১১২] কাঞ্চনকে দিয়া বণিক রূপলাল যাত্রার শুভারম্ভ করেছেন আর তখনই সাধুর নৌকা 'চার চৌদ্দ ছাপান্ন পাল তুলিয়া সাঁ সাঁ করিয়া যায়'। [১১৩] বিদায় গ্রহণের পর ধান দূর্বা তেল সিঁদুর বাতি দিয়ে নৌকার অর্চনা হয়। এরপর কর্ণধার কালী কালী রব তুলিতেই চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর মুখ ফিরাইয়া পলকে কালী সাগরের থই থই জলে ঢেউ ভাঙ্গিয়া উড়িয়া চলিল।'[১১৪]

বাণিজ্যিক পণ্য

'সওদাগর যত ধন রত্ন সকল দিয়া বাছা বাছা বেসাতি কিনিয়া ভরাপূর্ণ করিয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর সাজাইল।[১১৫]— পণ্যবাহী সপ্তডিঙ্গা, চৌদ্দডিঙ্গা মধুকর ময়ূরপঙ্খী, শুকপঙ্খী দাপটের সঙ্গে সমুদ্র উত্তাল করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে বটে, তবে রপ্তানি দ্রব্যগুলি প্রায় অনুল্লেখিত থেকে গেছে। অবশ্য 'শ্বেত-বসন্ত'[১১৬] গল্পে এক ছাগল বেপারী সওদাগরের পরিচয় পাই যে দেশ থেকে সাত হাজার ছাগল নিয়ে সাত জাহাজ ভর্তি করে বিদেশে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল।

এছাড়া, বাংলার সিঁদূর, বিশেষতঃ সতী নারীর সিঁদূর এক দূর্লভ রপ্তানি দ্রব্য। সতীকাঞ্চনমালা সওদাগর স্বামী রূপলালকে অনুরোধ করেছে—

"আমি সিঁদূর বেচিয়া বেড়াব বাড়ী বাড়ী তোমার পসরা নিয়া মাথে।'[১১৭] সত্যই দেশে মন্বন্তরের সময় কাঞ্চনমালা তার সধবা সিঁদূরের বিনিময়ে প্রাত্যহিক অন্ন সংগ্রহ করেছে।

লোককথাগুলির মধ্য দিয়ে নানাবিধ আমদানিকৃত দ্রব্যের সাক্ষাৎ মেলে। সপ্তদলমণি,[১১৮] রক্তদলমণি,[১১৯] স্বর্ণমুখ সাতশঙ্খ[১২০] ইত্যাদি মহার্ঘ পণ্যসম্ভার দেশে আমদানী করার চিত্রটি পাই 'কাঞ্চনমালা'গল্পে। শঙ্খ জনপ্রিয় হলেও, তা ছিল দুর্লভ বিদেশীপণ্য, রূপলাল বলেছে কাঞ্চনমালাকে— তোমার তরে আনিব শাঁখা গজমুক্তার মালারে।[১২১] 'Field of Bones' [১২২] গল্পে এক জাহাজের অধিনায়ক সোনার খনির সন্ধান পেয়ে চলেছে দূর দেশে। 'শাহনশাহ বাদশা' [১২৩] গল্পে সওদাগর দেশে নিয়ে এসেছে হীরা মাণিক্য, লালমোতি ইত্যাদি মহার্ঘ সম্ভার।

ভরণীয় বর্গের স্নেহের আব্দার মেটাতেও সদা তৎপর ছিল সওদাগর শ্রেণী। 'কণ্ঠকমল' পাখি'[১২৪] গল্পে এক পত্নী সওদাগরকে (যে আবার রাজাও) অনুরোধ করেছেন—

'আমার জন্য আরব থেকে জায়নামাজের পাটী আর তসবী কাঁটা আনবেন।'[১২৫]

—স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে গল্পটিতে।

আন্তর্জাতিক ও অন্তঃদেশীয় উভয় প্রকার বাণিজ্যই চালু ছিল। দেশের মধ্যে প্রধানত হাট-বাজারই ছিল ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র। নিত্য প্রয়জনীয় তৈজসপত্র কাঁটা-সূতা বিক্রয়,[১২৬] মুড়ি-মুড়কির দোকান,[১২৭] ময়ুর-পাখা বিক্রয়,[১২৮] কলুর তেল বিক্রয়,[১২৯] ফুটি, কুমড়ো,ওল, মানকচু[১৩০] ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য সবই হাটে বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনা হত। পান সুপারীর দোকানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় কাঙ্গালা গল্পে। তবে পান-সুপারী ছিল মহার্ঘ-বস্তু—জনপ্রিয় হলেও প্রধানত উচ্চবিত্তদের কাছে তা সুলভ ছিল। 'The Match Making

Jackal'[১৩১] গল্পে চতুর শিয়াল শিবালুর আনন দেখে রাজকন্যা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'It must be a very prosperous country where the jackals chew betel leaves'[১৩২]

শিল্পজাত দ্রব্যগুলি প্রধানতঃ দেশীয় হাটবাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। 'The History of a Rogue' [১৩৩] গল্পে সোনার তৈরি নকল নাক বিক্রয় প্রসঙ্গটি পাই। এছাড়া স্মরণীয় সেই ব্রতকথাটি যেখানে কামার হাটে লোহার অলক্ষ্মী মূর্তি নিয়ে বিক্রয় করতে এসেছিল।[১৩৪] বলা চলে, স্বর্ণালঙ্কার ও মহার্ঘ ধাতু-দ্বারা নির্মিত মূল্যবান সামগ্রীর বিক্রয় দেশেই প্রধানত আবদ্ধ হয়েছিল। আর কাঁচামাল হিসাবেই স্বর্ণ হীরা বিদেশ থেকে আমদানী করা হতো।

বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের মধ্যে স্থান ছিল পশুপক্ষীর। ইতিহাসমালার একটি গল্পে গৃহস্থের জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে জমজমাট ব্যবসা ছিল তা হলো বলদ বিক্রী।'[১৩৫] 'The Story of A Hiraman' [১৩৬] গল্পে ব্যাধ হীরামন পাখিটিকে নিয়ে সরাসরি পৌঁছেছে রাজদরবারে, স্বয়ং রাজার কাছেই বিক্রি করেছে সেটি। আর জেলেদের জীবন নির্বাহের একমাত্র উপায়ই ছিল মীনসন্তানগুলি।

ক্রয়-বিক্রয়রীতি

লোককথাগুলি কর্মমুখর জনজীবনের ব্যস্ত চিত্রশালা। ক্ষুদ্র বেপারিগণ হাটেই বাণিজ্যিক দ্রব্যের পসরা সাজাত। কিন্তু বৃহত্তর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিচিত্র পন্থা প্রযুক্ত হয়েছে বহু লোককথাতে। বিক্রয়কালে উৎসুক ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য প্রচলন ছিল শঙ্খধ্বনি—

বন্দরে অনেক বেনে, কাঠুরিয়া সেখানে আসিয়া শাঁখে ফুঁ হাঁকিল। এক বড় ভারি সওদাগর হা-হা করিয়া আসিয়া শঙ্খ ধরিল।[১৩৭]

বণিক কর্তৃক নিযুক্ত লোক বিদেশের হাটে বাজারে প্রার্থিত দ্রব্যের সন্ধানে উচ্চারিত কব তুলেছে; এমন দৃশ্যও দুর্লভ নয়—

'At last, the men went through the streets bowling out– wanted Sobur, wanted Sobur.'[১৩৮]

প্রিয়জনের বাঞ্ছিত দ্রব্যটির মূল্য যতই উচ্চমানের হোক না কেন, সেটি সংগ্রহের জন্য যত দুর্গম পন্থাই হোক না কেন, লোককথার বণিক তাতে পশ্চাৎপদ হত না। শাহজাদা নামদার, যার অবহেলিত পুত্র ক্ষ্যাপার বাঞ্ছিত বস্তু একটি কণ্ঠকমল পাখি, সেটি সংগ্রহের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেছে সে— 'দেখ উজির একপাক্ কিনতে মালমশলা সবই তো বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু বিক্রি হলেও পাক আমরা চাই, না হলে জাহাজ চলবে না।'[১৩৯]

রাজা জাহাজের সমস্ত পণ্য বিক্রয় করে ৮০ মণ তুলো ক্রয় করে সে তুলোর সাহায্যে আশ্চর্যসুন্দর কণ্ঠকমল পাখির ডিম সংগ্রহ করেছে।

স্বদেশে থাকাকালীন সওদাগরের জীবনে কর্মহীন বিশ্রাম ছিল দুর্লভ। দিনান্তে তহবিলের হিসাব মেটাতে হত তাদের—'শেষ প্রহরের ডঙ্কা বাজিতেই সওদাগর বহর বেসাতি

বুঝিতে গেছেন।'[১৪০]

সফল বাণিজ্যের মূল কৌশলগুলি বিবৃত হয়েছে 'শঙ্খমালা' গল্পে। শঙ্খমণির মা বাণিজ্যের করণীয়গুলি সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছে—

'বাপ! বুঝিয়া বেপার করিস। এক কড়ি কম করিতে পঞ্চকড়ি দ্বিগুণ করিস্। আপন কাহন বুঝিয়া নিস্। হাজার তুফান পাড়ি দিয়া ঘাটের ভরা বুঝাস।'[১৪১]

আর্থিক লাভের অন্যতম দূষিত পন্থা অসাধু বাণিজ্য। সততার পাশাপাশি অবাধে চলত কপটতা। সাতদিন ধরে শক্তিসুন্দর প্রদত্ত চন্দন কাঠটি নিয়ে সকল বণিকের দুয়ারে দাঁড়ায় কাঠুরিয়া 'আয়-বেণে, সায়-বেণে, গস্ত-বেণে সকল বেণের দুয়ারেই দেখিল মহামাণিক্য মহামাণিক্য বলে লোকেরে বিকায়।[১৪২] কোথাও বেণে দারুচিনি দিতে দরমুজা বাহির করে। কোনও বেণে পাথরের টুকরা ঝাঁপিতে ভরিয়া থোয়।

'ব্রাহ্মণ ও বেণে ভাইপো'[১৪৩] গল্পে অসাধু বেণে ভাইপো ব্রাহ্মণের বিশ্বাসের অমর্যাদা করে তার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করেছে। সরল নির্বুদ্ধিতার সুযোগে বোকা জামাইকে 'কিছু-মিছু' নামক দুষ্প্রাপ্য বস্তু প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধূর্ত দোকানী দিয়েছে একটি ওল।[১৪৪]

—এই ক্লেদাক্ত বাণিজ্যের রমরমা রাজত্বের পাশাপাশি কাঠুরিয়ার সততা ও নিষ্ঠা অবশ্য লক্ষ্যণীয়। 'শঙ্খমালা' গল্পে দেখা যায় বিক্রয়ের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে যে কোন বণিকের কাছে যে কোন মূল্যে কাঠুরিয়া শক্তিসুন্দরের চন্দনকাঠটি বিক্রয় করেনি।

'এই শহরে একটি বেণের মতো বেণে পাইলাম না। ধর্মের মায়ের বেসাতি বিকাইতে পারিলাম না, দেখি।'[১৪৫] *এই চিন্তা করে নিজের জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করে* বারো বৎসর সৎবণিকের সন্ধান করেছে—জাতিতে বণিক না হলেও এই পরার্থপরতা ও সৎ বাণিজ্য-নিষ্ঠা সত্যই বিস্ময়কর।

'লাভ নাই বাণিজ্যে'[১৪৬]—এই গল্পিকাটি বাণিজ্যিক পদ্ধতির মধ্যে এক হাস্যকর অসঙ্গতিকে প্রকট করে তুলেছে। বেঙ্গা ও আফুট্যা গাবতলির হাটে মুড়ির মোয়া আর মাঠা নিয়ে যায়। মধ্যপথে, গাছতলাতে বিশ্রামের সময় একটি দুই আনাকে মূলধন করে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে আহার্য সংগ্রহ করেছে। ফলে, একমাত্র সম্বল দুই আনাটি একবার বেঙ্গা ও একবার আফুট্যার কাছে ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত হয়েছে। ফলে, বেসাতির ঝুড়ি শূন্য হয়ে গেলেও লাভের ঘরের একমাত্র সম্পদ সেই দুই আনাটিই।

বাণিজ্যিক ক্রমাবনতি

কালের গতিতে যদুপতি যান, তাঁর মধুরাপুরীও গৌরব হারায়। বণিক শ্রেণীর অসীম প্রতিপত্তির রশ্মিছটাও ধীরে ধীরে অস্তগামী হয়েছে। দ্বাদশ শতকের কবি গোবর্ধন আচার্য বলেছেন—

তে শ্রেষ্ঠীনঃ ক্ব সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধুনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি।।

—হে শক্রধ্বজ, যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন) তোমাকে উন্নত করে গিয়েছিলেন, সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়! এখন লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ বা মেঢ়ি করতে চাইছে।'[১৪৭]

বাংলা লোককথাতেও এই একজাতীয় বিলাপোক্তি ফুটেছে 'শঙ্খমালা' গল্পে কর্ণধারের কণ্ঠে—

'হায়! সেদিনও নাই, সে কালও নাই, এখন চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর হয়তো জলের তলায় সাপ কুমীর হইয়া গিয়াছে'।[১৪৮]

বণিকজাতির ক্রমহ্রাসমান প্রতিপত্তি সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন, 'অষ্টম শতক হইতে সমাজ অধিকতর কৃষিনির্ভর এবং উত্তরোত্তর এই নির্ভরতা বাড়িয়াই গিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য ধনোৎপাদনের প্রধানত প্রথম উপায় আর থাকে নাই। সেইজন্য রাষ্ট্র ও সমাজে ইহাদের প্রাধান্যও আর থাকে নাই। শ্রেণী হিসাবে সপ্তম শতক পূর্ব মর্যাদা আর তাহারা ফিরিয়া পান নাই।'[১৪৯]

এই ভাবনার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোককথায়। পূর্বে বাণিজ্য ছিল বংশানুক্রমিক, গর্ব ও সম্ভ্রমের বিষয়। শঙ্খমণির মাতা সেই বংশগত সম্মান প্রসঙ্গে সচেতন করেছে শঙ্খমণিকে—"তুই জেলের ছেলে নোস্, মালীর ছেলে নোস্, তুই সওদাগরের পুত্র। তুই বাণিজ্যে না গেলে বংশের লক্ষ্মী ছাড়ে।'[১৫০]

পরবর্তীকালে এই পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা বৃত্তিতেই আবদ্ধ থাকার মানসিকতা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছে। 'চারিরতন'[১৫১] গল্পে সওদাগরের চারিপুত্র প্রত্যেকেই জীবনে সাফল্য অর্জন করেছে। বংশের লক্ষ্মী তাদের পরিত্যাগ করেন নি। সভারতন মন্ত্রণাদাতা, হালুয়ারতন হাল বায়, উন্দারতন নিষ্কর্মা আর রাগিনীরতন গান করে। লক্ষণীয়, নামগুলিও তাদের বৃত্তিরই অনুগামী।

বাণিজ্যিক দক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও অপসৃত হয়েছে। 'সওদাগরের সাত ছেলে'[১৫২] গল্পে দক্ষ ব্যবসায়ীর সাত পুত্রই অপদার্থ, বংশানুক্রমিক ক্ষুরধার বুদ্ধির কণামাত্র তাদের অধিকারে নেই। ফলে তাদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন ঘেসেড়া বৃত্তি।

দীনেশচন্দ্র সেন বাণিজ্যিক অধোগতির আনুষঙ্গিক কারণ হিসাবে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধকরণের প্রশ্ন তুলেছেন। সে প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য 'অনেক স্থলে হিন্দুর ছেলে প্রবাসে গেলে ভিন্ন ধর্মীয় মেয়ে বিবাহ করিয়া ফেলিত। দেশ হইতে লোক চলিয়া গেলে তাহারা অনেক সময় ফিরিয়া আসিতে চাহিত না, কোন স্বাধীন দেশে উপনিবিষ্ট হইত।'[১৫৩]

লোককথাগুলির পর্যালোচনায়, বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি সওদাগরের আকর্ষণ তীব্রভাবে ধরা পড়েছে। 'শাহনশাহ্ বাদশা'[১৫৫] গল্পে বাদশা নববিবাহিতা স্ত্রী অতুলাকে নিয়ে প্রমোদমন্দিরে লীলা বিলাসে ব্যস্ত, আর 'শঙ্খমালা' গল্পে শঙ্খমণি মাতার শত অনুযোগ উপেক্ষা করে 'নলভাঙিয়া ক্ষীর খায়' নাক ডাকাইয়া ঘুম যায়।'[১৫৬] অঋণী অপ্রবাসী হয়ে গৃহসুখ আস্বাদনের যে জড়তা বাঙালীকে কূপমণ্ডুক করে তুলেছিল—এ তারই লজ্জাকর আলেখ্য।

বণিকজাতির আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়েছে। স্বদেশের বাইরে তাঁরা নিতান্তই সাধারণ নাগরিক। সেকারণেই দেখি খাজনা না দেওয়ার অপরাধে বিদেশীরা রূপলালের নৌকা আটক করে।[১৫৭] উপরন্তু, সওদাগর শ্রেণীর প্রতি এক বিজাতীয় বিদ্বেষের

পরিচয় পাওয়া যায়, যখন দেখি 'কাটন কাটারী'[১৫৮] দেবতার পূজার বলির একমাত্র উপচার সওদাগর।

—'যে সে নরবলি নয়, নরবলির মানুষ সওদাগর হওয়া চাই।'[১৫৯]

বিলীয়মান বাণিজ্যের এই প্রায়ান্ধকার দৃশ্যাবলীই বাংলা লোককথার একমাত্র ভবিতব্য হয়ে থাকে নি। 'কাঞ্চনমালা' গল্পের শেষে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে অক্ষয় যৌবন ও সম্পদ লাভের বর পায় রূপলাল। সকল স্থবিরতা অতিক্রম করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয় সে—

'এইরূপে বারো বারো বৎসর পর বছর পূর্ণিমায় উৎসব নিয়া বারো যুগের যৌবন নিয়া রূপকাঞ্চন রূপকাঞ্চনের দেশের লোকজন সংসার করিতে লাগিলেন।'[১৬০]

—বলা চলে, ব্যক্তিসত্তা অতিক্রম করে সম্পদশালী বণিক জাতির প্রতিভু হিসাবেই রূপলালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সেকারণে লোককথার কথক ও শ্রোতার মানসপটে মুমূর্ষু বাণিজ্য বৃত্তির জীবনচিত্রই নিতান্তই গৌণ, অতীতের কোলাহল মুখর স্বর্ণ যুগই একমাত্র সত্য হিসাবে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—এখানেই লোককথার শিল্পোৎকর্ষ সার্থক।

শিল্প

যূথবদ্ধ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অগ্রগতিতে এসেছে শিল্প—ভিন্নরূপে, ভিন্নসময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় অবস্থায়। জীবনের সঙ্গে শিল্পকর্মের প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটেছে লোককথাগুলিতে। লোকসমাজের বস্তুগতভাবে উৎপাদনশীল স্তরেই শিল্পীর অবস্থান। লোককথায় শিল্প রূপ পেয়েছে মাটিতে, পাথরে, কাপড়ে সূতার নানা রঙ ও রেখার ভঙ্গীতে। নানা যুগের কলাশিল্পের ছাপ পড়েছে এখানে, লোকায়ত ও পরিশীলিত শিল্পকলা পারস্পরিক সাহচর্যে দীপিমান হয়ে উঠেছে, বিচিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে কৌমজীবন নিজেকে ব্যক্ত করেছে।

লোকশিল্পের প্রবহমান স্রোতে প্রচণ্ড বেগসঞ্চার করেছে বস্ত্রশিল্প। কার্পাস থেকে সূতা কাটা ও বস্ত্র বুনন, বহু লোককথায় জীবনধারণের অন্যতম অবলম্বন। বারোমেসে লক্ষ্মী পূজার ব্রতকথায় গরীব বামনী সূতা কেটে হাটে বিক্রী করে সংসার চালাত। 'সুখু আর দুখু' গল্পে—

'দুখুর মা আর দুখু দিনে রাত্রে সূতা কাটিয়া কোনোদিন একখানা গামছা কোনো দিন একখানা ঠেটী এই হয়। তাই বেচিয়া একবুড়ি পায়, দেড়বুড়ি পায়।'[১৬১]

এই গল্পেই হারানো তুলোর সন্ধানে দুখু পৌছায় চাঁদের মা বুড়ীর দেশে—'কেবল দাওয়ার উপরে এক বুড়ী বসিয়া বসিয়া সূতা কাটিতেছে। সেই সূতায় চক্ষের পলকে জোড়ায় জোড়ায় শাড়ী হইতেছে।'[১৬২]

সূক্ষ্ম সূতা-কাটাও উচ্চমানের শিল্প। রানী চিন্তা মিহি সরু সূতা কেটেছে ফলে তুলনামূলকভাবে তার উপার্জনও বেড়েছে—

—'And as she (Chintamani) was an intelligent and skillful woman, she spun finer thread than the other women and she got more money.'[১৬৩]

জন্মসূত্রে রানী হয়েও চিন্তামণির এই কারিগরী দক্ষতা বিস্ময়কর।

বয়ন ও সীবন শিল্প সমাদৃত হয়েছে বহু লোককথায় 'The Story of Prince Sabur'[১৬৪]গল্পে সূচ ও সূতার নিপুণ ফোঁড়ে পাখির পালক দিয়ে সুদৃশ্য পাখা তৈয়ারী করেছে বণিককন্যা। ঘন ফোঁড়ের কাঁথা[১৬৫] সদ্যোজাত শিশুর অঙ্গাবরণ। আবার 'বুদ্ধ-ভূতুম' গল্পে—

'এক একশ বছুরে বুড়ী বসিয়া একটি ছোট কাঁথা সেলাই করিতেছে'[১৬৬] —জরাগ্রস্তা বৃদ্ধার কাঁথা সেলাইয়ের দৃশ্যটি পরোক্ষভাবে স্মরণ করায় কাঁথা শিল্পের প্রাচীনত্বকে।

সাধারণ উপভোগের এই যে বস্ত্রসম্ভার, এগুলি বাংলার তাঁতিদেরই অসামান্য কারুকৃতির স্মারক।

মধুমালার অঙ্গশোভারূপ বস্ত্রসম্ভার দর্শনেও মদনকুমারের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে মুগ্ধতা—

'রাজকন্যার মেঘডম্বর শাড়ী, চন্দনরাঙা চাদর মদন দেখেন।'[১৬৭]

'শঙ্খমালা' গল্পে ঈর্ষান্বিতা কুঁজী শক্তিসুন্দরের 'আগুন পাটের শাড়ী'[১৭০] কাঁচুলি[১৭১] ছিঁড়িয়া দিল।

'মদনসাধু' গল্পেও রাজকন্যা সমলার পরিধেয় 'উদয়তারা'[১৭২] শাড়ি। আবার, নক্শী কাঁথার বুননের মতো শাড়ির জমিতেও কাহিনী ও চিত্রের রঙিন বুনন—

তখন মর্দ খুলিল যে শাড়ীর বন্ধন
শা'বালি বাদশার নাম লিখা হেরেম গুলিস্তান।
আলম আরার ছবি পাইল শাঁড়ীর ফোঁড়ে
দেখিয়া ছবির জ্যোতি অজ্ঞান হইয়া পড়ে।[১৭৩]

—প্রাক্অনুরাগ পর্বে শাড়ির ভূমিকাটি লক্ষ্য করার মতো।

কার্পাসবস্ত্র ব্যতীত পাটবস্ত্রের প্রচলন ছিল ব্যাপক। 'মধুমালা' গল্পেই আছে 'পাটবস্ত্রের চাঁদোয়া হীরামোতির ঝালর,'[১৭৪] শক্তিসুন্দরের অঙ্গে জড়ানো হয়েছে রত্ন পাটের শাড়ী।[১৭৬] মাদুর বুননের প্রসঙ্গ এসেছে 'চোর চক্রবর্তী'[১৭৭]গল্পে।

পশমী বস্ত্রের মধ্যে এসেছে শালের প্রসঙ্গ—'দেখ কোটাল, পার তো শাল্ না পার তো শূল',[১৭৮]কৃতকার্য কোটালের পুরস্কার স্বরূপ 'গায়ের শালখানা ফেলিয়া দিয়া রাজা পক্ষিরাজ ছুটাইয়া পুরে গেলেন',[১৭৯] 'The Match Making Jackal'গল্পে দীর্ঘ শোভাযাত্রার বিবরণেও এসেছে শালের প্রসঙ্গ—

'The streets were covered with cashmere shawls for her father and his attendants to walk on'[১৮০]

রাজকন্যা পুষ্পও লোমের সূতা তৈরী করেছে 'কন্যা তাহার উপর বসিয়া সারাদিন ভেড়ার লোমে সূতা পাকাইলেন।'[১৮১]

পশুচর্মের বস্ত্র পরিধানের প্রসঙ্গ এসেছে, অবশ্য, সেটি দুঃস্থ সম্প্রদায়েরই পরিধেয়—

'Clothed in leather'[১৮২]

বিচিত্র সীবন ও বুনন শিল্পের এই সমৃদ্ধি সামাজিক উৎপাদনে উৎকর্ষসাধন করেছে।

তাই সূচ-সূতা সম্পদ উপার্জনের প্রতীক, লোকমানসে যা বহুব্যাপ্ত হয়ে পরিণতি পেয়েছে যাবতীয় ইচ্ছাপূরণের মাধ্যমরূপে—

পাই এক হাজার সূচ
তবে খাই তরমুজ
সূচ পেতাম পাঁচ হাজার
তবে যেতাম হাট বাজার

এই সূচই সামাজিক সুরক্ষার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছে, অন্যায়ের প্রতিবিধানকারী রূপে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—

রাজার মুখ-ময় সূঁচ গা-ময় সূঁচ— মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ হইয়া গিয়াছে।[১৮৪]—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধেই এই শাস্তি। গল্পের শেষে দুষ্টের দমনেও সূঁচের ভূমিকা—

রাজার গায়ের লাখ সূঁচ সিলাই করিয়া রহিল।[১৮৫]

আসলে শিল্প সৃষ্টির মূলে কাজ করে চলেছে প্রকাশের তীব্র আবেগ। সেই আবেগে মিশেছে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিধানের কামনা। লোককথায় শিল্প প্রস্তুতিতে তাই কেবল অর্থনৈতিক পরিপুষ্টির আস্বাদ নেই স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বোধেরই প্রতীকীরূপ এই শিল্প।

লৌহ ও অন্যান্য ধাতুশিল্পেরও প্রসার ঘটেছিল। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে কৃষিকর্মের প্রতিটি ধাপে প্রয়োজন হয় লোহার। লাঙলের ফলা, দা, কুড়ুল, কাস্তে ইত্যাদির উল্লেখ আছে নানা গল্পে। 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে লোহা দিয়া 'কৃষাণ কাস্তে গড়াইল।'[১৮৬] ধাতব দ্রব্য প্রস্তুতির চিত্র ফুটেছে 'দেড় আঙুলে' গল্পে। 'একখানে এক ছোট্ট ঘর, তারি মধ্যে এক আড়াই আঙ্গুলে কামার তিন আঙ্গুল দাড়ি নাড়িয়া এক পৌনে আঙ্গুল আর এক কাস্তে গড়িতেছে।[১৮৭]

লৌহজাত অন্যান্য দ্রব্যগুলির মধ্যে বহুল প্রচলিত খড়্গ। কোচবিহারের একটি ব্রতকথায় আছে—

'পূবের ভানু পশ্চিমে যায়, শিথানের খাঁড়া ঝলমলায়।'[১৮৮] অশুভ প্রভাবনাশক হিসেবে খড়্গের ব্যবহার, 'শঙ্খমালা' গল্পে পরিস্ফুট—

'রাত হইলেই চার কপাটে খিল দিয়া মোমের বাতি আগুলিয়া এই খড়্গ নিয়া বসিয়া থাকিবে।'[১৮৯]

দুর্বিনীত রাক্ষস বিতাড়নে খাঁড়া যেমন কার্যকর, ঠিক তেমনি অবিচ্ছেদ্য নাপিতের ক্ষুর[১৯০] এছাড়া কোদাল, শাবল, খন্তা, দা, যাঁতি, সাঁড়াশি, বঁড়শি, চিমটা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্যগুলি লোককথার বস্তু ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে।

দৈনন্দিন জীবন সম্পৃক্ত দ্রব্যগুলি ছাড়াও সূক্ষ্ম ও শৌখিন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাংলার কর্মকারগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। তালপাতার মতো লিক্‌লিকে তলোয়ারের কথা পাই 'The Story of The Rakshasas' গল্পে—

'The noise roused Sahasra, who in a moment sprang to his feet, and

with his sword, which was as supple as a palm-leaf cut off the head of the Rakshasi.'[১৯১]

ক্ষুরধার তলোয়ারের প্রসঙ্গ এসেছে 'পুষ্পমালা' গল্পে—

'পুষ্প পক্ষিরাজের মুখ ফিরাইয়া আপনার শান তলোয়ার চক্র দিলেন, মুহূর্তে যত ডাকাত কাটা পড়িল।'[১৯২]

বাংলা লোককথায় মহার্ঘ আভরণ ব্যতীত বিচিত্র বস্তু নির্মাণেও সফল ধাতুকারগণ। 'The History of a Rough'[১৯৩]গল্পে সোনার নাক বিক্রয়ের প্রসঙ্গটিও শ্রোতাকে সচকিত করেছে।

কুমড়োর আকারে সোনার নৌকা তৈরী হয়েছে 'চোর চক্রবর্তী'[১৯৪] গল্পে। 'The Evil Eye of Sani'[১৯৫] গল্পে সোনা ও রূপার সিংহাসন তৈয়ারী হয়েছে। 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পেও সুবর্ণের দ্যুতি—

সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা রাখিয়া রাজপুরীর মধ্যে পাঁচ রানীতে বসিয়া সিঁথি পাটী করিতেছিলেন। এক দাসী আসিয়া খবর দিল যে নদীর ঘাটে যে শুকপঙ্খী নৌকা আসিয়াছে তাহার রূপার বৈঠা হীরার হাল।'[১৯৬]

দেখা যাচ্ছে উচ্চবিত্ত সমাজে স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি মহার্ঘ বস্তু নিত্য ব্যবহার্য বস্তুর মধ্যেই গণ্য হতো। 'মালঞ্চমালা' গল্পে পাই সোনার উনান, মুক্তার ঝিনুক, মোতির চামচ, রূপার কাজল লতার[১৯৭]উল্লেখ। রাজবংশীয়-জাতকের নামকরণেও মহার্ঘতার ঝিলিক, 'হীরারাজপুত্র'।[১৯৮] মাণিকরাজপুত্র,[১৯৯] মোতি রাজপুত্র,[২০০] কাঞ্চনমালা[২০১] ইত্যাদি নামকরণেও সম্পদের ইঙ্গিত।

কেবল নামকরণেই নয়, ধাতুর উৎপত্তির প্রসঙ্গটিও মানবদেহ সম্পর্কে নিষিদ্ধ। 'The Origin of Rubies' গল্পে চুনির উৎস সন্ধানে রাজপুত্র পৌঁছে গেছে সমুদ্রের তলদেশে। সেখানে ধ্যানমগ্ন শিবের সম্মুখে দ্বিখণ্ডিত নারীদেহ—

'He saw a stream of blood trickling from the severed head, falling upon the matted head of Siva and running into the ocean in the form of rubies'[২০২]

মানবদেহ নির্গত শোণিতের রূপান্তর ঘটেছে দামী রত্ন চুনিরূপে।

ধাতবদ্রব্যের সঙ্গে মানব প্রাণের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে 'কিরণমালা' গল্পে, অরুণের উক্তিতে—'যদি দেখ যে তরোয়ালে মরিচা ধরিয়াছে তবে জানিও আমি আর বাঁচিয়া নাই'।—তরোয়াল এখানে অরুণের জীবনের প্রতিভূ হয়ে গেছে।[২০৩]

ধাতু ও মানবদেহের পারস্পরিক রূপান্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধন—এই তথ্যটি পরোক্ষভাবে নির্দেশ করেছে শিল্পের সঙ্গে মানবের একাত্মতাকে।

শিল্পের আদিজনক মানুষই। সেকারণেই লোককথায় তার দেহ নিঃসৃত পদার্থই কারিগরী প্রদর্শনের উপাদান। পার্বতীর দেহ ক্ষরিত গাত্রমল থেকে জন্ম নিয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশ।[২০৪] আর ঠিক তেমনি মানবাত্মার বিচিত্র সৃষ্টি প্রকাশের বাসনাই মূর্ত হয়েছে ধাতু কণিকায়।

উন্নত মানের তক্ষণ শিল্পও যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছে। বাণিজ্য প্রধান বঙ্গভূমিতে নদীগামী বিচিত্র নৌযান, সমুদ্র গামী মজবুত পোত-নির্মাণের অজস্র চিত্র রঞ্জিত করেছে লোককথাকে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "শঙ্খজাতকে' একখানি জাহাজের উল্লেখ আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ৮০০ হাত, প্রস্থে ১০০ হাত ও ২০ 'fathom'জল ভাঙ্গিয়া যাইত বলিয়া লিখিত আছে।[২০৫]

সেই রকমই 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে বুদ্ধুর উক্তি চল্ আমরা ছুতো বাড়ী যাই, ময়ূরপঙ্খী গড়াইব।[২০৬] ময়ূরপঙ্খী শুক্‌পঙ্খী নৌকার সঙ্গে সঙ্গে জয়কালী[২০৭] ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ডিঙ্গাগুলিও উপেক্ষিত হয়নি। একই সঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে 'সোনার চৌদ্দ চূড়াসহ চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর যার তিন চৌদ্দ তের কাছি[২০৮] আর কখনো চার চৌদ্দ ছাপান্ন পাল।'[২০৯]

স্থলযানের মধ্যে সন্ধান মেলে রথের—'এক রথকারের রথ বিক্রয়ার্থে বিদেশ গমন।'[২১০]

'শ্বেত ও বসন্ত' গল্পে রাজকন্যা আয়না নির্মাণ করেছে মুনমুন কাঠের নৌকা আর পবন কাঠের বৈঠা—দারুশিল্পের অসাধারণ নিদর্শন।

অন্যান্য দারুশিল্পের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে আলমারী ও বিচিত্র পালঙ্কের প্রসঙ্গ 'The Story of Sweet Basanta' গল্পে আদুরে বণিকপুত্র টুনটুনি পাখির ডিমটিকে রেখেছিল একটি আলমারীতে—

'........he took the egg and put in almirah which was dug into the wall of house.'[২১১]—দেয়াল গাত্রসংলগ্ন এই দেরাজটির কারিগরী এতই অভিনব যে পক্ষী-ডিমজাত মানব কন্যাটি প্রমাণ মাপের পরিণত যুবতী হওয়া পর্যন্তই তার স্থায়ী বাসস্থানটি ছিল ঐ দেরাজটি।

ঠিক তেমনি অভিনব 'মধুমালা' গল্পের রাজকন্যা মধুমালার পালঙ্কটি। রাজকীয় শয়নাগারে 'তিনসারি ঘিয়ের বাতি, তের থাক্ পালঙ্কে মধুমালা নিঝুমে ঘুম যায়।'[২১২]

কখনো উন্নত মানের তক্ষণ শিল্পে লেগেছে অলৌকিকতার স্পর্শ। 'The Story of Rakshasas' গল্পে বুড়ি রাক্ষসীর তত্ত্বাবধানে তৈরী হল অলৌকিক নৌকা—

'By her directions a Boat was built of Hajol wood, the oars of which were of Mon Paban wood'[২১৩] এই অত্যাশ্চর্য নৌকাটি যেন রাক্ষসীর অনুগত ভৃত্য।

পাতালকন্যা মণিমালার গল্পেও সেই একই যাদু নৌকার প্রাদুর্ভাব—

তখন পেঁচোর মা বুড়ি একরাশ তুলো এক চরকা নিয়া পবনের নায়ে উঠিয়া বলিল—

ঘ্যাঁঘর চরকা ঘ্যাঁঘর
রাজপুত্র পাগল
হটর হটর পবনের না
মণিমালার দেশে যা।[২১৪]

বাঙালি সূত্রকার নির্মিত অপূর্ব পালঙ্কগুলিই প্রাণবন্ত। একটি লোককথায় নবীন কারিগর নির্মিত একটি খাটের একটি পায়া খটখট করে বেরিয়ে পড়ল এবং বাকী তিনটি পায়াকে

বলল, 'তোরা একটু আমার দিকটা ঠেকা দিস, আমি একটু ঘুরে আসছি।[২১৫] রাত্রিকালীন নগর পরিক্রমা সাঙ্গ করে ক্রমান্বয়ে পায়া তিনটিই রাজাকে সরবরাহ্ করে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য।

এইভাবে নির্মাণ কৌশল এবং নিখুঁত ব্যঞ্জনায় দারুশিল্পে বস্তুগুলি জীবন-রসে ও বর্ণের বৈচিত্র্যে গরীয়ান হয়ে উঠেছে।

প্রয়োজনসিদ্ধতাকে অতিক্রম করে নান্দনিকতার অভিভাবনা স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্পেও রূপলাভ করেছে। ঐতিহাসিক লামা তারনাথ পালযুগের দক্ষ স্থপতি ধীমান ও বীতপালকে স্মরণ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে।[২১৬] আর লোককথায় যে দক্ষ কারুশিল্পী সুরম্য হর্ম্য নির্মাণ করে বিস্ময়করররূপ ও ভাবুকতার স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে তারা হল রূপলাল ও সোনালাল—

'বড় বড় কারিগর রূপলাল, সোনালাল, হীরামাণিক, জয় বিজয় রাজ্যের আর যত কারিগর নিয়া এই পাথরের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পাতালে পুরী তৈয়ারী করিল।'[২১৭]

অট্টালিকা প্রস্তুতির বিপুল কর্মযজ্ঞ কোলাহলমুখর করে তুলেছে লোককথাকে—

দেশে দেশে পরগণায় পরগণায় লোক ছুটিল, খনক, গণক, পাইক, সিপাই, কুঠারী, কোদালি, মাল পালোয়ান যত লোক পৃথিবীর যেখানে যে পাথর—কালো, ধলো, লাল সকল পাথর আনিয়া রাজপুরীর বাহিরে এক মস্ত পাহাড় জমাইয়া দিল।[২১৮]

দেখা গেছে নির্মাণকার্যের সূত্রে বহু বিদেশীর অনুসংস্থানও হতো আর সমবেত অনলস প্রয়াসে যে অপূর্ব প্রাসাদ নির্মিত হতো তা এইরকম—

'সে এক অপূর্ব পাতালপুরী। পাথরের উপর পাথর, তারপর পাথর—হাজার পাথরের ভিত্ হাজার দেওয়াল, আর হাজার ছাদ। চারিদিকে ছিল খাড়া পাথরের ঢাল, তার না ছিল কবাট!—

কেবল উত্তর দিকে একটিমাত্র দুয়ার।'[২১৯]

জলের অতলেও গড়ে উঠেছে সুরম্য অট্টালিকা ছেনি হাতুড়ির নিখুঁত পেটনে স্থপতি ভাস্কর্য রূপদান করেছেন শিল্পের অনবদ্য রূপকে—

'সাপের দেওয়াল, সাপের থাম, সাপের মেজে, সাপের কড়ি, সাপের মণির দেওয়ালগিরি।'[২২০]

উদ্যম আর অধ্যবসায়কেই মূলধন করে অরুণ, বরুণ এবং কিরণমালা সৃষ্টি করেছে স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন—

'শ্বেত পাথর ধব্ ধব্ শ্বেত মাণিক রব্ রব্ দুয়ারে দুয়ারে রূপার কপাট, চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলসী। অট্টালিকার চারিদিকে ফুলের গাছ, ফলের গাছ--

পক্ষী পাখালীতে আঁটে না। মধুর গন্ধে অট্টালিকা ভুর্ ভুর্ পাখীর ডাকে অট্টালিকা মধুর-পুর।'[২২১]

লোককথার খেয়ালী রাজা নির্মাণ করেছে জলের উপরিভাগে বিশাল প্রাসাদ--

'চারিদিকে হুম্‌হুম্ সমুদ্রের জলের ডাক' চারিদিকে গুম্‌গুম্ পাহারা, কাল্ নিশুতির

কালো ছায়ায় ঢাকা সেই স্বর্ণ সোনার পুরী চূড়ায় সোনার কলস নিয়া খাড়া আছে।'[২২২]

এইভাবেই মানুষের সৌন্দর্য তৃষ্ণাকে কালের কপোলতলে ধরে রাখার অপূর্ব প্রয়াস এই শিল্পে রূপ পেয়েছে। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাচারিতা কত মারাত্মক হয়ে পড়েছে তা কুমোর জাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত কিংবদন্তীতে রূপ পেয়েছে।

দেবতা বিশ্বকর্মা সৃষ্টি করলেন লোহা, যার থেকে জন্ম নিল ভীষণ দানব লোহাসুর। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতোই দুর্ধর্ষ এই দানব শুরু করল স্বেচ্ছাচার। এবার এল এক কামার, সে জব্দ করল লোহাসুরকে—

'The kamar worked the bellows so hard, that before the demon could turn he had become red hot and had run out of the furnace as mother iron. From this, were forged eight different kinds of iron.'[২২৩]

লক্ষণীয়, লোহাকে ধাপে ধাপে ব্যবহার্য করে তোলার প্রস্তুতি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ গল্পে। লোহাসুরের তাণ্ডবকে যদি ধাতুশিল্পের অনিয়মিত অপরিকল্পিত উচ্ছ্বাস বলে ধরা যায়, তবে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় ধাতুর ব্যবহার শিল্পিত নিয়ন্ত্রিত রূপ পেয়েছে, আর উৎপাদন কর্মে বৈচিত্র্য এসেছে কামার অর্থাৎ মানুষেরই প্রচেষ্টায়। সর্বোপরি সার্থক স্রষ্টা হিসাবে সমগ্র মানবজাতির বিজয়-বন্দনার গাথাই এই কিংবদন্তী।

জীবিকা-বৈচিত্র্য

লোককথায় জনজীবন সর্বদা সরব সচল। 'সিঙ্গীজাল ধিঙ্গীজাল'[২২৪] নিয়ে জেলেরা ব্যস্ত। তাঁতি ব্যস্ত তাঁত গড়ার কাপড় বুননে, মাঠের ধুলো উড়িয়ে রাখাল ব্যস্ত গোচারণে, সুবারিষ ঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে চাষী ব্যস্ত ক্ষেত্রের কাজে।[২২৫]

উৎপাদন কর্মে কামারও পশ্চাৎপদ নয়-- 'একখানি এক ছোট্ট ঘর, তারি মধ্যে এক আড়াই-আঙ্গুলে কামার তিন আঙ্গুল দাড়ি নাড়িয়া এক পৌনে আঙ্গুল কুড়াল আর এক কাস্তে গড়িতেছে।'[২২৬]

লোককথার বিচিত্র কর্মযজ্ঞে এসেছে সূপকার, ঘেসেড়া, কিরণমালা গল্পে দেখা যায় তিনটি দরিদ্র ভগিনীর একজনের বিবাহ হয়েছে সূপকারের সঙ্গে, অপরজনের ঘেসেড়ার সঙ্গে।[২২৭] মূলাষষ্ঠীর ব্রতকথায় বাজারের মাংসের দোকানে বসেছে কসাই।[২২৮]

মজুরীর বিনিময়ে মোটবহন প্রসঙ্গ এসেছে চোর-চক্রবর্তী,[২২৯] ইত্যাদি গল্পে। পরগৃহে দাসীবৃত্তির মাধ্যমে জীবনধারনের তথ্য 'ননদের দাসী' গল্পে।[২৩০]

প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কোটাল কাড়া প্রহরী[২৩১] অষ্টঢালী ও করাতী সিপাইয়ের--

'করাতী সিপাইয়ের খাড়া পাহাড়া, মাছিটির সে পুরীতে যাইতে গেলে করাতের তলে হাজার খান হইয়া যায়।'[১৩২]

রাজবাড়ীর নিয়মিত বেতনভুক কর্মচারীগণের মধ্যে আছে ঘড়িখানার সর্দার,[২৩৩] জমিজরীপকারী[২৩৪] প্রমুখ।

রাজবাড়ির গণক ও বেতন ভোগী প্রশস্তিকারের আসনটির উপর একচেটিয়া দাবী

ব্রাহ্মণ সমাজের। ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্ৎসনায় সেই সত্যই প্রকাশিত—

'Just see how many Brahman pundits go to the Raja's house, recite a verse or two and are rewarded with money enough to keep their wife and children in comfort.'[২৩৫]

যজমানি পৌরোহিত্যও বহু ব্রাহ্মণের পেশা 'The Indigent Brahman' গল্পে পাই—

'The Brahman's gains were considerable when marriages were celebrated of funeral ceremony were performed'[২৩৬]

দারিদ্র্যের করাল ছায়া একাধিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে বাধ্য করেছে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে– 'নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা।'[২৩৭]

বিচিত্রবৃত্তির মধ্যে আছে– জুয়া খেলা। ইতিহাসমালার ১৪৬ সংখ্যক গল্পে[২৩৮] বঙ্গ দেশের এক জুয়াড়ীকে পাই যে জীবন নির্বাহের প্রাত্যাহিক অর্থ জুয়াখেলার মাধ্যমে সংগ্রহ করত।

বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের বিচিত্র বৃত্তি বেছে নিয়েছে তিলিসমৎ খাঁ আমার কাছে তিনটি মূল্যবান কথা আছে। এক একটির দাম একশ টাকা। যে কিনতে চাও, জলদি এসো।'[২৩৯]

বিচিত্র বৃত্তির মধ্যে অন্যতম প্রতারণা 'History of a Rogue'[২৪০] ঠগ ও শেয়ান[২৪১] ইত্যাদি গল্পে প্রতারণা সূক্ষ্ম বুদ্ধির কৌশলে অপূর্ব শিল্প হয়ে উঠেছে।

কখনো লোককথার নারী, বারাঙ্গনাবৃত্তিকেও অবলম্বন করেছে– 'য়ুয়্যা নাকি বাহার বেচি খায়।'[২৪২]

চৌর্যবৃত্তিও ডাকাতির মতো দুঃসাহসিক পেশাকেই জীবনধারণের অবলম্বন করার একাধিক প্রমাণ বহন করে চলেছে, সাত ডাকাতের মা,[২৪৩] 'The Adventure of Two Thieves and their Sons'[২৪৪] ইত্যাদি গল্পগুলি। কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে সৎভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে পুনরায় ফিরে গেছে আদিম পেশায়, সেই চোরদের যুক্তি–

'Our former trade of thieving was infinitely preferable to this sort of honest labour.'[২৪৫]

'মালিনী বৃত্তি লোককথায় অতি পরিচিত। মালিনী 'নিত্য ভোর ফুলের ডালা, সাঁজ ফুলের মালা,[২৪৬] সওদাগরের বাড়িতে ফুল জোগায়। 'মালঞ্চমালা'[২৪৭] গল্পে এই মালিনীর ভূমিকা রক্ষয়িত্রীর কিন্তু 'কাঞ্চনমালা' গল্পেই সে কুটিলা, দুর্ভাগ্য স্বরূপা, তার কুপ্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে–

মালিনী কলু বাড়ি থেকে তেল আনে, বেণেবাড়ি থেকে হলুদ আনে, কলুর বলদ মরে, বেণের বেণেতি রসাতলে যায়।

গ্রীষ্মে হাঁড়ি কলসী ফাটে, মাঠে ধান পচে, হাটে সওদা আসে না, সারা বছর এ-ই।'[২৪৮]

লোককথার বিচিত্র বৃত্তিধারী কর্মীদের জীবনযাপনের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা

যায়। সমবৃত্তিধারী মানুষেরা পৃথক পৃথক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিল 'কাঞ্চনমালা' গল্পে--

'ছুটিতে ছুটিতে কুমোরপাড়ার ঘাট, মালিনী হাঁড়ি কলসী কিনিয়া নিল। কামার বাড়ীর ঘাট মালিনী লোহার শিকল কিনিয়া নিল। ধোপা বাড়ীর ঘাটে মালিনী সাত হাত কাপড় কাচিয়া নিল।'[২৪৯]

উৎসবের বাজনদারেরাও একজোট হয়েই বাস করত--- 'রাজা ঢাকী শহর থেকে ঢাক আনাইলেন, ঢুলী শহর থেকে ঢোল আনাইলেন।'[২৫০]

অন্ধকার জগতের বাসিন্দারাও জোটবদ্ধ। 'বিদ্যাবতী' গল্পে ফাঁসুড়ে ডাকাত মনোহরের[২৫১] বিশাল রাজ্যের সন্ধান পাই।

লোককথায় জীবিকা নির্বাহের এই যে অজস্র পন্থা, তার মূলে আছে কর্মপ্রবণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উৎপাদনে আগ্রহ । আলস্য বিষবৎ পরিত্যজ্য। কারণ অলসতায়, 'মূলেধনে উবে, দিনে দিনে ডুবে।'[২৫২]

বিপুল শ্রমের জন্য প্রয়োজন জনশক্তির প্রাবল্য সেই কারণেই নীল ষষ্ঠীর অন্যতম ব্রতকথায়[২৫৩] ব্রাহ্মণ-পত্নী জন্ম দিয়েছে ৬০ হাজার ছেলেকে, যারা তার ব্রতের ফল-- দেশের ভবিষ্যৎ জনবল।

মনুষ্যশরীরের সীমাবদ্ধ সহনশীলতায় শ্রমের অক্লান্ত জীবনীশক্তি কোথা থেকে আসবে? লোককথায় মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুরাকথা মশার জন্মকথায়।[২৫৪] জেলেদের ক্লান্ত নিদ্রালু চোখ দুটিকে জাগিয়ে রাখতেই শ্রমদেবী সৃষ্টি করেন মশাদের। তাদের হুলের দংশনই জাগিয়ে রাখে ধীবর গোষ্ঠীকে, তাদের কর্মপ্রবাহকে। কঠিন পরিশ্রম, দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জনের প্রাণান্তকর তাগিদ এবং পরিবেশের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের উজ্জ্বল আলেখ্য।

অকর্মণ্য ব্যক্তি সমাজের চোখে অপরাধীরই সামিল। রাজবংশে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগর পুত্র কেহই কিছু করেন না, কেবল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান। দেখিয়া শুনিয়া রাজা, মন্ত্রী, সওদাগর, কোটাল বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিয়া দিলেন-- 'ছেলেরা খাইতে আসিলে ভাতের বদলে ছাই দিও।'[২৫৫]

সমাজের নিচু তলাতেও একই দৃশ্য। তাঁতি বউয়ের ক্রোধী কণ্ঠস্বর শোনা গেছে--

'If you had not the mean to support a wife, why did you marry me?'[২৫৬]

শ্রমের জয়গান পরোক্ষভাবে উচ্চারিত হয়েছে দেড়-আঙ্গুলে গল্পে। পিপ্পলকুমার পিতাকে সোনার কুড়ুল গড়িয়ে দিয়েছে। বিপুল বৈভবের আকর্ষণ উপেক্ষা করে একবেলা কাঠুরিয়া পিতার সঙ্গে বৃক্ষচ্ছেদনের বিপুল পরিশ্রমের অংশীদার হয়েছে--

'দেড়-আঙ্গুলে পিপ্পলকুমার এক বেলা রাজ্য করে এক বেলা বাপের সাথে কাঠ কাটে— খুট্‌ খুট্‌ খুট্‌।'[২৫৭]

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অলস অপবাদ পুরুষের উপরই বর্তেছে। যে শঙ্খমণি 'নাক ডাকাইয়া ঘুম যায়,'[২৫৮] তাকে তিরস্কার করেছে তার জননী অর্থাৎ নারী। কেবল

পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিয়ে লোককথার নারী তার কর্তব্য সমাধা করেনি, পুরুষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রম ও উপার্জনের সমান অংশভাগিনী। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অসামান্য অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবদান

বাংলা লোককথার নারী চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীকতা ও দক্ষতার অসাধারণ সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। এই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল ছাপ ফেলেছে অর্থনীতিতে, সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিতে।

লোককথায় সমাজের প্রতিটি স্তরেই কর্মঠ পরিশ্রমী মহিলার সাক্ষাৎ মেলে, স্বোপার্জিত ধনের প্রতি যাদের নিষ্ঠা ঐকান্তিক। 'সুখু আর দুখু' গল্পে কুটিলা সুখুর মা স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে সপত্নী আর সপত্নীপুত্রী দুখুকে সর্বাংশে বঞ্চিত করেছে কিন্তু দুখুর উপার্জিত অর্থে তার প্রবল বিরাগ–

'পরের কড়ির ভাগ বাঁটরী, তার কপালে খ্যাংরা মারি। তেমন পোদ্দারী সুখুর মা করে না। কপালে থাকে তো সুখু আমার কালই আপনি ইন্দ্রের ঐশ্বর্য লুটে আনবে।'[২৫৯] —এ উক্তি যতটা ঈর্ষাকাতর ততটাই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন।

নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের নারী সমাজ পুরুষের সঙ্গে শ্রম ও উপার্জনের সমান অংশভাগিনী। তাঁতিনী, নাপতিনী, জেলেনী, গয়লানী, মালিনী নিয়মিত কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিবারের ভরণ পোষণে সহায়তা করেছে।

অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারে নারীর কর্মসীমা গৃহের চৌহদ্দীতেই আবদ্ধ থাকত, গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণী শুচিস্মিতা রূপেই তাদের স্থিতি। কিন্তু আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয়ে যখন পুরুষের বলিষ্ঠ আশ্রয়চ্যুতি ঘটেছে তখনই মধ্যবিত্ত নারী বাধ্য হয়েছে স্ব-নির্ভর হতে। ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপুজোর ব্রতকথায়[২৬০] বিধবা বামনী সুতো কেটে দিন গুজরান করত। এমন কি ক্ষুধার জ্বালায় আত্মীয়গৃহে দাসীবৃত্তি গ্রহণের নিদর্শনও বহন করে চলেছে পৌষমাসের লক্ষ্মীপুজোর ব্রতকথা[২৬১] ননদের দাসী[২৬২] ইত্যাদি গল্প।

উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ে নারী কুমারী অবস্থায় পিতা এবং বিবাহের পর স্বামীর উপরই নির্ভরশীল। শ্রম ও উপার্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা নিষ্ক্রিয়। 'মধুমালা' গল্পে হরিণ-নয়নী, অমৃত-নয়নী, কমল-নয়নী' তিন রাজকন্যাই দ্বিধান্বিত চিত্তে স্বামী মদনকুমারের কাছে একই সংশয় বকুল প্রশ্ন পেশ করেছে– 'স্বামী তুমি আমায় পুষিবে তো?'[২৬২]

'কাঞ্চনমালা' গল্পে কাঞ্চনের গর্বিত উক্তি 'বাপ আমার রাজা, সওদাগর আমার স্বামী, মণিমাণিক্যের খেলা করেছি, মাণিক ছিটিয়েছি মণি ছিটিয়েছি, আমার কিসের দুঃখ।'[২৬৩]

কিন্তু বৈভব থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যখনই তারা নেমেছে মাটির পৃথিবীতে, তখনই তারা অতিমাত্রায় সক্রিয়। তাদের কর্মক্ষেত্রে অনভ্যাসের স্থবিরতা নেই, আছে স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা।

'শ্বেত ও বসন্ত' গল্পে এককড়া কড়ি মূলধন করেই আয়নাবতী উপার্জন করেছে প্রতিশ্রুত একাধিক বস্তু 'সোনার আঁচির, সোনার পাঁচির, সোনার সিংহাসন, নিরল কাননের ঘাট আর মুনমুন কাঠের নৌকা আর পবন কাঠের বৈঠা।'[২৬৪]

'সোনাফর বাদশা' গল্পে স্ত্রী অতুলা নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর খোঁজে নিঃসঙ্কোচে বাজীকর বৃত্তি অবলম্বন করে ভ্রাম্যমান নাট-গীতের দল নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে পাড়ি দিয়েছিল।[২৬৫]।

রাজদুহিতা কাঞ্চনমালাকেও পরিস্থিতির দুর্বিপাকে পড়ে সিঁদুর বিক্রি করে প্রাত্যহিক অন্ন সংগ্রহ করতে হয়েছে।[২৬৬] 'পুষ্পমালা' গল্পে রাজকন্যা পুষ্প নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধানে রত হয়েছে 'পথি নারী বিবর্জিতা' —পুরুষ শাস্ত্রকারের এই মন্তব্যের নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন করে ভিন্ন রাজ্যে গ্রহণ করেছে 'আট প্রহরের অষ্টঢালী বৃত্তি।'[২৬৭]

একাধিক লোককথায় অভিজাত পুরুষের ঠুনকো আত্মাভিমান নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে। অথচ এই বঞ্চনা মেয়েদের বলহীনা করেনি, বরং উদ্বেজিত করেছে তাদেরই অন্তর্নিহিত উদ্যোগী শক্তিকে।

কার্ত্তিক মাসের ব্রতকথায়[২৬৮] অথবা 'The Story of Prince Sobur'[২৬৯] -এ এমনই দুই পিতার চরিত্র ফুটে উঠেছে যারা মনে করে পুরুষকারই শ্রেষ্ঠ, দৈব মাহাত্ম্য অন্তঃসারশূন্য সংস্কারমাত্র, দুই পিতাই কন্যাদের কাছে 'নিজ ভাগ্যে খাই' এই উক্তি সহ্য করতে পারেনি। ধন, ক্ষমতার অসার গর্বে অন্ধ হয়ে একজন হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকই কন্যার স্বামী নির্বাচন করেছে। অপর জন ধাত্রীমাতা সহকন্যাকে বিসর্জন দিয়েছে গভীর অরণ্যে। সম্বল শুধু একটি সূঁচ-সূতা। বনেতেই কন্যা নিজ-ভাগ্য বিধাতার আশীর্বাদকে পাথেয় করে শুরু করেছে ময়ূর পাখা বোনা—

'As each morning a quality of plumes were collected everyday one fan was made and sold. So that in a short time the two women got rich.'[২৭০].

প্রত্যক্ষ আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ না করেও পুরুষকে প্রেরণা দিয়েছে, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছে নারী। শঙ্খমালা গল্পে অলস কর্মবিমুখ শঙ্খমণিকে সফল ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান তার মায়ের। সে শঙ্খকে বাণিজ্য সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছে তা বিচক্ষণ বণিক পত্নীর দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতারই ফসল 'এক কড়ি যারে ঊনো, পঞ্চ কড়ি করিস দুনো।[২৭১]

সমগ্র অর্থনীতির নিয়ন্ত্রীর শক্তি সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। তাঁর কৃপা লাভেই দরিদ্র ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্যশালী হয়েছে। আবার অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেবার অপরাধেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী একে একে রাজাকে পরিত্যাগ করেছে।[২৭২]

অর্থাৎ, নারী যখন স্বর্গবাসিনী, ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবী, সেখানে নারীই বরদা, সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী কিন্তু আত্মমর্যাদা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। তাদের প্রতি তিলমাত্র অবমাননার ফলে নিঃস্ব হতে হয়েছে পুরুষ সমাজকে। অথচ এই নারীই যখন ধূলিমলিন মর্ত্যবাসিনী কন্যা, স্ত্রী অথবা ভগিনী--যে কোন রূপেই সে নিবেদিতা পুরুষের প্রতি। পুরুষ যেখানে অক্ষম সেখানেই বিজয়লক্ষ্মী নারী অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করেছে দক্ষতার সঙ্গে।

'The Match Making Jackal' গল্পে দরিদ্র তাঁতির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে রাজকন্যার। রাজকন্যার গাত্র মার্জনা করার পর গাত্র সংলগ্ন পরিণত হয়েছে স্বর্ণকণিকায়--

'She put a little water in the flour and smeared her body with the paste. When the paste dried on her body, she began wiping the paste with her fingers, and as the paste fell in small balls, from her body, it got turned into gold.'[২৭৩]

একইভাবে 'সোনার গাছে মুক্তার ফল' গল্পে রাজপুত্র বীরবাহু চার বোনের সন্ধান পেয়েছে, যারা তার প্রার্থিত-'সোনার গাছে মুক্তার ফল'।

—তখনই বীরবাহু সেই ছোরা দিয়ে বড় মেয়ের গলা কাটতেই সোনার গাছ হল। তারপর আর একটির গলা কাটতেই রূপার ডাল হল, তারপর আর একটিতে হীরার পাতা, আর একটি কন্যে হলো মুক্তোর ফল।'[২৭৪]

—নারীর স্বার্থ হীন অবদান, নিজেকে রিক্ত করে আত্ম নিবেদনই রূপ পেয়েছে এই প্রসঙ্গে। সমাজের আদিপর্বে গোষ্ঠীর স্বার্থেই নারীর স্থান ও সম্মানটি বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। কৃষিজীবী মানুষ জমির উর্বরাশক্তি ও নারীর সন্তান-প্রদায়িনী শক্তিকে অবিচ্ছেদ্য মনে করেছে। নারীর এই শক্তি পুরুষের প্রেয় ছিল, তাই সে প্রণত হয়েছে প্রয়োজনে, কৃতজ্ঞতায়। বিগত দিনের নারীর প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্যই রক্ষিত হয়েছে লোককথায় ধর্মের তিরস্করনীর আড়ালে, মেয়েলি ব্রতের ব্রতস্তীর মধ্যে, দৈব মহিমা প্রকাশে, সমগ্র বাধা অতিক্রমকারী নারী শক্তির বিজয় ঘোষণার। লোককথায় নারী তাই রমণীরত্ন, মহার্ঘ রত্নসম্ভারের মতোই কাম্য ঐশ্বর্য। কৃতজ্ঞ পুরুষ তাই বলেছে--

যে ব্রত করে কন্যা পাইলাম তোমারে
সেই ব্রত করি কন্যা হবে ধন্য ধান্য।
তা শুনে কন্যা হরষিত হলেন
দেবীর দয়াতে তার অদৈন্য ধন্য।।[২৭৫]

সম্পদ বণ্টন

অসম সম্পদ বণ্টনের সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা লোককথার জনসমাজকে দুটি পৃথক গোত্রে বিভক্ত করেছে। ঐশ্বর্যের একদেশদর্শিতা ধনী দরিদ্রের জীবনযাপনে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সেকারণেই অপর্যাপ্ত সম্পদ সংরক্ষণের অপারগতায় বিব্রত রাজা টাকা শুকোতে দেয়। আর মাত্র এককড়া কড়ি বিনিময়ে দেড়-আঙুলের বাবা পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আত্মবিক্রয়ে বাধ্য হয়।

অর্থের এই অসাম্যের জন্য দায়ী উচ্চবিত্তের আগ্রাসী মনোভাব। ইতিহাসমালার ৮৩ সংখ্যক গল্পে[২৭৬] দেখি যে, স্বপ্নে স্বর্ণ নির্মিত পানের বাটা ও স্বর্ণালী শ্রীফল দেখে উন্মত্তের ন্যায় তাকে হস্তগত করার অভিযান চালিয়ে রাজা ব্যর্থ হয়। শেষে দৈববাণী শুনে তার চৈতন্যোদয় ঘটে। সে বোঝে-- "স্বপ্নেই সেই বস্তু দেখা যায়, বাস্তবে নয়।'[২৭৭]

উদগ্র সম্পদ কামনার দোসর হয়ে এসেছে আদিম প্রবৃত্তি ঈর্ষা। ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপুজোর ব্রতকথায়,[২৭৮] ব্রাহ্মণী ও তার পুত্রের আকস্মিক স্বাচ্ছন্দ্য সহ্য করতে না পেরে রাজা

সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাদের বাড়ি লুঠ করে তিল-ধুবড়ী নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন।

এইভাবে নির্লজ্জ মাৎস্যনায়ের রূপ প্রকট হয়েছে ইতিহাসমালার ১০৩ সংখ্যক গল্পে।[২৭৯] বানরের কাছ থেকে রাজা প্রত্যহ পাঁচটি মানিক সংগ্রহ করেন। পরিবর্তে বানরের ভাগে জুটেছে পাঁচ ঘা চাবুক, কারণ 'ছোটলোককে সুখ দেওয়া ভাল নয়',[২৮০] --অর্থাৎ বানর হয়েছে প্রতারিত শোষিতের প্রতিনিধি।

কেবল রাজাই নয়, প্রতারণার জাল বিস্তার করেছে মহাজন সম্প্রদায়। 'The Three Dancer'[২৮০] গল্পের মহাজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি গ্রাস করে কপট বিস্ময় প্রকাশ করেছে—

'O avaricious Brahman! That you make a demand on me for seven thousand rupees when you know very well that you have not left even have not left even seven cowries with me?'[২৮১]

একদিকে ক্রমাগত অর্থের স্তূপ পুঞ্জীভূত হয়েছে উচ্চবিত্তের গৃহে। (স্মরণীয়, কাঞ্চনমালার উক্তি—'মণি ছিটিয়েছি মানিক ছিটিয়েছি, মণিমাণিক্যের খেলা'[২৮২]) অপরদিকে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও চালিয়েছে শোষিত সম্প্রদায়, নিজের প্রাণ পর্যন্ত বাজী রাখতেও দ্বিধা করেনি। সেই কারণেই 'The Story of Brahmadaitya'[২৮৩] গল্পে একুশ বিঘা নিষ্কর জমিপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় উৎসুক ব্রাহ্মণের চিন্তা----

'If I go to the tree at night and succeed in cutting of one of its branches, I shall got one hundred bighas of rent free land, and become independent for life. If the ghosts kill me, my case will not be worse, for, to die of hunger is not better than to be killed by ghosts.'[২৮৪]

বহু লোককথায়, দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে নিতে মানুষ আশ্রয় করেছে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে।'

The Ghost who was afraid of being bagged'[২৮৫] গল্পের তাঁতি তাই একের পর এক আদেশ করেছে তারই আয়ত্তাধীন ভূতকে--

'Bring me, just now one thousand gold mohurs, and by to-morrow night you must raise a granary in my house, and fill it with paddy.. .....if you fail to do me bidding you will certainly be put into my bag.'[২৮৬]

--স্বাচ্ছন্দ্যের তীব্র আকঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নিয়েছে এই কল্পনা বিলাস।

লোককথায় রাক্ষস গোষ্ঠী স্বভাব-ধনী এবং রাক্ষস রাজ্য তাই লোককথার সদস্যদের কাছে সমৃদ্ধির সেই স্বর্গ, যেখানে দারিদ্র্যের লেশমাত্র নেই, আছে অফুরন্ত ঐশ্বর্য। 'The Story of Rakshasas' গল্পে রাক্ষসপুরীর দিগ্দর্শী সড়কগুলিতেও ঐশ্বর্যের চমক--

'He saw hillocks of cowries (shells used as money) on the road side, he had not produced far from them when he saw hillocks of four anna pieces and hillocks of rupees.......To the infinite surprise of the poor Brahman, these hillocks of shinning silvers coins were succeeded by a large

hill of gold mohurs.'[২৮৭]

সমাজ-সদস্যের সম্মান বিচার্য অর্থের তৌলে। পৌষ মাসের লক্ষ্মী পূজার ব্রতকথায়[২৮৮] ভাগ্যতাড়িত অসহায় বিধবা ব্রাহ্মণপত্নী ভ্রাতৃবধূর কাছ থেকে পেয়েছে ঘৃণা, গঞ্জনা আর উপেক্ষা। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর বরে যখন তারা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, তখনই ভ্রাতৃজায়ার যাবতীয় অনাদর রূপান্তরিত হয়েছে বিপুল সমাদরে। তাই পিসির বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষাকালে ব্রাহ্মণপুত্র আর তার মা একত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে—

সোনাদানা হীরে মুক্তো ধন্যমান্য গণ্য
যাদের কল্যাণে আজ মোদের নেমন্তন্ন।।[২৮৯]

উচ্চবিত্তের দারিদ্র্য বিলাসের অভিনব ছবি ফুটেছে 'রাজার খুদ খাওয়া' গল্পে।

—'রাজার বড়ো খুদের ভাত খেতে ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু কি করে বলেন খুদের ভাত খাব। তিনি হলেন রাজা। এদিকে লোভও সামলাতে পারছেন না। আর ভাবছেন খুদের ভাত না জানি কিরকম মিষ্টি খেতে।[২৯০]

এই সাধ পূরণে সাহায্য করল দাসী। 'রানী পাথরের থালায় খুদ ঢেলে বসে আছেন। তাই দাসী রাজসভায় গিয়ে বললে —

মহারাজ—

এসেছেন পাথরঘাটায় নাম খুদিরাম।
মহারাজের দেরি দেখে চলেন জুড়ন ধান।।[২৯১]

রাজার ইচ্ছাও পূরিত হলো। আবার সভাসদদের কাছে মানও বজায় রইল। সূক্ষ্মভাবে দেখলে এই ঘটনার মাধ্যমে অভাবী সমাজই যেন কৃপামিশ্রিত ব্যাঙ্গ কটাক্ষ করেছে ধনিকের প্রতি।

দেখা যাচ্ছে একদিকেধনের ঘাটতি কল্পনায় পুষিয়ে নিচ্ছে শোষিত সম্প্রদায়। অপরদিকে স্বেচ্ছায় সেই অভাবী সমাজই যেন কৃপামিশ্রিত ব্যঙ্গ কটাক্ষ করেছে ধনিকের প্রতি।

দেখা যাচ্ছে একদিকে ধনের ঘাটতি কল্পনায় পুষিয়ে নিচ্ছে শোষিত সম্প্রদায়। অপরদিকে স্বেচ্ছায় সেই অভাবী জীবনকে সখের সামগ্রী করে উপভোগ করে চলেছে বিত্তবান গোষ্ঠী। ঐশ্বর্য বিভাজনের এই চিরন্তন ট্রাজেডিই লোককথার আলেখ্য।

সম্পদ সংরক্ষণ

সংস্কৃত প্রবাদের অভিজ্ঞবাণী—'আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ' [২৯২]— বিপদকালের জন্য ধন সঞ্চয় করে রাখা উচিৎ। এই সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে লোকসমাজ। নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথায় দেখা যায়—

'নতুন বৌমা ধামা ধামা টাকাকড়ি মাটির ভেতর পুঁততে লাগলো।'[২৯৩]

দূরদেশে ভ্রমণের পূর্বে বসত-বাড়ির মেঝেয় গর্ত করে টাকা সংরক্ষণের প্রসঙ্গ এসেছে হুতোম পাখির জন্মকথায়—

'দুই বুড়ো-বুড়ি গরু- মোষ এমনকি ঘটি-বাটি খাট-গাড়ি সব বেচে টাকা সংগ্রহ করল। সেই টাকা এবং ধান-পাট তিল সরষে ঘরে যত মজুত ছিল, দুটি মাটির কলসীতে পুরে

গোয়াল ঘরের মেঝেতে পুঁতে দিল।' [২৯৪]

এই সংরক্ষণ সর্বদাই নিরাপদ হতো না। উপরোক্ত গল্পেই প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গৃহ ধনশুদ্ধ মাটির অতলে বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রাকৃতিক বির্পযয় ব্যতীত ছিল তস্করের উপদ্রব। 'The Adventure of Two Thieves and their sons' গল্পে দুই চোর তাদেরই আশ্রয় দাতা গৃহস্থের ধন, মাটি খুঁড়ে হস্তগত করেছে। [২৯৫]

তা সত্ত্বেও, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের সদস্যগণ অনেক ক্ষেত্রেই সঞ্চয়-গুপ্তির জন্য বেছে নিয়েছে গৃহের ভূতলকেই। 'শঙ্খমালা' গল্পের বণিক পত্নী পুত্রকে ব্যবসায়ের মূলধন স্বরূপ যে অর্থ দিয়েছে তা সঞ্চিত ছিল গৃহের মৃত্তিকা নির্মিত তলের গভীরে—

'আনন্দে মা আথিবিথি করিয়া .... ঝাল ঝাঁপি চালমাটি খুঁজিয়া পাতিয়া যত দুঃখের জ্বালা সয়ে বুকে, আপন মুখে অন্ন ছোঁয়ান নাই, তবু বংশের দিকে চেয়ে ধন খোয়ান নাই— সেই ধন মা এতক্ষণ চাটিমাটি খুঁড়িয়া বাহির করিলেন।' [২৯৬]

পাথেয় সংরক্ষণের অভিনব পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া গেছে 'The Evil Eye of Sani' গল্পে। নির্বাসিত রাজা শ্রীবৎস স্ত্রীকে বলেছে—

Sribatsa accordingly told his wife to make an opening in their mattress and to slow away in it all the money and jewels they had.'[২৯৭]

মাদুরের বদলে চর্মপেটিকাও ব্যবহৃত হয়েছে 'The Prince and his two wives' গল্পে—

'Then the Prince put inside the jackal's skin many kinds of gold pearls, and jewelled ornaments and a beautiful embroidered dress and sewed it up'[২৯৮]

সংরক্ষিত সম্পত্তির বিপুল আকর্ষণে ঝড় জীবনের মায়া কাটাতে পারেনি বিদ্রোহী আত্মা। 'ঘোনা-মোনা' এমনই এক গল্প যেখানে অর্থমোহে আকৃষ্ট ভূত মোনা স্বীকার করেছে—

'এই গাছের গোড়ায় আমার বাপ সাতাশ জালা মোহর রেখে মরে গেছে। আমিও মরে গাছের গোড়া পাহারা দিয়ে চলেছি।'[২৯৯] শেষে ব্রাহ্মণ সেই মোহর সৎকার্যে ব্যয় করে আত্মার মুক্তি ঘটিয়েছে।

পরসম্পদ রক্ষায় নিপুণ দায়িত্ব বোধের পরিচয় তুলে ধরেছে 'বুড়ো ও বুড়ি' গল্পের ছোট্ট ফিঙে পাখি। বুড়োর মৃত্যুর পর অসহায় মৃত্যুমুখে পতিত বুড়ির চিন্তা একটাই—

বুড়ো মোলো বুড়ি মরে
তার কুলগাছটি কে যত্ন করে? ৩০০

এই কুলগাছ রক্ষার দায়িত্ব নিল ফিঙে পাখি। প্রবল প্রতিপক্ষ সওদাগর ও তার শক্তিশালী অনুচরেরাও ছোট্ট পাখির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কূটকৌশলের কাছে হার মেনেছে। শেষে জয়ী ফিঙে ক্রমাগত উচ্চারণ করে চলেছে সেই সর্তকবাণী—

ফিঙেটি ফিঙেটি বাবুইহাটি
যে বুড়ির কুলগাছে হাত দেবে,
তার নাক চুল কাটি, নাক চুল কাটি, নাক চুল কাটি।[৩০১]

— কোন প্রকার প্রত্যুপকারের আশা ব্যতীত এই নির্ভেজাল প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদই ফিঙে পাখিকে যোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিরক্ষকের মর্যাদা দিয়েছে। এই বিশ্বাস ও আস্থাই সম্পদ সংরক্ষণের বুনিয়াদী নিরাপত্তার সূচক।

দ্রব্যমূল্য, বেতনক্রম, পারিশ্রমিক ইত্যাদির নিদর্শন

বস্তু সম্পদের মূল্যমানের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় কোন কোন লোককথায়।

'The Lucky Rascal'[৩০২] গল্পে এককাঠা চালের মূল্য পাই আশি কড়ি।

'The Triple Theft' গল্পে সংগ্রাহক ম্যাক্‌কুলকই কড়ির একটি হিসাবও দিয়েছেন পাদটীকায়।

'One hundred and sixty cowrie shell used to equal in value one pice, which when the rupee was at par worth three quarter of a half penny,'[৩০৩]

দেড়-আঙুলের গল্পে দুঃস্থ কাঠুরে রাজার কাছে আত্মবিক্রয় করেছে এককড়া কড়ির বিনিময়ে। নিয়ে এল হাটুরে, কড়ি দিয়ে কিনলাম কাঠুরে।[৩০৪] মহার্ঘ বস্তুমূল্যও নির্ধারিত হয়েছে কড়ি দ্বারা—

'বুড়ী শাড়ি বুনিয়া দিয়া কড়ি চাহিল।'[৩০৫]

কড়ি ব্যতীত 'কড়া', 'বুড়ী' ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যম—

'দুখু আর দুখুর মা দিনে রাত্রে সূতা কাটিয়া কোনোদিন একখানা গামছা কোনোদিন একখানা ঠেটী এই হয়, তাই বেচিয়া একবুড়ী দেড় বুড়ী পায়।'[৩০৬]

সুবচনীর ব্রতকথায় দরিদ্রা ব্রাহ্মণী— মেছুনীর কাছ থেকে দশকড়ার মাছ কিনেছে।[৩০৭]

[কড়ার মূল্যমানটি এইরূপ—কড়া- এক পণের ৮০ ভাগের ১ ভাগ [৩০৮]]

[বুড়ীর মূল্যমানটি এইরূপ—৫ গণ্ডায় ১ বুড়ী, ৪ বুড়ীতে ১ পণ [৩০৯]]

জীবিকা মূল্যের কিছু পরিসংখ্যানও পাই লোককথার ভাণ্ডারে। রাজকন্যা পুষ্প 'আট প্রহরের অষ্টঢালী'[৩১০] বৃত্তি গ্রহণ করে নিজেই তার মজুরী নির্ধারণ করেছে—

'একসূর্য ডুবিবে, আর সূর্য উঠিবে, ইহার প্রতি প্রহরে এক এক ঢাল মোহর আমার রোজগী।[৩১১]

রাজকন্যা হরবোলাও যখন বারাঙ্গনার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, তখন স্বয়ং স্থির করেছে তার সম্মান দক্ষিণা—

'আমার সঙ্গে পান খাইলে হাজার টাকা লাগে।[৩১২] জরুরী প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য মালঞ্চমালা মজুরী বৃদ্ধি করেছে, পালকিবাহকদের উৎসাহিত করেছে— 'জনকে দশ দশ মোহর, দোল চৌদল আন।'[৩১৩]

এই মোহরই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম। অবশ্য টাকার প্রসঙ্গও এসেছে। তাঁতির বুদ্ধি'[৩১৪] গল্পে রাজার পছন্দসই ঘোড়াটির দাম দশ হাজার টাকা।

কখনো বা পাই বিনিময় প্রথার উল্লেখ। বহু পরিচিত সেই শেয়ালের গল্পটি [৩১৫] স্মরণীয় যেখানে, নাকের বদলে নরুণ দিয়ে শুরু করে শেয়াল শেয় পর্যন্ত বৌ-এর বিনিময়ে লাভ করেছে ঢোল।

'কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা' গল্পেও কাঞ্চন বিলাপ করেছে এই বলে—

হাতের কাঁকন দিয়া কিনিলাম দাসী
সেই হইল রানী, আমি হইলাম বাঁদী।। [৩১৬]

অতি আধুনিক ভাবনাও প্রক্ষিপ্ত হয়েছে মূল্যমান প্রসঙ্গে। সেকারণে চোর চক্রবর্তী রাজার গল্পে পরামাণিকের ক্ষৌরীকরণের মজুরী চার টাকা।[৩১৭]

কুড়ির ক্রমহ্রাসমান মূল্য যে সব লোককথায় পাই, তন্মধ্যে 'The story of price sobur' অন্যতম। সেখানে ধাত্রীকে পাঁচকড়ার খই দিতে অস্বীকার করে দোকানী—

'The confectioner laughed at her and said. Be off, you old hag. Do you think khai can be had for five cowries? ' গুণাগুণ ভেদে বস্তুমূলের মাপকাঠিটির পরিবর্তন ঘটত। একটি চুণীর মূল্য যেখানে দশ হাজার টাকা [৩২০] একটি হীরামন পাখির মূল্যও তাই। কারণ পাখিটি প্রাজ্ঞ ও রাজার মন্ত্রণাদাতা। সে নিজেই তাই রাজাকে বলে—

'Please your majesty, my price is ten thousand rupees'[৩২১]

প্রতারণার কুটিল নিক্তিতেও ওঠানামা করে দ্রব্যমূল্য। ভিনদেশী সরল লোককে বোকা বানিয়ে ' কিছু-মিছু'[৩২২] রূপ মানকচু বিক্রি হয়ে যায় চড়া দামে, সাধারণ একটি বকের মূল্য হয় পাঁচশ টাকা। [৩২৩] আর চতুর তিলিসমৎ খাঁ তার বাড়িতে রক্ষিত 'হাঙ্গামাটির জন্য চেয়ে বসে হাজার টাকা। এই হাঙ্গামাটি আর কিছুই নয়, একটি বোলতার চাক।'[৩২৪]

এইভাবে ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ না হলেও দ্রব্যমূল্যের সূচকগুলি এবং তার হ্রাস-বৃদ্ধির একটি বিবরণ দিয়েছে লোককথা, যা বিবর্তিত অর্থনীতির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

বিবিধ কর

সমাজ বিবর্তনের ধারায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন সূত্রে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা রক্ষণাবেক্ষণের অনুগামী হয়েই এই শুল্ক প্রথার আবির্ভাব। অধিকাংশ ভূমির মালিকই রাজসম্প্রদায়। তাই ভূমিদান ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই ভোক্তাদের নিকট কর দাবী করত রাজারা। 'Gafoor and his Cow'[৩২৫] গল্পে রাজকীয় বাহিনীর অধিনায়ক রাজ-আদেশে গফুরকে সচেতন করে বলেছে—

'We have come to find out if you pay any rent. You know you are living in his State and you have to pay him a rent for this privilege.'[৩২৬]

কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শনটি রেখেছে 'মজন্তালী সরকার'। [৩২৭] কর-মকুবের চাবিকাঠিটি তারই হাতে— 'আচ্ছা তবে থাক্‌গে। কিন্তু তোরা ভালো করে কাজ কর, আর আমায় ভালো করে খেতে দিস।' [৩২৮]

— দেখা যাচ্ছে, রাজার সঙ্গে প্রজাদের সংযোগের যে অভাব সেই ফাঁকটুকু নিপুণভাবে পূরণ করত রাজকর্মচারীবেশী প্রতারকের দল।

'প্রজাদের খুব শাসনে রাখবে'— [৩২৯] অভিজ্ঞ পিতার এই উপদেশের বিকৃত অর্থ করেছে পুত্র। ফলে 'প্রজাশাসন' রূপান্তরিত হয় কর-আদায়ের অন্যতম পন্থায়—

'মন্ত্রী পরিষদেরা পাইক সিপাইরা প্রজাদিগকে খুব শাসন করিতে লাগিল, আর খুব টাকা আদায় করিতে লাগিল।'[৩৩০]

রাজ্য সংলগ্ন বিশাল বনভূমির ইজারাদারও সম্ভবত রাজারাই। 'শঙ্খমালা' গল্পের কাঠুরিয়া বিনা খাজনায় বনে কাঠ কাটার দরুণ অপরাধবোধে আক্রান্ত—

'খাজনা দেই না কড়ি দিই না, তোমার বনে কাঠ কাটি, পেটের রোজগারে খাটি।'[৩৩১]

ভূমিজ এবং বনজ কর ছাড়াও রাজ্যের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদীগুলির উপর ও অধিকার বলবৎ করত রাজারা। কর আদায় করত ভেসে চলা মহাজনী নৌকা থেকে। সওদাগর রূপলালের নৌকা তাই আটক করা হয়েছে খাজনা না দেবার জন্য—

'যায় নৌকা এক রাজার রাজ্যে গিয়া আটক। রাজা বলেন। খাজনা নাই। ঘাট বাহিয়া যায়।— বেসাতি নামাও।'[৩৩২]

বহির্বাণিজ্যের মতো অন্তর্বাণিজ্যেও শুল্ক প্রদান অপরিহার্য।'The Tale of Goail Hat'[৩৩৩]গল্পে বলপূর্বক কর আদায়ের প্রসঙ্গ এসেছে—

'Now the market at Goil Hat was very exorbitant and in consequence his twelve pompkins were all taken away for toll.'[৩৩৪]

কর আদায়ের এই মাৎস্যন্যায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলে সমবেত প্রতিবাদ জেগে ওঠে। ফলে, দয়ালু রানী কর মকুব করেছে—

'From this time all tolls are abolished in Goali Hat.'[৩৩৫]

বিদেশী রাজাও তাঁর প্রাপ্য শুল্ক মুকুব করেছে 'কাঞ্চনমালা' গল্পে—

'কাঞ্চন হাতে পায়ে নৌকা সেঁচিয়া বাহিয়া ছুটিয়া আসেন—'মহারাজ! স্বর্ণপুরী আপনার ঘাট অক্ষয় হউক নৌকার বেসাতি আমার।' রাজা নৌকা ছাড়িয়া দেন।[৩৩৬]

লোভী রাজার কূটবুদ্ধি রাজকর্মচারীদের অন্যতম অভিনব কর-আদায় পদ্ধতিটি ছিল 'নজর-খাজনা'। 'মালঞ্চমালা' গল্পের কোটাল বলে—'......রাজার বেহাই হতে চললাম, নজর খাজনা দে'।[৩৩৭]

রাজসন্দর্শনের জন্যও সাধারণ প্রজাকে আবশ্যিক ভাবে দিতে হতো সম্মান-দর্শনী। 'সরকারের ছেলে'[৩৩৮] গল্পে দলে দলে প্রজারা রাজদরবারে এসেছে, সঙ্গে এনেছে একটি করে টাকা নজরানা।

উপর্যুপরি খাজনা এবং নজরদানের মাধ্যমে রাজকোষাগার পরিপূর্ণ করা ছাড়াও, অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজ্যের ইতিবাচক ভূমিকাটিও কম নয়। এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্।

অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা

হৃতদরিদ্র অসমর্থ প্রজাদের বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের দায় বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে। শীতলষষ্ঠীর ব্রতকথায়[৩৩৯] ষাটটি শিশু সন্তান প্রতিপালনে ব্রাহ্মণ অক্ষম। তখন রাজা সে ভার নেয়—'রাজার হুকুমে নির্মিত হল ষাটমহল বাড়ি'[৩৪০] দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য 'ষাটটি গাই ষাট্‌টি ধাই'[৩৪১] নিযুক্ত হয়।

'কাঁকনমালা-কাঞ্চনমালা' গল্পে সারা রাজ্য জুড়েই শুরু হয়েছে খাদ্য বিতরণ—

'আজ পিঠা কুড়ুলির ব্রত। রাজ্যে পিঠা বিলাইতে হয়।'[৩৪২]

খাদ্য বিতরণের পুণ্যকর্ম দ্বিগুণ হয়েছে সুখানুভূতিতে যখন অপুত্রক রাজা লাভ করেছে পুত্র সন্তান। পুত্রলাভের আনন্দে রাজা দেব-দেবতা মানুষজন-পক্ষী খাওয়ান।'[৩৪৩]

প্রজাদের স্ব-রাজ্যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই নৃপতির অন্তরে দায়িত্বশীল পালক সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের অন্যতম ব্রতকথায়[৩৪৪]দারিদ্র্যের কারণে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণে ব্রাহ্মণ পরিবারকে রাজা অন্ন দিয়েছে, দিয়েছে নিষ্কর জমি।

রাজবাড়ির শিক্ষাগুরুকেও উপযুক্ত বেতন ভাতা ও সম্মান দিয়েছে রাজা। 'রত্নমালা' গল্পে গৃহশিক্ষক রাজপুত্রকে বলেছে—

'বাবা আমি তোমাদের রাজ্যে থাকি, রাজা আমাকে বহুবিঘা সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর দিয়েছে, রাজকোষ থেকে নিয়মিত বৃত্তি পাই। আর কিছু চাই না।'[৩৪৫] —এই কৃতজ্ঞ ভাষণ অতিরঞ্জিত নয়।

কলমচিও পায় আশাতিরিক্ত বেতন—

'The King allows the witty apprentice a liberal pay which enables him to live comfortably with his family everafter.'[৩৪৬]

পাক্‌শালাটিও জন সমাগমে পরিপূর্ণ—

'শতে শতে দাসী বাটনা বাটে, হাজারে হাজারে ধাই দাসী কুটনা কোটে। রাজভাণ্ডারে ছড়াছড়ি জন-জনতার হুড়াহুড়ি।'[৩৪৭]

অবশ্য সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ চিত্রটি ফুটেছে, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। 'The Adventures of two Thieves and their sons' গল্পে দেখা যায় যে প্রতিটি সিংহ-দরজায় ষোলজন পাহারাদার।

—'As the king had an infinite numbers of soldiers at his command, the guards at the door were relieved every-hour. So that one hour at each door there thirty two men present, consisting of the relieving party and of the relieved.'[৩৪৮]

অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীকে নিজ দেহরক্ষী করেছে রাজা এমন নজিরও দুর্লভ নয়। 'The Boy Whom Seven Mother Suckled' গল্পে বিদেশ থেকে আসা একটি ছেলেকেই রাজা পার্শ্বচর নিযুক্ত করেছে—

'He attended on the king and took every care to prevent the queen from swallowing him up.'[৩৪৯]

যোগ্যতার ক্রমবিবর্তনে বেতন ও পদমর্যাদার উন্নতি ঘটেছে। 'সরকারের ছেলে' এমনই এক গল্প যেখানে রামধন সরকার সামান্য ঘড়িয়াল হিসাবে নিযুক্ত থেকে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীর পদটি লাভ করেছে।[৩৫০]

সাধারণ জনগণও কৃতিত্বের যথোপযুক্ত পুরস্কার লাভ করেছে রাজার কাছ থেকে। 'মধুমালা' গল্পে রাজপুত্র মদনের জীবনরক্ষার পুরস্কার হিসাবে—'গোপ পাইল টাকা, রাখালেরা সিকা।'[৩৫১]

স্বাধীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকেও রাজা সাহায্য করেছে তাদের আত্মসম্মানে এতটুকু আঘাত না করে। 'কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর ব্রতকথায়'[৩৫২] দৈনন্দিন যে কোন অবিক্রীত দ্রব্য রাজা কিনে নেবে—এই নীতিটি ব্যবসায়ে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থসাহায্য দানেরই ইঙ্গিতবাহী। ব্রতকথাটিতে প্রজাপালক রাজা দরিদ্র কামারের কাছ থেকে লৌহ নির্মিত অলক্ষ্মী মূর্তিটি ক্রয় করেছেন উপযুক্ত মূল্যে।

এই কর্মের নিদারুণ ফলশ্রুতিতে একে একে সৌভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করেছেন রাজাকে। কিন্তু রাজা অবিচল থেকেছে তার নীতিতে। এই বোধই তাকে মহান দৃঢ়চিত্ত পালনকারীর মর্যাদা দিয়েছে।

একটি লোককথায় দেখি যে, বহু তপস্যায় বহু ক্লেশ সহ্য করে যখন আরাধ্য কল্পবৃক্ষের দর্শন পেল রাজা, তখন তার প্রার্থনা—

'হে বৃক্ষ এই বর দিন যেন আমার রাজ্যে কোন প্রজার গৃহে দারিদ্র্য না থাকে',[৩৫৩]

এই প্রার্থনা ফলবতী হয়েছে 'কিরণমালা' গল্পে 'সকল প্রজা সাতদিন সাত রাত্রি ধরিয়া মণিমুক্ত নিয়া ছড়াছড়ি খেলিল।'[৩৫৪]

সুশাসক নৃপতিমাত্রেরই বিশ্বাস—'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ'[৩৫৫]—প্রাজ্ঞব্যক্তি ধন ও জীবনকে পরহিতের জন্য উৎসর্গ করেন। সেকারণেই কোন প্রত্যাশা ব্যতিরেকেই লোককথার রাজারা ক্রমাগত দান করেছে—

'রাজা দেশে দেশে ঢেঁড়া দিলেন, যারা দুঃখী গরীব ফকির, তাদের অমুক দেশের বাদশা দান করবেন।'[৩৫৬]

অথবা স্মরণযোগ্য, অন্য একটি লোককথার অংশ বিশেষ—

'In a certain country, a king declared that he would give everyone whatever they wished for the space of two hours.'[৩৫৭]

—ধনদানের সঙ্গে মিশেছে দাতার গর্ব নয়, কৃতার্থের সুখময় অনুভূতি।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের করাল বিভীষিকার পরিচয় কোন কোন লোককথায় লভ্য। চাতক পাখির জন্মকথায়—

'মলেকদিন ধইর‍্যা বিষ্টি বাদল নাই। খরার চোটে কুয়া পুকৈর থিক্যা শুরু কইর‍্যা খাল

বিল পর্যন্ত হুগলই হুগিয়া গেছে।'[৩৫৮]

—অনাবৃষ্টিজনিত নিদারুণ খরার পরিচয় পাই এই কথায়।

'কাঞ্চনমালা' গল্পে বাণিজ্যে চলেছে সাধু রূপলাল, পথিমধ্যে চোখে পড়ে—

'দেশে দেশে মন্বন্তরা, লোকজন পশুপক্ষী না খাইয়া মরে। হাট-বাজারে খাবার নাই সাত সাত মাস সওদাগর কোন ঘাটে খাবার কিছু পান না।'[৩৫৯]

বাণিজ্যকালে অবশ্য কেবল মন্বন্তরই নয়, অন্যান্য বহু বিপদ নিত্যসঙ্গী। চঞ্চলা লক্ষ্মী বারে বারেই কুপিতা হয়ে পরিত্যাগ করেন সওদাগরকে। তাই ভিন্ দেশী রাজার রাজ্য সীমানায় ডঙ্কার আওয়াজ তোলাও ঘোর আর্থিক বিপদ ডেকে এনেছে ঐ 'কাঞ্চনমালা' গল্পেই —

'মহারাজ হুকুম দিলেন যত বেসাতি আটক দাও। সাধুকে ফাটক দাও। অমনি হাজার হাজার সিপাই ছুটিয়া গিয়া সাধুর ডিঙা মধুকর শুকন্ চড়ায় উঠাইয়া থুইল। বাস-বেসাতি পসরা লুটিয়া নিয়া রাজভাণ্ডারে স্তূপ দিল।'[৩৬০]

পূর্বপুরুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন প্রাচুর্য কখনও সওদাগরকে করে তুলেছে বিলাসী, কর্মহীন স্থবির। এই অলসতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে 'শঙ্খমালা' গল্পে অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয়েছে দুর্বিষহ দারিদ্র্য —

'মেয়ে বৌ নিয়া মা—সওদাগরের সওদাগরনী কুঁড়ের তলে থাকেন। ঢেঁকী বেনে তুষ খান, তুষ কুটে ভুষী খান।'[৩৬১]

বণিক জীবনে, আর্থিক বিপর্যয় নেমেছে 'The Story of Prince Sobur' গল্পে—

'By a sudden stroke of misfortune the merchant lost all his money, his house and property were sold and he, his wife and six daughters were turned adrift penniless into the world.'[৩৬২]

উচ্ছৃঙ্খল অমিতব্যয়িতা সাধারণ নাগরিককেও পরিণামে কপর্দকশূন্য অবস্থায় দাঁড় করাতো, তার নিদর্শনও লোকগল্পে কিছু কম নেই। 'Adi's wife'[৩৬৩] গল্পে আদি এমনই এক স্বেচ্ছাচারী বিলাসী যুবক, যে পিতার মৃত্যুর পর যাবতীয় সম্পত্তি বিলাসের স্রোতে বিসর্জন দিল। শেষে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় বিদেশে চাকরি গ্রহণই স্থির করল।

'I have not a single anna piece. I must go and take services in some country far away as it will be mean service, my relation will not see me there, so I shall not be ashamed.'[৩৬৪]

দেখা যাচ্ছে অভাবে পড়ে বিদেশের রাজ দরবারে কোন বৃত্তি গ্রহণের প্রচেষ্টা উচ্চবিত্তের পক্ষে যথেষ্ট অসম্মানেরই।

নগরের খোদ রাজবংশেও দুর্যোগের অভিঘাত আছড়ে পড়েছে। 'The Evil Eye of Sani' গল্পে শনির দৃষ্টিতে স্বয়ং রাজাও কাতরস্বরে লক্ষ্মীকে অনুযোগ করেছে—

'Mother Lakshmi, the evil eye of Sani is upon us. We are going away into exile'[৩৬৫]

রাজলক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূ মালঞ্চকে পরিত্যাগের কুপ্রভাব পড়েছে সমগ্র দেশে—

'এরাজ্যের রাজ-রাজত্ব বন্ধ, রাজ্যে লক্ষ্মী নাই শ্রী নাই।'[৩৬৬]

রাজা হবুচন্দ্র, গবুচন্দ্র মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে যখন 'মুড়ি মিশ্রির এক দর'[৩৬৭] সিদ্ধান্ত করেন, তখনই সেই রাজ্যের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দুর্বল ভিতটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দস্যু তস্করের উপদ্রবেও বহুরাজ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে—

নায়ে নায়ে ভর দিয়া যত রাজ্যের চোর আসিয়া রাজার রাজপুরীময় চুরি আরম্ভ করিল—

চাটি নিল বাটি নিল সব নিল চোরে,
মাটি পেতে পান্তা খান রাজ মনে মনে পুড়ে।[৩৬৮]

তস্করের উপদ্রব বন্ধ করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে 'The Adventures of Two Thieves and Their Sons.' গল্পে। ঘটনার এমনই পরিহাস যে সুশৃঙ্খল চৌরপদ্ধতির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে রাজ্য জোড়া নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা—

'All sorts of enquiries were made but all in vain. Proclamation was made in the city, a large reward was offered. But no one responded in the call.'[৩৬৯]

কেবল আর্থিক নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হয়নি, দেশের সুখ-শান্তির নিরুপদ্রব ভিতটিও টলোমলো, তা-ও বেশ বোঝা যায়।

দেশীয় তস্কর ব্যতীত বহিরাগত দস্যুর উপদ্রবও বড়ো কম নয়, 'পুষ্পমালা' গল্পে চন্দন ও পুষ্প বিদেশে যে বুড়ির বাড়ি অতিথি, সে বুড়ি 'সাত ডাকাতের মা,'[৩৭০] শ্বেত সরষে পথে ফেলে সেই চিহ্ন ধরে তার' চন্দন পুষ্পের অনুসরণ করেছে—

'সাত ডাকাত ঘোড়ায় কোড়া মারিয়া বাড়িতে আসে। দেখে পথে শ্বেতফুল। অমনি সাতভাই ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া ফুলের পথে ঘোড়া ছুটাইল।'[৩৭১]

জলদস্যুর উপদ্রবেও বণিককুল সদাব্যস্ত, 'মদনসাধু'[৩৭২] গল্পে ছয় মাস জলভ্রমণ করার পর প্রথম যেখানে সাধু বিশ্রামের উদ্যোগ করে তা 'হারমাদ ডাকাতের দেশ'।[৩৭৩]

ঐশ্বরিক শক্তির অবমাননাও আর্থিক অবনতির কারণ হয়েছে। বেশির ভাগ ব্রতকথাতেই দেখা গেছে, কোন রাজা বা শক্তিশালী জমিদার বা বড়ির কর্তা ব্রতিনীর ব্রত ভঙ্গ করেছে এবং শাস্তি হিসাবে প্রবল দারিদ্র্য পরিবার বা রাজ্যকে গ্রাস করেছে। 'সম্পদের বার ভাই'[৩৭৪] 'সৌভাগ্য চতুর্থী কথা'[৩৭৫] ইত্যাদি অজস্র লোকগল্পে ছড়িয়ে আছে এই দৃষ্টান্ত। দেবী সঙ্কটার অন্যতম ব্রতকথায়[৩৭৬] দুঃস্থ রাজার সব সম্পত্তি কিনে নেয় তারই অধীনস্থ কোটাল।

অর্থাৎ, লোককথায় নিরুপদ্রব আর্থিক জীবন আশা করাই অন্যায়। তবুও, উদ্যোগ, শ্রম, বুদ্ধি আর চাতুর্যের সঙ্গে লোককথার নারী-পুরুষ আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা

করেছে। তাই সর্ব বিপর্যয় অতিক্রম করে অন্তে সাফল্যও করায়ত্ত হয়েছে। ব্রতের দেব-দেবিগণ সন্তুষ্ট হয়েছেন—

'দেবতা মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যত লোকের আনন্দ'[৩৭৭]—এই আনন্দই সকল দুঃখের অবসানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

'তখন সোনার কিরণচন্দ্র সূর্যের আলোক রাজচূড়ায় পড়ে, আনন্দে রাজ্য উথলে।'[৩৭৮]

—ঐশ্বর্যময় সমৃদ্ধির এই চিত্রই বাংলা লোককথার সার-কথা।

উল্লেখপঞ্জী

১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরমার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০০, পৃ: ৫৪

২। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, বাংলার লোককথা, একাডেমী অব ফোকলোর, প্রথম প্রকাশ, ঈদ-উল-ফিতর (১৪০৮ হিজরী) পৃ: ১৯৯

৩। Dey Lal Behari, Folk Tales of Bengal, Uchcharan, 1993, P. 126

৪। Mcculloch William, Bengali Household Tales, London, 1912, P. 218

৫। মজুমদার আশুতোষ, মেয়েদের ব্রতকথা, দেব সাহিত্য কুটীর, জুলাই ১৯৯০, পৃ: ৪৬

৬। ঐ, পৃ: ৩৬

৭। ঐ, পৃ: ৪০

৮। ঐ, পৃ: ৭

৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক) পৃ: ৫৪

১০। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ: ১

১১। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব ,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক) পৃ: ৫৪

১২। ঐ, পৃ: ২১৭

১৩। ঐ, পৃ: ১৬১

১৪। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ: ২৬

১৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, কথা ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৬ পৃ: ৫৫৯

১৬। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) পৃ: ২৩৭

১৭। ভট্টাচার্য হিমাদ্রিশঙ্কর, ভট্টাচার্য সুধীশঙ্কর সম্পাদিত, কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ: ৭৮-৭৯

১৮। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃ: ২৩৭

১৯। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ১৫

২০। ঐ, পৃ: ১৬৩

২১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরদার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বাং ১৩৯৩ পৃ: ১০১- ১৫০

২২। ঐ, পৃ: ১২১

২৩। মজুদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ১৭

২৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃ: ১৭

২৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৩৯৫-৩৯৮

২৬। ঐ, পৃ: ৩৯৭

২৭। ঐ, পৃ: ৩৯৭
২৮। ঐ, পৃ: ৩৯৭
২৯। Indian Antiquiry Vol. IX. 1880, January P. 3
৩০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৫১-২২০
৩১। ঐ, পৃ: ২৭২-৩৭১
৩২। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা, শান্তিসদন গল্প সংখ্যা ১৩১, পৃ: ৯৭
৩৩। সেনগুপ্ত পল্লব, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ:৯৫
৩৪। ঐ, পৃ: ৯৭
৩৫। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ১৭
৩৬। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, কাহিনী কিংবদন্তী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ: ৮
৩৭। ঐ, পৃ: ১০
৩৮। ঐ
৩৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৭৮
৪০। ঐ, পৃ: ২৭৭
৪১। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ১০২
৪২। Chowdhury Kabir, Folk Tales of Bangladesh, Dacca, Bangla Academy,1972, P. 42-47
৪৩। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম দে'জ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০,পৃ: ৪৬৭
৪৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ. ৫৪
৪৫। Choudhury Kabir, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ: ৭৮-১১০
৪৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১১৫
৪৭। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২৪৪
৪৮। মিত্র মজুমদাব দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৫৮
৪৯। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩১
৫০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ২৫
৫১। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক) পৃ: ১৪৮
৫২। ঐ, পৃ: ১৫৭
৫৩। সেন সুকুমার, গল্পে গাঁটছড়া, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৯২, পৃ: ৯৪
৫৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃ: ১৩৬
৫৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৯৭-২০৪
৫৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১২৯
৫৭। ঐ, পৃ: ১৩৫
৫৮। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), ৫৯৫
৫৯। ঐ, পৃ: ৫৮৪
৬০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৩৫
৬১। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ৮৯
৬২। ঐ, পৃ: ১৬৯
৬৩। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১১১-১২১
৬৪। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ৭

৬৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৮২
৬৬। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক) , পৃ: ৮২-১১৭
৬৭। ঐ, পৃ: ১৬১-১৬৭
৬৮। দ্যতিয়েন ফাদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১০৬
৬৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) , পৃ: ৬৮০
৭০। ভৌমিক নির্মলেন্দু, বিহঙ্গচারণা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স ১৯৮৫, পৃ: ৫২৫
৭১। ঐ, পৃ: ৫২৩-২৪
৭২। ঐ, পৃ: ৫২৩
৭৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৩২৪
৭৪। ঐ, পৃ: ৩০৮
৭৫। ঐ, পৃ: ৩১১
৭৬। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৯৬-১০৩
৭৭। ঐ, পৃ: ৯৮
৭৮। ঐ, Dey Lal Behari, P. 244-248
৭৯। ঐ, পৃ: ২৪৪-২৪৮
৮০। ঐ, পৃ: ২৪৬
৮১। ঐ, পৃ: ২৪৬
৮২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১১৫-১২০
৮৩। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৩ সংখ্যক), পৃ: ৪৮২
৮৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১১৩
৮৫। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৩ সংখ্যক), পৃ: ১৫২
৮৬। মিত্র সুবলচন্দ্র সংকলিত, সরল বাঙ্গলা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস, অষ্টম সংস্করণ জুলাই ১৯৮৪, পৃ: ১৫০৬
৮৭। ঐ
৮৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৭৭
৮৯। ঐ, পৃ: ২৭৬
৯০। ঐ, পৃ: ৩১২
৯১। ঐ
৯২। ঐ
৯৩। ঐ
৯৪। ঐ, পৃ: ৩৪১
৯৫। দ্যতিয়েন ফাদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৭৮
৯৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৭৮
৯৭। ঐ, পৃ: ২৭৯
৯৮। ঐ, পৃ: ২৮৫
৯৯। ঐ
১০০। ঐ, পৃ: ২৮৬
১০১। সিদ্দিকী আশরাফ, কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫, পৃ: ৩৭
১০২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৮৬
১০৩। ঐ, পৃ: ২৪৭

১০৪। ঐ, পৃ: ২৯০
১০৫। ঐ, পৃ: ২৪৭
১০৬। ঐ
১০৭। ঐ, পৃ: ২৯০
১০৮। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক) পৃ: ৩৪-৪
১০৯। ঐ, পৃ: ৩৫
১১০। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৯৬-১০৩
১১১। ঐ, পৃ: ৯৯
১১২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৪৯
১১৩। ঐ
১১৪। ঐ, পৃ: ২৯৩
১১৫। ঐ, ২৮৬
১১৬। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ১১-১৯
১১৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৪৯
১১৮। ঐ, পৃ: ২৪৪
১১৯। ঐ
১২০। ঐ
১২১। ঐ, পৃ: ২৪৮
১২২। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২২৭-২৪৩
১২৩। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ১৬৩-১৭৫
১২৪। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ৮২-১১৭
১২৫। ঐ, পৃ: ৮৪
১২৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১১৫
১২৭। Dey Lal Behari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১১৫
১২৮। ঐ
১২৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃ: ২৫
১৩০। ঐ
১৩১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৯৭-২০৪
১৩২। ঐ, পৃ: ১৯৮
১৩৩। Indian Antiquiry, Vol-I 1872, The Seventh Story, P. 344-345
১৩৪। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ৭
১৩৫। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পর্কিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২ সংখ্যক), পৃ: ১০২
১৩৬। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৮২-১৯১
১৩৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৩৪১
১৩৮। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১১৭
১৩৯। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক) পৃ: ৮৭
১৪০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৩৬
১৪১। ঐ, পৃ: ২৪২
১৪২। ঐ, পৃ: ৩১৫
১৪৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৯ সংখ্যক), পৃ: ৬২

১৪৪। ঐ, পৃ: ৩০
১৪৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৩১৫
১৪৬। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ২২৩-২২৫
১৪৭। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৩ সংখ্যক), পৃ: ২৭৬
১৪৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৮০
১৪৯। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৩ সংখ্যক), পৃ: ২৭৫
১৫০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৭৮
১৫১। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ১৭৬-১৭৮
১৫২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৯ সংখ্যক), পৃ: ২৫
১৫৩। সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ: ৪৭১
১৫৪। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ১৬৩
১৫৫। ঐ, পৃ: ১০৮-১৩৯
১৫৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৭৭
১৫৭। ঐ, ২৫১
১৫৮। ঐ।
১৫৯। ঐ।
১৬০। ঐ, পৃ: ২৭০
১৬১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১১৫
১৬২। ঐ, পৃ: ১১৬
১৬৩। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৯৮
১৬৪। ঐ, পৃ: ১১১-১২১
১৬৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৭৯
১৬৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১৩
১৬৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৬৭
১৬৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৪০
১৬৯। ঐ, পৃ: ৪০
১৭০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৩০১
১৭১। ঐ।
১৭২। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ৪৬
১৭৩। ঐ, পৃ: ৪৮
১৭৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৫৫
১৭৫। ঐ, পৃ: ৩০১
১৭৬। ঐ, পৃ: ৩৩৮
১৭৭। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ১২৮-১৩৯
১৭৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৫৭
১৭৯। ঐ, পৃ: ১৫৮
১৮০। Dey Lal behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২০৪
১৮১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১৪৮
১৮২। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২১৩
১৮৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ২৮

১৮৪। ঐ, পৃ: ২৬
১৮৫। ঐ, পৃ: ৩০
১৮৬। ঐ, পৃ: ৬৮
১৮৭। ঐ, পৃ: ১৩৭
১৮৮। ভট্টাচার্য হিমাদ্রিশঙ্কর, ভট্টাচার্য সুধীশঙ্কর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৭ সংখ্যক), পৃ: ১০০
১৮৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৯০
১৯০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১১১
১৯১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৬৮
১৯২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১২৯
১৯৩। Indian Antiquiry, Vol.I, 1872, P. 344-345
১৯৪। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ১২৮-১৩৯
১৯৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৯৬-১০৩
১৯৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৭
১৯৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৯৭
১৯৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৫
১৯৯। ঐ
২০০। ঐ
২০১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২২১-২৭০
২০২। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৯৫
২০৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৫৭
২০৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১০
২০৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১০
২০৬। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৩৭
২০৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৮৫
২০৮। ঐ
২০৯। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ১৪
২১০। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২ সংখ্যক), গল্পসংখ্যা ৬, পৃ: ৪
২১১। Dey Lal behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৮২
২১২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৬৩
২১৩। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৭৮
২১৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৯১
২১৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃ: ৪০৮
২১৬। রায় নীহাররঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৪ সংখ্যক)
২১৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৪৫
২১৮। ঐ
২১৯। ঐ
২২০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৮৯
২২১। ঐ, পৃ: ৫৬
২২২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যাক)
২২৩। Risley H.H. Tribes and Castes of Bengal. Firma Mukhopadhyay, 1981. P.388

২২৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ম সংখ্যক), পৃঃ ৯৯
২২৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক),পৃঃ ২৩৭
২২৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ম সংখ্যক) পৃঃ ১৩৩
২২৭। ঐ, পৃঃ ৫১
২২৮। মজুমদার আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫সংখ্যক), পৃঃ ৪০-৪১
২২৯। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২সংখ্যক), পৃঃ ১২৮-১৩৯
২৩০। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃঃ ৫৯৯-৬০১
২৩১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক) পৃঃ ১৬১
২৩২। ঐ, পৃ, ৪৫
২৩৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৮৮, পৃঃ ৭৯
২৩৪। ঐ, পৃ, ৮১
২৩৫। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক), P.30-35
২৩৬। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), P.47
২৩৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ম সংখ্যক), পৃঃ ১২১
২৩৮। দ্যতিয়েন ফাদার , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২ সংখ্যক), পৃঃ ১০৭
২৩৯। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ, ২০৫
২৪০। Indian Antiquiry, Vol.I,1872, P. 344-345
২৪১। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০২ সংখ্যক), পৃ, ২০৫
২৪২। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, কাহিনী কিংবদন্তী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃঃ ৩৬-৪৫
২৪৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ১২৪
২৪৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক),P. 139-158
২৪৫। ঐ, P. 142
২৪৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ২২৬
২৪৭। ঐ, পৃঃ ১৫১-২২০
২৪৮। ঐ, পৃঃ ২৪৩-২৪৪
২৪৯। ঐ, পৃঃ ২৫৪
২৫০। ঐ, পৃঃ ১৪৮
২৫১। ভট্টাচার্য আশুতোষ; পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃঃ ২১৫-২১৭
২৫২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ২৫৬
২৫৩। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃঃ ৪৯-৫২
২৫৪। চক্রবর্তী বরুণকুমার, প্রসঙ্গ লোকপুরাণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, জানুয়ারী ১৯৯১, পৃঃ ৫৪
২৫৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ম সংখ্যক), পৃঃ ৯৫
২৫৬। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক),P.223
২৫৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ম সংখ্যক), পৃঃ ১১৪০
২৫৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ২৭৭
২৫৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ম সংখ্যক), পৃঃ ১১৮
২৬০। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ৭৯
২৬১। ঐ, পৃঃ ২৪২
২৬২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক) পৃ ৭৯

২৬৩। ঐ, পৃঃ ২৪২
২৬৪। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃঃ ১৪
২৬৫। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃঃ ১০৮-১৩৯
২৬৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ২৪৯
২৬৭। ঐ, পৃঃ ১৩৮
২৬৮। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ, ১২
২৬৯। Dey Lal Behari,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), P. 111-121
২৭০। ঐ, P. 115
২৭১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ২৮২
২৭২। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃঃ ৭-১১
২৭৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃঃ ২০৪
২৭৪। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, ভূত-পেত্নী, মডার্ন বুক এজেন্সী, পঞ্চদশ সংস্করণ, পৃ, ৫৭
২৭৫। চট্টোপাধ্যায় অঘোরনাথ, মেয়েলী ব্রত, প্যাপিরাস, জুন ১৯৯৭, পৃঃ ২২
২৭৬। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২ সংখ্যক), পৃঃ ২৪২
২৭৭। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃঃ ১
২৭৮। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২ সংখ্যক), পৃঃ ৫৯
২৭৯। ঐ, পৃঃ ৭৫
২৮০। Banerjee Kasindranath, Popular Tales of Bengal, Calcutta, 1905, P. 18-31
২৮১। ঐ, P. 22
২৮২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃঃ ২৪২
২৮৩। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), P. 176-181
২৮৪। ঐ, P. 175-176
২৮৫। ঐ, P.223-226
২৮৬। ঐ, P. 224
২৮৭। ঐ, P. 58
২৮৮। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃঃ ২২-২৫
২৮৯। ঐ, পৃঃ ৬৯
২৯০। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, বেড়াল ঠাকুরঝি, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৮, পৃঃ ৬৮-৬৯
২৯১। ঐ, পৃঃ ৬৯
২৯২। মিত্র সুবলচন্দ্র সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬ সংখ্যক), পৃঃ ১৪৯৭
২৯৩। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃঃ ৮১
২৯৪। ভৌমিক নির্মলেন্দু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭০ সংখ্যক), পৃঃ ৫২৬
২৯৫। Dey Lal Behari,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক),P. 139-158
২৯৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৮১-২৮২
২৯৭। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক),P. 97,
২৯৮। Indian Antiquiry, Vol-IX, 1880, January, P. 3
২৯৯। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, ভূতপেত্নী, জানুয়ারী ১৯৯৫, পৃ: ১৪-১৮
৩০০। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯০ সংখ্যক), পৃ: ২৭-৩৪
৩০১। ঐ, পৃ: ৩৪
৩০২। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) P. 152-175

৩০৩। ঐ, পৃ: ১৭৫-২০৫
৩০৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১৩২
৩০৫। ঐ, পৃ: ৯১
৩০৬। ঐ, পৃ: ১১৫
৩০৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃ: ৫৪১
৩০৮। রায় বিদ্যানিধি যোগেশ চন্দ্র, বাঙ্গালা শব্দকোষ, ভূর্জপত্র, পুনঃপ্রকাশ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১০০
৩০৯। ঐ, পৃ: ৬৮৬
৩১০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৩৮
৩১১। ঐ, পৃ: ১৩৮
৩১২। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ১০১
৩১৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৮৯
৩১৪। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৯০ সংখ্যক), পৃ: ৬৬-৬৭
৩১৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১০৭-১১৪
৩১৬। ঐ, পৃ: ২৮
৩১৭। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ১২৮-১৩৯
৩১৮। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১১১-১২১
৩১৯। ঐ, পৃ: ১৪৩
৩২০। ঐ, পৃ: ১৯৩
৩২১। ঐ, পৃ: ১৮৩
৩২২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৩ সংখ্যক), পৃ: ৭৫-১০৯
৩২৩। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ২১৫
৩২৪। ঐ, পৃ: ২২০
৩২৫। Chowdhury Kabir, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ: ৭৮-১১০
৩২৬। ঐ, পৃ: ৯২
৩২৭। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী, পাত্রজ পাবলিকেশন, ডিসেম্বর, ১৯৯০। পৃ:৩৮১-৩৮৫
৩২৮। ঐ, পৃ: ৩৮৩
৩২৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৩ সংখ্যক), পৃ: ১১১
৩৩০। ঐ, পৃ: ২১৪
৩৩১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ৩০৮
৩৩২। ঐ, পৃ: ২৫১
৩৩৩। Indian Antiquiry, Vol-III, 1874, P. 342-343
৩৩৪। ঐ, পৃ: ৩৪২
৩৩৫। ঐ, পৃ: ৩৪৩
৩৩৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৫১
৩৩৭। পৃ. ১৫৬
৩৩৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৩ সংখ্যক), পৃ: ৭৫-২০৯
৩৩৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃ: ১৩১-১৩৫
৩৪০। ঐ, পৃ: ১৩৩
৩৪১। ঐ, পৃ: ১৩৩

৩৪২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ২৮
৩৪৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৫৯
৩৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষ, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য ডি.এম. লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ: ২০০
৩৪৫। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ২১৭
৩৪৬। Banerjee Kasindranath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৮০ সংখ্যক), পৃ: ৯১
৩৪৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ২৪
৩৪৮। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৫২
৩৪৯। ঐ, পৃ: ১০৭
৩৫০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৩ সংখ্যক), পৃ: ৭৫-১০৯
৩৫১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২২ সংখ্যক), পৃ: ৯৭
৩৫২। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ৭-১১
৩৫৩। ব্যতিয়েন ফাদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩২ সংখ্যক), পৃ: ১০৪
৩৫৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ৬৩
৩৫৫। মিত্র সুবলচন্দ্র সংকলিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৬ সংখ্যক), পৃ: ১৫০২
৩৫৬। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক), পৃ: ১২৫
৩৫৭। Indian Antiquiry, Vol-II, 1873, P. 357
৩৫৮। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৩২
৩৫৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২৫৩
৩৬০। ঐ, পৃ: ৩৪৬
৩৬১। ঐ, পৃ: ২৭৭
৩৬২। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১১৫
৩৬৩। Indian Antiquiry, Vol-IX, January 1880, P. 2
৩৬৪। ঐ
৩৬৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৯৭
৩৬৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ১৯০
৩৬৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৩৩ সংখ্যক), পৃ: ৫
৩৬৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১৩৮
৩৬৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৫৫
৩৭০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), পৃ: ১২৪
৩৭১। ঐ, পৃ: ১২৬
৩৭২। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ৩৪-৪৬
৩৭৩। ঐ, পৃ: ৩৭
৩৭৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক), পৃ: ৩২৯-৩৩২
৩৭৫। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫ সংখ্যক), পৃ: ১৪৮-১৫২
৩৭৬। ঐ, পৃ: ২৪৮-২৫০
৩৭৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২১ সংখ্যক), পৃ: ২২০
৩৭৮। ঐ, পৃ: ২২০

পঞ্চম অধ্যায়

রাজ-প্রসঙ্গ

'এক যে ছিল রাজা

তখন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না—রাজার নাম কি? অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজ্য সে সকল ইতিহাস ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল।'[১]

লোকসংস্কৃতির গবেষকবৃন্দের নিকট সেই ইতিহাস ভূগোলের তর্কই মুখ্য। লোককথার অনাবিল প্রবাহ থেকে প্রাচীন লোকজীবন-ইতিহাসের ক্ষুদ্র খণ্ড তথ্যগুলি চয়নেই গবেষণার সার্থকতা।

ইতিহাসের এক অপরিহার্য অধ্যায় রাজবৃত্ত বর্ণন। লোককথার মধ্য থেকে বাংলার জীবনেতিহাস সঞ্চয়ে এই রাজপ্রসঙ্গ বহুক্ষেত্রেই আবির্ভূত হয়েছে। অবশ্য রাষ্ট্র বিন্যাসের পারম্পর্য সমন্বিত সুগঠিত পূর্ণচিত্র বাংলা লোককথায় দুর্লভ। যা আছে তা হলো, বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন ব্যক্তিক ক্রিয়াকর্মের বিভিন্ন শাখা উপশাখার খণ্ডচিত্র।

নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক হইতেই বোধহয় বাংলার বিভিন্ন কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হইতেছিল। কিন্তু এই বিবর্তন যখনই হউক তাহার পর বহু দিন পর্যন্ত ঐতিহ্যে ও লোকসংস্কৃতিতে কৌমতন্ত্রের স্মৃতি যে শুধু জাগরূক ছিল তাই নয়, ইতস্তত তার কিছু অভ্যাস প্রচলিত ছিল।'[২]

বাংলার লোককথাগুলিতেও রাজতন্ত্রের এমনই এক শৈশবকালের চিত্র উপস্থাপিত, যেখানে গঠনোন্মুখ রাজতন্ত্র তার সমস্ত মর্যাদা ও সমারোহ নিয়ে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসরমান।

রাজচরিত্র ও রাজকীয় জীবনচর্যা

বাংলা লোককথায় সাধারণতঃ কোন বিশিষ্ট রাজার রাজত্বকালের সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই (ব্যতিক্রম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কতিপয় কিংবদন্তী) রাজাদণ্ডধর[৩] তাম্বুলরাজ[৪], রাজা দুধবর্ণ[৫] নীলমানিক[৬] প্রমুখ কাল্পনিক নামধারী রাজচরিত্রেরই প্রতিষ্ঠা।

হীরারাজপুত্র[৭], মাণিকরাজপুত্র[৮], মোতিরাজপুত্র[৯]—রত্নশোভিত নামকরণের মতোই তাদের শারীরিক সৌন্দর্য অতুল। রাজসভায় তাদের আবির্ভাবে 'পৃথিবীর উপর হাজার ফুল ফুটিয়া ওঠে। পৃথিবীর উপর শোভা যেন ঢালিয়া পড়ে।'[১০]

একটি গল্পে রাজকন্যার সৌন্দর্যের দ্যুতি সারা শহরকেই উজ্জ্বল আলো দান করেছে—

'Our Raja has one daughter. So radiant her beauty that when she comes out upon the palace roof, the whole city is brilliantly lighted up'[১১]

কিন্তু সৌন্দর্য বা সাজসজ্জার আড়ম্বর এ দু'য়ের কোনটিই রাজচরিত্রের আবশ্যিক শর্ত

নয়—প্রয়োজন দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার। এক্ষেত্রে স্মরণীয় ফিঙে পাখীর রাজা হওয়ার বৃত্তান্তটি।[১২] বিধাতা সকল পাখীর সম্মুখে ঘোষণা করলেন অতিপ্রত্যুষে যে সর্বপ্রথম তাঁর দর্শনে উপস্থিত হবে, সেই হবে পক্ষীকুলের শাসক। পরের দিন প্রভাতে যখন অন্যান্য সব পাখী ব্যস্ত সাজসজ্জায়, ফিঙে বিনা প্রসাধনে উপস্থিত হল বিধাতার কাছে। তার ক্ষিপ্রতা দূরদর্শিতা সন্তুষ্ট করল বিধাতাকে। ফলে সেই হল পাখীদের রাজা।

মানসিক চিন্তনগতি ও শারীরিক কুশলতার সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন শিক্ষার। কেবল অক্ষরজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, সে কথাটি তীব্রভাবে স্মরণ করিয়েছে মালঞ্চমালা। বালক স্বামী চন্দ্রমাণিকের শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তায় কাতর সে, "রাজার রাজপুত্র আমার স্বামী। পাঁচ বছরে পা, এখন লেখাপড়া না শিখাইলে আর চলেনা।"[১৩] এই দুশ্চিন্তার নিরসনে বাঘ-বাঘিনী যেন ঈষৎ অবজ্ঞা ভরেই বলেছে—"কতপণ্ডিত সাঁঝ সকালে ঘুরে হোক্কা-হোয়া করে, বল ধরিয়া আনিয়া নিই।[১৪] তখনই মালঞ্চ তীব্র প্রতিবাদ করেছে—" তাতে যে আমাদের হয় না।'[১৫] মনে পড়ে যায় চূড়ামণির কিসসা[১৬] -এর অন্যতম গল্পে শিক্ষায় তীব্র অনীহা—এই অপরাধেই নিজ পুত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপেরই হুকুম দেয় রাজা—'এই মূর্খ ছাইলাকে তোমার লগে লইয়া যাও। সমুদ্রের মধ্যে ইহাকে ফেলিয়া দিবে।'[১৭]

বাঙ্‌নিষ্ঠা রাজচরিত্রের আবশ্যিক শর্ত। তাই প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদে দুধবর্ণ রাজার পুত্ররা মালীর ছেলের সঙ্গে অশ্ব প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়—"দেখ মালী রাজার ছেলে যখন কথা দিয়েছি ঘোড়া ছুটাইব।"[১৮] শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গায়ের বহুমূল্য শালখানি কোটালকে পুরস্কার দেয় রাজা[১৯] আর পিতৃসত্য রক্ষার তাগিদে রাজকন্যা পুষ্প কোটালপুত্র চন্দনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের গ্রন্থি বন্ধন করে—'মার সত্য পিতার সত্য, দুই সত্যের বাঁধন—কোটালের ঘরই আমার ঘর।'[২০]

লোককথার রাজাগণ দক্ষ অশ্বারোহী, সফল যোদ্ধা—"আজ রাজপুত্র চন্দ্রমাণিক ঘোড়া ছুটাইবেন। ঘোড়া ছুটাইতে সবুর সহে না, রাশ টানিয়া ধরেন। ঘোড়ার গায়ের ভঙ্গি ঢেউ খেলে চারিপায়ে টগবগ উঠে"[২১]। মৃগয়া তাদের আবশ্যিক ব্যসন—

"রাজার পুত্র হইয়া মৃগয়া না করিলাম তো কি করিলাম? যে হাতে রাজদণ্ড ধরিলাম, সে হাতে বাণ ধরিলাম বাবা আমাকে বিদায় দাও"[২২] 'মধুমালা' গল্পে মদনকুমারের এই আক্ষেপ চিনিয়ে দিয়েছে রাজসম্মানের সঙ্গে মৃগয়ার অবিচ্ছেদ্য বাঁধনটিকে। এছাড়াও মনে রাখতে হবে ভবিষ্যতের বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য যে সমরকুশলতার প্রয়োজন, তা শিক্ষার প্রাথমিক ধাপও এই মৃগয়া।

অস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে রাজারা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন দেশভ্রমণে—

'একদিন রাজপুত্রের মনে হইল দেশ ভ্রমণে যাইবেন। রাণী আহার নিদ্রা ছাড়িলেন, কেবল রাজা বলিলেন, আচ্ছা যাক্।'[২৩]

—বহির্জগতের জীবনযাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতা পুত্রকে ঋদ্ধ করবে, সম্ভবত এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েই রাজা বাধা দেয়নি পুত্রকে, দেশের ভবিষ্যৎ পালনকর্তাকে।

দৈনন্দিন জীবনে এই রাজসম্প্রদায় রাজকীয় ব্যসনে অভ্যস্ত। সচ্ছলতার বর্ণময় চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে রাজকীয় সম্পদ ভাণ্ডারে। কুঠুরী ভরা মোহর, ভাণ্ডার ভরা মাণিক্য ছাড়াও হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, মন্ত্রী অমাত্য, সিপাই লস্করে রাজপুরী গম্‌গম্‌ করত।

"রাজার ঘরে হীরায় মাণিকে কথা বাঁটে, স্বর্গের দেবতা রাজার দুয়ারে দুয়ারী খাটে।"[২৪]

—অর্থাৎ অর্থবল ও জনবল উভয় ঐশ্বর্যেই রাজাগণ সমৃদ্ধ।

বিত্তের এই স্বীকৃতি শোনা যায় স্বয়ং রাজার মুখ থেকেই, "The Boy with The Moon On Forehead"—গল্পে নগর পরিক্রমাকালে তিন কন্যার অলৌকিক গুণের কথা শুনে রাজার স্বগত চিন্তা—

I don't care a straw for the girl whose clothes never tear and never get old, neither do I care for the other girl whose fuel is never consumed; nor for the third girl whose rice never fails in the pot.[২৬]—অন্ন জ্বালানী এবং বস্ত্র সম্পর্কে রাজা চিন্তামুক্ত। জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি তারা অনায়াসে উপেক্ষা করে যেতে পারে। তাঁদের লক্ষ্য তাই অসাধারণ অভাবনীয় বস্তুর দিকে—

"But the fourth girl is quite charming. She will give birth to twin children a son and a daughter, the daughter will be divinely fair and the son will have the moon on his forehead. I'll make her my wife." [২৭]

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাস দ্রব্যে রাজার তৃপ্তি পেতো না, অসম্ভবকে কুক্ষিগত করাই তাদের সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াত। প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলেই তারা সর্বতোভাবে পরিশ্রমজীবী হতে পারত না। মৃগয়া, দেশ ভ্রমণ ও রাজ্য বিজয়ের দুর্বার গতিই তাদের অসাধারণত্ব দান করেছে।

রাজঅন্তঃপুরের দিকে তাকালেও চোখে পড়ে কর্মময় চাঞ্চল্য। যদিও রাণী এবং রাজকন্যাদের অশন-বসন-আভরণে রাজকীয় রত্নালঙ্কারের শিঞ্জন, শতেক নহর হীরার হারের ঔজ্জ্বল্য[২৮] তাঁরা সোনার খাটে, রূপার খাটে পা রেখে সিঁথিপাটী করেন[২৯] স্নান সাধারণ পুকুরে, ঘরের খৈল গামছাই অঙ্গ মার্জনার উপকরণ[৩০] কখনো বা তারা ছাইগাদার পাশে আঁশ ছাড়াতেও বসে—

'আজ বড়রাণী ভাত রাঁধিবেন, মেজরাণী তরকারি কাটিবেন, সেজরাণী ব্যঞ্জন রাঁধিবেন, ন-রাণীজল তুলিবেন, কনেরাণী যোগান দিবেন, দুয়োরাণী বাটনা বাটিবেন আর ছোট রাণী মাছ কুটিবেন। পাঁচরাণী পাকশালে রহিলেন, ন-রাণী কূয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরাণী ছাইগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।'[৩১]

রাজপরিবারের কন্যাকে নিতে হতো চতুঃষষ্ঠীকলার পাঠ,'পুষ্পমালা' গল্পে রাজকন্যা পুষ্প গুরুর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করে আর গৃহে—"কন্যা পঞ্চভাত ব্যঞ্জন নামাইয়া নিজের হাতে করিয়া বাপমায়ের সামনে দিল, দাসী বাঁদীকে দিল, জন আশ্রিত কুকুর বিড়ালটা

যে, তাকেও খাওয়াইল।"[৩২]

অথচ এই সাধারণ কাজ কর্মের মধ্য দিয়েই তাদের আভিজাত্য, স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। সেকারণেই 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা'[৩৩] গল্পে মেকী রাণী কাঁকন গড়েছে আস্কে পিঠে, চাস্কে পিটা আলপনা দিয়েছে "এখানে এক খাবল ওখানে এক খাবল"[৩৪] আর দক্ষ কারিগরী বিদ্যার প্রমাণ দিলেন প্রকৃত রাণী—

"....আস্তে আস্তে পদ্ম-লতা আঁকিলেন, পদ্ম-লতার পাশে সোনার সাত কলস আঁকিলেন, কলসের উপর চূড়া, দুই দিকে ধানের ছড়া আঁকিয়া, ময়ূর, পুতুল, মা লক্ষ্মীর সোনা-পায়ের দাগ এই সব আঁকিয়া দিলেন"[৩৫]। কখনো বা অন্তঃপুরে পর্দানসীন অবস্থাও কিছুটা তুলে ধরেছে 'কুটুম পাখী' জন্ম সংক্রান্ত পুরাকথাটি [৩৬]। কন্যার বৃদ্ধ পিতা এই ভেবে কাতর হয়েছেন যে " এই সুন্দরী কন্যার রাজপুরীতে বিবাহ হয়েছে, ফলে একবার বউ হয়ে ঢুকলে রাজপুরী থেকে আর বেরোতে পারবে না।" [৩৭]

রাজপুরীর বিবাহ রীতিও বড়ো বিচিত্র। রাজবংশের বিবাহযোগ্যা কন্যা ও পুত্রের আলেখ্য নিয়ে দেশে দেশে সুযোগ্য পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করত ভাটগণ। উপযুক্ত বিবরণে "লিখন লিখিত তারা যুগল বটপাতে'। [৩৮] সঙ্গে থাকত বাখা চিত্রকর—

দুইদলে ছিল বহু বাখা চিত্রকর
অঙ্গুলি চিরিয়া পট আঁকিল বিস্তর [৩৯]।

যোগ্য পাত্র-পাত্রীর ছবি ও বিবরণ মনোনীত হলে তখনই হত প্রা[illegible]মিক কথাবার্তা, তরপর নিজ নিজ দেশে সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রত্যাবর্তন—

"ভাই....মালা চন্দন বদল লও, মধু মধু বোল দিয়া আপন আপন ঘোড়া ছাড়।"[৪০]

কখনো বা বিবাহ নামক শুভ কর্মটির তত্ত্বাবধায়ক ঘটক। 'The Match Making Jackal'[৪১] লোককথাটিতে বোঝাই যায় এই দায়িত্ব পালন করেছে চতুর শিয়াল। তারই দক্ষ বাক্-চাতুর্যে রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে সাধারণ তাঁতীর।

স্বয়ম্বর সভার আয়োজন হয়েছে "রাল দুর্গার ব্রতকথায়।"[৪২]

বিবাহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে কন্যার সৌন্দর্যই বিচার করত রাজা বা রাজপুত্রের দল। বলা যায়, তাদের দুর্বলতাই ছিল সৌন্দর্যের প্রতি। মধুমালা[৪৩], কাঞ্চনমালা[৪৪] গল্পে রাজপুত্র মদন এবং রূপলাল দুজনেই তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে রূপের প্রতি— পাইলাম সুন্দরী করিব ঘর[৪৫] অশোকষষ্ঠীর ব্রতকথায় কিংবা The Origin of Opium গল্পে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই অজ্ঞাতকুলশীল বনমালা বা আশ্রমকন্যাকে বিবাহ করেছে রাজা।

নারী-সৌন্দর্যের এমনই মোহ যে 'The Story of A Hiraman'[৪৮] গল্পে অপরের বাগদত্তা বধূকে হরণ করতেও দ্বিধা করে নি মোহগ্রস্ত নৃপতি—

"Struck with the matchless beauty of the lady, the king of the country want to save her. The lady was made a captive and her lover was not put to death by but his eyes were put out"[৪৯] কখনো বা ঘটেছে 'পলকে প্রণয়'।

Life's Secret গল্পে বিধাতা পুরুষের ভগ্নীর কন্যা ও রাজপুত্র ডালিম পরস্পরের প্রতি প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হয়েছে। সেই মুহূর্তেই সম্পূর্ণ হয়েছে গান্ধর্ব বিবাহ "As priests were out of question the hymeneal rites were performed a la Gandharava."[৫১] সৌন্দর্যের সঙ্গে বুদ্ধির সমাবেশও পাত্রীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। চড়া-চড়ী[৫২] গল্পের রাজা মন্ত্রী কন্যাকে একের পর এক কঠিন শর্তের সামনে উপস্থিত করিয়েছে। বুদ্ধিমতী মেয়েটি অসাধারণ কূট কৌশলে সবকটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই সঙ্গে জয় করেছে রাজার শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা।

'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী'[৫৩] গ্রন্থে, হরণ সুনাই[৫৪] গল্পে রাজপুত্র ফৈলন খাঁ ও রাজকন্যা হরণ সুনাই এর মধ্যে দৈহিক বলের ভীষণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সৌন্দর্য বা বুদ্ধি এখানে বিচার্য নয়, শারীরিক কসরতে দক্ষ নারী 'হরণের' মধ্যেই—রাজপুত্র ফৈলন খুঁজে পেয়েছে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এবং জীবন-প্রিয়াকে। কেবল অভিজাত বংশীয় পাত্র-পাত্রীই রাজারা সন্ধান করত না, বহুক্ষেত্রেই অতি সাধারণ-সমাজ থেকেই রাজপরিবারের বধূ বা জামাতা নির্বাচিত হয়েছে। 'দেড় আঙুলে গল্পে'[৫৫] কাঠুরে পুত্র দেড় আঙুলে কানা রাজকন্যার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। সুস্থ রাজকন্যাকে তাঁর পিতা সেই কাঠুরে ছেলের হাতেই অর্পণ করেছেন।

'কাদাখোঁচা পাখীর জন্মবৃত্তান্ত সংক্রান্ত পুরাকথাটিতে[৫৬] দেখি মূক রাজপুত্রকে সুস্থ করার জন্য রাজ্যে ঘোষণা করা হয়েছে—"যে কন্যে রাজপুত্রের মন ফিরিয়ে তাকে কথা কওয়াতে পারবে, তারই সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ দেওয়া হবে। তা সে কন্যে যে বংশেরই হোক দেখতে যেমনই হোক।"[৫৭]

"ডালিমকুমার"[৫৮] গল্পে সাত পাশাবতী পাণিগ্রাহী রাজপুত্রদের আহ্বান করেছে পাশাখেলায়—

যে জিতে সে মালা পায়
হারিলে মোদের পেটে যায়।[৫৯]

—পরাজিত দয়িত ভক্ষণের রীতিটি নরমাংসাহারী আদিম যুগটিকেই স্মরণ করায়।

কেবল প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে রাজকন্যা বিবাহ করেছে কুষ্ঠরোগীকে। (রাল দুর্গার ব্রতমাহাত্ম্য)[৬০]

প্রকৃত পক্ষে রাজপরিবারের জীবনচর্যা স্মরণ করায় প্রাচীন বাংলার সামন্ততন্ত্রকে যে সামন্ততন্ত্র গ্রাম্য অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রাচীন রূপকথায় রাজকন্যা গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তে যায়,[৬১] রাখাল ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।[৬২] আবার অগাধ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও টুনটুনির বাসায় রক্ষিত একটি মাত্র টাকার জন্য তাদের পরশ্রীকাতরমন ঈর্ষাগ্নিতে দগ্ধ হয়। অন্যদিকে সম্পদনারায়ণ ব্রতকথায়[৬৪] নৃপতি হয় সর্ববিদ্যাবিশারদ—

রাজকথা জানে/ রাজনীতি জানে/ এক টাকা ভেঙে পাঁচ টাকার সাদায় করতে

জানে।/কলাবন নিড়াতে জানে/ বাঁশবন নিড়াতে জানে।[৬৫]

অর্থাৎ মানসিক ও শারীরিক উভয় বলেই তারা সমৃদ্ধ। বস্তুত লোককথার কথক সচেতনভাবে যে চিত্রটি বার বার অঙ্কন করে, তা আদর্শ রাজারই চিত্র। নানা বিড়ম্বনা সঙ্কীর্ণতা ও তুচ্ছতার উর্ধ্বে উঠে রাজারা "জন জৌলুষ ঘিরে সোনার পাগড়ী শিরে"[৬৬] জাঁকজমকপূর্ণ শাসনকার্য পরিচালনা করে অনন্তকাল ধরে—শ্রোতার মানসপটে এই দৃশ্যটিই জীবন্ত থাকবে।

নির্ণীয়মান রাজতন্ত্রের পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে রাক্ষস রাজ্যগুলির কথা। বাংলা লোককথায় প্রধানত রূপকথায় রাক্ষস জাতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখি যে রাক্ষস দল শিকারজীবী মাংসাশী জাতি অতিভোজনে অভ্যস্ত। পশুপক্ষীর মাংস অপেক্ষা নরমাংসেই অধিক তৃপ্তি তাদের—আঁইলো মাঁইলো মানুষের গন্ধ পাঁই লোঁ ধরে ধরে খাঁই লো।[৬৭]

—রূপকথার রাক্ষসের এই সাধারণ পরিচিতি যাদুবিদ্যার সাহায্যে নিজ রূপবদলেও তারা পারদর্শী।—'রাক্ষসী মন্ত্রীপুত্রের ঘোড়া আর মন্ত্রী পুত্রকে খাইল। তারপর এক রূপসী মূর্তি ধরিয়া সেই গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।'[৬৮] রাক্ষসজাতির বাসস্থান সভ্য জনপদ থেকে দূরে। বিশাল অঞ্চল জুড়েই তাদের পুরী—

'সে কি পুরী— রাজ্যজোড়া। সেই অছিন অভিন্ পুরী' রাক্ষসে কিলবিল......গাদায় গাদায় মরা, গাদায় গাদায় জরা, পচায় গলায় পুরী। দগ্‌দগে থক্‌থক্ গন্ধে বারো ভূত পালায়....যত রাক্ষস পৃথিবী ছাঁকিয়া জীবন্ত মারিয়া আনিয়া পুরী ভরিয়া ফেলিয়াছে'[৬৯]

অর্থাৎ সভ্য সমাজ থেকে দূরে অস্বস্তিকর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশেই রাক্ষসজাতির স্থায়ী আবাস। সর্বপ্রাণবাদ, রূপান্তরবাদ ইত্যাদি নানা অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার মণ্ডিত তাদের কার্যাবলী। অথচ আকৃতি তাদের যতই ভীষণদর্শন হোক না কেন শারীরিক গঠনে তারা নররূপী। স্ব-সমাজে আচার-আচরণে আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ ভালবাসায় সাধারণ মানব-প্রকৃতিরই পরিচয় দিয়েছে তারা। "আমার নীলু আমার নাতু"[৭০] বলে রাক্ষসী আয়ী-বুড়ী যখন নীলকমলকে কোলে তুলে নেয়, তখন সে স্নেহময়ী পিতামহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

লোককথার সংগ্রাহক লালবিহারী দে তাঁর 'The Folktales of Bengal' গ্রন্থে একটি লোককথার পাদটীকায় (Thc Story of the Rakshsas)[৭২] রক্ষজাতির পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

".....they were probably the chief of the aborigines whom the aryans overthrew on their first settlement in the country."[৭৩] রাক্ষস যদি বিজিত অনার্যের প্রতিভূ হয়, তবে এই ধারণা অসঙ্গত নয় যে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েই তারা চলে গিয়েছিল, "সাত সমুদ্র তেরনদীর পারে" নিরাপদ দূরত্বে "লঙ্কাপুরে" বা কোকাফ রাজ্যে।[৭৪]

আর্যদের প্রতি তাদের স্বভাব বিদ্বেষ। তাই নিজ লোকালয়ের সীমানা পেরোনোমাত্র রাজা বা রাজপুত্র তাদের কবলে ধরা পড়ে। এমন কি মাঝে মাঝে রাক্ষসজাতি জোটবদ্ধ হয়ে আক্রমণও করেছে লোকালয়ে। নীলকমল আর লালকমল[৭৫] ইত্যাদি লোককথা পর্যবেক্ষণে মনে হয় নিজরাজ্যে খাদ্যসংকটের কারণেই এই আক্রমণ পন্থা বেছে নিত তারা।

অবশ্য, অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজের প্রতি এই বিরাগ সর্বত্র বজায় থাকে নি। বহুক্ষেত্রেই রাক্ষসীরা স্বেচ্ছায় রাজা বা রাজপুত্রের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেছে,[৭৬] সভ্য নাগরিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। নরমাংসভোজীর মতো বর্বর হলেও শিক্ষার আলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়নি।

'The Rakshasi wife of the king gave him a letter of introducing to her mother in which she requested her to devour the boy the moment he put the letter into her hands'[৭৭]

—প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য লেখনী-পত্রের সাহায্য নিয়েছে রাক্ষসী।

বিপরীতক্রমে, এ দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয় যে আর্যদের সঙ্গে চিরন্তন বিবাদ থাকলেও তাদের সন্তানের প্রতি এক আশ্চর্য অপত্য স্নেহই অনুভব করেছে তারা—

এই পুরী আমার বাপের, রাক্ষসেরা আমার বাপ-মা রাজা-রাজত্ব খাইয়াছে, কেবল আমাকে রাখিয়াছে।[৭৮]

শত্রুপক্ষের কন্যাসন্তানকে জীবিত রেখে তাদের লালন করার ঘটনাটি যেন ক্ষীণ ভাবে আর্যঅনার্য সংস্কৃতির মিলনসূত্রটিকেই স্মরণ করায়।

সভ্য মানুষ মাত্রেই যে রক্ষজাতির প্রিয় ভোজ্য নয়, সে স্বীকারোক্তি স্বয়ং রাক্ষস-রাজের মুখ থেকেই পাই 'The Finding of Dream'[৭৯] গল্পে। রাজপুত্র শিবদাস দিকভ্রান্ত হয়ে গিয়ে পড়েছে রাক্ষস রাজ্যে। রাজকন্যার হৃদয় তীব্র-আকর্ষণ অনুভব করেছে এই মানব তনয়ের প্রতি। সেই মুগ্ধতা সার্থক স্বীকৃতি পেয়েছে উভয়ের বিবাহে। বিবাহের পর আতঙ্কগ্রস্ত শিবদাসকে আশ্বস্ত করেছে স্বয়ং রক্ষরাজ—

"We are Rakshasas it is true. But we do not kill our husbands and suffer the torture of widowhood. We could not commit such a sin"[৮০]

এই বৈধব্যের যন্ত্রণার উপলব্ধি এবং পাপ-পুণ্য বোধ সংক্রান্ত এই ভাবনা নিঃসন্দেহে আধুনিক। তবে এই উক্তিটি রাক্ষসজাতির সুশৃঙ্খল জীবনছন্দ এবং তাদের মানসিক ভাবনার চিন্তার কাঠামোকে চিনিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

রাক্ষসজাতি তথা শিক্ষিত অনার্য গোষ্ঠী সম্পর্কে মনে পড়ে মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'রাক্ষস খোক্কস'[৮১] গ্রন্থের বুড়ো রাক্ষস[৮২] নামক লোককথাটি। বনবাসী শিশু রাজকন্যাকে বৃদ্ধ রাক্ষসপতি পালন করেছে পিতার নিরাপত্তায়, মাতার মমত্বে, শুধু তাই নয়, তার বিবাহ দিয়েছে আর্যগোষ্ঠীরই এক তরুণ নৃপতির সঙ্গে "মেয়ের বিয়ে দিয়ে একলা মনের দুঃখে সে মরে গেল"[৮৩] কন্যার বিচ্ছেদে কাতর

পিতার এই ইচ্ছামৃত্যুর দৃষ্টান্ত অসাধারণ। এইভাবে কল্পিত ভয়ঙ্করত্ব ভেদ করে, বর্বরত্বের খোলস পরিত্যাগ করে যে মহানুভবতার পরিচয়টি বুড়ো রাক্ষস দিয়েছে তার ফলে সমগ্র রাক্ষস-জাতিই মহিমান্বিত হয়েছে। এই ইতিবাচক ভাবনাই বাংলার লোককথাকে অমর করেছে।

রাজ্যের সীমানা, বিস্তৃতি

বাংলা লোককথার রাজ্যগুলি ক্ষুদ্র অনেকটা, গোষ্ঠী রাজ্যের মতো। এক একটি জনপদকে আশ্রয় করে এক একটি বৃহত্তর কৌমসমাজ গড়ে উঠত। 'মালঞ্চমালা' গল্পে 'বারো রাজ্য তের রাজগি'[৮৫]—এর উল্লেখ পাই রাজা কিংবা রাজপুত্র দুদিন ঘোড়া ছুটিয়েই পার হয়ে যায় নিজ রাজ্যের সীমানা—

—ছুটেন ছুটেন রাজপুত্র, এক রাজ্য ছাড়িয়া আর রাজ্যে,—তবু রাক্ষসী পিছু ছাড়ে না[৮৬]

নিশিপ্রভাতেই কন্যা, কুমার এক রাজার রাজ্য ছাড়াইয়া আর এক রাজার রাজ্যে গিয়া পড়িলেন।[৮৭]

কোন রাজ্যই সম্পূর্ণ জনপদ নয়, মাঠ, গহন অরণ্য আর বিশাল পাহাড়ের নির্জনতা রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার নিখুঁত পরিমিতিকে ব্যাহত করেছে—

—শীতরাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন, রাজ্যের সকল বন ঘুরিয়া খুঁজিয়া একটাও হরিণ যে পাওয়া গেল না। [৮৮]

—দেখিতে দেখিতে পাহাড় বনের ময়দানে ক্রোশ পাথার জুড়িয়া মদন কুমারের কাণাৎ পড়িয়া গেল।[৮৯]

বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রও বারংবার হাতছানি দিয়েছে রাজ্যকে। বাণিজ্যিক কারণে বটেই, এছাড়াও বহু রাজা সমুদ্রের জলে নির্মাণ করতেন সৌধ—

চারিদিকে হুম্‌হাম্ সমুদ্রের জলের ডাক — মধ্যে মধুমালার ঘর—সমুদ্রের জলে ভাসে পুরী একেশ্বর।[৯০]

কখনো দেশের নদীজলে ভাসমান ময়ূরপঙ্খী পথ-ভুলে পড়ত সমুদ্রে—

'ময়ূরপঙ্খী সারারাত ছুটিয়া ছুটিয়া ভোঁরে রাঙ্গা নদীর জলে গিয়া পড়িল।...মাঝিরা দিক হারাইল, পাঁচময়ূরপঙ্খী ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রে গিয়া পড়িল।'[৯১]

এই বর্ণনা স্মরণ করায় হুগলী নদীর পলিপুষ্ট দক্ষিণ বঙ্গকে। অনুমানটি আরো জোরদার হয়ে ওঠে, যখন দেখি সমুদ্রের ঘূর্ণি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বুদ্ধু "মাঝিদিগে বলিল উত্তরদিকে পাল তুলিয়া দে।"[৯২] আর—

"দেখিতে দেখিতে ময়ূরপঙ্খী সমুদ্র ছাড়াইয়া এক নদীতে আসিয়া পড়িল! নদীর জল যেন টল্‌টল্ ছল্‌ছল্ করিতেছে। দুই পাড়ে আম কাঁঠালের হাজার গাছ।"[৯৩] পলিমাতৃক শ্যাম-ধরণী-সরসা-বঙ্গদেশেই এমন চিত্র পাই।

সমুদ্রের মতো বারংবার হাতছানি দিয়েছে উত্তরের পাহাড়। উত্তর পূব, পূবের উত্তর

মায়াপাহাড় আছে।[৯৪] সেই দুধ-মুকুট ধবল পাহাড়ের ঝকঝকে গজমতি [৯৫] সংগ্রহ করে নিজের রাজ্যে নিয়ে এসেছে 'শীত-বসন্ত', গল্পে ছোট ভাই বসন্ত।

বলা যায় তীব্র অনুসন্ধিৎসা, দেশ ভ্রমণের পিপাসাই রাজবংশীয়দের গতিবিধি কোন সঙ্কীর্ণ সীমায় বেঁধে রাখেনি।

অবশ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সেই ঊষালগ্নে এক কৌম সমাজের সঙ্গে অপর কৌম সমাজের বিরোধও ঘটেছে—

'রাজপুত্রদের ময়ূরপঙ্খী যাইতে যাইতে তিন বুড়ীর রাজ্যে গিয়া পৌঁছিল। অমনি তিন বুড়ীর তিন বুড়ী পাইক আসিয়া নৌকা আটকাইল।'[৯৬]

দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে নিজ রাজ্যের সীমানা বিস্তারে এবং অন্যান্য কৌমপ্রধানদের পদানত করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে শীত-রাজা।

—"রাজা হইয়া শীত, আজ এ রাজাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য নেন, কাল ও রাজাকে হারাইয়া দিয়া তাহার রাজ্য আনেন, আজ মৃগয়া করেন, কাল দিগ্বিজয়ে যান—এই রকমে দিন যায়।" (শীত-বসন্ত)

বিবাহ উপলক্ষে কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ রাজত্বের কিয়দংশ প্রদত্ত হত। বিস্তৃত হত পাত্রপক্ষের রাজ্য সীমানা। 'মধুমালা' গল্পে মদনকুমারকে তাম্বুল রাজা এমনই যৌতুক দিয়েছে—

রাজা ধনরত্ন, মণি-মাণিক্য, জলা জঙ্গাল পাট-পাটন বারো বায়ান্ন সত্তর-কুড়ি রাজত্ব-রাজগী যৌতুক দিয়া.....শুভক্ষণ ঊষায় জামাই কন্যা তুলিয়া দিলেন।[৯৯]

কখনো বা একটি মাত্র কন্যা সন্তানের পিতা তাঁর সম্পূর্ণ রাজ্যের শাসনভারই অর্পণ করতেন জামাতার প্রতি—

তখন রাজাশ্বশুর, রাণী শাশুড়ী জামাই-বেয়াইকে রাজ্য দিয়া তপস্যায় গেলেন। (দেড় আঙুলে)[১০০]

অপেক্ষাকৃত আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পটভূমিতে একটি গল্প গড়ে উঠেছে 'সরকারের ছেলে'। [১০১] সেখানে নগরের রাজা রাজধনকে জমি জরিপকারী পদে নিযুক্ত করেছে—

"কাজ এই—এই শহরে মোট কতগুলি রাস্তা আছে, কোন্ রাস্তা কতটা লম্বা, কতটা চওড়া, কোন্ রাস্তার উপর কটা বাড়ী আছে, কোন্ বাড়ীটি কত বড়—এই সব মাপিয়া আসিয়া আমায় বলিতে হইবে।"[১০২] বলা যায় ক্রম অগ্রসরমান সভ্যতায় জীবনযাত্রা যত জটিল হয়েছে, ততই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও সেই সম্পর্কিত নিরাপত্তার প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে। লোককথা ক্রমবিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরে নি ঠিকই, তবু টুকরো ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রাচীন কৌমতন্ত্র, নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় সভ্যতার বিস্তৃতিই কেবল আলোকিত করে নি, শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে অধীনস্থ প্রজাদের সম্পর্ক শাসননীতি ইত্যাদিরও পর্যাপ্ত উপকরণের ইঙ্গিত দিয়েছে।

রাজা-প্রজার সম্পর্ক

বাংলা লোককথায় প্রজাদের নিকট রাজা ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় প্রভু। 'পুষ্পমালা'[১০৩] গল্পে কোটালিনীকে বলতে শোনা যায়, 'রাণী দিদি, দেবতা তোমরা'[১০৪]—এই স্বাভাবিক ভীতিমিশ্রিত সম্ভ্রম বোধই রাজাপ্রজার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। সেই দূরত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল সঙ্কীর্ণমনা কতিপয় রাজন্য বর্গের গর্বিত আভিজাত্য বোধে। রাজা-প্রজার এই ব্যবধান প্রজাকূলের মনে যে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল, সেই ক্ষোভ স্পষ্ট রূপ পেয়েছে মালঞ্চমালা গল্পে কোটালনীর উক্তিতে—"কুঁড়ে বেঁধে কুঁড়েয় আছি, তার তলেও রাজার হাঁচি।"[১০৫]

এই সদাসন্ত্রস্ত মনোভাবের বশবর্তী হয়েছে 'মালঞ্চমালা' গল্পে কোন পাল্কীবাহকই মালির পুত্রকে (প্রকৃতপক্ষে রাজপুত্র চন্দ্রমাণিক) দোল-চৌদোলে বহন করতে রাজী হয়নি। কারণ উক্ত যানগুলি রাজকীয়, একমাত্র রাজবংশীয়দের ব্যবহার্য।[১০৬] এখানেই শেষ নয়, মালীপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ তখনই সম্ভব যদি "মালীর ছেলে বারো বৎসর শিকল গলায় পরে।"[১০৭]

প্রজাবর্গের অধিকারের এই সীমাবদ্ধতা অন্যত্রও প্রকট। মণিমুক্তা মোহর ইত্যাদির মালিকানাও একমাত্র রাজার। তাই সৎপথে স্বীয় কর্মদক্ষতার অর্জিত সহস্র মোহরও রাজভাণ্ডারে বাধ্যতামূলক ভাবে অর্পণ করতে হয়েছে, "দেবতার লোভ"[১০৮] ইত্যাদি গল্পে। পরিবর্তে অবশ্য মোহরের উপার্জনকারী সমপরিমাণ টাকা অথবা কড়ি লাভ করেছে।

প্রজারা বহুক্ষেত্রেই খেয়ালী রাজকোষের শিকার হয়েছে। ইতুর ব্রতকথাটিতে প্রিয়তমা রাণী উমনোর শারীরিক আঘাত লাগায় শাস্তি ভোগ করেছে অসহায় প্রজাবৃন্দ। রাজা হুকুম দিয়েছেন"আঠারো হাড়ীর মাথা আন, আর তাদের মা-বুড়ীর চোখ উপড়ে তোল।"[১০৯]

শিথিল-চরিত্র শাসকের লোলুপ দৃষ্টি রেহাই দেয়নি দরিদ্র প্রজার সুন্দরী স্ত্রীকেও। 'The story of the Bull'[১১০] গল্পে গফুরের যুবতী স্ত্রীকে নিজ কুক্ষিগত করতে চেয়েছেন কামার্ত রাজা—

'How can the wife of a poor subject of mine have feet more beautiful than the face of my queen! All right I must have that girl in my palace.'[১১১]

নিজ নির্বুদ্ধিতা-জনিত খেসারতের যে মূল্য রাজাকে দিতে হয়েছে, প্রজাদের কাছ থেকে সেই ক্ষতির দ্বিগুণ অর্থ আদায় করতেও পশ্চাৎপদ নয় স্বার্থপর শাসক। তাঁতীর বুদ্ধি[১১২] গল্পে রুগ্ন ঘোড়াটি হাজার টাকামূল্যে ক্রয় করে রাজা পশ্চাৎতাপ করেছেন এবং পরের ঘোড়াটিকে রাজ্যে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন "যার বাড়ীর সামনে রুগ্ন ঘোড়াটা মারা যাবে, সে দেবে হাজার টাকা।"[১১৩]

'রাজার ভাগ্যে খাই'[১১৪] প্রত্যক্ষভাবেই এই মতবাদে বিশ্বাসী লোককথার প্রজাবর্গ এবং প্রজাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক রূপে রাজন্যগণের আত্মম্ভরিতাও অসীম। সে কারণেই এই

মতের প্রতিবাদী বিরোধীদের অর্থাৎ যারা জীবনের ঘটমান ফলাফলের ক্ষেত্রে নিজ ভাগ্য অথবা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রী শক্তিকে স্বীকার করেছে তাদের কপালে জুটেছে নির্বাসন দণ্ড।[১১৫]

স্বার্থপর সর্বগ্রাসী মনোভাবের উগ্ররূপ ফুটেছে টুনটুনি আর রাজার কথা[১১৬] গল্পে। প্রয়োজন অতিরিক্ত ধন রক্ষায় রাজা বিব্রত, অথচ তার থেকে মাত্র একটি টাকাও টুনটুনি পাখিকে দিতে অপারগ। হাস্যকরভাবে, বলশালী একাধিক পাইক গিয়ে টুনটুনির কাছ থেকে সেই টাকাটিই ছিনিয়ে আনেন, প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত রাজা টুনটুনিকে হত্যা করতেও পশ্চাৎপদ নয়।

সুবচনীর ব্রতকথাটিও রাজার লোভ ও স্বার্থপরতা তুলে ধরেছে।

রাজবাড়ীর হাঁসগুলির দেখাশোনার দায়িত্ব দুইখ্যার উপর। গরীব দুইখ্যা একদিন একটিমাত্র খোঁড়া হাঁস মেরে খায়। সেই অপরাধেই রাজার আদেশে মাতা-পুত্র উভয়কেই কারারুদ্ধ করা হয়। এইভাবে 'জনসজনপদসহিতসুখ'[১১৮] এই উদার ভাবনাটি বারংবার খণ্ডিত হয়েছে।

"বৃহদ্‌বঙ্গের রইদ্‌রাজার কিচ্ছা" নামক কথাটি সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের নির্মম দৃষ্টান্ত। মেঘরাজার পুত্র ও রৌদ্র রাজার কন্যা পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

রৌদ্র রাজা কন্যার আঁচলে বেঁধে দিয়েছে একফালি রোদ্ সেই রোদে ধান সেদ্ধ করে কন্যা রোজ ভাত খায় আর শ্বশুর-শাশুড়ীকে অন্নগ্রহণের জন্য সাধ্যসাধনা করে। কিন্তু অজানা বস্তুর স্বাদ গ্রহণে তারা ভীত। শেষে মন্ত্রী রাজ-আদেশে অন্নগ্রহণ করে; এরপরই সেই উৎকৃষ্ট দ্রব্য সমাদৃত হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রথাগত সংস্কার ত্যাগ করে রাজা স্বয়ং অন্নভক্ষণে অপারগ কিন্তু তাঁরই কঠোর আদেশে মন্ত্রী শত অনিচ্ছাতেও গ্রহণ করেছে অন্ন। অথচ আত্মরক্ষার্থে প্রজাদের মৃত্যুসম বিপদের দিকে এগিয়ে দিতেও রাজারা পশ্চাৎপদ নয়। এইভাবে কাপুরুষতার অযোগ্যতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে রাজারা।

'Phakir Chand'[১২১] গল্পেও দেখি বন্ধু মন্ত্রীপুত্র একের পর এক নিজ জীবন বিপন্ন করে রাজপুত্র ও তাঁর পরিণীত বধূর জীবন রক্ষা করেছেন। পরিবর্তে বন্ধু রাজপুত্র তাঁকে উপহার দিয়েছেন অবিশ্বাস আর লাঞ্ছনার তীক্ষ্ণ তীর—

"You must have some evil design, and you pretend that you have done this to save my life."[১২২]

মন্ত্রীপুত্র তখন নিদারুণ মনোকষ্ট নিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং ক্রমে ক্রমে প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়েছেন। লোককথায় এই ঘটনা যেন নিদারুণ বিশ্বস্ততার প্রতিদানে তীব্র অপমানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রজার রক্ষক রাজা 'সর্বত্র চোপহতান্ পিতেবানু গৃহ্নীয়াৎ' (৪/৩) অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভয় উপস্থিত হইলে রাজা ভয়পীড়িত প্রজাবর্গকে পিতার ন্যায় রক্ষানুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন[১২৪] এখানে প্রজাই রাজাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সকৃতজ্ঞ প্রতিদানের পরিবর্তে চূড়ান্ত অপমানই মন্ত্রীপুত্রকে শোকস্তব্ধ করেছে। তীব্র শোকই যেন মূক প্রতিবাদে জমাট বেঁধেছে প্রস্তরে।

অবশ্য সর্বদাই যে প্রজাবৃন্দ রাজার পদানত হয়েছে, তা নয়, সংঘবদ্ধ প্রজাশক্তি

বহুক্ষেত্রেই আপন অধিকার আদায় করতে সর্মথ হয়েছে। 'টুনটুনি আর নাপিতের কথা''[১২৫] গল্পে ফোড়া কাটবার শত অনুরোধও যখন রাজার নাপিত উপেক্ষা করে তখন ধৈর্যশীল টুনটুনি পাখিটি সংঘবদ্ধ করেছে তার অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ মশককুলকে। এই মশারই জোট আক্রমণে রাজা ও নাপিত উভয়েরই গর্ব এবং আভিজাত্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। রাজা বলে, নাপিত বেটার মাথা কাটি। নাপিত হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললে রক্ষে কর, টুনিদাদা। এস তোমার ফোড়া কাটি।'[১২৬]

''তাঁতীর বুদ্ধি''[১২৭] গল্পটিতে প্রজাদের কটূবুদ্ধি রাজচরিত্রের উন্নত মানের রূপান্তর সাধনেও সক্ষম হয়েছে।

রাজ আদেশের বিরোধিতা করে রাজার বিবেককে জাগ্রত করতে চেয়েছে প্রজার সৈন্যবর্গ—মালঞ্চমালা[১২৮] গল্পে আপন পুত্রবধূ মালঞ্চ যে রাজার জীবন রক্ষয়িত্রী, তাকেও প্রয়োজন ফুরোলে অস্বীকার করেছে রাজা—

রাজকন্যা পেলেম বউ/কোটালকন্যা ফেলে থোও[১২৯]

তখনি শত-সহস্র প্রজা অকৃতজ্ঞ রাজ-আদেশের বিরোধিতা করেছে, প্রাণ-ভয় উপেক্ষা করে—

ঠাট কটক বলিল মহারাজ। এই কোটালকন্যা ঘোড়া ধরিল, দেখ ঠাট কটক কথা কহিলে গর্দান যাবে। মহারাজ এই কোটালকন্যা বাঘ হুলাইল[১৩০]।

শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করার এই মানসিক দৃঢ়তার বীজ তাঁদের আত্মসম্মানের গভীরে উপ্ত। তাদের আত্ম-ক্ষমতা সম্পর্কে গণশক্তির সংঘবদ্ধ সার্মথ্য সম্পর্কে তারা যে যথেষ্ট সচেতন, তার নিখুঁত আলেখ্য উপস্থিত হয়েছে পুষ্পমালা' গল্পে। কোটালপুত্র চন্দন রাজকন্যার তর্জনীর শাসন উপেক্ষা করে সোচ্চার ঘোষণা করেছে—

'ডর কি রাজকন্যা আমার চৌদ্দ পুরুষের প্রাণে তোমার বাপের রাজ্য'[১৩২]।

প্রকৃতপক্ষে রাজা-প্রজার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যবর্তী বিভেদের রেখাটি রাজচিত্র ভেদেই পরিবর্তনশীল। রাজতন্ত্রের সেই শৈশবকালে বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে রাজা-প্রজার সম্পর্কটা সাত-সমুদ্র তের নদীর মতো দুস্তর হয়ে ওঠেনি। রাজ দরবারের চিত্রগুলিতে দেখা যায়— ''রাজ্য রম্‌রম্ সভা গম্‌গম লোকজন গুবগুব[১৩৩] অর্থাৎ প্রজাবলেই রাজার ঐশ্বর্য।''

বিপরীতক্রমে, রাজার ছত্রছায়ায় প্রজাবর্গও নিরাপদ তাই রাজার সন্তানহীনতায় সমগ্র প্রজাকুলই আসন্ন অভিভাবকহীন নিরাপত্তাহীনতায় কাতর হয়েছে। মধুমালা[১৩৪] মালঞ্চমালা[১৩৫] ইত্যাদি গল্পে দেখা যায়, অপুত্রক রাজার সন্তান কামনায় সমগ্র প্রজাবৃন্দই কাতর প্রার্থনায় জানিয়েছে বিধাতার নিকট--

—'রাজ্যের সকল লোক ছুটিয়া আসে—সোনার অঙ্গে জ্যোতি জ্বেলে, ওগো ঠাকুর কে আপনি। যে হন সে হন আঁতুড়ে রাজপুত্র মরে, তার কপালের লেখা আপনি খণ্ডাইয়া দিয়া যান।'[১৩৬]

সদ্য পিতৃত্বলাভের গৌরবময় আনন্দটুকুও সমগ্র প্রজার সঙ্গেই উপভোগ করতে রাজা কুণ্ঠিত নয়—

"সভাজন ডাকিয়া গলার হার খুলিয়া দিলেন জনপ্রজা ডাকিয়া রাজভাণ্ডার এলাইয়া দিলেন"[১৩৭]

প্রজাসেবার্থে হাট-বাট দীঘি-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার চিত্রও পাওয়া যায় 'মধুমালা' 'মালঞ্চমালা' ইত্যাদি লোককথায় —"রাজার রাজ্য উছলিয়া পড়ে। রাজাদের দেবতা মানুষ জন পশুপক্ষী খাওয়ান হাট বাট দীঘি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন।"[১৩৮]

বিশেষ পর্ব বা তিথি উপলক্ষ্যেও রাজভাণ্ডার থেকে অকাতর খাদ্য, অর্থ দানের চিত্রও সুলভ লোককথায়।

—আজ পিটাকুডুলির ব্রত, রাজ্যে পিটা বিলাইতে হয়।[১৩৯]

"পাটরাণী পাটেশ্বরী ধূপদীপ, বরণ ডালা এ দিয়া আপন পুরীর সাত সলিতা ঘিয়ের বাতি বাড়াইয়া দিলেন স্নান করিলেন, দান করিলেন"[১৪০]

প্রজাদের শান্তি নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতেও রাজা যেমন সদাসতর্ক থাকত তেমনি তাদের সামান্যতম ইচ্ছা পূর্ণ করতেও ওরা দ্বিধাহীন। "কিরণমালা"[১৪১] গল্পে তিনটি দরিদ্র মেয়ের ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সত্য করে তোলার তাগিদেই "রাজা তিন বোনের বড় বোনকে ঘেসেড়ার সঙ্গে বিবাহ দিলেন, মেজোটিকে সূপকারের সঙ্গে আর ছোটটিকে রাণী করিলেন।"[১৪২]

সম্পদের দুস্তর ব্যবধান ভুলে রাজা সাধারণ প্রজার নিমন্ত্রণও রক্ষা করেছে কিরণমালা[১৪৩] গল্পে। সেকারণেই প্রজারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগ দিয়েছে রাজপুরীর বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে "হাসি আহ্লাদে রাজপুরী ভরিয়া উঠিল সাত দিন সাতরাত্রি ধরিয়া মানুষেরা ক্ষীর ছানা ননী ছড়াইয়া ছিটাইয়া খাইল।"[১৪৪]

রাজলক্ষ্মী কুলবধূকে বরণ করে রাজপুরীতে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর সময়েও প্রজাবর্গই রাজার সঙ্গী।

—"রাজা রাজপুরীতে গিয়া ধন, রত্ন ভাণ্ডার খুলিয়া পথ জঙ্গল দীঘি সরোবর কাটাইয়া কাণাতের উপর কাণাৎ—দুই ধারে কড়ির সার সিঁদুরের পাতান—বাদ্য ভাণ্ড দিয়া আপনি সাত নাতি রাজ্যের লোক নিয়া দুয়ার দরজায় খাড়া আছেন"[১৪৫]

বহুক্ষেত্রে রাজপরিবারের সমস্যা সমাধানে প্রজার মীমাংসা চূড়ান্ত। "কিরণমালা"[১৪৬] লোককথাটিতে রাণী অলক্ষ্মী—এই অপরাধে 'রাজ্যের লোকেরা ডাকিনী রাণীকে উল্টা গাধায় উঠাইয়া মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়া আসিল।'[১৪৭]

'শঙ্খমালা'[১৪৮] গল্পে নীলরাজার মাতৃত্বের অধিকার জনিত সমস্যাটির বিচার সর্বপ্রজা সমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে—'দেব আছেন, ধর্ম আছেন এই সভার অসংখ্য সভাজন আছে—যে নীলের মা হও দুধের ধারে পরীক্ষা দাও।'[১৪৯]

—অর্থাৎ দেব এবং ধর্মের সঙ্গে সমান গুরুত্ব পেয়েছে জনমত।

গুণবান কর্মদক্ষ প্রজা রাজন্যবর্গের সম্মানের পাত্র। বিশেষত যে প্রজার নিকট রাজার ঋণ অশেষ; তারা পেত বিশেষ মর্যাদা। 'শঙ্খমালা'[১৫০] গল্পে যে কাঠুরিয়া নীল

রাজার মা শক্তিকে পিতৃসুলভ মমতায় আশ্রয় দিয়েছে, গল্পের শেষে সেই হয়েছে নগরকোটাল। [১৫১]

একই ভাবে মালঞ্চমালা[১৫২] গল্পেও যে কোটালের দৌলতে রাজা পুত্রবান হয়েছে, তাকে প্রথমে অবজ্ঞা করলেও কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে অনুশোচনা-দগ্ধ হৃদয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে, কোটালনীকে 'সমাদরে আনিয়া রাণীর সাথে পঞ্চব্যঞ্জন পারশ'[১৫৩] দিয়েছেন কোটালের বাড়ীর পথ "সোনার হীরায় বাঁধাইয়া দিয়াছেন"[১৫৪]

জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত বহু প্রজারই রাজকোষ থেকে নিয়মিত বৃত্তি পেত সে প্রসঙ্গ চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

বহু দরিদ্র অথচ গুণীপ্রজাকে নিষ্কর ভূমিদান এবং তাতে জীবিকায় অর্থ বা উপকরণের জোগান দেওয়াও নৃপতির বদান্যতারই পরিচায়ক। "The Match Making Jackal"[১৫৫]গল্পে বর্ণিত হয়েছে ঘটনাটি—

"Your Majesty need not to be surprised at my august master's soliquy. His palace is surrounded by a population of seven hundred weavers; to whom he has given rent free lands, and whose welfare he continually seeks."[১৫৬]

ঐ গল্পেই দরিদ্র প্রজাকুলের জন্য এমন কি অসুস্থ পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রসঙ্গটি এসেছে—

"Hospitals were established in several parts of the town of diseased subjects, sick and infirm animals"[১৫৭]

প্রজারা জীবিকাসূত্রে বিদেশে গমন করলে তার অরক্ষিত সম্পত্তি এবং পরিবারেও সুরক্ষার দায়িত্ব ও নিয়েছে রাজা—

"King Bhoj promised the Brahaman to take care of his family and property in his absence"[১৫৮] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজচরিত্রের সুখ দুঃখের সঙ্গে প্রজাদের সুখ-দুঃখকে একাত্ম করে মেলে ধরা হয়েছে—

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্।

—প্রজার সুখ উপস্থিত হইলে রাজারও সুখ হয় এবং প্রজার হিত হইলে তাহা রাজার হিত বলিয়া বিবেচ্য। যেটা রাজার নিজের হিত, সেটা তাহার হিত নহে, কিন্তু প্রজাবর্গের যেটা প্রিয়, সেটাই রাজার হিত। [১৫৯]

বাংলা লোককথার কয়েকটি যেন এই ভাবনারই প্রতিফলক। যেমন 'সম্পদ নারায়ণের ব্রতকথা'[১৬০]

প্রজার কাছে দেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদেই রাজা রাণী "আপনার সম্পদ পরকে দিলে/ পরের বিপত্তি ঘাড়ে নিলে,"[১৬১] শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে দারিদ্র্য গ্রাস করে নিল তাদের—

"রাজার হাতীশালায় হাতী মোলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া মোলো, দুইটা গোলা ঢলে পড়লো উরিপুরী দক্ষিণ দুরী ছারখার হলো।"[১৬২]

সাংঘাতিক বিপর্যস্ত জীবনকে বরণ করেও রাজার প্রত্যয়ের ভিত্‌টি ছিল মজবুত। এরই ফলে শেষ রক্ষা হয়েছে। সম্পদ নারায়ণ সন্তুষ্ট হয়েছে। সন্তান-সম প্রজাবর্গকে পিতৃসুলভ নিরাপত্তা দানে সফল হয়েছেন রাজা প্রমাণ দিয়েছে উদার হৃদয়ের।

বহু ক্ষেত্রেই অবশ্য কৃতজ্ঞ প্রজার কাছ থেকেও যথাযোগ্য প্রতিদান পেয়েছে রাজন্যবর্গ। রাজবংশীর কুটিল চক্রান্তে যখন সদ্যোজাত কন্যা বা পুত্র গভীর বনে পরিত্যক্ত হয়েছে তখন সাধারণ প্রজাই, জীবিকায় যারা কুম্ভকার কিংবা পুজারী ব্রাহ্মণ, তারাই পালন করেছে ভবিষ্যৎ বংশধরকে। "The Boy with Moon on his Forehead"[১৬৩] গল্পে কুমোরের পণির আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য সদ্যোজাত পুত্র কন্যাকে ফেলে দিয়েছিল নিষ্ঠুর ভগিনীত্রয়। কিন্তু সেই শিশু প্রাপ্ত হয়ে প্রতিবেশীদের নিকট কুমোর দম্পতির প্রতিক্রিয়া—

I had hardly hoped to have children at all. But now that the gods have given me these twins, may they receive the blessing of you all and live for ever. [১৬৪]

রাজপরিবারের নিরাশ্রয় লাঞ্ছিতা বধূকেও আশ্রয় দিয়েছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রজা। "The story of Sweet Basanta" গল্পে শ্বেতের স্ত্রী দুর্ভাগ্যতাড়িত জীবনে অসহ্য কষ্ট সহ্য করেছে। শেষে আশ্রয় লাভ করেছে ব্রাহ্মণের কাছে—

At the request of the old Brahman she related to him her whole story. The upshot was that she was received into the Brahman's family, where she was treated by the Brahman's wife as his own daughter' [১৬৬]

এই ভাবে লোককথায় রাজা-প্রজাদের সম্পর্ক এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রন্থিবদ্ধ যে পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্যের বোধ সম্পর্কে আরোপিত সচেতনতার কোন প্রয়োজনই হয় নি। উভয়েরই নিশ্চিত বিশ্বাস এটাই যে রাজার রাজ্যশাসন বা প্রজার নিরাপত্তা কোন একপক্ষের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। রাজ্যের রাজলক্ষ্মী যেমন রাজার চরিত্র ও শাসনে অচলা থাকেন, তেমনি রাজাদের খনিত পুষ্করিণীতেও জল ওঠে না যতক্ষণ না সাধারণ প্রজার সাহায্য পাওয়া যায় 'হাড়ী সাতজনা মালী সাত জনার' দৃষ্টি পাতেই নির্জলা পুকুরে জল উদ্ধার হলো—'হল্‌হল্‌ করতে লাগলো, কল্‌কল্‌ করতে লাগলো।'[১৬৭]

শুধুমাত্র হৃদ্যতা, সহানুভূতি অথবা বিপরীতক্রমে বলা যায় কেবল বিদ্বেষ প্রতিহিংসার একপেশে বন্ধনে রাজা-প্রজার সম্পর্ক অনড়তা পায়নি। দায়িত্ব, স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রয়োজন কর্তব্যবোধের সঙ্গেই স্বার্থপরতা বিদ্বেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক অমোঘ বিচিত্র শৃঙ্খলে রাজা এবং প্রজাকূল পরস্পরের সঙ্গে চিরতরে আবদ্ধ থেকেছে।

রাজ্য-শাসন নীতি

'ইন্দ্রযমস্থানমেতদ্‌ রাজানঃ প্রত্যক্ষ হেডপ্রসাদাঃ
তানবমন্যমানং দৈবোহপি দণ্ড স্পৃশ্যতি।১।১৩'[১৬৮]

রাজা ইন্দ্রস্থানীয় হইয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং যমস্থানীয় হইয়া নিগ্রহ বিধান করেন।' (অর্থশাস্ত্র)[১৬৯]

কৌটিল্যের মতের সমর্থনেই আমরা বলতে পারি রাজদণ্ডের প্রতাপ অব্যাহত। অপ্রতিহত নীতি প্রবর্তন, শাসন, সমর, বিচার ইত্যাদি সর্বপ্রকার দায় এ অধিকারের উৎস রাজা। প্রজাদের কাছে রাজা 'incarnation of justice'[১৭০]

দক্ষ ও সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য শাসনের পরিচয় প্রায়ই মেলে। 'নুলো রাক্ষসী', 'কিরণমালা' ইত্যাদি গল্পই প্রমাণ করে রাজ্য পরিচালনা কেবল রাজদরবারে চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকত না। দিবসকে অতিক্রম করে রাত্রির অন্ধকারেও ছদ্মবেশে রাজারা রাজ্যশাসনে অতন্দ্র—

"রাজার তো নামে মৃগয়া। দিনের বেলায় মৃগয়া করিতেন, রাত্রি হইলে ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিতেন।"[১৭১]

রাজ্যের সমৃদ্ধি, প্রজার শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক সফল রাজনীতির কূটকৌশলগুলি অপূর্ব পন্থায় বর্ণিত হয়েছে 'রাজপুত্র'[১৭২] গল্পে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ মহারাজ উপযুক্ত পুত্রকে যে উপদেশ দিয়েছে তা এইরকম।

প্রতিদিন প্রতিগ্রাসে মুড়া খাইও।
টাকা ধার দিয়া টাকা লইও না।
প্রজাকে সর্বদা শাসনে রাখিও।
আর,
তিন ঠেঙ্গে তে-মাথার কাছে বুদ্ধি নিও।[১৭৩]

প্রাথমিকভাবে রাজপুত্র গভীরভাবে চিন্তা না করেই অন্নের প্রতিটি গ্রাসের সঙ্গে মাছের মুড়ো খেয়েছে ফলে অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অকৃপণ হস্তে রাজভাণ্ডার উজাড় করে প্রজাদের অর্থ ধার দিয়েছে। এইরূপে— 'টাকা ধার দিতে দিতে সে টাকা আর ফেরত না লওয়াতে রাজার রাজভাণ্ডার শেষে একেবারে শূন্য হইয়া গেল।'[১৭৪]

প্রজাদের শাসনে রাখার পদ্ধতিটিও এইরূপ বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে—

'পাইক, সিপাই, সর্দার সকলে দিকে দিকে ছুটিল। সেই মুহূর্তে প্রজাদিগকে যে অবস্থায় যেখানে যাহাকে পাইল, সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া নিয়া গিয়া একেবারে বাঁধিয়া ফেলিল.....বাঁধিয়া ফেলিয়াই প্রজাদিগকে বেত, লাঠি, কীল লাথি—চটাচট চাপড়। ....প্রজারা দলে দলে ঘর ছাড়িল, বাড়ী ছাড়িল, শেষে রাজ্য ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল।[১৭৫]

'তিন ঠেঙ্গে'র কাছ থেকে বুদ্ধি নেওয়ার শর্ত পূরণ করার জন্য তিনপা বিশিষ্ট শেয়াল, গাধা, বিড়াল আর কুকুরকে হাজির করে হাস্যকর পরিস্থিতির অবতারণা করা হয়েছে।

এইভাবে যখন রাজ্য অবনতির প্রান্ত সীমায় উপস্থিত, তখনই রাজপুত্রের সাক্ষাৎ ঘটেছে এক 'উজ্জ্বল মূর্তি'[১৭৬] বৃদ্ধের সঙ্গে। জরাভারে ন্যুব্জ এবং লাঠির সাহায্যে চলে

তাই তিন-ঠেঙ্গে তে মাথা[১৭৭] অত্যন্ত সহজ ভাষায় অভিজ্ঞ বৃদ্ধ রাজপুত্রকে বুঝিয়েছে স্বর্গবাসী রাজার নির্দেশগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ। প্রতি গ্রাসে মুড়া খাওয়ার অর্থ অল্পে তুষ্টিসাধন,[১৭৮] টাকা ধার দিয়ে না নেওয়ার অর্থ-- "মনে রাখুন রাজপুত্র, পাইব না ভাবিয়াই কোন জিনিস রাখিয়া টাকা ধার দিতে হয়। তা হইলে টাকা না পান, টাকার বদলে সেই জিনিসটি থাকে।"[১৭৯]

আর, প্রজাকে শাসনে রাখার অর্থ সুশাসন, গুণীর সমাদর[১৮০] ইত্যাদি।

'The King's Cousin'[১৮১] গল্পে স্বয়ং রাজাই বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রজাদের জটিল জীবনতত্ত্ব বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিয়েছে ইতিহাসমালার একটি গল্পে[১৮২] আবার, তস্করই রাজাকে জীবনসত্য সম্পর্কে চকিত করে--- অভাবে, কৌতূহলে, বা স্বভাবে প্রত্যেক মানুষের অতীতে চৌর্যবৃত্তির কলঙ্কিত চিহ্নে মুদ্রিত, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।[১৮৩]

জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সক্রিয় বুদ্ধি চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছে এক রাজপুত্র 'সাদা ঘোড়া'[১৮৪] গল্পে। শত্রুপক্ষের অগণিত সৈন্যের সম্মুখে লোকবলে দুর্বল রাজপুত্র অল্প সংখ্যক সৈন্যের সহায়তায় যুদ্ধ করেছে অসাধারণ বীরত্বে। শুধু তাই নয়, সম্মুখ সমরে জয়লাভ অসম্ভব জেনে কূটকৌশল অবলম্বন করেছে--

"রাজকুমার একখানি প্রকাণ্ড পাথর সকলের অজ্ঞাতসারে সৈন্যদলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাহারা ভাবিল বুঝি তাহাদেরই পশ্চাদ্‌বর্তী সৈন্যগণ এই পাথর ফেলিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেই মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। পাঁচজন ব্যতীত সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হইল।"[১৮৫]

----এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি যে কেবল প্রবল প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করেছে; তাই নয়, রাজপুত্রের নিজ দেশকে সুদৃঢ় নিরাপত্তার স্থায়িত্বও দান করেছে।

সৎ রাজনীতির পক্ষপাতশূন্য বিচারের দৃষ্টান্ত রাজাগণের সুস্থ বিচারবোধকেই একাধিকবার মর্যাদা দান করেছে। বিশেষ করে নিজ অবাধ্য পুত্রদের শাস্তি দানেও তারা নির্মম। অবিনীত, অশিক্ষিত রাজপুত্রের শাসনে রাজ্যের অবস্থা যে 'কাষ্ঠমিব হিঘুণজগ্ধং'[১৮৬] অর্থাৎ, ঘুণধরা কাঠের মতোই হয়ে যায়, সে বিষয়ে রাজারা যথেষ্ট সচেতন। তাই সোনার কাটী রূপার কাটী[১৮৭] গল্পে অকর্মণ্য, কর্মবিমুখ রাজপুত্রের সম্পর্কে রাজার মনোভাব কেহই কিছু করেন না। কেবল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ান। দেখিয়া শুনিয়া রাজা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিয়া দিলেন-- "ছেলেরা খাইতে আসিলে ভাতের বদলে ছাই দিও"[১৮৮]

অথবা 'চূড়ামণির কিস্‌সা' গ্রন্থের অন্যতম গল্পে রাজপুত্র বলপূর্বক অধীনস্থ প্রজার নবপরিণীতা বধূর মুখ দর্শন করে। ক্রুদ্ধ নৃপতি শাস্তি-বিধান করে--

"অপর লোকের বৌ'র মুখ সোয়ারীর দরজা খুইলা দেইখল। এদের চাইরজনার একজনার বুদ্ধি নাই উন্নতির লক্ষণ নাই। ইহাদের দূর কইর‍্যা দেও।"[১৯০]

সৎশাসন বহুক্ষেত্রেই কূটবুদ্ধিকে অবলম্বন করে নিজ মর্যাদা রক্ষা করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

উল্লেখ করা যায় 'The Adventures of Two Thieves'[১৯১] গল্পটি। রাজ্যের সমস্ত লোক চোরের উৎপাতে নাজেহাল, সেই সময়ই রাজা ঘোষণা করে ছিল, যে লোক চোর ধরে দেবে সে পুরস্কৃত হবে। গল্পের শেষে আমরা দেখি পুরস্কারের লোভে ছোট চোরের ছেলেই সন্ধান দিয়েছে অপরাধীদের—তখন রাজার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে নিজ অঙ্গীকার রক্ষা ও ন্যায়বিচার দুই-ই সুসম্পন্ন হয়েছে—

'As the King had promised to give a lakh of rupees to the detective, the sum was placed before the son of the younger thief. But soon after he ordered four pits to be dug in the earth in which were buried alive with all sorts of thorns and thistle the elder thief and the younger thief and their two sons.'[১৯২]

শাসনকার্যে রাজাকে সাহায্য করত মন্ত্রী, উজীর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ। 'সরকারের ছেলে'[১৯৩] নামক লোককথাটিতে নব-নিযুক্ত কর্মচারী রামধনের যোগ্যতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে রাজাকে নানা পরামর্শ দিয়েছে মন্ত্রী। মন্ত্রীরই নির্ধারিত নানা সমস্যার সমাধানের ভার দেওয়া হয়েছে রামধনকে।

মন্ত্রীর অপর অভিধা সন্ধিকারী। (দৃষ্টান্ত—রমুনা-যমুনা[১৯৪]।) এ ব্রতকথাটিতে মন্ত্রী বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় রাজাদেশের বিরোধিতা করতেও দ্বিধা করেন নি--অবশ্যই রাজার অজ্ঞাতে। ক্রুদ্ধ নৃপতি যখন আপন স্ত্রী পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেয় তখন মন্ত্রী যথা সন্ধিকারীর চিন্তা--

'এখন বা রাজার মতিচ্ছন্ন হইছে, পরে আপশোষ করব, এখন বিলাইকুত্তা কাইটা তার রক্ত দিয়া রাজারে ছ্যান করাই।'[১৯৫]

সময় বিশেষে মন্ত্রী প্রখর জীবনসত্য সম্পর্কেও রাজাকে সচেতন করেছে। ইতিহাসমালার একটি গল্পে 'সকল হইতে বাক্য মিষ্ট'[১৯৬] এই তথ্যকে হাতে কলমে প্রমাণ করার জন্য মন্ত্রী এক অদ্ভুত উপায় স্থির করে। রাজাকে নিমন্ত্রণ করে প্রচুর মিষ্টান্ন সুখাদ্যের আয়োজন রাখা হয় রাজার সামনে। কিন্তু রাজার প্রতি অতিরুক্ষ ব্যবহার রাজাকে বিষম কুপিত করে তোলে। পরদিন পুনরায় নিমন্ত্রিত হল রাজা। এবার খাদ্য সামান্য, কিন্তু ব্যবহার অতি ভদ্র ও বিনীত। তখন রাজা প্রসন্ন মনে মিষ্ট বাক্যের গুণ উপলব্ধি করল।

রাজঅন্তঃপুরে রাজার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করেছে উজীর পুত্র। 'শঙ্খমালা'[১৯৭] গল্পে নীলমাণিক যখন প্রকৃত মাতৃপরিচয় জানার আগ্রহে বিভ্রান্ত, তখন উজীর পুত্রই উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছে--

'বারো ধনুক জমি মাপিয়া দিব, তোমার মা রাণী আর তোমার জননী-মা দুজনেই সেইখান হইতে দাঁড়াইয়া আপন আপন বুকের দুধ টিপিয়া দিবেন-- যার দুধের ধার না হেলিয়া না টলিয়া তোমার মুখে আসিয়া পড়িবে জানিবে তিনিই তোমার গর্ভধারিণী।'[১৯৮]

দেখা যাচ্ছে কেবল মন্ত্রীই নয়, মন্ত্রীপুত্র উজীর পুত্রও সুচিন্তিত পরামর্শে রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে। 'Phakirchand'[১৯৯] পাতালকন্যা মণিমালা[২০০] ইত্যাদি লোককথায়

মন্ত্রীপুত্রেরা শুধু পরামর্শদানই করেনি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ মেধা ও বাক্‌পটুতা এবং তৎপরতার সাহয্যে রাজার জীবনের যাবতীয় সমস্যা-সমাধানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে রাজার প্রাণ পর্যন্ত রক্ষা করেছে—

" At midnight when the royal couple were asleep, the minister's son perceived a snake of gigantic size enter the room through one of the water passages and climb up the tester frame of the bed. He rushed out of his hiding place, killed the serpent, cut it up in pieces, and put the pieces in the dish for holding betel-leaves and spices"[২০১]

রাজপুত্র, অর্থাৎ যে ভবিষ্যৎ রাজা, তার প্রাণ রক্ষার্থে আক্ষরিক অর্থেই নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে মন্ত্রীপুত্র।

অবশ্য, কৃতজ্ঞ রাজপুত্র নিজ পুত্রসন্তানদের হত্যা করে বন্ধু মন্ত্রীর জীবনদান করেছেন সেই রক্তস্পর্শে।

এইভাবে কর্তব্য দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতায় পারস্পরিক এমন এক সম্পর্ক রাজা ও মন্ত্রী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা রাজার-প্রজার নীরস কর্তব্যকে উপেক্ষা করে আদর্শ আত্মীয়তাকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সেই কারণেই 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা'[২০২] গল্পে নকল রাণী কাঁকনের হাত থেকে রাজা এবং রাজ্যকে উদ্ধারের জন্য কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে রাখাল—অকৃতজ্ঞ রাজার প্রতি কোন ক্ষোভ না রেখেই কেবল বন্ধু রাজার জীবন রক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। গল্প শেষে কৃতজ্ঞ রাজা মন্ত্রী করেছে রাখালকেই—

"তখন রাখাল সারাদিন মন্ত্রীর কাজ করেন, রাত্রে চাঁদের আলোতে আকাশ ভরিয়ে গেল, রাজাকে লইয়া গিয়া নদীর ধারে সেই গাছের তলায় বসিয়া সোনার বাঁশী বাজান। রাজা গলাগলি করিয়া মন্ত্রী বন্ধুর বাঁশী শোনেন।[২০৩]

পুষ্পমালা',[২০৪] 'মালঞ্চমালা'[২০৫] ইত্যাদি গল্পে দেখা যায় শাসনকার্যে সাধারণ জনসমাজ বহুক্ষেত্রেই স্বাধীন নির্ভীক মতামত প্রদান করেছে। 'কিরণমালা'[২০৬] গল্পে যেমন ডাকিনী রাণীকে প্রজারাই গাধার পিঠে চাপিয়ে রাজ্য পার করে দিয়েছে।[২০৭]

আবার পুষ্পমালা [২০৮] গল্পে সেই প্রজারাই পুষ্পমালাকে অভয় দিয়েছে— "হাঁ, মা রাজার বিচারে মাথা থাকিলে, তোমার সঙ্কটে দাঁড়াব।"[২০৯]

রাজাজ্ঞার বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণেও অধীনস্থ কর্মচারী নির্ভীকতার প্রমাণ দিয়েছে 'শীত বসন্ত'[২১০] গল্পে—

'খড়গ নামাইয়া রাখিয়া দুই রাজপুত্রের বাঁধন খুলিয়া দিয়া ছলছল চোখে জল্লাদ বলিল— 'রাজপুত্র' রাজার আজ্ঞা কি করিব কোলে-কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছি, সেই সোনার অঙ্গে আজ কিনা খড়গ ছোঁয়াইতে হইবে! আমি তা পারিব না রাজপুত্র। আমার কপালে যা থাকে থাকুক।'[২১০]

রাজ্যশাসনকার্যে পুরোহিত জ্যোতিষীর দাপটও কিছু কম নয়, সঙ্কটকালে তাদের

মতামতই চূড়ান্ত বিবেচিত হয়েছে একাধিকবার। 'মধুমালা'[২১২] গল্পে,'তখনি পুরুত পণ্ডিত যোগী জ্যোতিষী ডাকাইয়া রাজা সভায় বলেন—বারো বৎসরের তিন দিন বাকী কবাট খুলি কি—না খুলি?'[২১৩]

অনেক গনিয়া পাতিয়া যত জ্যোতিষী মত দিলেন না খুলিলে মদন যখন প্রাণ ত্যজে- -তখন কি করা? বারো বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—এখন, তিন দিন-- তা খুলুন'[২১৩] ঠিক এরকমই " The Lucky Rascal"[২১৪] গল্পে চোরের উপদ্রবে অতিষ্ট রাজা শরণ নিয়েছে জ্যোতিষীর-- We must cell in the aid of an astrologer[২১৫] জ্যোতিষীও দক্ষতার সঙ্গে গণনা করে চোরের অবস্থিতি নির্ণয় করেছে—

" He is in your garland weaver's house and at this moment is playing card is[২১৬]

সুনিয়ন্ত্রিত রাজকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রজাসমাজে আদেশ নির্দেশ সংবাদ জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে রাজকর্মচারী মারফৎ রাজার পরওয়ানা জারী করা হতো। 'সরকারের ছেলে'[২১৭] গল্পে—

"রামধন তখনই রাজার দপ্তর খান হইতে পরওয়ানা আর লোকজন দড়াদড়ি মাপিবার জিনিসপত্র সব লইয়া শহর মাপিতে বাহির হইয়া পড়িল।[২১৮]

রাজার তরফ থেকে সংবাদ, আদেশ নির্দেশ জারী করর ক্ষেত্রে ডঙ্কা বা ঢেঁড়ার ভূমিকাটিও গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে রাজা ঢেঁটরার দিলে, "রাজপুত্রকে যে ভাল করিবে, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তাকে দিব।[২১৯]

ডঙ্কা জয়ধ্বনি সূচক মাঙ্গলিক বার্তাবাহক হয়ে উঠেছে 'মালঞ্চমালা'[২২০] গল্পে—

'মালঞ্চমালার নামে রাজডঙ্কায় কাঠী পড়িল, রাজ্যে জয়-জয়।'[২২১]

দিনান্তে রাজপুরীতে প্রত্যাগত রাজপুরুষের আগমনী বার্তাও অন্তঃপুরে পৌঁছাত এই ডঙ্কার বাদ্যে—

"উজীরপুত্র বাপ আমার! মদনমনিকে চোখে চোখে রাখিও। সাঁঝের ডঙ্কা যেন রাজপুরীতে আসিয়া বাজে।[২২২]

কয়েকটি ক্ষেত্রে অসুস্থ রাজার অপারঙ্গমতায় অথবা রাজার অবর্তমানে রাণীই সুনিপুণ শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা[২২৩] গল্পে—

"সূচরাজার রাজসংসার অচল হইল--সূচরাজা মনের দুঃখে মাথা নামাইয়া বসিয়া থাকেন, রাণী কাঞ্চনমালা দুঃখে কোন রকমে রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।"[২২৪]

"The toll of Goail Hat"[২২৫] গল্পে রাণী রাজ্য পরিচালনা করে নিপুণভাবে। শুধু তাই নয়, 'সাধু'র কূটবুদ্ধির তারিফ করে আর যাবতীয় করও মকুব করে দেয়।

রাজনীতি প্রসঙ্গে কূটবুদ্ধি অপরিহার্য। প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে কূটনীতির সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের যে ভরপুর উত্তেজনাময় প্রতিযোগিতা, তার স্বাদ প্রায়ই অনুভব করে লোককথার শ্রোতা।

পাঁচ-তোলা কন্যা গল্পে'[২২৬]——

"এই বাদশার প্রতিবেশী ছিল আরেক বাদশা। সে একদিন চিঠি দিয়া পাঠাইল যে তাহার মহল পুষ্করিণী এই বাদশার মহল পুষ্করিণীকে দাওয়াত দিতেছে। অবিলম্বে আসিয়া সে যেন দাওয়াত খাইয়া যায়।"[২২৭]

বাদশাহের কনিষ্ঠ পুত্র এই নিমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে লিখে জানিয়েছে—

"আমাদের মহল পুষ্করিণী কিছুদিন যাবৎ বড়ই অসুস্থ। চলাফেরা করিতে পারেন না। হেকিম সাহেবও তাহাকে নড়াচড়া করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আপনার পুষ্করিণী যদিও মেহেরবাণী করিয়া তাঁহার দাওয়াত কবুল করেন তবে সব দিক দিয়েই ভাল।'[২২৮]

—বুদ্ধির এই চাপান-উতোর শেষ পর্যন্ত পরিণতি পেয়েছে শাহজাদা ও প্রতিবেশী রাজকন্যার বিবাহ বন্ধনে।

রাজার কূটবুদ্ধির শিকার কখনো বা তারই অধীনস্থ কর্মচারী। যেমন 'চড়াচড়ী' গল্পে স্বেচ্ছাচারী রাজা তারই দক্ষ মন্ত্রীকে এক অসঙ্গত অর্থহীন কাজের দায়িত্ব আরোপ করেছে—

"রাজামশাই একদিন জেদ ধরেছেন, পৃথিবীর তুলনায় তাঁর রাজ্য কতখানি তা মন্ত্রীমশাইকে বলতে হবে। না পারলে তাঁর গর্দান যাবে।"[২৩০]

এখানেও সমস্যার সমাধান করেছে মন্ত্রীকন্যা। তারই নির্দেশ মতো মন্ত্রী বলেছে—

"মহারাজ আপনার রাজ্য সমস্ত পৃথিবীর একলক্ষ ভাগের এক ভাগ। বিশ্বাস না করেন তো আপনি না হয় এ হিসাবে সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করে দেখুন।"[২৩১]

এই কৌশলী উত্তর রাজাকে জব্দ করেছে কিন্তু সুখী করেনি—

'সভার সমস্ত লোক হাঁ করে মন্ত্রীর মেয়ের বুদ্ধির গল্প শোনে আর প্রশংসা করে।....রাজা কিন্তু মনে মনে মন্ত্রীর মেয়ের উপর চটে রইলেন।'[২৩২]

—এই ক্রোধের মূলে হীন ঈর্ষাকাতর মনটি ধরা পড়েছে স্পষ্টভাবে, যে ঈর্ষার উৎস রাজার আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্খা।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে পক্ষীকুল। 'The Two Bridegrooms'[২৩৩] গল্পে রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্বক্ষণের সঙ্গী একটি তোতাপাখি। তোতাটি সর্বজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী।

'This bird was able to give true information about everything past, present and future and the Raja never undertook business of any importance without consulting it. Practically it was his chief Minister.'[২৩৪]

তোতাটি মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছে এবং প্রকৃত মন্ত্রণাদাতার ভূমিকাটিও সার্থক করে তুলেছে।

'The Story of A Hiraman' [২৩৫] গল্পের হীরামন পাখিটি রাজার বন্ধু, রক্ষক এবং পরামর্শদাতা। শুভচিন্তকের দায়িত্ব পালন করেছে। তারই নির্দেশিত পন্থায় রাজা লাভ

করেছে একটি টগ্‌বগে পক্ষীরাজ ঘোড়া এবং এক সুন্দরী রমণীরত্নকে। এমনকি দুর্ঘটনাবশত অন্ধ রাজার দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রত্যাবর্তিত হয়েছে এই পাখিটির দৌলতে—'That moment the hiraman flew across the oceans and rivers, came to the forest and applied the special balm to the sightless sockets of the king. The king opened his eyes and saw'.[২৩৬]

'রাজপুত্র'[২৩৭] গল্পেও দিক্‌ভ্রষ্ট হতবুদ্ধি নব্যরাজাকে সার্থক দিশা দেখিয়েছে শুকপাখি। "দেখ তোমরা যা করিতেছ, বোধ হয় রাজার কথার অর্থ—তা নয়। রাজপুত্র তুমি দেশভ্রমণে বাহির হও।"[২৩৮] দেশভ্রমণেই বাঞ্ছিত সাফল্য করায়ত্ত হয়েছে রাজপুত্রের।

রাজবংশীয়গণ যেখানে স্বয়ং পশুপক্ষীর দেহধারী সেখানেও কার্যকালে বিচক্ষণতার অভাব নেই। "কলাবতী রাজকন্যা" গল্পে প্রবৃত্তিতাড়িত অসংযমী মানব রাজপুত্রগণের বিপরীতে বাঁদর-পেঁচা বুদ্ধু-ভূতুম ধীরস্থির কর্তব্যনিষ্ঠ। অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে তাদের কোন অবদান লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু, কলাবতী রাজকন্যাকে লাভ করার ক্ষেত্রে বুদ্ধু ও ভূতুম যে বুদ্ধি শক্তি, তৎপরতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রমাণ রেখেছে তা ভবিষ্যতের দক্ষ রাজনীতিজ্ঞেরই পূর্বাভাস।

ঢোল ডগর কাঁধে,[২৪০] কাঁথা বুড়ী,[২৪১] অন্ধকুঠুরীর,[২৪২] হাত এড়িয়ে অজগরকে নিধন করে গাছের পাতার ফল এনে[২৪৩] বুদ্ধু প্রমাণ করেছে তার পৌরুষ ও দক্ষতা। তার এই নৈপুণ্য বাহ্যিক মর্কটাকৃতিকে ম্লান করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গল্পের শেষে তাই বুদ্ধু-ভূতুম হয়ে যায় বুধকুমার[২৪৪] আর রূপকুমার[২৪৫]। অর্থাৎ লোককথাটির মধ্য দিয়ে এই সত্যটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শারীরিক সৌন্দর্য শাসনকার্যের ক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ। শ্রী এবং প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও নিষ্ঠাই পারে স্বস্তির স্বর্গরাজ্য রচনা করতে।

পশুপক্ষীর রূপকে সফল রাজনীতিজ্ঞকে প্রতিষ্ঠা করা অথবা সুশাসনের ক্ষেত্রে, তাদের দ্বারাই সার্থক পন্থার দিকে ইঙ্গিত করা—এই তথ্যগুলি টোটেম নির্ভর সভ্যতারই স্মারক।

যে পশুর উপর আদিম মানব জীবনধারণের প্রতি মুহূর্তে নির্ভরশীল ছিল, যে পশুর পায়ের ক্ষিপ্রগতি, প্রজ্ঞা, ধূর্ততার সঙ্গে নিজ প্রকৃতির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল, তাদেরই পথদ্রষ্টা গুরুত্ব আসনে অধিষ্ঠিত করে কৃতজ্ঞ স্মৃতিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।

দক্ষ সুশাসনের বৈপরীত্যে প্রকট হয়ে উঠেছে দুর্বল শাসনরীতি, অরাজকতার দৌরাত্ম্য। মনু বলেন—

'সমীক্ষ্য সধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ।।'[২৪৬]

"দণ্ড যদি সম্যক বিবেচিত হইয়া ধৃত হয় তবে প্রজাসমুদয় সুখে থাকে। পরন্তু অন্যথা হইলে অর্থাৎ অবিচারপূর্বক সেই দণ্ডবিহিত হইলে সকলকেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।"[২৪৭]

অপদার্থ রাজনীতির উৎকট চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী[২৪৮]

গল্পে। সেখানে 'মুড়ি মিশ্রির এক দর'।[২৪৯] দেওয়াল চাপা পড়ে সিঁধেল চোর মারা যাওয়ায় ক্রমান্বয়ে প্রাণদণ্ড দণ্ডিত হয় কোটাল, গৃহস্থ, মালী, কুমোর প্রমুখ চুরির সঙ্গে সম্পর্কহীন নির্দোষ ব্যক্তিগণ। পারস্পরিক দোষারোপে উক্ত চরিত্রেরা সকলেই রক্ষা পায় আর প্রাণদণ্ডের আদেশে দণ্ডিত হয় নিরীহ কাঠুরিয়া। কিন্তু মূর্খ রাজ্যশাসনের হাস্যকররীতি অনুসারে অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি হয় না, শূলের মাপ অনুযায়ী উপযুক্ত নাগরিক নির্বাচন করে তাকে শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ডাদেশ সার্থক করে তোলা হয়। অবশ্য গল্প শেষে দেখা যায় 'মাহেন্দ্রক্ষণে'[২৫০] প্রোথিত হওয়া শূলে আরোহণের লোভ রাজা ছাড়তে পারেননি।

"আমার হুকুমে আমার রাজ্যে শূল পোঁতা হইয়াছে। আর সশরীরে স্বর্গে যাইবার অদৃষ্ট আমার মত রাজা ছাড়া আর কারও হইতেই পারে না"[২৫১]—অবিমৃষ্যকারিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মূর্খ নৃপতির আত্মবিনাশ ঘটেছে।

কখনো রাজা মূর্খ নয়, কিন্তু চরম অকৃতজ্ঞ। 'মালঞ্চমালা' গল্পে যে মালঞ্চ শিশু রাজপুত্রের পাণিগ্রহণ করে তাকে নবজীবন দান করেছে, তার প্রতিদান বড় মর্মান্তিক—

"তার আগেই কোটাল কন্যার দুই চোক উপড়াইয়া লোহার শলার আগুনে পোড়াইলেন।—দর দর রক্ত পড়ে! —কোটাল কন্যাকে বনবাস নিয়া যায়।"[২৫৩]

শুধু এই ঘটনাই নয়, পাগল ঘোড়া হরিকালীর[২৫৪] রাশ ধরে তাকে শান্ত করেছে কোটালকন্যা মালঞ্চ, বাঘের আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা করেছে পরিবর্তে রাজার প্রতিক্রিয়া—

"কোটালিনীকে পাঁচ পয়জার দিয়া বাহির করিয়া কোটালিনীকে, কোটালকন্যাকে, রাজা পাইক দিয়া সিপাই দিয়া দূর করিয়া খেদাইয়া দিলেন।"[২৫৫]

এই আচরণ যেমন রাজার কৃতঘ্ন স্বার্থপর রূপটিকে নগ্ন করেছে ঠিক তেমনি শাসনকার্যে ও প্রজারক্ষণে রাজার অপারঙ্গমতাকেও আবৃত করতে পারেনি।

রাজা যেখানে স্ত্রৈণ, সেখানে মাত্রাছাড়া অরাজকতার চিহ্ন প্রকট। 'কলাবতী রাজকন্যা'[২৫৬] গল্পে স্ত্রৈণ অসহায় রাজার "চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল গড়াইয়া"[২৫৭] পড়ে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবিধানে সে নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র। তাই অবাধ্য দুর্বিনীত সন্তানের নিয়ন্ত্রণে অক্ষম—

"পাঁচ রাজপুত্রেরা বেড়াইতে বাহির হইয়া—আজ ইহাকে মারে, কাল উহাকে মারে, আজ ইহার গর্দান নেয়, কাল উহার গর্দান নেয়, রাজ্যের লোক তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিল।"[২৫৮]

'শীত-বসন্ত'[২৫৯] গল্পে সুয়োরাণীর ডরে থর্ থর্ থর্ কম্পমান[২৬০] রাজা আপন পুত্রবধের আদেশ দেন দ্বিধাহীনকণ্ঠে—

অমনি রাজা জল্লাদকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন—"শীত-বসন্তকে কাটিয়া রাণীকে রক্ত আনিয়া দাও।"[২৬১]

লুপ্তপ্রায় হৃতশ্রী আত্মসম্মানরক্ষার তাগিদে আপনার নির্দোষ কন্যা বা স্ত্রীকে বনবাসের চূড়ান্ত দণ্ড দেওয়ার নিষ্ঠুর কর্মটিও সম্পন্ন করেছে 'চড়াচড়ী'[২৬২], ভাজাপিঠে[২৬৩] কিরণমালা[২৬৪] ইত্যাদি গল্পের রাজমহোদয়রা।

সাত ভাই চম্পা [২৬৫] গল্পে সপত্নী ছয় রাণীরা সদ্যোজাত সন্তানগুলিকে হত্যা করে "হাত মুছিয়া মুখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কতগুলি ব্যাঙের ছাড়া ইঁদুর ছানা আনিয়া দেখাইল। দেখিয়া রাজা আগুন হইয়া ছোট রাণীকে রাজপুরীর বাহির করিয়া দিলেন।"[২৬৬]

শাসনকার্যে দীর্ঘসূত্রিতার রূপটিও গোপন থাকেনি 'The Ghost Brahman' [২৬৭] গল্পে। রাজার ধর্ম "'রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য'[২৬৮] অর্থাৎ সকল প্রজার নিরাপত্তা বিধান। কিন্তু উক্ত গল্পটিতে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণে রাজা ব্যর্থ। কুলীন ব্রাহ্মণটি কর্মসূত্রে বিদেশ গমন করলে ব্রাহ্মণের অবয়বধারী একটি ভূত তার বাড়ী দখল করে। পরে ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্তন করলে প্রকৃত পরিচয় সংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা অরাজকতার ভয়ঙ্করত্বকেই ফুটিয়ে তুলেছে যেখানে স্থাবর-অস্থাবর কোন সম্পত্তিরই নিরাপত্তা নেই। অবস্থা চরমে ওঠে যখন স্বয়ং রাজাও কোনও মীমাংসা করতে পারে না। দুর্বলতা ঢাকার হীন প্রচেষ্টাই অবলম্বন করে—

"Day after day the Brahman went to the king and besought him...and the king not knowing what to say every time, put him off to the following day..."[২৬৯]

এরই ফলে অসহায় ব্রাহ্মণের প্রতিক্রিয়া 'What a wicked world this is: I am driven from own house, and another fellow, has taken possession of my house and of my wife; And what a king this is; He does not do justice.'[২৭০]

—এই হাহাকার যেন অপদার্থ প্রভুর অধীনস্থ ছিন্নমূল মানুষের চিরন্তন বিলাপ।

সমস্যার হাল ধরেছে রাজ্যের এক সাধারণ রাখাল। রাজার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সে প্রয়োগ করেছে ব্যবহারিক বুদ্ধি যার ভিত্তি একটি সাধারণত বিশ্বাস। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের অবয়বধারী ভূত দুজনকেই সে একটি কলসীর ভেতর ঢুকতে আদেশ করে। বিদেহী আত্মাটি ঢুকে যায় পাত্রটির মধ্যে কিঁন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়, ক্ষুব্ধ হয়—

'You are a neartherd and your intellect is that of a neartherd'[২৭১]

রাখাল-রাজার প্রতি এই যে বিদ্রুপবাণী উচ্চারণ, তা ব্রাহ্মণেরই অজ্ঞতা ও অহংকারেরই প্রকাশ। ইচ্ছামতো দেহাকৃতির পরিবর্তনের অক্ষমতাই যে মনুষ্যোচিত স্বাভাবিক আচরণ তা ব্রাহ্মণের বোধগম্য হয়নি। কিন্তু রাখাল রাজা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গেই ভূতকে বোতল বন্দি করেছে। এই ঘটনা রাজার বিচার-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করেছে ঠিকই, সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাসও দিয়েছে যে দেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিয়ন্ত্রক সাধারণ প্রজাকুলের মধ্য থেকে আবির্ভূত হতে পারে।

রাজকর্মচারীগণও রাজার অক্ষমতার সুযোগে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করেছে পূর্ণমাত্রায়।

শঙ্খমালা গল্পে নীলরাজা নেহাৎই বারো বৎসর বয়স্ক বালকমাত্র। এই অপরিণতমনস্কতার সুযোগে রাজসিপাইরা অবাধে লুঠতরাজ চালিয়েছে। রেহাই পায়নি বিদেশী বণিকের দল। রাজার ঘাটে ডঙ্কা মারার অপরাধে সিপাই কুল গর্জে উঠেছে—

"কে রে বেটা মর্দানা রাজার ঘাটে ডঙ্কা মার বেটা কয়টা ঘাড়ে গর্দানা? ...মহারাজ হুকুম দিন"

'যত সিপাই শঙ্খ সাধুর হাতে বাঁধন পায়ে ছাদন দিয়া রাজসভায় আনিয়া হাজির করিল।'[২৭৩]

রাজার বিচারের রায় সৈনিকদের অন্যায় উল্লাসে ঘৃতাহুতি দিয়েছে—

"যত বেসাতি আটক দাও, সাধুকে ফাটক দাও, অমনি হাজার সিপাই ছুটিয়া গিয়া সাধুর ডিঙ্গা মধুকর শুকনচড়ায় উঠাইয়া থুইল, বাস-বেসাতি-পসরা লুটিয়া নিয়া রাজভাণ্ডারে স্তূপ দিল।"[২৭৪]

রাজকর্মচারীদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা উচ্চপদের জন্য ঈর্ষাকাতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অযথা জটিলতা সৃষ্টি করেছে শাসনকার্যে। 'What will Co-operation not effect' গল্পে ভগবান নামক কর্মচারীর বিশ্বস্ততায় খুশী হয়ে তাকে দেহরক্ষী পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে, নিজ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন, তখনই পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীর স্বার্থে ঘা লাগল। এই প্রসঙ্গে গল্পটিতে এ তথ্যও ফুটে উঠেছে যে অর্থের লালসার সামনে সৎ শাসনের নীতিবোধ অতি ভঙ্গুর সে কারণেই উৎকোচের লোভ দেখিয়ে কুটিলমন্ত্রী অতি সহজেই বশীভূত করে ফেলে প্রত্যেকটি কর্মীকে ফলে ভগবান দেখা করতে এলে নতুন দ্বাররক্ষী অনায়াসে বলতে থাকে—

'The Raja is very angry with you and has strictly forbidden me to allow you to enter the palace. Not only that, he has given orders that, as soon as you appear you are to be expelled from the city.'[২৭৬]

এই মিথ্যাচারের চক্রে রাজার কোন ভূমিকাই নেই। রাজার সম্পূর্ণ অগোচরে মসৃণভাবে রাজাদেশের নামে স্বৈরাচারী কর্মচারীগণ তাদের স্বার্থজাল বিস্তার করত এবং রাজা নিজের অগোচরেই তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হত।

অবশ্য অসাধু রাজচরিত্রেরও অভাব নেই এবং তাদের স্বেচ্ছাচারে মন্ত্রণা দেবার মতো দুষ্ট বুদ্ধিধারী প্রজাও উপস্থিত। 'The story of the Bull'[২৭৭] গল্পে দেখা যায় একটি নাপিত রাজার কুমন্ত্রণাদাতা।

'The evil advice of the barber made the king lose all sense of justice and fairness.'

অবশ্য লোককথার প্রায় সর্বত্রই অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটে। রাজাও নাপিতের কুচক্রী মনোভাবটি অবগত হয়েছে গল্প শেষে। ফলে সৎপ্রজা গফুর ও রাজার মধ্যে হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা সুশাসনের চির অন্বিষ্ট।

সে কারণেই সর্বপ্রকার দুর্নীতি, অরাজকতাকে অতিক্রম করে যে মহামন্ত্রটি রাজ্য শাসনের ভিতটি মজবুত করেছে, মনুর ভাষায় সেটি এই প্রকার—

ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দিষ্ট ফলভোক্তাহি রাজা ধর্ম্মেন যুজ্যতে।।[২৭৯]

অর্থাৎ সর্বধর্মাপেক্ষা প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম, শাস্ত্রোক্ত-করাদিভোক্তা রাজা সর্বতোভাবে তৎপ্রতিপালনে বাধ্য।[২৮০]

কোজাগরী-লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায় নিজ প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রক্ষার্থে রাজা কামারের তৈরী লোহার অলক্ষ্মী মূর্তি কিনে নেয়। আর অলক্ষ্মীর স্পর্শ একে একে রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, যশোলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী রাজাকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ধর্ম যখন রাজ্য ত্যাগের মনস্থ করেন, রাজার তীব্র প্রতিক্রিয়া—

"ধর্ম্মরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অলক্ষ্মীকে কিনেছি। ধর্ম্ম আমি কেমন করে ছাড়বো? আমি ধর্ম্মের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছি, সুতরাং আপনার যাওয়া হবে না।"[২৮২]

রাজার কথায় ধর্ম আর যেতে পারলেন না। রাজার আত্মসুখ এবং নিরাপত্তা নিতান্তই গৌণ, রাজার প্রথম এবং একমাত্র কর্তব্য—সর্বস্যাস্য যথান্যায় কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম।।[২৮৩]

অর্থাৎ আপন আপন প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ—এই বিশ্বাস থেকেই রাজা স্বয়ং ধর্মকেই ন্যায়মার্গ দর্শন করানোর শক্তিটুকু সংগ্রহ করেছে, শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে বোধটি সর্বকালের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

সিংহাসনের উত্তরাধিকার

সিংহাসনের উত্তরাধিকার সাধারণত পুরুষানুক্রমিক! 'রাজার মৃত্যুর পর কতক দিন গিয়াছে। শোক দুঃখ ক্রমে দূর হইয়াছে। রাজপুত্র এখন রাজা হইয়াছেন।'[২৮৪]

বংশধর যখন একমাত্র সন্তান, তখন তার প্রতি যত্নেরও সীমা নেই। 'মধুমালা'[২৮৫] গল্পে রাজপুত্র মদনকুমার নিরাপত্তার কারণে বারো বৎসর যাবৎ পাতালপুরীর অধিবাসী। অধৈর্য কুমারকে রাণী সান্ত্বনা দেবার কালে স্মরণ করায় ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের কথা—

বাবা এত দিন গিয়াছে, আর দুইটা দিন, তারি পরে তোরি চাঁদ সূরয, তোরি রাজ্যপাট।[২৮৬]

সে কারণেই অপুত্রক রাজার একচ্ছত্র রাজ্যপাট তাকে শান্তি দিতে পারে না কারণ 'রাজপুরীর সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি নিবু নিবু, রাজত্ব আর থাকে না।'[২৮৭]

কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানই অভিপ্রেত। 'পুষ্পমালা'[২৮৮] গল্পে সদ্যোজাত সন্তান 'ক্ষীরের পুতুল কন্যা'[২৮৯] এই সংবাদে রাজার প্রতিক্রিয়া—

'মুখ নীচু করিয়া রাজা রাজসভায় চলিয়া গেলেন।....রাজার সভায় চামর থামিল আতুঁড় ঘরে রাণীর গা ঘামিল, রাজ-আঙ্গিনায় জগঝম্প বাজে কি না বাজে।'[২৯০]

এই শোকাকুল মানসিকতার উৎস সম্ভবত এই ধারণা যে, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কন্যার বিবাহিত স্বামীই বধূর পিতৃরাজ্যের বিদেশীর করায়ত্ত হবে।

রাজ্য যাতে যোগ্য উত্তরাধিকারীর হস্তেই অর্পিত হয়, সেই বিবেচনায় রাজারা ভাবী জামাতার মধ্যে সন্ধান করেছে দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাবান পৌরুষত্বের অনিবার্য উপস্থিতি। 'নীলকমল আর লালকমল'[২৯১] গল্পে রাজার ঘোষণা—

'যে কোন জোড়া রাজপুত্র খোক্কস মারিতে পারিবে, জোড়া পরীর মতো রাজকন্যা আর তাঁহার রাজত্ব তাহারাই পাইবে।'[২৯২]

নীলকমল আর লালকমল বীরত্বের সঙ্গে খোক্কসের নিধন করেছে—

"পরদিন রাজা গিয়া দেখেন, দুই রাজপুত্র রক্তজবার ফুল, গলাগলি হইয়া ঘুমাইতেছেন; চারিদিকে মরা খোক্কসের গাদা। দেখিয়া রাজা ধন্য ধন্য করিলেন।"[২৯৩]

—এই ভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ দূরীভূত করে রাজ্যের নিরাপত্তা পুনঃ আনয়ন করেছে যে রাজপুত্র বিদেশী হলেও তাদেরই হস্তে অকুণ্ঠ-চিত্তে রাজ্যের অধিকার অর্পণ করেছে অভিজ্ঞ রাজা—

"দুই রাজ্য এক হইল, নীলকমল, লালকমল, ইলাবতী লীলাবতীকে লইয়া দুই রাজা সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।"[২৯৪]

এই ঘটনায় শুধু রাজ্য সীমা বিস্তৃত হল, তাই নয়, প্রজাগণের যৌথ সংযুক্তিতে জনবল অধিক মাত্রায় শক্তিশালী হয়ে রাজ্যকে নিরাপদ করে তুলল।

দীর্ঘদিনের ভয়ঙ্কর বিপদের রাহুমুক্তি ঘটিয়েছে যে রাজপুত্র, তারই হস্তে আপন কন্যা ও রাজ্য অর্পণ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের দৃষ্টান্তও সুলভ—

এক দৈত্য রূপার কাটী ছোঁয়াইয়া আমাদের গম্‌গমা সোনার রাজ্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিল—আপনি আসিয়া আমাদিগে জাগাইয়া রক্ষা করিলেন। রাজা বলিলেন—আমার কি আছে, কি দিব?—এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম, এই রাজত্ব তোমাকে দিলাম।[২৯৫]

উত্তরাধিকারী নির্বাচনে বংশ অপেক্ষা বীর্যের এই স্বীকৃতি বজায় থেকেছে সাধারণ জনসমাজের ক্ষেত্রেও। বহুক্ষেত্রেই রাজকন্যার বরমাল্য অর্পিত হয়েছে সাধারণ প্রজার কণ্ঠে। গর্বিত আভিজাত্যবোধে উদ্ধত রাজবৃন্দ বারংবার তাদের কঠোর পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছে কিন্তু অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও একাগ্রতাকে পাথেয় করে বারংবারই তারা সাফল্য লাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দেড় আঙ্গুলে' [২৯৬] গল্পটি উল্লেখ করা যেতে পারে। দেড় আঙ্গুলে পিপ্পলকুমার এক কাঠুরিয়ার ছেলে। কিন্তু সে যখন চোরদের বিতাড়ন করে, কানা রাজকন্যার দৃষ্টি স্বাভাবিক করে, আত্ম-বিক্রীত পিতাকে স্বাধীন করার মূল্য স্বরূপ কড়ি নিয়ে 'টিকি ফর্‌র ফর্‌র জুতা ফটর ফটর পাগড়ী ফুলাইয়া নল ঘুরাইয়া রাজার কাছে গেল।'[২৯৭] তখন রাজার প্রতিক্রিয়া—

বীরের কুমার পিপ্পলকুমার এস রে বাপ এস
তোমার তরে রাজ্য ধন, সিংহাসনে বস।[২৯৮]

দেড় আঙ্গুলে পৌরুষের দীপ্তি ও বীর্যবত্তার কাছে তার শারীরিক ক্ষুদ্রতা নিতান্তই ম্লান হয়ে গেছে। আন্তরিক তাগিদেই সিংহাসনে দেড় আঙ্গুলের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

রাজ্যহীন রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচনে অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে শীত-বসন্ত[২৯৯] গল্পে।

'রাজার ছেলে নাই, পুলে নাই, রাজসিংহাসন খালি পড়িয়া আছে, রাজার লোকজনেরা শ্বেত রাজহস্তীর পিঠে পাট সিংহাসন উঠাইয়া দিয়া হাতী ছাড়িয়া দিল। হাতী যাহার কপালে রাজটিকা দেখিবে, তাহাকেই রাজসিংহাসনে উঠাইয়া দিয়া আসিবে। সেই রাজ্যের রাজা হইবে।'[৩০০]

—রাজচক্রবর্তী তিলকের উপস্থিতি যে অত্যাবশ্যক তা বোঝা যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে শ্বেতহস্তী নির্বাচনই চূড়ান্ত। অর্থাৎ, বংশানুক্রমিক সিংহাসনের অধিকার হস্তান্তরিত হলেও তার মালিকানা সীমাবদ্ধ থাকছে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই, যার স্মারক ঐ তিলক।

ঐ গল্পেই দেখা যায় যে ভ্রাতৃস্নেহের দুরন্ত আবেগে, বিজিত রাজ্যের অধিকার শীত রাজা কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকেই অর্পণ করেছে—

শীত বলিলেন—"ভাই, আমি তোমাকে পাইয়াছি, রাজ্য নিয়া কি করিব? রাজ্য তোমাকে দিলাম।"[৩০১]

বসন্ত যখন রূপবতী রাজ্যকন্যাকেই বিবাহ করে তারই রাজত্বে বসবাস করে, 'তখন সেটাকে মাতৃশাসিত সমাজব্যবস্থার নিদর্শন বলে কেউ কেউ মনে করেছেন।'[৩০২]

নারীশাসিত আর একটি রাজ্য পাশাবতীর পুর।[৩০৩] 'পাশাবতী দুধারে নিশান উড়াইয়া ঘর-কুঠুরী সাজাইয়া সাজিয়া বসিয়া আছে। যে আসিয়া পাশা খেলায় হারাইতে পারিবে আপনি আপনার ছয় বোন নিয়া তাহাকে বরণ করিবে।"[৩০৪] এই গল্পে 'পাশা খেলা' যেন যুদ্ধেরই বিকল্প। পাশাখেলায় জয়লাভই সেই ছাড়পত্র, যার মাধ্যমে রাজত্ব ও শাসনব্যবস্থা এক বিদেশীর দখলে চলে যাচ্ছে।

নিরুদ্দিষ্ট সন্তান তথা রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে খুঁজে পেয়ে নিজ রাজ্য স্থানান্তরিত করার অভিনব নজির দেখা গেছে 'কিরণমালা'[৩০৫] গল্পে। সদ্যোজাত অরুণ, বরুণ ও কিরণমালাকে হিংসুক মাসীরা ভাসিয়ে দিয়েছে জলে, 'ভাসানে রাজপুত্র, রাজকন্যা গিয়া ব্রাহ্মণের ঘর আলো করিল'[৩০৬] এখানে ব্রাহ্মণের ভূমিকা রক্ষাকারী এক পালক পিতার, যে ভবিষ্যৎ শাসকদের লালন করে রাষ্ট্রের প্রতি মহান দায়িত্ববোধেরই পরিচয় দিয়েছে।

গল্পের শেষে নিখোঁজ পুত্র-কন্যার সন্ধান পেয়ে নিজ আভিজাত্যের দম্ভ ত্যাগ করে স্নেহপ্রবণ পিতার বাৎসল্যে সন্তানের দৃঢ় অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন রাজা—

'তাহার পর রাজা রাজ্যপাট তুলিয়া আনিয়া অরুণ বরুণের পুরীতে বসাইয়া দিলেন।....রাণী রাজা অরুণ বরুণ কিরণমালা কোটী কোটীশ্বর হইয়া যুগ যুগ সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।'[৩০৭]

রাজধানী স্থানান্তরিত করার এই তুঘলকি নীতিটি প্রজাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সে প্রশ্ন অবশ্যই থেকে যায়, তবে এটা ঠিকই যে শ্রোতার মন পারিবারিক মিলন-দৃশ্যটিকেই অধিক আপন করে নেয়।

বংশধরকে জীবিত রাখার তাগিদে তাকে অশিক্ষিত করে রাখার নজিরও পাওয়া

গেছে—'ব্রহ্মানন্দ রাজার ছয় উপযুক্ত পুত্রই বাণিজ্যকালে দুর্ঘটনায় প্রাণ দিল। অবশেষে রাজার আর একটি পুত্র হলো, এর নাম পৃথ্বীরাজ। অন্য পুত্রদের রাজা লেখাপড়া শিখিয়েছিল। কিন্তু পৃথ্বীরাজকে লেখাপড়া শেখাল না। কি জানি যদি মরে যায়।'[৩০৯]

সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভের একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ 'চোর চক্রবর্তী রাজা'[৩১০] গল্পটি। চৌর্যকার্যে চূড়ান্ত সফলতাই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নির্বাচনের একমাত্র শর্ত। রাজা কনিষ্ঠ জামাতার সঙ্গে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে—"চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা—এই কথা তুমি বা তোমার পুত্র অথবা কন্যা কোনদিন যদি আমার কাছে প্রমাণ করতে পার, তাহলে সেদিন হতে এই লিখন বলে তুমি তোমার পুত্র অথবা কন্যা এই রাজ্যের রাজা হবে। আমি স্বেচ্ছায় রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।"[৩১১]

নির্বাসিতা কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র অর্থাৎ রাজার পৌত্র এই শর্তকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করেছে। কাহিনীর অগ্রগতিতে দেখা গেছে যে ছেলেটি চৌর্য কার্যে দীক্ষা দানকারী গুরুর বুকের উপর থেকে টাকা চুরি করে। সজাগ চিলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে তার ডিম চুরি করে, রাজপুরীর অতন্দ্র পাহারা উপেক্ষা করে পুরস্ত্রীদের অলঙ্কার চুরি করেছে এবং শেষে স্বয়ং রাজাকেই প্রতারণা করে তার পোশাক চুরি করে সুচতুর তস্কর চূড়ামণি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। 'তারপর রাজা তাকে "চোর চক্রবর্তী" উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান'; [৩১২]

সিংহাসনের উত্তরাধিকার কখনই নির্বিঘ্ন ও অবিচ্ছেদ্য নয়। প্রায়শই প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র কিংবা পরোক্ষ বিবাদ পরিস্থিতি জটিলতর করে তুলেছে। 'সোনাফর বাদশা'[৩১৩] গল্পে উজীর পুত্র যাদুবিদ্যার সাহায্যে বাদশাকে রূপান্তরিত করে একটি কাক পক্ষীতে। সিংহাসন অধিকার করে ঘোষণা করে, 'যে একটি কাক মারিয়া আনিবে, সে কাক প্রতি একশো টাকা পাইবে।'[৩১৪] শেষে সোনাফর বাদশার স্ত্রী অতুলার চতুরতায় পুনরায় বাদশা আপন অবয়ব ফিরে পান।

রাজ্য থেকে বাদশার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগেও উজীর রাজ্য দখল করেছে "বাদশা ফৈলন খাঁ ও হরণ সুনাই"[৩১৫] নামক লোককথাটিকে। শেষে ফৈলন খাঁর পুত্র জুলমৎ খাঁ মল্লযুদ্ধে উজীরকে পরাস্ত করে পিতৃরাজ্য পুনর্দখল করেছে।

.....'কলাবতী রাজকন্যা'[৩১৬] 'শীতবসন্ত'[৩১৭] ইত্যাদি গল্পে স্ত্রৈণ রাজার অসহায়ত্বের সুযোগে যে মন্ত্রণাজাল রচিত হয়েছে, সেখানে রাজপুত্রদের সঙ্গে রাণীরাও সমান অংশভাগিনী। সপত্নী-কলহ, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব ঝগড়াঝাঁটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটিমাত্র ক্ষেত্রে—সিংহাসনের অধিকার। কলাবতী রাজকন্যা গল্পে 'রাজা ভুতুমের গালে চুমা খাইলেন, বুদ্ধুকে দুই হাত দিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন।'[৩১৮] তখনই সপত্নী পুত্রদের প্রতি রাণীদের বিদ্বেষ ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে--

'রাণীরা ভুতুমের গালে ঠোনা মারিলেন বুদ্ধুর গালে চড় মারিয়া ফেলিয়া দিলেন।[৩১৯]

এই রাগের উৎস সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থচেতনা যার মূলে আছে আপন পুত্রের সিংহাসন

লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

কাপুরুষ নৃপতির যথোচিত সাহস নেই এ-নারীদের বিরুদ্ধাচরণ করার। 'শীতবসন্ত'[৩২০] গল্পে রাজাই নারীর দুষ্কর্মের সহযোগী হয়ে যায় যখন দেখি স্ত্রীর আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মতোই জ্ঞানরহিত রাজা আপন বংশধরদের হত্যার আদেশ দেন—

'শীতবসন্তকে হত্যা করিয়া রাণীকে রক্ত আনিয়া দাও।'[৩২১]

উত্তরাধিকারী লাভের আশায় ব্যগ্র রাজা মুহূর্তের অবিবেচনায় যে প্রতিজ্ঞা করেন সেই হঠকারিতার সুযোগ নিয়েছে কুটিল মানুষ। শঙ্খকুমার[৩২২] সঙ্কটার ব্রতকথা[৩২৩] কিংবা 'The man who wished to be perfect'[৩২৪] ইত্যাদি লোককথায় ভয়ঙ্কর তান্ত্রিক, আপন সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যেই নিঃসন্তান রাজাকে পুত্রলাভের ঔষধ প্রদান করেছে

"I will give the medicine, on one condition, that of those twins you will give one to me and keep the other yourself."[৩২৫]

বংশরক্ষার দুরন্ত তাগিদেই এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাবে সম্মত হয় রাজা—

"..........as he was so anxious to have a son to bear his name and inherit his wealth and kingdom he at last agreed to the terms"[৩২৬]

ঘটনার অগ্রগতিতে দেখা যায়, জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারীকেই অসহায় পিতা সঁপে দিয়েছে সন্ন্যাসীর কবলে। অবশেষে অলৌকিক সাহায্যেই দুষ্ট তান্ত্রিকের মৃত্যু ফাঁদ থেকে রেহাই পেয়েছে রাজপুত্র। দেবী কালিকার কাছে বলি প্রদত্ত মৃত রাজপুত্রদের খুলিগুলিই তাদের উদ্ধারের উপায় বলেছে। তাদেরই পরামর্শ অনুযায়ী কালিকার কাছে প্রণতি জানানো পূর্ব মুহূর্তে বড়কুমার বলেছে—

"As a prince; I do not know how to perform the act of prostration. Please show me the way first, I will gladly do it"[৩২৭]

তান্ত্রিক যখনই প্রণামের ভঙ্গিমা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে মাথা নীচু করেছে তখনই-- 'the prince, at one stroke of his sword seperated his head from his body.'[৩২৮]

—স্বরাজ্য থেকে দূরে গভীর অরণ্যে বিদেহী আত্মার সাহায্যেই নিজ জীবন রক্ষায় সমর্থ হয়েছে রাজপুত্র, আর রাজক্যে উত্তরাধিকারহীনতার আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছে।

কখনো বা উদারমনস্ক রাজা কোন উপকারের বিনিময়ে প্রায়শই অর্ধেক রাজত্ব উপকারীদের দান করার প্রতিজ্ঞা করতেন। এই ঘোষণা সাধারণ দরিদ্র প্রজার মনে প্রভুত্বের, রাজৈশ্বর্য লাভের অবাঞ্ছিত কামনা জাগিয়ে তুলত। ফলে ক্ষমতাভোগের লালসায় অন্যায় পদক্ষেপ নিতেও তারা দ্বিধা করত না। 'The storv of the Rakshasas'[৩২৯] গল্পে চম্পাদল ও সহস্র দলের যৌথ প্রচেষ্টায় ভয়ঙ্করী রাক্ষসী নিহত হয়েছে, কিন্তু এই বিনাশের কৃতিত্বের দাবীদার হয়েছে গরীব কাঠুরিয়ার দল--

"Remembering the promise made by the king that the killer of the Rakshasee should be rewarded by the hand of his daughter and with a

share of the kingdom each of the wood-cutters seeing no claimant at hand thought of obtaining the reward."[৩৩০]

একই উদ্দেশ্যে অলস অক্ষম মালী 'অষ্টঢালী'র কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে দ্বিধাহীন মিথ্যাভাষণ করে–

মহারাজ! অষ্টঢালী ঢাল ঢাল মোহর নেয়, আরাম করিয়া মালঞ্চে ঘুমায়। এই দেখুন, শঙ্খিনী আমি মারিয়া আনিয়াছি।[৩৩১]

রাজা বলিলেন– "মালি! অর্দ্ধেক রাজত্ব তোমার! সিপাই গর্দ্দান দাও।"[৩৩২]

–রাজার অবিমৃষ্যকারিতা এবং অবিচারই অধিকার সংক্রান্ত সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। আশ্চর্যজনকভাবে প্রজাদের একাংশই সেই সমস্যার সত্য সমাধানটিকে উদ্ধার করেছে।

রাজঅন্তঃপুরেও উত্তরোধিকার সংক্রান্ত জটিলতার অবধি নেই।

'The Boy whom Seven Mothers suckled'[৩৩৩] 'নীলকমল আর লালকমল'[৩৩৪] এই সব গল্পে রাক্ষসী বিমাতাই সংহারিকা মূর্তিতে আবির্ভূতা, যে আত্মতৃপ্তির জন্য সমগ্র রাজার উপরই লোভের নখ বিস্তার করতে চেয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে তার মাথার চুলের স্পর্শে রাজার হাতের উদ্যত তলোয়ার স্খলিত হয়, রাজার কর্ম্মক্ষমতা লোপ পায়। ক্রোধপরবশ এই রাক্ষসী পতির পৌরুষ হরণেই তৃপ্ত নয়, পুত্রের প্রতি তার ক্রোধ কঠিনতর, তাদের নির্মমভাবে ভক্ষণ ও চর্বণ করাতেই রাক্ষসীর তৃপ্তি। সাতমাতার স্তন্যে লালিত সন্তানটিও রাজপুরীতে প্রবেশের অধিকার পায় সামান্য পরিচারক রূপে। আর অজিত কুসুম ও পরজন্মে নীলকমল, লালকমল রূপ বহিরাগত যুবক হিসাবেই পরিচিত হয়। অর্থাৎ, উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাদের স্ব-স্থানচ্যুত হয়েছে অসহায় অবস্থায়। কিন্তু, ধৈর্য, পৌরুষ আর বীর্যবত্তার ক্রমপ্রকাশে ধীরে ধীরে আপন অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

..........and the boy that was suckled by seven mothers was recognised by the king as his rightful heir'[৩৩৫]

সহোদর ভ্রাতাই যখন বয়সে অনুজ হয়েও আপন শ্রী ও ধীর সাহায্যে প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠানের অগ্রাধিকার প্রায় সুনিশ্চিত করে ফেলে, তখনই জ্বলে উঠেছে ঈর্ষাগ্নি। 'কলাবতী রাজকন্যা'[৩৩৬] গল্পে ঈর্ষান্ধ ভ্রাতাগণ–'ঢোল-ডগর শিয়রে বুড়ীর কাঁথা-গায়ে বুদ্ধুকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলিয়া দিলেন। ভুতুম মাস্তুলে ছিল, তার বুকে তীর মারিলেন। বুদ্ধু ভুতুম, জলে পড়িয়া ভাসিয়া গেল।"[৩৩৭]

এই ঘৃণ্য চক্রান্তের অংশীদার হিসাবে রাজপরিবারের বহির্ভূত সদস্যদের দেখাও মেলে,'Life Secret'[৩৩৮] গল্পে দুয়োরাণী বারংবার সপত্নীপুত্র ডালিমের প্রাণহরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে, এই কার্যের সহায়ক রাজচিকিৎসক 'with that physician the Duoqueen was in collusion"[৩৩৯]

অর্থাৎ সিংহাসনে আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সেই অধিকার সীমা

প্রলম্বিত করতে নানা বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলা সর্বদাই রাজাকে সন্ত্রস্ত রাখত। ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজার ব্রতকথায়[৩৪০] দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণ পুত্রের সমৃদ্ধি দেখে ভীত রাজার চিন্তা--

'গরীব মানুষ যখন এত বড় হয়েছে, তখন কোনদিন হয়ত আমার রাজত্ব কেড়ে নিতে পারে। এই ভয়ে রাজা একদিন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের বাড়ী লুঠ করে তিল-ধুবড়ি নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন'[৩৪১]

সন্দেহ নেই অত্যধিক ত্রাসই রাজাকে বাধ্য করেছে এই অন্যায় লুণ্ঠন কার্যে।

সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের বিরাম নেই। 'মায়া নৌকা'[৩৪২] গল্পে রাজাকে নিজ অধীনস্থ প্রজার সদ্যোজাত পুত্রকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিতেও দেখা যায় কারণ--

'রাজা স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর এক প্রজার ছেলে রাজ্যের রাজা হবে। এই স্বপ্ন দেখে রাজা মনে মনে ঐ ছেলেটিকে মেরে ফেলবার মতলব করে অনেক টাকা দিয়ে ছেলেটিকে তার বাপের বাড়ী থেকে কিনে নিয়ে, আপনার বাড়ীতে আনলেন।[৩৪৩]

একদিকে ক্ষমতা দখলের এবং সিংহাসনের অধিকার কায়েমী রাখার নিরলস সতর্ক প্রয়াস, আর অপরদিকে সেই নিশ্ছিদ্র প্রহরাকে উপেক্ষা করেই সকলের অগোচরে মসৃণ পথে রাজদণ্ড সাধারণ মানুষের অধিকারে চলে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে 'শঙ্খমালা'[৩৪৪] গল্পে।

'রাজার রাণীর ছেলে হয় ছেলে হয় শোর পড়ে, কিন্তু রাণীর ছেলে হয় না'[৩৪৫] --এই পরিস্থিতিকে নিজ আকাঙ্ক্ষা, রাজসুখভোগের বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে কাঠুরাণী। রাজবাড়ীর দাই-এর সঙ্গে পরামর্শ করে মৃতবৎসা মৃতরাণীকে 'কাঁথায় কাপড়ে জড়াইয়া গলায় পাথর বাঁধিয়া খিড়কী দুয়ার দিয়া টানিয়া নিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল।'[৩৪৬] এবং শক্তিসুন্দরের সদ্যোজাত শিশুপুত্রকে সেই আঁতুড় ঘরে স্থাপন করে কাঠুরাণী স্বয়ং নবপ্রসূতি রাণীরূপে আপন পরিচিতি জাহির করল।

বংশধর বদলের এই চক্রান্তে রাজার কোন প্রতিক্রিয়াই লক্ষিত হয় না। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবেই 'রাজা এ গোঁফে চাড়া দেন, ও গোঁফে চাড়া দেন, আগে পাছে ভেড়ার পাল নিয়া তীর ধনুক হাতে বুক ফুলাইয়া বেড়ান।'[৩৪৭]

অপরদিকে নির্বিঘ্নে রাজপুত্রসুলভ মর্যাদার 'দিনে দিনে সাতস্বর্গের ঐশ্বর্য্যে বাঁটিয়া নিয়া নীলমাণিক ক্রমে বড় হইলেন। রাজসভায় যান আসেন। ক্রমে রাজদণ্ডও হাতে নেন। রাজার রাজ্যে 'চার চাক্‌লা বাঁধিয়া উঠে।'[৩৪৮]

এই ঘটনা অক্ষম রাজার অদ্ভুত ঔদাসীন্য প্রকট করে নি, নীলমাণিকের দক্ষতাকে ও সাফল্যের পরিচিতিকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে। শঙ্খমনি সওদাগরের পুত্র হয়েও নীলমাণিক যে ভাবে অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের মতোই রাজ্যের শ্রী বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছে, তাতে তার অনধিকার চর্চার শ্রোতার মনে কোন সংশয়ই সৃষ্টি করেইনি উপরন্তু নিষ্ক্রিয় রাজার

অক্ষমতার বৈপরীত্যে সমগ্র সওদাগর শ্রেণীরই কর্মঠ পৌরুষ ও বীর্যবত্তার অভিনব স্মারক হয়ে উঠেছে। গল্প শেষে তাই অনিবার্যভাবেই জনসমক্ষেই নীলমাণিকের অধিকার স্বীকৃতি পায় বিপুল মর্যাদার, আর বংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা--এই চেতনার সওয়ারী হয়েই উত্তরাধিকার নির্ণায়ক মানদণ্ডটি ব্যাপ্তি পায় বৃহত্তর স্বীকৃতিতে।

রাজ্যের নিরাপত্তা ও বিপর্যয়

রাজ্যের সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বের সর্বোচ্চ রাজার অধিষ্ঠান।

'সুসংগৃহীত রাষ্ট্রোহি পার্থিব সুখমেধসে'[৩৪৯]

অর্থাৎ রাজ্য সুরক্ষিত হলে রাজার সুখও বৃদ্ধি পায়। বিপরীত ক্রমে রাজা যখন ব্যক্তিগত শোকে মুহ্যমান হয়ে রাজকর্মে অবহেলা করেন, তখন কতখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তারই প্রত্যক্ষ রূপ স্পষ্ট হয়েছে 'মধুমালা' গল্পে--

রাজ-রাজত্ব বিচার-আচার পালন পাট সব বন্ধ। এই সাতদিনে পথের কাঁকরে পথ ঢাকিয়া সাপ-শিয়ালে বাসা করিয়াছে। মালঞ্চে ফুল নাই, জীয়াসে কূল নাই, গাছের তলে গাছের ফলে আর ঘাস-জঙ্গলে ছাইয়া গিয়াছে।[৩৫০]

—পরিবেশের এই বিধ্বস্ত চিত্রই রাজ্য ও রাজার একাত্ম সম্পর্কটিকে চিনিয়ে দিয়েছে। সে কারণেই রাজার আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় নৃপতিহীন অরক্ষিত রাজ্যে অবস্থান স্বয়ং রাজলক্ষ্মীর কাছেও অর্থহীন--

'I am Rajlakshmi, the guardian deity of this palace. The king will be killed this night. I am therefore not needed here. I am going away'[৩৫১]

তাই রাজ্য সুরক্ষিত রাখতে নৃপতি সদা সতর্ক। 'Strike but Hear'[৩৫২] 'কিরণমালা'[৩৫৩] 'নুলো রাক্ষসী'[৩৫৪] ইত্যাদি গল্পে নৈশকালীন নগরার প্রহরার দায়িত্ব নিয়েছে স্বয়ং রাজা। কখনো সুযোগ্য রাজপুত্রও পিতার কার্যে সহায়তা করেছে

'The three princess then made up their minds to patrol the city every night with this view they set up a station in the outskirt of the city where they kept their horses'[৩৫৫]

এছাড়াও রাজ্যের প্রতিরক্ষা বাহিনী যথেষ্ট সমৃদ্ধ। 'মালঞ্চমালা'[৩৫৬] 'পুষ্পমালা'[৩৫৭] ইত্যাদি গল্পে নগর কোটালের উপস্থিতি দৃষ্ট হয়েছে। আর অব্যর্থ লক্ষ্যভেদকরূপে মর্যাদাও পেয়েছে সে—

'কোটাল মাটিতে মাথা ছোঁয়াইয়া বলিল, --মহারাজ! মারি তো হাতি, লুটি তো ভাণ্ডার। —বলিয়াই এক মাটির ডেলা কুড়াইয়া নিয়া বিড়বিড় করিয়া জোরে ফলের পানে ঢিল ছাড়িয়া দিল। ঢিল হন্‌হন্ করিয়া গিয়া-- কাকের ছোঁয়ে দুই আম পাড়িয়া আনিয়া রাজার হাতের উপর রাখিল।'[৩৫৮]

পাইক, সিপাই, সর্দার শিরদার ইত্যাদি বিভিন্ন পদের সঙ্গেই এসেছে 'করাতী সিপাই'—

সেই অন্ধকার দুয়ারে বিষম করাতী সিপাই খাড়া পাহারা। মাছিটিও সে পুরীতে

যাইতে গেলে করাতের তলে খান খান হইয়া যায়।[৩৫৯]

রাজপুরীর দুয়ারে অষ্টপ্রহরের পাহারাদার 'অষ্টঢালী'[৩৬০] সিপাইও অতন্দ্র প্রহরী—

'একরাত্রি যায়, দুইরাত্রি যায়, অষ্টঢালী এক সরোবরের পাড়ে শাল গাছে বসিয়া আছে'[৩৬১]

রাজপ্রাসাদের প্রহরার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার চিত্র ফুটেছে 'Adventures of Two Thieves and their Sons'[৩৬২] গল্পে। দক্ষ প্রহরীর সতর্ক পাহারা। প্রহরান্তরে প্রহরী পরিবর্তিত হয়, ফলে ক্লান্তির কোন অবকাশই নেই—

"Before the zenana could be got at four doors, including the Lion Gate, had to be passed; and each of these doors had a guard of sixteen stalwart men........As the king had and infinite number of soldiers at his command the guards at the doors were relieved every hour; so that once every hour at each door there were thirty two men present, consisting of the relieving party and of the relieved"[৩৬৩]

অন্তঃপুরের মহিলা মহলের নিরাপত্তার দিকেও নৃপতির কড়া নজর। কখনো পাতালপুরী কখনো বা সমুদ্রের মধ্যে নির্মিত হয়েছে একমাত্র কন্যার প্রাসাদ।

'চারিদিক হুম্‌হুম্‌ সমুদ্রের জলের ডাক, চারিদিকে গুম্‌গুম্‌ পাহারা, কাল নিশুতির কালো ছায়ায় ঢাকা সেই স্বর্ণ—সোনার পুরী চূড়ায় সোনার কলস নিয়ে খাড়া আছে"[৩৬৪]

অন্তঃপুরে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির চুপিসাড়ে প্রবেশ বন্ধ করার উপায় 'ডঙ্কানিনাদ'[৩৬৫] চোরের উৎপাত বন্ধ করার এক অভিনব পন্থার হদিস দিয়েছে কণ্ঠকমল পাখী[৩৬৬] গল্পের দ্বার পাল--

"যদি চারমণ ঘুংগোর কিনে, আর চারটে তারের জাল তৈরী করে তাতে ঘুংগোরগুলো গাঁথা যায় তবে চোর ধরা পড়বে। ঘুংগোর বাজলে আমরা বুঝতে পারব।[৩৬৭]

তবে উল্লেখ্যে এটাই যে, যতটাই সতর্ক প্রহরা টিক ততখানিই আকর্ষক সেই দুর্ভেদ্যতাকে অতিক্রম করার পদ্ধতিগুলি। কখনো সিংহদরজার প্রহরীর পরিবর্তনের সময়ে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে,[৩৬৮] কখনো বা রাজডঙ্কার তালে তালে পা মিলিয়ে,[৩৬৯] অবতীর্ণ হয়েছে বহিরাগতের দল।[৩৭০]

রাজ্যের অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিঘ্নিত করে প্রায়শই বেজে উঠেছে, যুদ্ধের দামামা। 'চন্দ্রপুরের চন্দ্র রাজার'[৩৭১] পুত্র 'চন্দ্রমাণিককে'[৩৭২] কারারুদ্ধ করেছে 'দুধবর্ণ রাজা'[৩৭৩] এবং চন্দ্ররাজকে প্রেরণ করেছে গর্বিত বার্তা—

"যদি রাজা তোমার পুত্র হয়, যুদ্ধ জিনিয়া লও। রাজা হুকুম দিলেন-- 'দুধবর্ণ রাজার রাজ্যে হানা দাও।"

হানা দিলেন। দুধবর্ণের বিস্তর সিপাই, রাজা পারিলেন না, হারিয়া রাজা বন্দী হইলেন।'[৩৭৪]

এই অপারগতা অন্যত্রও প্রকট, যেখানে রাজ্য রাক্ষসীর আক্রমণ প্রতিহত করতে

সন্তানসম প্রজাদেরই একে একে উপঢৌকন দিয়েছে রাজা, তারই অধীনস্থ প্রজার কণ্ঠে বেজে উঠেছে আক্ষেপ—

"Our king became a suppliant before the Rakshasi and begged her to show mercy to us his subjects... From that day the king made it a rule that every family in the town should in its turn send one of its members to the temple as victim to appease the wrath and to satisfy the hunger of the terrible Rakshasi"[৩৭৫]

কখনো বা কোন শর্ত ব্যতীতই অবাধে অত্যাচারে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। আতঙ্কিত প্রজাবৃন্দ স্বদেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

"পরদিন রাজ্যে হুলুস্থূল। ঘরে ঘরে মানুষের হাড়, পথে পথে হাড়ের জঙ্গল। রাক্ষসে দেশ ছাইয়া গিয়াছে আর রক্ষা নাই। ......জীবন্ত মানুষ দলে দলে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।"[৩৭৬]

রাক্ষস জাতিকে যদি অনার্য অধিবাসীবৃন্দের রূপক কল্পনা করা যায়, তবে এ ভাবনা অসঙ্গত নয় যে নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করে প্রায়শই সভ্য প্রদেশে তাদের আকস্মিক আক্রমণে নিরীহ নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বিধবস্ত হয়েছে। সাময়িক হলেও সভ্যপ্রদেশেও অনার্য অধিকারই বলবৎ হয়েছে।

দুর্বল রাজশক্তি বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে স্বয়ং অক্ষম হলে, বহুস্থলে বিদেশী সাহায্যেরই দ্বারস্থ হয়েছে। 'নীলকমল আর লালকমল'[৩৭৭] গল্পে জোটবদ্ধ খোক্কসের কুটিল আগ্রাসনের মোকাবিলা করেছে নীলকমল আর লালকমল দুই ভাই। তীক্ষ্ণ তরোয়ালে 'খোক্কসের দুই হাত কাটিয়া কালো রক্তের বান ছুটিল।' 'প্রদীপের গরম ঘির স্পর্শে খোক্কসের লোম পুড়িয়া ঘর ভরিল।'[৩৭৮]

কিন্তু নীলকমলকে তাদের ভয়, কারণ 'নীলকমল আর জন্মে রাক্ষসী রাণীর পেটে হইয়াছিলেন, তাই তাঁর শরীরে কিনা রাক্ষসের রক্ত'[৩৭৯] স্বজাতির এক সদস্যের বিপক্ষে আক্রমণ যেন জাতির অন্তর্বিরোধেরই সামিল, এই বোধবশত তারা প্রথমে ইতঃস্তত করলেও শেষ পর্যন্ত ছলনার আশ্রয়ই নিয়েছে। লালকমলের অসতর্ক মুহূর্তের উচ্চারণ "লালকমল জাগে"[৩৮০] এই কথাতেই আক্রমণের বাহানা খুঁজে পেয়েছে দ্বিধাশূন্যভাবে—

"দুয়ার কবাট ভাঙ্গিয়া সকল খোক্কস লালকমলের উপর আসিয়া পড়িল। ঘিয়ের দীপ উল্টিয়া গেল, লালের মাথার মুকুট পড়িয়া গেল,"[৩৮১]

শেষ পর্যন্ত খোক্কসের হিংসক প্রকৃতি পরাজিত হয়েছে নীলকমলের রক্ষাত্মক গুণের কাছে—

'নীলকমলের সাড়ায় আ-খোক্কস, ছা-খোক্কস সকল আধমরা হইয়া গেল। নীলকমল উঠিয়া ঘিয়ের দীপ জ্বালিয়া দিয়া সব খোক্কস কাটিয়া ফেলিলেন। সকলের বড় খোক্কসটা নীলকমলের হাতে পড়িয়া যেন গিরগিটির ছা!'[৩৮২]

অন্ধকার জগতের বাসিন্দারা যখন লৌকিক মানব, তখন রাজ্যের অধিবাসীদের

উপর অত্যাচার চালাতে তারা নির্ভীক। 'Strike But Hear',[৩৮৩] দেড় আঙ্গুলে, ইত্যাদি গল্পগুলিকে সাড়ে সাত চোরসহ, চোরের রাজা চ্যাং পিছলের [৩৮৪] অত্যাচারে নাগরিক জীবনে ত্রাহি রব উঠেছে।

"নায়ে নায়ে" ভরা দিয়া যত রাজ্যের চোর আসিয়া রাজপুরীময় চুরি আরম্ভ করিলে সিপাই শাস্ত্রী ধোঁকা, রাজা হলেন বোকা।[৩৮৫]

সংঘবদ্ধ এই চোরেদের পৃথক রাজ্য, তারা অস্ত্রশক্তিতেও বলীয়ান—

'খোনা, খুন্তি,পোলো,থোলো, রায়বাঁশ, গলফাঁস সকল নিয়া রাজ্যের যত চোর অলিতে গলিতে খাড়া হইল, খানা খুঞ্জি ফিরিয়া দাঁড়াইল'[৩৮৬] শক্তিশালী সেই চোরের দলকে পরাজিত করেছে মানব দেড় আঙুলে। দিশেহারা নৃপতিকে আশ্বস্ত করে সে আশ্রয় নিয়েছে কূটকৌশলের। চোরেদের প্রহরার মধ্যেই সে সাতনলার খোলস চিরে ভীমরুল ছেড়ে দিয়েছে চোরের রাজ্যে—

"নল চিরিয়া হাজার চুল, খোলস কেটে ভীমরুল! চেরা চেরা নল সূচ হেন ছোটে, ভীমরুল হুল পুট্‌পুট ফোটে— চোরের রাজ্যে হুড়োহুড়ি, গড়াগড়ি, লটাপটি,ছুটাছুটি। তিন রাত্তিরে ঘর দোর ফেলে যত চোরণী দেশ ছেড়ে পালিয়ে পুলিয়ে দূর।"[৩৮৭]

আরো ভয়ঙ্কর ডাকাতের অত্যাচার, পথিমধ্যে সতর্কিত আক্রমণেই যাদের উল্লাস। "বিদ্যাবতী"[৩৮৮] গল্পে সওদাগর পুত্র বিদ্যাধর 'ফাঁসুড়ে ডাকাত মনোহরের রাজ্যে'[৩৮৯] উপস্থিত হয়েছে দুর্ভাগ্যবশত। ডাকাত মনোহর আবার দক্ষ গণৎকার। গণনার সাহায্যে সে জেনেছে বিদ্যাধরের সম্পত্তি পাঁচটি মূল্যবান মাণিকের কথা। এরপরই মাণিকের লোভে সে হিধা, সিধা, মাধা [৩৮৯] প্রমুখ সাত সন্তান সহ আক্রমণ করেছে বিদ্যাধরকে। বিদ্যাধর সাতভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সকলেরই শিরচ্ছেদে সমর্থ হয়েছে।

'পুষ্পমালা'[৩৯০] গল্পে 'সাত ডাকাতের মা'[৩৯১] তারই দুই সিপাইর (যারা আদতে পুষ্পমালা ও চন্দন)। সাজ তাজে কত মণি! গায়ে পায়ে হীরার খনি'[৩৯২] দেখে লোভে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। নিজ পুত্রদের কাছে সংকেত বার্তা প্রেরণে অভিনব উপায় স্থির করেছে। "বুড়ী শ্বেত সরিষা পড়িয়া দুই পুঁটুলী করিয়া দুই পক্ষিরাজের পিছনে বাঁধিয়া, সূচের ফুটা করিয়া রাখিয়াছিল, সিপাইরা তাহা জানেন না, সিপাইরা ছুটেন, সরিষা পড়ে আর পথে পথে শ্বেত ফুটিয়া উঠে!

এমন সময় সাত ডাকাত ঘোড়ায় কোড়া মরিয়া বাড়ীতে আসে,— দেখে পথে শ্বেত ফুল! অমনি সাত ভাই ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া ফুলের পথে ঘোড়া দিল,"[৩৯৩]

ডাকাতের লোভ ধনরত্নকে অতিক্রম করে কন্যা পুষ্পমালাকেও রেহাই দেয়নি—

"চমকিয়া কন্যা পড়িতে পড়িতে উঠিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কেন ডাকু, এখন কি?"

"এখন রাজকন্যা! আমার ঘরে চল।"[৩৯৪]

বহিরাগত অসৎ অত্যাচারীই নয়, নিজ দেশেই রাজার বুদ্ধিনাশী অসৎকর্মের মাশুল দিতে হয়েছে জনগণকে। খাম্‌খেয়ালী রাজার অবিমৃষ্যকারিতায় নিরীহ প্রজার প্রাণদণ্ডাদেশ

হয়েছে ইতুর ব্রতকথায়—

'পথে যেতে দুর্বা গাছের শেকড় লেগে উম্‌নোর পা কেটে গেল। রাজা তা দেখে রেগে বলে, "আঠারো হাড়ির মাথা আর তাদের মা বুড়ীর চোখদুটো নিয়ে আয়। অনুচরেরা তাই করলে। রাজা রাণীর হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন।"[৩৯৫]

অন্যায় বিচার নামক প্রহসনে নির্দোষ বিদেশীর শূলদণ্ড হয়েছে 'হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী'[৩৯৬] ইত্যাদি গল্পে। আর অসৎ আভিজাত্যের বলি হয়েছে 'কোটাল কন্যা মালঞ্চমালা'[৩৯৭]। 'পাতালকন্যা মণিমালা'[৩৯৮], 'ফকিরচাঁদ'[৩৯৯], ইত্যাদি গল্পগুলিতেও মন্ত্রীপুত্রের আনুগত্য প্রাধান্য লাভ করেছে ঠিকই, সে সর্ববিপদ থেকেই নববিবাহিত রাজ-দম্পতিকে রক্ষা করেছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলিই হয়তো প্রতীকের মাধ্যমে আমাদের জানাচ্ছে রাজ্যের দুরবস্থার কথা, সেখানে শ্রমবিমুখ এক যুবরাজ তার মন্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিচ্ছে রাজ্য রক্ষার ভার।

মানবেতর প্রাণীদের গতি-প্রকৃতিও রাজ্যের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। 'নীলকমল আর লালকমল'[৪০০] গল্পে যে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর সন্তানদের দুই রাজপুত্র আপন রক্ত দিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন, তারাই রাক্ষসীর প্রকোপমুক্ত করার কার্যে রাজপুত্রদের সহায়ক হয়েছে। তাদের পিঠে চেপেই লাল-নীল দুই ভাই রাক্ষসপুরীতে গমন করে রাক্ষসের প্রাণ ভীমরুল আনতে সক্ষম হয়েছে।

'দেখিতে দেখিতে ডাঙ্গা জাঙ্গাল, নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, মেঘ, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য সকল ছাড়াইয়া, দুই রাজপুত্র-পিঠে বাচ্চারা হুহু করিয়া শূন্যে উড়িল।'

শূন্যে শূন্যে সাতদিন রাত্রি উড়িয়া আট দিনের দিন বাচ্চারা এক পাহাড়ের উপর নামিল। পাহাড়ের নীচে ময়দান, ছাড়াইলেই রাক্ষসের দেশ।'[৪০১] 'ডালিমকুমার'[৪০২] গল্পে রাক্ষসীর প্রাণ একটি শুক পাক্ষীর মধ্যে। তাই সেই শুক পাখীটিকে হত্যা করলেই দেশের শান্তির প্রত্যাবর্তন ঘটে।—

'শুকের গলা ছিঁড়িল। রাক্ষসী গ্যাঁ গ্যাঁ করিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। পৃথিবীতে যত রাক্ষস জন্মের মত ধ্বংস হইয়া গেল।'[৪০৩]

বৃহৎ রাক্ষুসে পাখির অতর্কিত আক্রমণে নাগরিক জীবনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে 'The Boy whom seven Mother Suckled'[৪০৪] গল্পে। অসহায় প্রজার আর্তি নিবেদিত হয়েছে রাজদরবারে—

'A monstrous bird comes out apparently from the palace every evening and seizes the passengers in the street and swallowed them up'[৪০৫]

উন্মাদ পক্ষীরাজ ঘোড়ার দৌরাত্ম্যেও নাগরিকের বহির্জীবন বিপজ্জনক 'রাজ্যের রাজ রাজত্ব বন্ধ রাজ্যের লক্ষ্মী নাই, শ্রী নাই, মালঞ্চ শোনেন, সে রাজ্যের পক্ষিরাজ ঘোড়া পাগল। পাগল রাজ্যময় ছোটে, মানুষ পাইলেই ধরিয়া খায়।'[৪০৬]

ভয়ঙ্কর সরীসৃপ তার বিষাক্ত ফণার ছোবল তুলেছে বহুবার—

'এক শঙ্খিনী অজগর সেই রাজ্য উজাড় করে, তার শঙ্খের ডাকে সমস্ত রাজ্য মূর্চ্ছা যায়, অজগর কেহই মারিতে পারে না।'[৪০৭]

শঙ্খের ভয়ঙ্কর দাপট, দুরন্ত গতি, তীব্র গর্জনও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে—

'কন্যা শুনেন—দু-র হইতে গাছ মড়্‌মড়্‌, হাড়ক্কড়, ক্কড়্‌—নিমিষে লেজের দাপটে বন-জঙ্গল উড়াইয়া নিয়া পাড় পাহাড় ধ্বসাইয়া শঙ্খিনী সরোবরে নামিল; তিন শোষে সরোবর 'কদ্দর্ম শেষ' করিয়া ডাক ফুকারিয়া চলিয়া গেল।'[৪০৮]

গহন বনে, নিশীথরাত্রের ভয়ঙ্কর অজগর রেহাই দেয়নি বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণকারী অসহায় পথিককে—

"Their admiration, however, was soon changed into sorrow and fear, for the serpent came hissing to the foot of the tree on the branches of which their were seated and swallowed up, one by one the horses tied to the trunk. They feared that they themselves would be the next victim"[৪০৯]

রাজপুরীর সুরক্ষিত শয়নকক্ষেও নিদ্রিত রাজার জীবননাশে কাল ছোবল তুলেছে অজগর।'Strike But Hear' [৪১০], 'Phakir Chand'[৪১১], এই সব গল্পে দেওয়ালের সূক্ষ্ম ছিদ্র পথেই এই করাল সরীসৃপ প্রবেশ করেছে—

What was his surprise when the prince saw a huge cobra going round and round the golden bedsted on which father was sleeping'[৪১২]

'ডালিমকুমার'[৪১৩] গল্পে মৃত্যুদূতরূপী এই সরীসৃপ আবার রাজকন্যার শরীরে অবস্থান করছে। রাজকন্যার নাসারন্ধ্র থেকে বেরিয়ে সেই রাজকন্যারই পাণিপার্থী রাজপুত্রদের বিনাশ করতে উদ্যত—

'পরদিন দেখা যায় রাজকন্যার ঘরে কেবল হাড় গোড়; রাজার চিহ্নও নাই! এই রকমে কত রাজা গেল। রাজকন্যা জানেন না। কেহই বুঝিতে পারে না, রাজাকে কিসে খায়।'[৪১৪]

রাজপুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে গুণী ও শক্তিশালী ডালিমকুমার এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর সেই সূতাশঙ্খ রূপ অজগরকে বিনাশ করিতে পেরেছে—

সূতাশঙ্খ বত্রিশ ফণা ছড়াইয়া বিষদাঁতে আগুন ছুটাইয়া লক্‌লক্‌ করিয়া উঠিয়াছে, রাজপুত্রের তরোয়াল ঝন-ঝন শব্দে ঘরের ঝাড় বাতি চূর্ণ করিয়া সূতাশঙ্খের বত্রিশ ফণায় গিয়া লাগিল।[৪১৫]

—স্বয়ং রাজকন্যার নাসারন্ধ্র থেকে ভয়ঙ্কর সর্পের নিষ্ক্রমণ যেন রাজপুরীতে অন্তর্ঘাতেই রূপক। প্রতি মুহূর্তেই জীবনহানির আশংকা, নিভৃত অন্দর মহলেও বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলেছে—এই সত্যটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিজ রাজ্যেই আপনজনের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার নজির কলঙ্কিত করেছে রাজ-আভিজাত্যকে। ইতিহাসমালা-এর ১৯৫ সংখ্যক [৪১৬] গল্পে দেখা যায় 'কর্কটসধর্মাণোহি

জনকভক্ষারাজপুত্রাঃ'[৪১৭]

কর্কটের ন্যায় আপনজনক হত্যায় উদ্যত রাজপুত্র। সৎ কর্তব্যবান পিতা কুপথগামী পুত্রকে ভ্রষ্টপথে গমন থেকে নিবারণ করার জন্য তিরস্কার ও তাড়না করতেন। কিন্তু কুচক্রী পুত্রের অভিপ্রায়—'রাজা যাহাতে মরেন এমন চেষ্টায় উদ্যত হইয়া রাজনাপিতকে ডাকাইয়া কহিল যে, 'রাজাকে ক্ষৌরী করিবার সময় গলদেশে ক্ষুর বসাইয়া দিয়া মারিতে পারিলেই তোমাকে রাজ্যের চতুর্থাংশের একাংশ দিব।''[৪১৮]

৫৯ সংখ্যক কথাটিতে[৪১৯] কুপুত্রদ্বয় পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, তার একমাত্র কারণ—

'পিতা বর্তমান থাকিলে পুনরায় অধ্যাপক রাখিবেন; অতএব পিতৃবিনাশের চেষ্টা করি, তাহা হইলে নিষ্কন্টকে রহিব।'[৪২০]

অন্তঃপুরের এই ষড়যন্ত্রে সামিল রাজার নিজ পত্নীগণও। 'The Brahman's Verse'[৪২১] গল্পে রাজনাপিত আর পাটরাণীর মধ্যেই নৃপতি হত্যার ষড়যন্ত্রটি রচিত হয়েছে। নারীর কূটবুদ্ধি, খলতা এবং বিপরীতক্রমে তাদেরই সততা, ত্যাগ এবং মহত্ত্ব রাজ্যের শ্রী, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার উপর যথেষ্টই প্রভাব বিস্তার করেছে।

নারী যখন রাক্ষসী, তখন তার আগ্রাসন দুই প্রকার। প্রথমত সে নিঃশব্দ, কুটিল ও রহস্যময়। শুধু চোখের দৃষ্টিতে সে শুষে নেয় প্রাণরস, যেন গণ্ডুষে। পান করে জীবন—

' যো না পাইয়া রাক্ষুসী ছুতা-নাতা খোঁজে, চোখের দৃষ্টি দিয়া সতীনের রক্ত শোষে। দিন দণ্ড যাইতে না যাইতে লক্ষ্মীরাণী শয্যা নিলেন।'[৪২২]

অথবা 'হাড়মুড়মুড়ি' ব্যারামের ছলনায় মোহগ্রস্থ বাজাকে উদ্বিগ্ন করে সতীন পুত্রকে ঠেলে দেয় দূর রক্ষপুরে—মৃত্যু জগতে।[৪২৩]

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দেখা যায় আগ্রাসী মুখবিবরেই প্রাধ্যান্য—যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য লালসা-চরিতার্থতা। 'The Story of the Rakshasas'[৪২৪], 'The Story of Sweet Basanta'[৪২৫], 'The Boy whom seven Mother sucked'[৪২৬], 'নীলকমল আর লালকমল'[৪২৭], 'সোনার কাটী রূপার বাটী' [৪২৮] ইত্যাদি গল্পে রক্ষ-রমণীর রূপ প্রবল, বীভৎস এবং ক্রূর—

'She therefore ate in the darkness of night gradually ate up all the members of the royal family all the king's servants and attendants and his horses, elephants till none remain in the palace.'[৪২৯]

জীবন ভক্ষণের এই উন্মত্ত ভঙ্গী মাত্রাছাড়া নিষ্ঠুরতা পায় যখন বিক্ষিপ্ত চিত্ত রাক্ষসী আপন পুত্রকেই ভক্ষণ করে—

'রাণী দেখিল পৃথিবী উল্টাইয়াছে—পেটের ছেলে শত্রু হইয়াছে। রাণী মনের আগুনে জ্ঞান-দিশা হারাইয়া আপনার ছেলেকে মুড়মুড় করিয়া চিবাইয়া খাইল।'[৪৩০]

কখনো রাণীর সহচর সহস্র রাক্ষস। যেন নারীর ক্রূরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘাতক পুরুষের শক্তি—

'রাজার চোখের সামনে রাক্ষস কুসুমকে খাইতে লাগিল।...রাজার শরীর থরথর

কাঁপে। রাজা বসিতে পারিলেন না। রাণী খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাজপুরীর চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল,...গাছপালা মুচড়িয়া নদীর জল উছলিয়া রাক্ষসের ঝাঁক দেশে ছুটেল।'[৪৩১]

লক্ষ্য করা দরকার যে নির্বিচারে ভক্ষণ অথবা ভক্ষণের উদ্দেশ্যেই অগণিত হত্যা—রক্ষরমণীকে কেন্দ্র করে এই একটিমাত্র ভীতিই নাগরিক জীবনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নারী যখন কুটিল মানবী তখন চারিত্রিক সংকীর্ণতাজনিত তার বহুমুখী কুটিল মন্ত্রণা আমাদের স্তম্ভিত করে।

'শীত-বসন্ত'[৪৩২] গল্পে ঈর্ষাগ্নিতে দগ্ধ রাণী যাদু-বড়ির সাহায্যে সপত্নীকে পরিণত করেছে টিয়া পাখীতে। সপত্নী-পুত্রহত্যার আদেশ দিয়েছে। তারই অনিবার্য পরিণামে রাজ্য বিপর্যস্ত হয়েছে—

তিন রাত যাইতে না যাইতে সুয়োরাণীর পাপে রাজার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, দিন যাইতে না যাইতে রাজার রাজ্য গেল, রাজপাট গেল।[৪৩৩]

'সাত ভাই চম্পা'[৪৩৪] গল্পেও আত্মসুখ সর্বস্ব রাণীরা ছোটরাণীর সকল সন্তানকে হত্যা করেও স্বয়ং নির্বিকার, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজপুরী—'বড়রাণীদের মুখে আর হাসি ধরে না, রাজপুরীতে আগুন দিয়া ঝগড়া—কোন্দল সৃষ্টি করিয়া ছয় রাণীতে মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।'[৪৩৫]

এই ঈর্ষাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে কিরণমালা [৪৩৬] গল্পের হিংসুক ভগ্নীত্রয়, কিংবা The Boy with the Moon on His Forehead'[৪৩৭] গল্পের রাজার ছয় স্ত্রী, এই ঈর্শা থেকে জন্ম নিয়েছে অপরাধের বীজ। 'The story of Princc Sobur'[৪৩৮] গল্পে রাজপুত্র সবুর যে আপন ভগ্নীর স্বামী, যখন বণিক-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে, তখনই বোনেদের অসৎ ক্রিয়াকলাপ—

'They broke several bottles, reduced in the broken pieces into fine powdcr and scattered it profusely down on the bed'[৪৩৯]

পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধে হত্যার এই জঘন্য ষড়যন্ত্র নিরাপত্তার দুর্বল ভিতটিকে চিনিয়ে দিয়েছে সেই সঙ্গে আতিথ্যগুণটিকেও কলঙ্কিত করে তুলেছে।

কুটিল ছলনাজাল বিস্তার করে, সূঁচ রাজার প্রকৃত রাণী কাঞ্চনমালাকে নিজ দাসীতে পরিণত করে, আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য রাণী সেজে বসে কাঁকনমালা—

'রাণী ডুব দিয়া উঠিয়া দেখেন, দাসী রাণী হইয়াছে, তিনি বাঁদী হইয়াছেন। রাণী কপালে চড় মারিয়া ভিজা চুলে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁকনমালার সঙ্গে চলিলেন।'[৪৪০]

এই সমস্ত ঘটনাই ঘটেছে সূঁচ রাজার অগোচরে। তারই অধীনস্থ অকৃতজ্ঞ প্রজা রমণী হয়েও অনায়াসে রাজধানী দখল করে প্রজাপালনের নামে অকথ্য স্বেচ্ছাচার চালিয়ে গেছে; আর বৃহৎ রাজধানীর একজন নাগরিকেরও প্রতিবাদ জানানোব সৎসাহস হয়নি—

'রাজপুরীতে গিয়া কাঁকনমালা পুরী মাথায় করিল। মন্ত্রীকে বলে—'আমি নাইয়া

আসিতেছি হাতী ঘোড়া সাজাও নাই কেন? পাত্রকে বলে—'আমি নাইয়া আসিব, দোল-চৌদোলা পাঠাও নাই কেন? মন্ত্রীর পাত্রের গর্দান গেল।

সকলে চমকিল, এ আবার কি! —ভয়ে কেহ কিছু বলিতে পারিল না।'[৪৪১]

সম্ভবত দমন ও পীড়নে উৎকণ্ঠিত জনগণ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ধারণাও করতে অক্ষম। নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাতেই তারা জর্জরিত।

'নাগন দাসী'[৪৪২] কাঁকনমালা সর্পিনীর ন্যায় বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞের সুযোগ পেয়েছে রাজারই কর্মফল হেতু। উন্নাসিক রাজপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠানের পর আভিজাত্যের দম্ভে উপেক্ষা করেছে দরিদ্র রাখালের বন্ধুত্ব। সেই অকৃতজ্ঞতাজনিত পাপই সূঁচের রূপকে সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করেছে—

'রাজার মুখ-ময় সুঁচ, গা-ময় সূঁচ, মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ হইয়া গিয়াছে।'[৪৪৩]

এইভাবে রাজার দুষ্কৃতিই যেন প্রাথমিক পর্যায়ে পীড়া দিয়েছে এবং দূরবর্তীকালে ক্রূর কাঁকনমালার রূপ ধরে রাজ্যকে ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাঞ্চনমালা ও রাখাল বন্ধুর যৌথ উদ্যোগে এবং অনুশোচনার পবিত্রতায় সেই কর্মফলের কারাগার থেকে রাজার মুক্তি ঘটেছে।

"রাজার গায়ের লাখ সূঁচ উঠিয়া গেল, লাখ সূঁচে কাঁকনমালার চোখ-মুখ-সিলাই করিয়া রহিল।"[৪৪৪]

এই কর্মফলের হাত থেকে রেহাই পায়নি রমণীরাও। ইতুদেবীকে অবহেলা করেছে উমনো, ঐশ্বর্যের দম্ভে। ফলে দৈব অভিশাপে তার প্রতিটি পদক্ষেপ রাজ্য-বিপর্যয়ের বার্তাবাহী হয়ে উঠেছে—

"উমনো যে পথ দিয়ে যায়, সেই পথে লোক মরতে লাগলো, ঘরে আগুন লাগতে লাগলো চুরি ডাকাতি হতে লাগলো।

.... তারপর রাজার আজ হাতীশালে হাতী মরতে লাগলো, কাল ঘোড়াশালে ঘোড়া মরতে লাগলো রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হতে লাগলো। এই সব অমঙ্গল দেখে রাজ্যের সবাই বলতে লাগলো কি ডাইনি বউ এসেছে বাবা, রাজ্য সুদ্ধ সব যাবে।"[৪৪৫]

শ্রীবৎস রাজা অন্যায় দেবরোষের শিকার হয়েছে The Evil Eye of Sani[৪৪৬] গল্পে। দেবী লক্ষ্মীকে দেবতা শনি অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দিয়েছে রাজা, তারই ফলে শনির কোপের শিকার হয়ে দীর্ঘসময়ব্যাপী করাল দুর্ভাগ্যে আক্রান্ত রাজা। সুবিবেচক নৃপতির মতোই আপন বিপর্যয়ের পরোয়া না করেই চিন্তা করেছেন তার প্রজাদের এবং রাণীর নিরাপত্তার কথাই....as the evil eye of Sani will be upon me at once, I had better go away from the house for if I remain in the house, evil will befall my subjects and me, but if I go away it will over take me only.[৪৪৭]

অবশ্য দেবী লক্ষ্মীই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের প্রাক্‌মুহূর্তে সর্বদাই রাজাকে রক্ষা করেছেন এবং সব বিপদের অন্তে রাজার পরিণতি—

'...he again became what he formerly was, the child of Fortune'[৪৪৮]

অবশ্য ঐশ্বরিক ক্ষমতাই নয়, বিঘ্নমুক্তির ক্ষেত্রে পার্থিব মানবীর অবদানও বহু লোককথাকেই অন্যত্র মাত্রা দান করেছে। 'পুষ্পমালা'[৪৪৯] গল্পে রাজকন্যা পুষ্প সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনী। পিতা-মাতার সত্য রক্ষার খাতিরেই সে কোটালপুত্র চন্দনকে স্বামীত্বে বরণ করে পাড়ি দিয়েছে অজানা উদ্দেশ্যে, পথের যাবতীয় আক্রমণ থেকে পতিকে রক্ষা করে বীরাঙ্গনা এই নারী—

'পক্ষিরাজের মুখ ফিরাইয়া, আপনার 'শান তরোয়াল চক্র দিলেন'[৪৫০]—মুহূর্তে যত ডাকাত কাটা পড়িল।' এখানেই শেষ নয়, কন্যা অষ্টঢালী বৃত্তি অবলম্বন করে ভিন রাজ্যের শঙ্খিনী সর্পকে হত্যা করে রাজ্যকে ত্রাসমুক্ত করেছে[৪৫১] আপন অশ্রুজলে বনফুলের মালা গেঁথে পিতা মাতাকে সত্যভঙ্গের অপরাধের ভার থেকে মুক্ত করে নিজ রাজ্যের শান্তি রক্ষার মহান দায়িত্বও পালন করেছে পুষ্প[৪৫২]।

'কিরণমালা'[৪৫৩] গল্পেও মায়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে ধাবমান কিরণমালার রূপটি রমণীকুলের চিরকালীন গর্বের চিত্র—

'রাজপুত্রের পোষাক পরিয়া, মাথে মুকুট হাতে তলোয়ার.....যায় যায় কিরণমালা আগুনের মত উঠে, বাতাসের আগে ছুটে, কে দেখে কে না দেখে দিন রাত্রি পাহাড় জঙ্গল রোদ বান সকল লুটাপুটি গেল, ঝড় থমকাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া তের রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন।'[৪৫৪]

কিরণমালা সোনার ঝারির জলে কেবল নিজ ভ্রাতাদেরই প্রাণদান করেনি দীর্ঘকালের শত শত রাজপুত্রদের মুক্তি দিয়েছে প্রস্তর রূপ থেকে। জলের ছিটা-ফোঁটা পড়ে যত যুগের যত রাজপুত্র গা মোড়া দিয়া উঠিয়া বসেন।[৪৫৫]

মাঙ্গলিক নারীশক্তি যেন কিরণমালারই রূপ ধরে জড় পুরুষকুলকে মুক্তি দিয়েছে অনড়তার অভিশাপ থেকে। এই রক্ষাকর্ত্রীর প্রতি তাই কৃতজ্ঞ পুরুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বোধন—

সাতযুগের ধন্য বীর[৪৫৬]

তিলে তিলে পলে পলে আত্মাহুতি দিয়ে অন্যের সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য সর্ববিধ নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে 'মালঞ্চমালা'। ঘটনার প্রথমাবধিই শিশু স্বামী চন্দ্রমানিকের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ও অধিকারবোধ—

বাবা পুছো গিয়া রাজারে, পুছো গিয়া রাণীরে
পতি যেন আমি দান পাই গো!—
পতি যদি আমার মরে বাসর ঘরে—।[৪৫৭]

এই উক্তি স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর 'শ্বশুর মহারাজের'[৪৫৮] কোপ জাগরূক করে।—

"ছার কোটালের কন্যা তার এত কথা![৪৫৯]
আগে আগে কথা কাটে অমঙ্গলের কথা বাঁটে"

প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল রাজার নিজেরই অন্তরে, যার সর্বনাশা প্রকোপে রাজপুরী বিধ্বস্ত হয়েছে, অপহৃত হয়েছে নবজাতক পুত্রের প্রাণও—

'রাজবাড়ীর দেউড় চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, রাজবাড়ীতে আগুন লাগিল। বাসরঘরে

দুধ তুলিয়া রাজপুত্র মরিয়া গেল।'[৪৬০]

হীনমন্য নৃপতি বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছে মালঞ্চকে। ডাকিনী অপবাদে বিতাড়িত হয়েছে মালঞ্চ মৃত শিশু স্বামী সহ। কিন্তু, তারই প্রখর সতর্কতায় অপার মমত্বে অসীম সহনশীলতায় মৃতরাজপুত্র চন্দ্রমাণিক শুধু যে প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তাই নয়, ধীরে ধীরে পূর্ণাবয়ব যুবকে পরিণত হয়েছে, শিক্ষা সমাপন করে রাজকন্যা কাঞ্চীর বরমাল্যলাভ করেছে। স্বয়ং লক্ষ্মীশ্রী মালঞ্চেরই হৃদয়মনে অধিষ্ঠিত। তাই তারই বিচ্ছেদে 'রাজপুরীর আজ দেউড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে, কাল চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, আজ এ তারা খসে, কাল ও তারা খসে। ....রাজপুত্রের সাত ছেলে হইল সকল ছেলে মরিয়া গেল'[৪৬১] —দেখা যাচ্ছে, রাজপুরীর স্থায়িত্বই নয়, প্রকৃতির পরিপূর্ণতা অথবা জীবন মৃত্যুর লীলা মালঞ্চরূপী সৌভাগ্য লক্ষ্মীকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত। ক্রমাগত বঞ্চনার অত্যাচারে দগ্ধ, মালঞ্চ সেই দুঃখাগ্নি থেকেই সংগ্রহ করে নিয়েছে অলৌকিক তপঃপ্রভা।

—"চোকের জলে আপন আঁচলের কানি ছিড়িয়া আপন হাতে করিয়া, পূর্ণিমার দিন দেখিয়া, দরমণ্ডপের সপ্ত ঘিয়ের বাতি জ্বালিয়া যোড় আসনে বসিয়া রহিলেন। তিন দিনের দিন ত্রিসন্ধ্যায় পুরীর দরজা খুলিয়া গেল যেখানে যে যত বাঘের পেটে গিয়াছিল, সকলে বাঁচিয়া উঠিলেন।"[৪৬২]

মালঞ্চের পুণ্যফলের প্রভাই পুনর্জীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র। কৃতজ্ঞ প্রজারা মালঞ্চকে করেছে ঠাকুরাণী।[৪৬৩]

এইভাবেই ঠাকুরাণী মালঞ্চের ত্যাগ, তিতিক্ষা ধৈর্য সহনশীলতা ও নম্রতার অর্ঘ্য, শুভবোধক নিরাপত্তার এক অদৃশ্য ছত্রছায়ায় সমগ্র রাজ্যকেই সুরক্ষা দান করেছে। স্বস্তি, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির এক চিরস্থায়ী চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে—

'তখন সোনার কিরণ চন্দ্র সূর্য্যের আলোকে রাজচূড়ায় পড়ে, আনন্দে রাজ্য উথলে।'[৪৬৪]

'মালঞ্চমালা'[৪৬৫] গল্পটিতেই প্রতিহারীর ভূমিকা পালন করেছে বাঘ বাঘিনী। স্বেচ্ছায় আন্তরিক স্নেহের তাগিদেই এই বনচর প্রাণী আপন দুগ্ধে চন্দ্রমাণিকের ক্ষুণ্নিবৃত্তি ঘটিয়েছে,[৪৬৬] পাঁচ বৎসর মালঞ্চের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে পিতার সতর্কতায়, মাতার মমত্বে। যে মালঞ্চকে তার স্বজাতিরই প্রতিনিধি বিতাড়িত করেছে, তাকেই স্বমর্যাদায় নিরাপত্তা দিয়েছে বনচর প্রাণী। তাই আমরা বলতে পারি এরা অরণ্যচারীর, অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সম্প্রদায়েরই প্রতীকী রূপ। রাক্ষসের রূপকে তাদের সংহারক মূর্তিই প্রকাশিত হয়েছে, আর বাঘ-বাঘিনীর রূপকে ফুটে উঠেছে তাদের হৃদয়ের উদারতার, মমত্ববোধের চিত্রটি অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ছবিটি আর সরল স্বচ্ছ মানসিকতার আদর্শটি।

সভ্য সমাজ বাঘ-বাঘিনীর আক্রমণেও বিপর্যস্ত হয়েছে—

'দলে দলে বাঘ দুধবর্ণের পুরী ঝাঁপাইয়া পড়িল হাতী, ঘোড়া, মানুষ, বিড়াল, সাত ভাই, রাজপুত্র দুধবর্ণরাজা, সকল গ্রাসে গ্রাসে খাইয়া বাঘেরা গর্জিয়া রাজকন্যাকে খাইতে যায়।'[৪৬৮]

—এই আক্রমণের তাগিদটি কিন্তু এসেছে নি:স্বার্থ ভালোবাসা থেকেই—সভ্য সমাজের মালঞ্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দানই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য।

কাহিনীর সমাপ্তিতে যখন পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয়েছে, তখনও বাঘেদের অবদান লক্ষণীয় 'হাসি-আহ্লাদে রাজপুরী ভরিয়া উঠিল। সাত দিন রাত্রি ধরিয়া বাঘের যত শত্রুর রাজ্য খাইয়া আসিয়া সোনার গাড়ুর জলে আঁচাইল, পাট কাপড়ের গামছায় মুখ মুছিয়া, তাম্বুল খাইয়া জনে জনে সোনার খাটের বিছানে, বসিল[৪৬৯]

'শত্রুর রাজ্য খাইয়া' অর্থাৎ সভ্য দেশকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা প্রদান করেছে অনার্য সম্প্রদায়ই। সভ্য জাতিরা বাধ্য হয়েছে তাদের অস্তিত্বকে সম্মান জানাতে। কিন্তু 'সোনার খাট বিছানা' অর্থাৎ অপর্যাপ্ত আরামকে উপেক্ষা করেই তারা প্রত্যাবর্তন করেছে স্বস্থানে অবশ্য কৃতজ্ঞ রাজার কাছ থেকে 'যত বাঘেরা বিদায় পাইল'[৪৭০]

এইভাবে সভ্য নাগরিকের বিশ্বাসঘাতকতার ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থচেতনার বৈপরীত্যে অনার্য সম্প্রদায়ের শারীরিক বল ও মানসিক মহত্ত্ব উজ্জ্বল প্রভা বিস্তার করেছে। আর আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বন্দ্বের দীর্ঘ বিদ্বেষের পথটিকে চিরতরে রুদ্ধ করেছে।

বাংলা লোককথাগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনায় এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সৎ-অসৎ দক্ষ-অদক্ষ ন্যায় পরায়ণ, লোভী, স্বার্থপর—সর্বপ্রকারের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনই বহন করে চলেছেন রাজকুল। অবশ্য রাজপ্রাসাদের বিলাস-ব্যসন শাসন-সংগ্রামে অবরুদ্ধ জীবন কখনো রাজার ক্ষেত্রে ডেকে এনেছিল এক মানসিক অতৃপ্তি, যা মুক্তি খুঁজে পেয়েছিল স্বেচ্ছা নির্বাসনে কিংবা ত্যাগমণ্ডিত সন্ন্যাসী জীবনে।

'শীত-বসন্ত'[৪৭১] গল্পে 'সকল খোয়াইয়া সকল হারাইয়া রাজা আর সুয়ো রাণীর মুখ দেখিলেন না, রাজা বনবাসে গেলেন।'[৪৭২]

—আত্মগ্লানি থেকেই এই সংসার ত্যাগ করে আরণ্যক জীবন গ্রহণের ভাবটির জন্ম, যেখানে কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে ঘটবে চিত্তশুদ্ধি।

রাজার বেটা মোহনলাল[৪৭৩] তাই সংসার জীবনের জটিলতা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছে তপস্যায়—

'রাজা যে মোহনলাল, চেৎ নাই ভেৎ নাই, ভেড়ার পাল হারাইয়া তীর ধনুক ফেলিয়া রাজা তপস্যায় গেলেন।'[৪৭৪]

'দেড় আঙ্গুলে'[৪৭৫] গল্পেও যে পিপ্পলকুমারের[৪৭৬] সঙ্গে রাজার বিরোধ, শেষে তার হস্তেই রাজত্ব ও রাজকন্যা সমর্পণ করে রাজদম্পতি—শান্তির জন্য অবলম্বন করেছে বাণপ্রস্থ আশ্রমের শুচি স্নিগ্ধ সংযমী জীবন—

'তখন রাজা শ্বশুর, রাণী শাশুড়ী, জামাই বেয়াইকে রাজ্য দিয়া তপস্যায় গেলেন।[৪৭৭]

অর্থাৎ গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ যথাযথভাবে চতুরাশ্রমের প্রতিটি পর্যায়কে পালন না করলেও তার কিছু নিদর্শন এই রাজবৃত্তে অঙ্কিত। প্রজাপালন

ও রক্ষার মাধ্যমে রাজার গার্হস্থ্য জীবন কর্তব্য নির্বাপিত করেছে এবং বৃদ্ধকালে মুক্তচিত্তে সংসার-জীবন থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি--বাংলার লোককথার রাজন্যবর্গের এইখানেই অভিনবত্ব।

উল্লেখপঞ্জী

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী, ফাল্গুন, বাং ১৩৯৪, পৃ. ১৭৫

২। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দেজ পাবলিশিং বৈশাখ ১৪০০, পৃ.৩১৮

৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ষোড়শ সংস্করণ বাং ১৩৯৩, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৩৭

৪। ঐ, পৃ. ৬০

৫। ঐ, মালঞ্চমালা, পৃ. ১৫৫-২২০

৬। ঐ, শঙ্খমালা, পৃ. ২৯৮

৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরমার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ভাদ্র ১৪০০, পৃ.৫

৮। ঐ

৯। ঐ

১০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ৪৯

১১। Mcculloch William, Bengali Household Tales. The Triple Theft. London. 1912. P. 175-206

১২। চক্রবর্তী বরুণ কুমার, প্রসঙ্গ লোকপুরাণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স, জানুযারী, ১৯৯১, পৃ: ৮০

১৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ১৮২

১৪। ঐ

১৫। ঐ, পৃ: ১৮৩

১৬। মণিরুজ্জামান মোহম্মদ, ঢাকার লোককাহিনী, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯২।

১৭। ঐ, প্রথম গল্প, পৃ: ৬

১৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ১৯৪

১৯। ঐ, পৃ: ১৫৮

২০। ঐ, পৃ:১২১

২১। ঐ, পৃ: ১৯৩

২২। ঐ, পৃ: ৫০

২৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ ২১

২৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ৩৩

২৫। Dey Lal Behari, Folk Tales of Bengal. Uccharan. 1993 P. 205-212

২৬। ঐ, P. 206

২৭। ঐ

২৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ৪২

২৯। ঐ, পৃ: ৭

৩০। ঐ, পৃ: ২৭
৩১। ঐ, পৃ: ৩
৩২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ১২২
৩৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ৪
৩৪। ঐ, পৃ: ২৯
৩৫। ঐ
৩৬। ভৌমিক নির্মলেন্দু, বিহঙ্গচারণা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৮৫, পৃ. ৫৯১-৫৯৩
৩৭। ঐ, পৃ: ৯৩
৩৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ২৩২
৩৯। ঐ, পৃ: ২৩৩
৪০। ঐ, ২৩৪
৪১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), P. 197-196
৪২। মজুমদার আশুতোষ, মেয়েদের ব্রতকথা, দেবসাহিত্য কুটীর, ১৯৯০, পৃ: ২৫৪
৪৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ৩৩-৯৮
৪৪। ঐ, পৃ: ২২৫-২৭০
৪৫। ঐ, পৃ: ২৩৫
৪৬। মজুমদার আশুতোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ:৪৬-৫০
৪৭। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) P. 192-196
৪৮। ঐ, P. 181-191
৪৯। ঐ, P. 188
৫০। ঐ, P. 1-14
৫১। ঐ, P. 10
৫২। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, বেড়াল ঠাকুরঝি, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৮, পৃ: ৭০-৭৮
৫৩। সিদ্দিকী আশরাফ, কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫
৫৪। ঐ, পৃ:২৬-৩৩
৫৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ১২৯-১৪০
৫৬। ভৌমিক নির্মলেন্দু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৬ সংখ্যক), পৃ: ৫৭৬-৫৭৭
৫৭। ঐ, পৃ: ৫৭৩
৫৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ৭৯-৮৬
৫৯। ঐ, পৃ: ৮১
৬০। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ:১৫৪
৬১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ১০৫-১৫০
৬২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ২৫-৩০।৬৩) রায় চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী, পাত্রজ পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ: ৩১১-৩১৪
৬৪। বসাক শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, পুস্তক বিপণি, মে ১৯৯৮। পৃ:১৭৮-১৮৮
৬৫। ঐ, পৃ: ১৮৪
৬৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ. ৩৬০
৬৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ১০০
৬৮। ঐ, পৃ: ৯৭

৬৯। ঐ, পৃ: ৭৫-৭৬
৭০। ঐ, পৃ: ৭৫
৭১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক)
৭২। ঐ, P. 57-81
৭৩। ঐ, P. 59
৭৪। Indian Antiquiry, Vol-1, The Second Story,1872, P, 170-172
৭৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭সংখ্যক) পৃ. ৬৫-৭৮
৭৬। ঐ, পৃ: ৯৫-১০৫
৭৭। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), P. 107
৭৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ১০০
৭৯। Indian Antiquiry, Vol-IV, 1875, P. 53-59
৮০। ঐ, P. 54-55
৮১। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ রাক্ষস, খোক্কস, মডার্ন বুক এজেন্সী, পঞ্চদশ সংস্কারণ, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত
৮২। ঐ, বুড়ো রাক্ষস, পৃ:৩৫-৩৮
৮৩। ঐ
৮৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ১৫১-২২০
৮৫। ঐ, পৃ: ১৯০
৮৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ৯৭
৮৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ১৩৪
৮৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ৪৫
৮৯। ঐ, মধুমালা, পৃ: ৫৫
৯০। ঐ, পৃ: ৬৩
৯১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ১২
৯২। ঐ, পৃ: ১৩
৯৩। ঐ
৯৪। ঐ, পৃ: ৫৭
৯৫। ঐ, পৃ: ৪৩-৪৪
৯৬। ঐ, পৃ: ৫
৯৭। ঐ, পৃ: ৩৯
৯৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ২৯-১০০
৯৯। ঐ, পৃ: ৯২
১০০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক) পৃ. ১৪০
১০১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, দাদামশায়ের থলে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৮৮, পৃ ৭৫-১০৭
১০২। ঐ, পৃ, ৮১
১০৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) পৃ. ১৪১-১৫০
১০৪। ঐ, পৃ: ১০৭
১০৫। ঐ, পৃ: ১৬৬
১০৬। ঐ, পৃ: ১৮৯

১০৭। ঐ, পৃ: ১৯৬
১০৮। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৫, পৃ: ২৯৯-৩০১
১০৯। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ:১৮০
১১০। Chowdhury Kabir, Folk Tales of Bangaladesh, Dacca, Bangla Academy, 1972. P. 78-110
১১১। ঐ, P. 91
১১২। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫২ সংখ্যক), পৃ:৬৬-৬৭
১১৩। ঐ, পৃ: ৬৬
১১৪। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ:৫৩
১১৫। ঐ
১১৬। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৩ সংখ্যক) পৃ: ৩১১-৩১৪
১১৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ: ৩১১-৩১৩
১১৮। দত্ত রত্না, প্রাচীন ভারতের প্রশস্তিকারের বর্ণনায় রাজা, ঐতিহাসিক, ৩ বর্ষ, ২-৪ সংখ্যা, জুলাই ১৯৮১, পৃ:৩
১১৯। বসাক শীলা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৪ সংখ্যক), পৃ: ১১৮-১২১
১২০। ঐ, পৃ: ১১৯
১২১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক)। P. 15-16
১২২। ঐ, P. 42
১২৩। বসাক রাধাগোবিন্দ, কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৮১, পৃ: ৬
১২৪। ঐ, পৃ: ১৩
১২৫। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৫ সংখ্যক), ৩০৭-৩১০
১২৬। ঐ, পৃ: ৩১০
১২৭। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (৫২ সংখ্যক), পৃ· ৬৭
১২৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ:১৫১-২০০
১২৯। ঐ, পৃ: ২০৫
১৩০। ঐ
১৩১। ঐ, পৃ: ১০১-১৫০
১৩২। ঐ, পৃ: ১১৩
১৩৩। ঐ, পৃ: ৫০
১৩৪। ঐ, পৃ: ২৯-১০০
১৩৫। ঐ, পৃ:১৫১-২০০
১৩৬। ঐ, পৃ: ১৬৩
১৩৭। ঐ, পৃ: ১৫৮
১৩৮। ঐ, পৃ: ১৫৯
১৩৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ ([illegible] সংখ্যক), পৃ: ২৮
১৪০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৪৪
১৪১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ:৫০-৬৩
১৪২। ঐ, পৃ: ৫১
১৪৩। ঐ
১৪৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২১৯

১৪৫। ঐ, পৃ: ২১৭
১৪৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৫০-৬৩
১৪৭। ঐ, পৃ: ৫৩
১৪৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২৭২-৩৭১
১৪৯। ঐ, পৃ: ৩৫৭
১৫০। ঐ,
১৫১। ঐ, পৃ: ৩৭১
১৫২। ঐ,
১৫৩। ঐ, পৃ: ১৯১
১৫৪। ঐ, পৃ: ২১০
১৫৫। Dey Lal Behari,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p.197-204
১৫৬। ঐ, p 203
১৫৭। ঐ, p.204
১৫৮। Indian Antiquiry, Vol-1, 1872, p.172
১৫৯। বসাক রাধাগোবিন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৩ সংখ্যক), পৃ·২৩
১৬০। বসাক শীলা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক), পৃ: ১৭৮-১৮৮
১৬১। ঐ, পৃ: ১৮৩
১৬২। ঐ, পৃ:১৮১
১৬৩। Dey Lal Behari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p. 205-222
১৬৪। ঐ, p 212
১৬৫। ঐ, p. 82-95
১৬৬। ঐ, p. 92
১৬৭। বসাক শীলা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬৪ সংখ্যক), পৃ: ১৭৯
১৬৮। বসাক রাধাগোবিন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৩ সংখ্যক), পৃ: ১১
১৬৯। ঐ, পৃ: ৩১
১৭০। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p. 124
১৭১। মিত্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ৫০
১৭২। মিত্র মজুমদার পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ১১০-১২৫
১৭৩। ঐ, পৃ: ১১১
১৭৪। ঐ, পৃ: ১১৩
১৭৫। ঐ, পৃ: ১১৪
১৭৬। ঐ, পৃ: ১২০
১৭৭। ঐ, পৃ: ১২২
১৭৮। ঐ, পৃ: ১২৩
১৭৯। ঐ, পৃ: ১২৩
১৮০। ঐ, পৃ: ১২৪
১৮১। Benerjee Kasindranath. Popular Tales of Bengal. 1905, p. 181-186
১৮২। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা, শান্তিসদন পৃ: ২৯-৩০
১৮৩। ঐ, পৃ: ৩০

১৮৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ২০
১৮৫। ঐ, পৃ: ৬৪৬
১৮৬। বসাক রাধাগোবিন্দ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৩ সংখ্যক), পৃ: ২০
১৮৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ:৯৫-১০৫
১৮৮। ঐ, পৃ: ৯৫
১৮৯। মণিরুজ্জামান মহম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৬ সংখ্যক)
১৯০। ঐ, পৃ: ৫১
১৯১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p. 139-158
১৯২। ঐ, p. 158
১৯৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ৭৫-১০৯
১৯৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ৩৪০
১৯৫। ঐ, পৃ: ৩৪০
১৯৬। দ্যতিয়েন ফাদার পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮২ সংখ্যক), পৃ: ৮৬
১৯৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২৭২-৩৭১
১৯৮। ঐ, পৃ: ৩৫৫
১৯৯। Dey Lál Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p.15-46
২০০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৮৭-৯৪
২০১। Dey Lal Behari,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p. 41
২০২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ২৫-৩০
২০৩। ঐ, পৃ: ৩১
২০৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ:১০১-১৫০
২০৫। ঐ, পৃ: ১৫১-২২০
২০৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ:৫০-৬৩
২০৭। ঐ, পৃ: ৫৩
২০৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১১০-১৫০
২০৯। ঐ, পৃ: ১৪৩
২১০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৩৫-৪৯
২১১। ঐ, পৃ: ৩৭
২১২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ:২৯-১০০
২১৩। ঐ, পৃ: ৪৯
২১৪। Mcculloch William.পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১ সংখ্যক), p. 152-175
২১৫। ঐ, p.173
২১৬। ঐ
২১৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ:৭৫-২০৯
২১৮। ঐ, পৃ: ৭৮
২১৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৯০
২২০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৫৫-২২০
২২১। ঐ, পৃ: ২১৯
২২২। ঐ, পৃ: ৪১

২২৩। মিত্র মজুমদার পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ:২৫-৩০
২২৪। ঐ, পৃ: ২৬
২২৫। Indian Antiquiry. Vol-111, 1874, p.342
২২৬। সিদ্দিকী আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৩ সংখ্যক), পৃ: ১৫-১৬২
২২৭। ঐ, পৃ: ১৫৮
২২৮। ঐ
২২৯। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫২ সংখ্যক), পৃ: ৭০-৭৮
২৩০। ঐ, পৃ: ৭০
২৩১। ঐ, পৃ: ৭২
২৩২। ঐ, পৃ: ৭৩
২৩৩। Mcculloch William,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১ সংখ্যক), p. 228-239
২৩৪। ঐ, p.228
২৩৫। Dey Lal Behari,পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p.182-191
২৩৬। ঐ, p. 191
২৩৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ:১১০-১২৫
২৩৮। ঐ, পৃ: ১১৯
২৩৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৩-২০
২৪০। ঐ, পৃ: ১৬
২৪১। ঐ, পৃ: ১৩
২৪২। ঐ, পৃ: ১৫
২৪৩। ঐ, পৃ: ১৬
২৪৪। ঐ, পৃ: ২০
২৪৫। ঐ
২৪৬। মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ:, ১৬৯
২৪৭। ঐ
২৪৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ:৩-১৭
২৪৯। ঐ, পৃ: ৫
২৫০। ঐ, পৃ: ১৫
২৫১। ঐ পৃ: ১৫
২৫২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ:১৫১-২১০
২৫৩। ঐ, পৃ: ১৭১
২৫৪। ঐ, পৃ: ১৯১
২৫৫। ঐ, পৃ: ২০৭
২৫৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ:৩-২০
২৫৭। ঐ, পৃ: ৯
২৫৮। ঐ, পৃ: ৫
২৫৯। ঐ, পৃ: ৩৫-৪৯
২৬০। ঐ, পৃ: ৩৭
২৬১। ঐ, পৃ: ৩৭

২৬২। গুপ্ত বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫২ সংখ্যক), পৃ: ৭০-৭৮
২৬৩। ঐ, পৃ:, ৮৪-৮৭
২৬৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ:৫০-৬৩
২৬৫। ঐ, পৃ: ৩১-৩৪
২৬৬। ঐ, পৃ: ৩২
২৬৭। Dey Lal Behari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p. 159-162
২৬৮। মনুসংহিতা পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৬৪ সংখ্যক), পৃ: ১৬৭
২৬৯। Dey Lal Behari পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক), p. 160
২৭০। ঐ p. 160
২৭১। ঐ, p. 162
২৭২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ২৭২-৩১৭
২৭৩। ঐ, পৃ: ৩৪৬
২৭৪। ঐ, পৃ: ৩৪৬
২৭৫। Mcculloch William পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১ সংখ্যক), p. 119-125
২৭৬। ঐ, পৃ: ১২৪
২৭৭। Chowdhury Kabir, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৭ সংখ্যক),
২৭৮। ঐ, পৃ: ৯২
২৭৯। মমনুসংহিতা পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৪৬ সংখ্যক), পৃ: ১৮৫
২৮০। ঐ, পৃ: ১৮৫
২৮১। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ: ৭ ১১
২৮২। ঐ, পৃ: ৯
২৮৩। মনুসংহিতা পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৪৬ সংখ্যক), পৃ. ১৬৭
২৮৪। মিত্র মজুমদাব দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৭২ সংখ্যক), পৃ: ১১১
২৮৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২৯-১০০
২৮৬। ঐ, পৃ: ৪৮
২৮৭। ঐ, পৃ: ৩৩
২৮৮। ঐ, পৃ: ১০১-১৪০
২৮৯। ঐ, পৃ: ১০৯
২৯০। ঐ
২৯১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৭৫-৭৬
২৯২। ঐ, পৃ: ৬৮
২৯৩। ঐ, পৃ: ৭২
২৯৪। ঐ, পৃ: ৭৮
২৯৫। ঐ, পৃ: ২৪
২৯৬। ঐ, পৃ: ১২৯-১৪০
২৯৭। ঐ, পৃ: ১৪০
২৯৮। ঐ
২৯৯। ঐ, পৃ: ৩৫-৪৯
৩০০। ঐ, পৃ: ৩৮

৩০১। ঐ, পৃ: ৪৯
৩০২। ভট্টাচার্য ফ্রান্স; ঠাকুরমার ঝুলি, একটি পাঠ, এক্ষণ ১৩ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, জুন ।৯৭৮, পৃ: ১৮
৩০৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৮১
৩০৪। ঐ
৩০৫। ঐ, পৃ: ৫০-৬১
৩০৬। ঐ, পৃ: ৫৩
৩০৭। ঐ, পৃ: ৬৩
৩০৮। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, বাংলার লোককথা, পুস্তক বিপণি, ১৪০৮ হিজরী, শ্বেত বসন্ত, পৃ: ১১
৩০৯। ঐ, পৃ: ১১
৩১০। ঐ, পৃ: ১২৮-১৩৯
৩১১। ঐ, পৃ: ১২৯
৩১২। ঐ, পৃ: ১৩৯
৩১৩। সিদ্দিকি আশরাফ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৩ সংখ্যক), পৃ: ১০৮-১৩৯
৩১৪। ঐ, পৃ: ১২৯
৩১৫। ঐ, পৃ: ২৬-৩৩
৩১৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৩-২০
৩১৭। ঐ, পৃ: ৩৫-৪৯
৩১৮। ঐ, পৃ: ৯
৩১৯। ঐ, পৃ: ৯
৩২০। ঐ, পৃ: ৩৫-৪৯
৩২১। ঐ, পৃ: ৩৭
৩২২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ১০৭
৩২৩। ঐ, পৃ: ২৮২
৩২৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 162-171
৩২৫। ঐ, p.162
৩২৬। ঐ
৩২৭। ঐ, p. 171
৩২৮। ঐ, p. 171
৩২৯। ঐ, p. 57-81
৩৩০। ঐ, p. 68
৩৩১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৪২
৩৩২। ঐ
৩৩৩। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 401-410
৩৩৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণাবঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৬৫-৭৮
৩৩৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p.110
৩৩৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৩-২০
৩৩৭। ঐ, পৃ: ৯
৩৩৮। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p.1-15
৩৩৯। ঐ p.4

৩৪০। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ: ৬
৩৪১। ঐ, পৃ: ৪
৩৪২। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮১ সংখ্যক), পৃ:৪৫-৫৩
৩৪৩। ঐ, পৃ: ৪৫
৩৪৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্তি গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২৭২-৩৭১
৩৪৫। ঐ, পৃ: ৩২০
৩৪৬। ঐ, পৃ: ৩৩১
৩৪৭। ঐ, পৃ: ৩৩২
৩৪৮। ঐ
৩৪৯। মনুসংহিতা পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪৬ সংখ্যক), পৃ: ১৮১
৩৫০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৪০
৩৫১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 129
৩৫২। ঐ p. 129-138
৩৫৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৫০-৩
৩৫৪। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮১ সংখ্যক), পৃ: ৩২-৪০
৩৫৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p.129
৩৫৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৫১-২০০
৩৫৭। ঐ, পৃ: ১০১-১৫০
৩৫৮। ঐ, পৃ: ১৫৭
৩৫৯। ঐ, পৃ: ৪৫
৩৬০। ঐ, পৃ: ১৩৮
৩৬১। ঐ
৩৬২। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 139-158
৩৬৩। ঐ p. 153
৩৬৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৬৩
৩৬৫। ঐ, পৃ: ২০৮
৩৬৬। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ৮২-১১৭
৩৬৭। ঐ, পৃ: ১০১
৩৬৮। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 152
৩৬৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ২০৮
৩৭০। ঐ, পৃ: ১০১
৩৭১। ঐ, পৃ: ২০১
৩৭২। ঐ
৩৭৩। ঐ, পৃ: ১৯৮
৩৭৪। ঐ, পৃ: ২০২
৩৭৫। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 65
৩৭৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৬৮
৩৭৭। ঐ, পৃ: ৬৮
৩৭৮। ঐ, পৃ: ৭১

৩৭৯। ঐ, পৃ: ৭০
৩৮০। ঐ, পৃ: ৭১
৩৮১। ঐ
৩৮২। ঐ, পৃ: ৭২
৩৮৩। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p.129-138
৩৮৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ১৩৯
৩৮৫। ঐ, পৃ: ১৩৮
৩৮৬। ঐ, পৃ: ১৩৯
৩৮৭। ঐ
৩৮৮। ভট্টাচার্য আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ১১৫
৩৮৯। ঐ, পৃ: ১১৬
৩৯০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ১০১-১৫০
৩৯১। ঐ, পৃ: ১২৪
৩৯২। ঐ
৩৯৩। ঐ, পৃ: ১২৬
৩৯৪। ঐ, পৃ: ১৩৪
৩৯৫। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত, (৪২ সংখ্যক), পৃ: ১৮০
৩৯৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০১ সংখ্যক), পৃ: ৩ ১৭
৩৯৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১৫১-২০০
৩৯৮। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৮৭-৯৪
৩৯৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 15-46
৪০০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৬৫-৭৮
৪০১। ঐ
৪০২। ঐ, পৃ· ৭৯-৮৬
৪০৩। ঐ, পৃ: ১০৫
৪০৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p.104-110
৪০৫। ঐ p. 110
৪০৬। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ১৫১-২০০
৪০৭। ঐ, পৃ: ১৩৮
৪০৮। ঐ, পৃ: ১৪১
৪০৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p.16
৪১০। ঐ p. 129-138
৪১১। ঐ p. 15-46
৪১২। ঐ p. 103
৪১৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৭৯-৮৬
৪১৪। ঐ, পৃ: ৮২
৪১৫। ঐ, পৃ: ৮৪
৪১৬। দ্যতিয়েন ফাদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮২ সংখ্যক) পৃ: ৯৯
৪১৭। বসাক রাধাগোবিন্দ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১২৩ সংখ্যক), পৃ: ৬ · ·

৪১৮। দ্যতিয়েন ফাদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮২ সংখ্যক)
৪১৯। ঐ, পৃ: ৪৩
৪২০। ঐ
৪২১। Mcculloch William, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১১ সংখ্যক) p.30-35
৪২২। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৬৫
৪২৩। ঐ, পৃ: ৯৫-১০৫
৪২৪। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 57-81
৪২৫। ঐ p. 82-96
৪২৬। ঐ p. 104-111
৪২৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৬৫
৪২৮। ঐ, পৃ: ৯৫-১০৫
৪২৯। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 106
৪৩০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৬৭
৪৩১। ঐ
৪৩২। ঐ, পৃ: ৩৫-৪৯
৪৩৩। ঐ, পৃ: ৪০
৪৩৪। ঐ, পৃ: ৩১-৩৪
৪৩৫। ঐ, পৃ: ৩২
৪৩৬। ঐ, পৃ: ৫০-৬৩
৪৩৭। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 205-222
৪৩৮। ঐ p. ১১১-১২১
৪৩৯। ঐ p. ১১৮
৪৪০। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ২৭
৪৪১। ঐ, পৃ: ২৭
৪৪২। ঐ, পৃ: ৩০
৪৪৩। ঐ, পৃ: ২৬
৪৪৪। ঐ, পৃ: ৩০
৪৪৫। মজুমদার আশুতোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪২ সংখ্যক), পৃ: ১৭৫-১৭৬
৪৪৬। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২৫ সংখ্যক) p. 96-103
৪৪৭। ঐ p. 97
৪৪৮। ঐ p.103
৪৪৯। মিত্র মজুমদাব দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃ: ১০১-১৫০
৪৫০। ঐ, পৃ: ১২৯
৪৫১। ঐ, পৃ: ১৪১
৪৫২। ঐ, পৃ: ১৪৯
৪৫৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃ: ৫০-৬৩
৪৫৪। ঐ, পৃ: ৫৮
৪৫৫। ঐ, পৃ: ৫৯
৪৫৬। ঐ, পৃ: ৬০

৪৫৭। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃঃ ১৬৮
৪৫৮। ঐ, পৃঃ ২১৬
৪৫৯। ঐ, পৃঃ ১৬৮
৪৬০। ঐ, পৃঃ ১৬৯
৪৬১। ঐ, পৃঃ ২১৩
৪৬২। ঐ, পৃঃ ২১৮
৪৬৩। ঐ, পৃঃ ২২০
৪৬৪। ঐ, পৃঃ ২২০
৪৬৫। ঐ, পৃঃ ১৫১-২০০
৪৬৬। ঐ, পৃঃ ১৮২
৪৬৭। ঐ, পৃঃ ১৮২
৪৬৮। ঐ, পৃঃ ২০২
৪৬৯। ঐ, পৃঃ ২১৯
৪৭০। ঐ, পৃঃ ২২০
৪৭১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃঃ ৩৫-৪৯
৪৭২। ঐ, পৃঃ ৪০
৪৭৩। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), পৃঃ ৩৭০
৪৭৪। ঐ, পৃঃ ৩৭০
৪৭৫। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), পৃঃ ১২৯-১৪০
৪৭৬। ঐ, পৃঃ ১৪০
৪৭৭। ঐ, পৃঃ ১৪০: ১৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোককথায় ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস ও লোককথা বিশিষ্ট অর্থে পরম্পরাশ্রয়ী। উভয়ের সংযোগেই প্রাচীন প্রসঙ্গে বর্তমানের জ্ঞান বিস্তারের অবকাশ —

'Combined history and folktale can restore much of the picture of early times and can work through the fullness of later times with some degree of success.'[১]

'ইতিহাস রচনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রায় অস্পষ্ট অতীত থেকে সময়ের সূত্র বেয়ে ধীরে ধীরে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসা, প্রত্ন-সাক্ষ্যের পদচিহ্ন অনুসরণ করে।'[২] লোকসাহিত্য সরবরাহ করে চলে হারানো অতীতের অজস্র উপাদান। অবশ্যই অবিমিশ্র ঐতিহাসিক তথ্য সেখানে থাকেনা। থাকে না কোন বিশেষ একটি যুগ অথবা বিশিষ্ট এক সমাজের নিরেট এক সত্য তথ্য। তবুও যুগ ঐতিহ্যমূলক বিবর্তন-ধর্মিতার জন্য লোকসাহিত্য হয়ে ওঠে সামগ্রিক সমাজ-চৈতন্যের বাহক—

'Folklore can serve as a store house of information to the historian.'[৩]

—যথাযথভাবে সংগৃহীত লোকসংস্কৃতিব উপাদান, ঐতিহাসিক তথ্যরাজির অমূল্য সংরক্ষণ ভাণ্ডার, গবেষকদের এই মতটি লোককথা সম্পর্কেও সর্বদা প্রযোজ্য। বাংলা লোককথা সমগ্র জাতি বিশেষের সমবেত ঐতিহাসিক সৃষ্টি এবং জাতীয় মানসের যৌথ অভিব্যক্তি। স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র বাঙালী জাতির জীবনেতিহাসের খণ্ডচিত্র লোককথায় সুলভ। সেই খণ্ড বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্যেই একদিকে যেমন ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিভিন্ন যুগ-নির্যাস ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে ইতিহাস-নির্দিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের কোন কোন স্মৃতি ফলকও প্রোথিত হয়ে লোককথার বিস্তীর্ণ জমিতে।

লোককথার সঙ্গে ঐতিহাসিক নিদর্শনের প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রধানত দুভাবে ঘটেছে। গল্পের কথক গল্পের আদি ডৌলটি বজায় রেখে তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ অনুযায়ী কোথাও যখন উপভোগ্য বাড়তি উপাদানের প্রলেপ দেন, তখনই সমসাময়িক বাস্তবতার নির্দিষ্ট উপকরণ অর্থাৎ ব্যক্তি, স্থান বা বস্তু, কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গল্পকে বিশ্বাস্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়।

অপরদিকে, বিশিষ্ট কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব স্থান বা ঘটনা অবলম্বন করেও রচিত হয় বিচিত্র জনশ্রুতি, যা লোককথার এক সমৃদ্ধ শাখা কিংবদন্তীর বিষয়বস্তু। এবার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বাংলা লোককথায় প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর আলোচনা করা যাক্।

বাস্তব অস্বিত্ব-সম্পন্ন যে নদীটি তার বহতা স্রোত নিয়ে বারংবার উপস্থিত হয়েছে, সেটি গঙ্গা—

১) গঙ্গার জলে সিনান কর রে শক্তি, দুঃখের গেল দিন।[৪]

২) ভোরে চৌকাঠের উপর গঙ্গাজল; ধূপের ধোঁয়ায় ঘর পাগল।[৫]

গঙ্গার পবিত্রতা সম্পর্কিত এই বোধটি প্রাচীন। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—

'গঙ্গাজলকে পাপীতাপী আর্ত ও মুমূর্ষুর অনন্যশরণ পরিকল্পনা পূর্বক, স্মৃতিকার আর্যসমাজের উপনিবেশ একটা নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া জাতীয় ঐক্য দৃঢ়বদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।'[৬]

—অর্থাৎ, দীনেশচন্দ্রের মতে, গঙ্গাপূজার এই ধারণাটি পৌরাণিক, গঠনোন্মুখ প্রাচীন আর্যসমাজে উদ্ভূত ধর্মীয় সংস্কার।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের বক্তব্যেও গঙ্গাপূজার ইঙ্গিত পাই—

"There is also abundant evidence that worship of the Ganga, Yamuna and matrikas from the sixth century A.D onwards.'[৭]

মকরবাহিনী গঙ্গামূর্তির প্রসঙ্গও লোককথায় এসেছে—'অমনি মা গঙ্গা তখন মকরে চড়ে এসে আঁচল পেতে কড়িগুলি নিলেন।'[৮]

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে—'মকরবাহিনী গঙ্গার মূর্তি, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বের স্থাপত্য রীতির নিদর্শন।'[৯]

ঐতিহাসিক মতে, 'গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া মাল বিদেশে রপ্তানি হইত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সমৃদ্ধি বজায় ছিল।'[১০]

লোককথায় গঙ্গাতীরস্থ বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য ধরা পড়েছে—'গঙ্গার কিনারে এক বন্দরে অনেক বেনে।....সওদা নায়ে থেকে নামায় উঠায়।[১১] রাক্ষসদের সঙ্গে রাজপুত্রের সংঘাত রূপকথার অতি পরিচিত অভিপ্রায়।' 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে'[১২] রাক্ষসের দেশ। কোন কোন লোককথায় উল্লিখিত হয়েছে যে—'লঙ্কাদেশ রাক্ষসের রাজ্য। রাজপুত্র সাঁতার দিয়ে ভাসতে ভাসতে সেই লঙ্কাদেশের কিনারায় এলেন।'[১৩] এই 'লঙ্কাদ্বীপের অপর নাম সিংহল তথা শ্রীলঙ্কা। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ৩২ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি প্রণালী দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন।...ভারতের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আবহমান কাল হইতেই বিদ্যমান।'[১৪] 'বৃহৎবঙ্গ'[১৫] গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন দ্বীপবংশ, মহাবংশ, কুলবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকারের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[১৬] ঐ একই কাহিনী আবার পাচ্ছি মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'প্রাচীন বাংলার গৌরব'[১৭] গ্রন্থে। ডঃ দীনেশচন্দ্র এই ঘটনায় আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের ছায়াপাতও লক্ষ্য করেছেন।[১৮] আরও বলেছেন 'এই সিংহলের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্বন্ধের সংস্কার মূলক কাহিনী বঙ্গসাহিত্যের অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে।'[১৯] অর্থাৎ রাজপুত্রদের রাক্ষসের রাজ্যে অভিযানের মধ্যে আমরা অনার্য, অধ্যুষিত লঙ্কাদ্বীপে, অপেক্ষাকৃত উন্নত আর্য প্রতিনিধি যাত্রার ইঙ্গিত পাচ্ছি।

এছাড়া, 'লঙ্কা স্বর্ণ রৌপ্য সম্পদে পরিপূর্ণ এবং প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র'[২০]—

ঐতিহাসিক এই সত্যতার সমর্থন লোকগল্পে প্রায়শই দেখা যায়—

'The Raja advised the merchant to buy gold from Lanka.'[২১]

দুর্দান্ত দস্যুর আক্রমণ লোককথার সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করেছে বারংবার এ প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। চোর, ডাকাত বা দস্যু হিসাবে যাদের সাধারণ পরিচিতি, কখনো বা সেই দলে ঐতিহাসিক বিভীষিকা ঠগী তথা ফাঁসুড়ে সম্প্রদায়কেও লক্ষ্য করা গেছে। ঠগী সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যসার এইরূপ—

'ঠগ বা ঠগী একটি দস্যু সম্প্রদায়ের নাম। ইহারা দলে দলে পথিকের ছদ্মবেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিত এবং কথাবার্তায় অন্যান্য পথিকদের সঙ্গে ভাব করিয়া তাহাদের সঙ্গ লইত। পরে অবসর মতো তাহাদের গলে রুমাল বা অন্য প্রকার ফাঁস লাগাইয়া তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ঠগ দস্যুদের [২২] উপদ্রব ছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঠগীদের উপদ্রব চরমে পৌঁছিয়াছিল।'

'ঠগেরা পুরুষানুক্রমে হনন ও চৌর্যকার্যে নিযুক্ত থাকিত। ঠগগণের অপর নাম ফাঁসিগর বা ফাঁসুড়ে। বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে কর্নেল উইলিয়াম শ্লীম্যান ঠগীদলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন।'[২৩]

'বিদ্যাবতী'[২৪] গল্পটিতে ফাঁসুড়ে ডাকাত মনোহরের উল্লেখ পাই। মনোহর, [২৫] তার সঙ্গী হিধা, [২৬] সিধা,[২৭] মাধা[২৮] এই নামগুলি কাল্পনিক, কিন্তু তাদের আচরণ অনেকটা বাস্তবের ফাঁসুড়ে তথা ঠগীর অনুসারী। গল্পটিতে তারা বিদ্যাধরের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছে, আত্মীয়তার ছলনায় বিদ্যাধরের কাছে রক্ষিত পাঁচটি মানিক হস্তগত করার চেষ্টা করেছে ও নির্জন স্থানে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। অবশ্য,ফাঁস নয়, ছুরির সাহায্যে।

অর্থাৎ লোকমনকে উত্যক্ত করেছে যে অতীত স্মৃতি, লোককথায় তারই চিহ্ন ফুটে উঠেছে—

'The tradition of all the dead generations weight like a nightmare on the brain of the living.'[২৯]

আশার কথা এটাই যে, কেবল বিভীষিকাময় স্মৃতিসর্বস্ব নয় লোককথার জগৎ। গতিশীল সমাজ ও জীবনে বাস্তবতার অনিবার্য অনুষঙ্গে লোককথায় আশ্রয় লাভ করেছে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ, পালাবদলকারী ঘটনা এবং ঘটনা সংগঠনের ক্ষেত্র সমূহ। বলা চলে লোককথার কষ্টিপাথরে ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের পুনর্মূল্যায়ন ঘটেছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের চেতনায় সঞ্চার করেছে বহুমুখী আদর্শ সম্পৃক্ত বলিষ্ঠ বিশ্বাস।

'Thus the awakening of the dead in those revolutions serve the purpose of glorifying the new struggles.'[৩০]

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

ইতিহাস খ্যাত নৃপতি, কবি, ধর্মপ্রচারক এমন কি দুর্দান্ত দস্যুকেও কেন্দ্র করে লোককথা ঘটনাজাল বয়ন করে চলেছে। সেই সকল কাহিনী থেকে আমরা যেমন ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সন্ধান পাই, তেমনি লোকমানসের ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত কি কি

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তারও হদিস পাওয়া যেতে পারে। কয়েকটি নিদর্শন উল্লেখিত হল।

রাজা বিক্রমাদিত্য—প্রজাবৎসল জনপ্রিয় এই নৃপতি বারংবার তাঁর যাবতীয় সদ্‌গুণ সহযোগে আবির্ভূত হয়েছেন লোককথায়। 'The Two Bridegrooms.'[৩১] 'King Vikramaditya and his bride'[৩২] ইত্যাদি একাধিক লোককথায় কেবল সুশাসক হিসাবেই নয়, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবেও তিনি চিহ্নিত হয়েছেন—

'Before his birth Vikramaditya was declared by Siva to be distinctive to hold supremacy over all Rakshasas, Yakshas, Vetal'[৩৩]

এই নৃপতি সম্পর্কে কোষগ্রন্থে বলা হয়েছে—

'চন্দ্রগুপ্ত ২য় (৩৭৬/৮০-৪১৫) প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৬ অথবা ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এদেশে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী[৩৪] আছে। কেহ কেহ মনে করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই জনপ্রবাদে বিক্রমাদিত্য। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার স্বাধীন অঙ্গরাজ্যগুলির উপর গুপ্তরাজগণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলার সামন্ত প্রভুরা সর্বান্তঃকরণে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন সমুদ্রগুপ্তের—

'The rulers of Bengal gratified the emperor Samudragupta by payment of all kinds of tribute by obedience to his command and by approach for paying court to him.'[৩৫]

বাংলায় এই প্রতাপ অব্যাহত ছিল সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময় অবধি, এতথ্যও উল্লেখ করেছেন ঐতিহাসিক।

'............ the Son of Samudragupta had to reconquer the province by defeating different states of Bengal.'[৩৬]

অর্থাৎ সুশাসক চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বাংলার লোকমানস পরিচিত ছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণ প্রমাণ করে যে তিনি সুশাসক ও প্রজাবৎসল ছিলেন।[৩৭] সুতরাং প্রজারা তাঁকে ভক্তি করবে এবং তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করবে এটাই স্বাভাবিক।

অপরদিকে, বত্রিশসিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে রচিত হলেও যে বিপুল সংখ্যক বাঙালীর চিত্ত জয় করেছিল সে তথ্যের দিকে নির্দেশ করেছেন আশরাফ সিদ্দিকী—

'সংস্কৃত বেতাল পঞ্চবিংশতির বিক্রমাদিত্যকে এ ধরনের নায়ক বলা যেতে পারে। একটি মাত্র বীব অসীম সাহসী চরিত্র নানারূপ অসাধ্য সাধন করে লোকচিত্ত জয় করে থাকে।........ লোকমুখে বিপুল বিস্তৃতির মাধ্যমে এই রোমাঞ্চকর চরিত্রটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরাই 'Local legend' -এর জন্ম দেয়।'[৩৮]

অর্থাৎ একদিকে বেতালপঞ্চবিংশতির জনপ্রিয়তা ও অপরদিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের

সুশাসন প্রজাবাৎসল্য লোকমানসে এক দেবোপম বিক্রমাদিত্যকে সৃষ্টি করেছে, যিনি বীরত্ব চাতুর্য, ত্যাগ ও সাহসিকতার স্মারক।

কবি জয়দেব— 'গীতগোবিন্দের পদাবলীর ভণিতা থেকে জানা যায় যে কবি জয়দেবের জন্মস্থান ও নিবাস ছিল কেন্দুবিল্ব গ্রাম। ----কেন্দুবিল্ব সম্ভবরোহিনীরমণ। বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে অজয় নদের তীরে কেঁদুলি গ্রাম।'[৩৯]

'খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভায় গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ও জয়দেব এই পঞ্চরত্ন বর্তমান ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।'[৪০] এই বিদ্বৎপঞ্চকের মধ্যে জয়দেব কালজয়ী হয়েছেন। ইনি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁর বিখ্যাত কাব্য গীতগোবিন্দের কারণে।

একাব্যের ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত কিন্তু ভাব বাংলা। 'বাঙ্গালা দেশের কীর্ত্তনের আসরে অশিক্ষিত গায়কেরা পর্যন্ত গীত গোবিন্দের গান সর্বত্র গান করে।'[৪১]

জয়দেব সম্পর্কে অজস্র লোকশ্রুতি বিস্তার লাভ করেছে বাঙালী মননে। যেমন, জয়দেব ও তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী উভয়েই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন এবং বুড়ণ মিশ্র নামক সঙ্গীতশাস্ত্রে দিগ্বিজয়ীকে প্রকাশ্য রাজসভায় পরাস্ত করেছিলেন।[৪২] কখনো শোনা যায় যে দস্যুরা তাঁর হস্তপদচ্ছেদন পূর্বক সর্বস্ব অপহরণ করে কিন্তু দৈববলে সে অঙ্গ জোড়া লাগে।[৪৩] সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীটি এইরকম--

'কবি জয়দেব একবার স্মরগরলখণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং পর্যন্ত লিখে ভাবতে ভাবতে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং ভগবান কবি জয়দেবের রূপ ধরে পদ্মাবতীর অতিথি হয়ে গীতগোবিন্দের পুঁথি খুলে লিখে দিয়ে যান-- 'দেহি পদপল্লবমুদারম্।'[৪৪]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভক্তিরসাপ্লুত লোকচিত্তের কল্পনাই পক্ষবিস্তার করেছে কাহিনীগুলিতে। প্রতিভাবান ভক্তকবির প্রতিও লোকশ্রদ্ধা অর্পিত হয়ে চলেছে কবির জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে, প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত উৎসবের মধ্য দিয়ে--

'His birth place was Kendubilva where an annual fair is still held in his memory on the last day of the Bengali month Pausha.'[৪৫]

যবন হরিদাস, রামচন্দ্র খাঁ ও রাজনটী হীরা— এই তিনটি চরিত্র একটি বিশেষ লোককাহিনীর সূত্রে একত্রিত। ইতিহাস বলে -

'যবন হরিদাস (আনুমানিক ১৪৫০-১৫৩০খ্রী:) চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদের অন্যতম। ....সম্ভবত আঠার বৎসর বয়সে হরিপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া নিজ গৃহত্যাগ করিয়া অনতিদূরে বেনাপোলের বনমধ্যে হরিসাধনায় নিমগ্ন হন এবং রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন করিতেন। চৈতন্যদেবের বহু পূর্বেই অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র দান করেন। .. ....চৈতন্যদেবের পদতলে মাথা রাখিয়া আশি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।'[৪৬]

অপরদিকে বেনাপোলের ভূস্বামী ছিলেন বৈষ্ণব বিদ্বেষী রামচন্দ্র খাঁ। 'হরিদাসের কুটীরের প্রায় এক মাইল দূরে কাগজপুকুরিয়া গ্রাম। এই স্থানে রামচন্দ্র খাঁ নামক জনৈক

প্রতাপান্বিত জমিদার বাস করিতেন। ....তিনি মুসলমানের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলেও মুসলমানের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে তান্ত্রিক শাক্ত বলিয়া নব প্রচলিত বৈষ্ণব মতের বিরোধী ছিলেন।'[৪৭]

এই রামচন্দ্র খাঁ বারাঙ্গনা হীরা নটীর সহায়তায় ভক্ত হরিদাসের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের নিষ্ফল চেষ্টা করেছে। প্রচলিত লোককথা এই নিষ্ফলতাকেই ব্যাখ্যা করেছে ভক্তিতদ্‌গতচিত্তে। বৈষ্ণব ভক্ত হরিদাসের তিন লক্ষ বার হরিনাম জপের মধুর ঝঙ্কারই হীরানটীকে পরিণত করছে ভক্তিপ্রাণা এক সন্ন্যাসিনী রমণীতে। ব্যর্থ হয়েছে রামচন্দ্র খানের প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা।[৪৮] অর্থাৎ, যে নাম-মাহাত্ম্য বৈষ্ণব যুগের দান, সেই নামসঙ্কীর্তনের জয়যাত্রাই ঘোষিত হয়েছে লোককথাটিতে। এ প্রসঙ্গে মনীষী যদুনাথ সরকারের মতটি উল্লেখ করা যায়—

'Even greater than this moral reformation of the upper and middle classes has been the work of Vaishnavism in uplifting the lower ranks of society and the illiterate masses, by carrying religion to their doors through the device of Nam-Sankirtan or chanting processions.'[৪৯]

সাধক হরিদাসের সান্নিধ্য বারাঙ্গনা হীরার অন্তরে ত্যাগধর্মের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে। পাপার্জিত অর্থে সে তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্মাণ করে সুগম রাস্তা। —'উহা এখনও হীরার জাঙ্গাল নামে খ্যাত আছে। যশোহরের উত্তরাংশে কাজুরা প্রভৃতি গ্রাম হইতে এই রাস্তার সূচনা দেখা যায়।'[৫০]

পর্তুগীজ দস্যুরডা—ইওরোপের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্ররাজ্য পর্তুগাল থেকে বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে দলে দলে পর্তুগীজগণ এসে উপস্থিত হয় ভারতে। 'ক্রমে ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা প্রথম বঙ্গে আসে। ....১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন র‍্যালফ ফিচ্ বঙ্গে আসেন, তখন হুগলী সম্পূর্ণরূপে পর্তুগীজদের অধিকৃত দেখিতে পান। তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসা ছিল দস্যুতা ও ইন্দ্রিয় সেবা।'[৫১]

বাক্‌লা যশোর, হিজলী, উড়িষ্যায় পর্তুগীজ অত্যাচারে ত্রাহি রব ওঠে।

'everybody knows how many raids they make every year with their fleets on the lands and kingdoms of Bacala and Solimanuas. Jessore, Angelim and Ourixa'[৫২]

এই অত্যাচারী দস্যুতার যুগে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন রডা—যশোবরাজ প্রতাপাদিত্যের গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ।[৫৩] তিনি মোগল সংঘর্ষকালে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন।[৫৪] দস্যুতা পরিত্যাগ করে প্রতাপাদিত্যের প্রভুত্ব স্বীকার করার কারণ-- 'ফিরিঙ্গি দলপতি কাপ্তেন রডা একটি যুদ্ধে বন্দী হইয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান না করিয়া নিজের কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ইহার ফলে, রডা চিরজীবন বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত প্রতাপের এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।'[৫৫] সুদক্ষ সেনানায়ক

হিসাবে ইতিহাস রডাকে মনে রেখেছে। কিন্তু লোককাহিনী রডার এই বিশ্বস্ততার পশ্চাতে আবিষ্কার করেছে এক বঙ্গললনার প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়মাধুর্যকে, যে প্রেম দুর্দান্ত দস্যু রডাকে পরিণত করেছে এক প্রেমিকে।[৫৬] 'যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানা শহর থেকে চারমাইল দক্ষিণে গড়কালীর ভগ্নমন্দিরটি এই রডারই প্রতিষ্ঠিত'[৫৭] —এই জনশ্রুতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রডার মতো ব্যতিক্রমী চরিত্রকে বাদ দিলে পর্তুগীজ সম্প্রদায় যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল বাংলার বুকে, তার চিহ্নও বহন করে চলেছে লোককথা। 'মদনসাধু'[৫৮] গল্পেই আছে 'দুর্দান্ত হারমাদ ডাকাতের দেশ।'[৫৯]

—'পর্তুগীজদের নৌবহরের নাম আরমাডা। উহার অপভ্রংশে হার্ম্মাদ হইয়াছে।'[৬০] -—বলেছেন মনীষী সতীশচন্দ্র মিত্র। অন্যত্রও এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে--

'The tribe was called Harmad. This word (Harmad) is evidently Armad, a corruption of Armada.'[৬১]

সুতরাং উপরোক্ত নিদর্শনগুলি থেকে একটি তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রজাবৎসল নৃপতি থেকে দুর্দান্ত জমিদার কিংবা একনিষ্ঠ ভক্ত অথবা বারাঙ্গনা—লোককথার জগতে কেউই অপাংক্তেয় নয়।

এছাড়া বহু ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম—সম্পৃক্ত জলাশয় ছড়িয়ে আছে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেগুলি বিশেষ কোন ঘটনার সাক্ষ্যবহ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত--

মহীপালের দীঘি—'ভারত-বিশ্রুত মহীপাল দীঘি বিশালত্বে ও নির্মল সলিলের খ্যাতিতে পাল-সম্রাটগণেরই যোগ্য।'[৬২] রঙ্গপুরের সন্নিহিত দিনাজপুর স্থানে অবস্থিত এই দীঘি পালবংশের বিখ্যাত নৃপতি মহীপাল কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল-- এইরূপ জনশ্রুতি।[৬৩] ঐতিহাসিক মতটি এইরূপ--

'পালরাজ দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপাল (৯৭৮-১০৩০ খ্রী:) পালবংশের লুপ্ত গৌরব ও শক্তি কতক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তিনি বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত হইতে পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ এবং মিথিলাদেশ পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।'[৬৪]

মহীপাল স্বদেশে নানা লোকহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের উক্তি স্মরণীয়--

.... the achievements of Mahipala must be regarded as highly remarkable, and he ranks as the greatest Pala emperor after Devapala. He not only saved the Pala kingdom from impending ruin, but probably also revived to some extent the old imperial dreams........'

'Traditions have associated the name of Mahipala with a number of big tanks and towns in North and West Bengal.'[৬৫]

দীঘির সঙ্গে মহীপালের নাম যুক্ত হওয়াব ঘটনাটি প্রজাহিতকারী নৃপতির প্রতি জনগণের কৃতজ্ঞতার স্মারক হতে পারে। তবে দীঘির সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছে একটি

অপহরণ কাহিনী। গ্রাম্য কন্যা লীলা যখন ঐ দীঘিতে স্নানরতা, তখন তাকে অপহরণ করেন মহীপাল।[৬৬] এই ঘটনা নৃপতির অকলঙ্ক চরিত্রে ফাটল ধরিয়েছে সন্দেহ নেই, যদিও ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে ইতিহাস নীরব।

এই প্রকার লালসা-নিষিক্ত কামনা জড়িত হয়ে আছে 'সরকার ঝি'[৬৭] দীঘিকে ঘিরে।

সেনহাটির সরকার ঝি দীঘি ঃ

দীঘিকে ঘিরে কাহিনীটি এইপ্রকার--

আওরঙ্গজেবের অধীনস্থ ফৌজদার নুরউল্লার খাঁ তাঁরই সেরেস্তার কর্মচারী রাজারাম সরকার। সরকারের সুন্দরী বাল-বিধবা কন্যার প্রতি লোভের হাত বাড়ালো সৈন্যাধ্যক্ষ লাল খাঁ। সরকার কন্যা অসীম বুদ্ধিবলে লাল খাঁর কাছে আত্মসমর্পণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন ও শর্ত আরোপ করেন, সেনহাটীর জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য একটি দীঘি খনন করার। খনন কার্য সমাপ্ত হলে সেই দীঘির জলেই আত্মত্যাগ করে আপন সতীত্ব রক্ষা করেন সরকার ঝি।[৬৮]

'যশোর-খুলনার ইতিহাস'[৬৯] গ্রন্থে উল্লিখিত আছে---

'বাদশাহ আওরঙ্গজেব নূরউল্যা খাঁ নামক একজন আত্মীয়কে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি কেবলমাত্র যশোহরের ফৌজদার নহেন, এক সঙ্গে যশোহর, মেদিনীপুর, হিজলী, হুগলী ও বর্দ্ধমানের যুক্ত ফৌজদার ছিলেন।'[৭০]

'........ নূরউল্যা যোদ্ধা না হইলেও কৌশলী শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ লাল খাঁই তাঁহার শাসনের কলঙ্ক। লাল খাঁ ফৌজের ভার ও অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া বড় দুর্দান্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার পাশবিক অত্যাচারের কত কাহিনী শুনা যায়।'[৭১]

খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামের দীঘিকে ঘিরে সেইরকমই একটি কলঙ্কিত কাহিনী প্রচারিত হয়েছে বলা যায়। নূরউল্যা জামাতার আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিতাড়িত করেন। সুন্দরী সংক্রান্ত অপকর্মই নূরউল্যার ক্রোধের কারণ-- এই মত প্রকাশ করেছেন অশ্বিনীকুমার সেন।[৭২] তিনি আরও বলেন-- "লাল খাঁর নির্বাসনের পর নূরউল্যা দৌহিত্রকে কিছু সম্পত্তি দেন। দৌহিত্রের নাম বহরম খাঁ।"[৭৩]

এইভাবেই শাসকের কামাগ্নি থেকে আত্মরক্ষার্থে অসহায়া রমণীর আত্মবলিদানের করুণ দীর্ঘশ্বাসই বহন করে চলেছে 'সরকার ঝি' দীঘি।

লাল বাঁধ-- বনবিষ্ণুপুরের এই লাল বাঁধকে[৭৪] ঘিরে নানা কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মল্ল রাজবংশের অন্যতম রাজা হলেন দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১৬৯৪-১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ।[৭৫] এই সময় দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা এক ব্যাপক বিদ্রোহের অভিঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর রহিম খাঁ বিদ্রোহীদের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে পরিগণিত হয়।[৭৬]

রঘুনাথ সিংহ মোগলবাহিনীর পক্ষে এই বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে আসেন। পরাস্ত করেন বিদ্রোহীদের। শোভা সিংহের কন্যাকে পাটরানী করেন এবং নর্তকী হিসাবে উপস্থিত হন লালবাঈ।[৭৭]

'লালবাঈকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গোপাল সিংহের নেতৃত্বে রাজনৈতিক চক্রান্ত দানা বেঁধে ওঠে। রাজনৈতিক চক্রান্তে ধর্মীয় প্ররোচনা ঔরঙ্গজেবের সময়েই শক্তিশালী হাতিয়াররূপে পরিগণিত হয়। গোপাল সিংহ হাতিয়ারটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এমনকি রঘুনাথ মহিষী চন্দ্রপ্রভাও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। আততায়ীর হাতে অতর্কিতে নিহত হয়েছিলেন রঘুনাথ সিংহ। গোপাল সিংহ নিজেকে অভিষিক্ত করেছিলেন মল্ল রাজ্যের সিংহাসনে।'[৭৮]

কথিত লোককাহিনী কিন্তু রঘুনাথ সিংহের মৃত্যুর অপর এক কারণ উপস্থিত করেছে। লাল বাঈয়ের মোহে মত্ত রাজা রাজকার্য উপেক্ষা করেন। লালবাঁধ নামে দীর্ঘিকা খনন করান। দীঘির তীরস্থ বিশাল প্রাসাদে আমোদে নিমগ্ন থাকেন। ক্রমে লালবাঈ-এর প্রেরণায় সমগ্র বিষ্ণুপুরবাসীকেই মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতে উদ্যোগী হন। হিন্দুদের এই বিপদের সময় স্বয়ং পাটরানী মহারাজকে স্বহস্তে হত্যা করেন এবং পতির চিতায় প্রাণ ত্যাগ করেন। এই রাজ্ঞী 'পতি ঘাতিনী সতী' আখ্যা পান। লালবাঈকেও লালবাঁধের জলে নিক্ষেপ করা হয়।[৭৯] সুতরাং প্রজার কল্যাণার্থে এবং সমগ্র দেশবাসীর ধর্মরক্ষায় প্রাণপ্রিয় পতিকে হত্যা—এই মহান আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে লোককথাটির মধ্যে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধর্ম প্রচার এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত বিভিন্ন স্থান নামের উৎপত্তির পশ্চাতে কার্যকর। কতগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাক্।

বাঘনাপাড়া—বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র বাঘনাপাড়া।[৮০] ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বংশীবদন গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে নবদ্বীপ থেকে এখানে আসেন। কথিত আছে যে তিনি হরিনাম শুনে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত স্থানটিতে ব্যাঘ্রকুলকে উদ্ধার করেন। তারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করে চলে যায়। সেই থেকেই ঐ স্থানটির নাম বাঘ-না-পাড়া।'[৮১]

নাম-কীর্তনের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাহিনীটি একটি সত্য-ভিত্তিক তাৎপর্য আছে। মনীষী বিনয় ঘোষ বলেছেন, 'চারশো বছর আগে' বংশীবদন ও তাঁর বংশধরদের সঙ্কীর্তন ও খোলকরতালের শব্দে বাঘনাপাড়া হঠাৎ যখন মুখর হয়ে উঠেছিল, খোলকরতালের প্রচণ্ড শব্দে বাঘের পক্ষে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। একে বাঘ তাড়ানো কীর্তন বলা যেতে পারে। বাঘের প্রতিপত্তি, এইভাবে নাম সঙ্কীর্তনের ফলে বাঘনাপাড়ায় কমে যাওয়া আশ্চর্য নয়।'[৮২]

অবশ্য, লোকমনন বৈষ্ণব-ভাবনিষিক্ত হরিনামের অলৌকিক শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছে। লোকমননের এই নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা G. L. Gomme মন্তব্যটি উল্লেখ করতে পারি—

'Folklore is governed by its own laws and rules which are not the laws and rules of history' [৮৩]

সিলেট—হিন্দু এবং মুসলমানের সংঘাতের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই নামকরণের মূলে। হজরত শাহ জালালই সিলেটের নামকরণ করেছেন।[৮৪] — এইরূপ কিংবদন্তীর বক্তব্য। শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দ সুরমা নদীর খেয়া তুলে মূল ভূখণ্ডের চারদিকে এক পাথর প্রাচীর খাড়া করলেন। শাহজালাল ও তাঁর শিষ্যদের অভিযান ব্যর্থ করে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পুণ্যশ্লোক শাহজালাল প্রাচীরের কাছে গিয়েই উচ্চরোলে হাঁক দিলেন—শিলহট্ অর্থাৎ পাথর হটে যাও। অনেকে মনে করেন এই শিলহট্ থেকেই শ্রীহট্ট তথা সিলেট নামকরণ হয়েছে।[৮৫]

এই কিংবদন্তীটি অবশ্যই মুসলমান পীর-মাহাত্ম্য কীর্তন কবেছে। তবে সত্যতা সম্পর্কে কিছু সংশয় থেকেই যায়। অবশ্য শাহজালাল যে শ্রীহট্ট তথা সিলেট অধিকার করেন তা ইতিহাস সমর্থিত—

'Mr. Stapleton is right in fixing the date of the first invansion of syllet by Muslim armies in 703 A.H (1303 A,D)'[৮৬] আর লোককথা অনুযায়ী এই মুসলমান বাহিনীর নেতৃত্ব করেন শাহজালাল—

'There are also Hindu legends regarding the defeat of the valiant Rajah Gaur Govinda of Syllet by an army led by Shah Jalal.'[৮৭]

অপরদিকে, শাহজালাল সম্পর্কে গবেষক বক্তব্যেও আমরা এই সিলেট বিজয়ের ইঙ্গিত পাচ্ছি—

'শাহজালালের জন্মস্থান আরবের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হেজাজ। ৭২১ হিজরাব্দের ৭ই রবিওল আউয়াল তারিখে হজরত শাহজালাল বাজী স্বয়ং হজরত শাহ্ সৈয়দ কবীর বাজীর উপস্থিতিতে তিনশত একজন মুজাহিদের একটি কাফেলা নিয়ে হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। এই কাফেলায় আরো মুজাহিদ পথিমধ্যে মিলিত হন। তাঁদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিনশত দশ। তাঁদের দিল্লীতে উপস্থিতির তারিখ ৭২২ হিজরাব্দের ২২শে জেলহজ্জা।

দিল্লীতে অবস্থান কালে সিলেট-রাজ গোবিন্দের সহিত সম্রাট বাহিনীর সংঘর্ষের বিষয় অবগত হয়ে হজরত শাহজালাল সদলবলে সিলহট্ অভিমুখে অগ্রসর হন। সংঘর্ষের মুল কারণ ছিল সেখানকার মোসলেম আলি বোরহানুদ্দিনের উপর রাজা গোবিন্দের অত্যাচার। এসময়ে 'সেই কাফেলায় আউলিয়ার সর্বমোট সংখ্যা ছিল তিনশত একশট্টি জন। সে যুদ্ধে রাজা গোবিন্দের পতন ঘটে।'[৮৮]

অর্থাৎ, সিলেটে, ইসলাম-বিজয় ঘটনাটিকেই পীর শাহজাল্লালের অলৌকিক মহিমা প্রদর্শনের নিদর্শন হিসাবে প্রচার করে মুসলমান ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাই অর্পিত হয়েছে।

বিপরীতক্রমে, দেশীয়, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে মুসলমানী অপপ্রচারের ব্যর্থ প্রচেষ্টাও বহু

লোলকথার উপভোগ্য। আনন্দ চাঁদ গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়ের বিগ্রহ সুপুর গ্রামের দর্শনীয় বিষয়।[৮৯]

জনশ্রুতি বলে, আনন্দমোহনের বিরোধিতা করে ধর্মান্ধ মুসলমান জমিদার গোমাংস ভেট দেন শ্যাম রায়কে। কিন্তু গোস্বামীর মন্ত্রবলে গোমাংস পদ্মফুলে পরিণত হয়।[৯০]

বিগ্রহ শ্যাম রায়কে ঘিরে এই কাহিনীতে সত্যের কঙ্কাল যাই থাকুক, বৈষ্ণব ধর্মের সৌরভ বিতরণই যে কাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

হিন্দু-মুসলমান ধর্মের অভেদ তত্ত্ব প্রচার করেছেন সৈয়দমর্তুজা। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় লেখক চিত্তপ্রিয় মিত্র বলেছেন—

'১১৬৪ সালে সাধক কবি হেয়াৎ মামুদ তাঁর লিখিত 'আম্পিয়া বাণী'তে সৈয়দ মর্তুজাকে বন্দনা করতে বলেন—

সৈয়দ মুর্তজা বন্দো করিয়া ভকতি

এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে সৈয়দ মর্তুজা এসময়ে একজন বিশিষ্ট সাধকরূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ১১৫৬ বঙ্গাব্দে রানী ভবানীর স্বাক্ষরযুক্ত একখানি দলিলে মর্তুজানন্দের নামে ১০০ শতবিঘা দানের উল্লেখ দেখা যায়।

দলিলটিতে মর্তুজাকে স্বর্গীয় জ্যোতি বলা হয়েছে। দলিলটি ভারতের ধর্মীয় উদারতার পরিচয় বহন করে এবং একটি জাতীয় সংহতিরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'[৯১]

এই সৈয়দ মর্তুজাই কিংবদন্তীতে হয়ে উঠেছেন মর্তুজানন্দ।[৯২] কথিত আছে যে, 'আনন্দময়ী নাম্নী হিন্দু সাধিকা, তাঁর সাধকসঙ্গিনী। রাজমহলের নিকট রাজগাঁও স্টেশন সংলগ্ন আম্বিয়া গ্রামে দুইটি মাটির ঢিপি আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী, মর্তুজা আনন্দময়ী প্রতি বৎসর কিছু সময় ঐস্থানে সাধনভজন করতেন।'[৯৩] সৈয়দমর্তুজার ভনিতায় একটি পদ উল্লেখ করেছেন সুকুমার সেন—

'সৈয়দ মর্তুজা সূফী পীর ও বৈষ্ণব মহান্ত দুই ছিলেন বলিতে পারি। ইহার দুইটি ভালো পদ কল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে। ভনিতায় বলা হয়েছে

বাপে দিল জনমখানি মায়ে দিল ক্ষীর

সৈয়দ মর্তুজা কহে জনমের ফকির।'[৯৪]

গবেষক মতে, ভাগীরথীর ভাঙনের ফলে সৈয়দ মর্তুজা হিন্দুপীরের সমাধি ছাপাঘাটি থেকে হারুয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হারুয়ায় মাজারে পাশাপাশি মর্তুজা ও আনন্দময়ীর সমাধি আছে।'[৯৫]

মুসলমান গুরুর সঙ্গে বৈষ্ণব হিন্দু রমণীর সাধন সম্পর্কে কেন্দ্র করে এক ভক্তিপূর্ণ নিবেদনকে ঘিরেই এই লোককাহিনীর বিকাশ ঘটেছে। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সমন্বয়ের উদার ঐতিহ্যই এই 'মর্তুজানন্দ' অভিধার কারিগর।

নামকরণের পশ্চাতে জনশ্রুতির বিচিত্র উর্বর কল্পনারও পরিচয় মেলে। যেমন 'খুলনা' অঞ্চলটির নামের উৎপত্তি বিষয়ক একটি কাহিনী—

'রাত্রিতে কোন দুঃসাহসিক মাঝি নৌকা খুলিতে গেলে জঙ্গলের মধ্য হইতে বন-

দেবতা তাহাকে বারণ করিয়া বলিতেন খুলো না, খুলো না। যে স্থান হইতে এই খুলো না শব্দ হইত বা কোন একবার হইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়া গেল খুল্না। হয়তো খুল্না শব্দের অক্ষর বিন্যাস হইতে কল্পনা কৌশলেই এই ব্যুৎপত্তি।'[৯৭]

মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণ সম্পর্কেও উদ্ভট কল্পনা প্রসূত মজাদার কাহিনীর স্পর্শ পাওয়া যায়—

'কর্ণসুবর্ণের এক রাজার খুব বড় বড় কান ছিল। সেই জন্য সর্বদা পাগড়ী দিয়ে রাজা কান ঢেকে রাখতেন। রাজার নাপিত প্রাণদণ্ডের ভয়ে এই লম্বা কানের কথা গোপন রাখত। কিন্তু গোরুর মত বড়ো কান বলে মধ্যে মধ্যে সে গোকান গোকান বলে চেঁচিয়ে উঠত। রাজার এই গরুর মতো কান থেকে গোকর্ণ নাম হয়েছে।'[৯৮]

প্রকৃতপক্ষে একরাশ কৌতূহল নিয়ে ইতিহাসের কাছে প্রশ্ন করে জনশ্রুতি। আর যেখানে ইতিহাস নীরব, সেখানেই লোককথা হয়ে ওঠে সোচ্চার। লোকরুচিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাই শুধু সে তৈরী করে না, নিষ্ঠুরকে শাস্তিও দান করে, সৎ ও সাধুকে করে সম্মানিত।

ঠিক একইভাবে লোকচিন্তার অভিনবত্ব রাজা নীলাম্বরের পরাজয়ের গ্লানিকে ম্লান করে দিয়েছে। নীলাম্বর কামতাপুর রাজ্যের শেষ রাজা।[৯৯] 'গৌড়ের ইতিহাস'[১০০] গ্রন্থে পাই—

'হোসেন শাহ্ কামতাপুর অধিকার করিয়া তাহার স্মরণার্থ মালদহ নগরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কামতাপুরের অক্ষাংস ২৬°৯৩০´´ দ্রাঘিমা ৮৯°২২১৫´´, এই রাজ্যের অভ্যন্তর দিয়া সিংহমারী নদী প্রবাহিত। কামতাপুরের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। রাজা নীলধ্বজ কামতাপুরের রাজধানী স্থাপন করেন। নীলধ্বজ ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বরাজ্যে বাস করান। কামতাপুরের শেষ রাজার নাম নীলাম্বর। নীলাম্বরের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী শচীপাত্রের পুত্র রাজান্তঃপুর দূষিত করায় রাজা মন্ত্রিপুত্রকে মারিয়া তারার মাংস মন্ত্রীকে খাওয়ান। মন্ত্রী ইহা জানিতে পারিয়া দারুণ মনঃক্ষোভে কামতাপুর ত্যাগ করিয়া গৌড়ে হোসেন শার নিকট আগমন করেন। হোসেন শাহ তাহার প্রবর্তনায় কামতাপুর অধিকার করেন। রাজধানী লুণ্ঠিত হইল (১৪৯৮)'[১০১]

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার সমর্থন করেছেন এই বক্তব্য—

'In 1498, Husain launched a vigorous campaign with a view to recovering the lost territory and putting a permanent stop to Khen aggression, This was is popularly believed to have being instigated by Nilambar's Brahmam minister whose licentious son had been brutally murdered by that Raja.The Bengali forces finally gained entrains into the fortress, it is said by mean of treachery and captured Nilambar, who was taken to Gour but subsequently escaped.' [১০২]

নীলাম্বরের এই পলায়নের কারণটি লোককথার কৈফিয়তে নাটকীয় অথচ বিশ্বাসযোগ্য

হয়ে উঠেছে। নীলাম্বরের দেশপ্রেমকে লোকমন শ্রদ্ধা করেছে, তাই—জনশ্রুতিতে নীলাম্বরের মুক্তি ঘটেছে তাঁরই মন্ত্রীর স্ত্রী মাতৃসমা ক্ষেমাদেবীর হস্তক্ষেপে।[১০৩]

মন্ত্রী শচীপাত্র যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মন্ত্রীর স্ত্রী ক্ষেমাদেবী পুত্রহন্তা হওয়া সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক নৃপতিকে মুক্ত করেন মুসলমানের কারাগৃহ থেকে।

মানবজীবনের সত্য, সততা, প্রেম বা বীরত্ব ইত্যাদি মহান আদর্শ যে যে ঘটনায় আহত হয়েছে, সেইসব ঘটনার ইতিবৃত্তকেই চিরন্তন বেদনাভারের মতো বহন করে চলেছে জনশ্রুতি। তার নবনিরীক্ষায় অশুভের পরাভব ঘটেছে, সত্যনিষ্ঠ মানবজীবনের পরিণামজয়ী শক্তি মাহাত্ম্যই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘটনার নাটকীয়তাকে সম্পূর্ণতা দান করার জন্য জনশ্রুতি মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুঃসাহসিক ভাবেই অপ্রাকৃত ঘটনাকেও কল্পনায় আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

বর্ধমানের শের-আফগানের কবরের ধারে মেহেরুন্নিসার ছায়ামূর্তির আনাগোনা এই কিংবদন্তীতেই, লভ্য। বর্ধমানের শাসক-শের-আফগানের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আকর্ষণ ইতিহাসখ্যাত ঘটনা। কুতুবউদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করে শের-আফগানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন জাহাঙ্গীর। বর্ধমানে মঙ্গলকোট নামক স্থানে কুতুবউদ্দীন বনাম শের-আফগানের তুমুল যুদ্ধ হয়, যার পরিণতি উভয়েরই মৃত্যু। এই তথ্য ইতিহাস সমর্থিত—

'Jahangir, a fortnight after his accession sent Man Singh off to Bengal, as subahdar of that province once more (10th November, 1605). Jahangir was disconsolate, his home was dark because she who was coveted as the light of his Harem--and was deslined afterwards to blaze forth as the light of the world was then illuminating the humble, tent of her lawful husband Sher-Afkan Istaylu a petty Turkish jagirdar of Burdwan. The royal sorrow found a sympathetic listener in his foster Brother Qutbuddin Khan Koka who was appointed on 2nd September, 1606 governor of Bengal with whispered instruction as to the means if procuring the head-line balm for the affiliated royal heart. ....was soon killed in the course of a conflict with Sher Afgan. 30th May, 1607' [১০৫]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই কুদৃষ্টি, পরস্ত্রীর প্রতি অন্ধ আকর্ষণে নির্দোষ শের-আফগানকে হত্যার চক্রান্ত এই সকল ঘটনাই লোকবিচারে ক্ষমার অযোগ্য। সেই কারণেই কিংবদন্তীতে দেখা যায় আগ্রার বাদশাহী প্রেমকে উপেক্ষা করে গভীর রাত্রে অনুতপ্ত মেহের ভূতপূর্ব স্বামীর কবরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[১০৬]

বহু ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণ ঘটনার সুষ্ঠু পরিণতি রচনা করে লোককথা। যেমন চুয়াড় বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী কর্ণাগড়ের রাণী শিরোমণি [১০৭] সম্পর্কে লোকমনন নিজস্ব সিদ্ধান্ত আরোপ করেছে। গবেষক মতে—

'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে উত্তর মেদিনীপুর ব্যাপকভাবে

চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। ঘাটশীলার রাজা, মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি বগড়ীর রাজা, সকলেই প্রথমে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

গণগণির মাঠ ছিল বিদ্রোহী লায়েক নেতাদের ও যোদ্ধাদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি ও আশ্রয়স্থল।[১০৮]

এই চুয়াড় বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত রাণী শিরোমণির নাম। 'কর্নাগড়ে সদ্‌গোপ রাজবংশের রাণী শিরোমণি প্রায় ৫৬ বছর রাজত্ব করেন(১৭৫৬-১৮১২) পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে চুয়াড় বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ-শাসকদের হাতে রাণী শিরোমণিকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হতে হয়ে, যেহেতু ইংরেজদের সন্দেহ হয় যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাণীও গোপন চক্রান্তে লিপ্ত।"[১০৯]

'.....দীর্ঘদিন ধরে গেরিলা যুদ্ধের আদর্শে বিদ্রোহ চালিয়ে ইংবেজদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কৌশলে লড়াই করেই বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়।'[১১০]

এছাড়াও ইতিহাস বলে, 'চুয়াড় বিদ্রোহের সময় দলপতি গোবর্ধন দিক্‌পতি রাজবাড়ী দখল করেন। রানী নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচন খানের আশ্রয় নেন।[১১১] কিন্তু লোকইতিহাস এই অবমাননাকর পরিণতিকে স্বীকার করেনি। তাদের মতে ইংরেজদের চাটুকার গোবর্ধন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সমগ্র দলের সঙ্গে, ফলে দলের পরাজয় ঘটেছে, কিন্তু রাণী সসম্মানে অঙ্গীভূত হয়েছে ভগবতী মহামায়ার বিগ্রহমূর্তিতে।[১১২] 'কর্ণগড়ের দক্ষিণে অধিষ্ঠাত্রী দেবা ভগবতী মহামায়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত।'[১১৩] অর্থাৎ গুপ্তপথে জঙ্গলমহালের মধ্যে দিয়ে এসে ঈশ্বরী মূর্তিতে বিলীন হওয়ার ঘটনায় লোকমননের স্বস্তিই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহী চুয়াড়গণ তথাকথিত সভ্যশাসক ইংরাজের কাছে 'Lawless Tribe' [১১৪] তাদের বিদ্রোহী স্বভাব[১১৫] ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উন্নাসিকতার প্রতিবাদ করেছে লোককথা। বাংলার অজস্র সমাধিমন্দির দীর্ঘিকা, অন্ধ প্রাচীন কোন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই তারা খুঁজে পেয়েছে সেই অন্ত্যজ গোষ্ঠীরই কীর্তিধ্বজাকে—

'.....the treasures of the past demonstrated the ageless skill and genius of the working class who made them, not the genius of the emperors who had enjoyed them.'[১১৬]

মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি[১১৭] সেই মাহাত্ম্যই ঘোষণা করছে। সাগরদীঘির একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে পাল বংশের কোন রাজা ব্রহ্ম হত্যার পাপক্ষালনের জন্য ৭৪০ শকাব্দে এই দীঘি উৎসর্গ করেন। বিশাল দীঘি প্রায় একমাইল দীর্ঘ। শোনা যায়, এই দীঘি খুব গভীর করে খোঁড়া সত্ত্বেও জল ওঠেনি। অতঃপর রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে সাগর নামে স্থানীয় একজন কুম্ভকার যদি দীঘির মধ্যে থেকে এককোদাল মাটি তোলে তবে জল উঠবে। রাজার আদেশে সাগর এককোদাল মাটি তোলার পর দীঘি খব দ্রুত জলে ভরে যায় এবং জলমগ্ন হয়ে সাগর প্রাণত্যাগ করে। এইজন্য এই দীঘির নাম হয় সাগর দীঘি।[১১৮]

রাজার আভিজাত্যকে উপেক্ষা করে সামান্য এক কুম্ভকারের কৃতিত্বও আত্মোৎসর্গের মহিমাই যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দীঘি কল্লোলে।

ঠিক এইরকমই বিচিত্র কাহিনী শোনা যায় মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের অবস্থিত দেবীর মন্দির ও মন্দির সম্মুখস্থ দীঘিটি সম্পর্কে।[১১৯] 'ঝাড়খণ্ডের অরণ্যপথে যেতে যেতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই সমস্ত বনদেবীর উপাসকদের পাষণ্ড মনে করেছিলেন।[১২০] কিন্তু লোকইতিহাস এই ধিক্কারেরই প্রতিবাদ জানিয়েছে। নারায়ণগড়ের রাজবংশের আদি পুরুষ রাজা গন্ধর্ব শ্রীচন্দন পাল (বঙ্গাব্দ ৬৭১-৭০৩)। শ্রীচন্দন 'মাড়ি-সুলতান' নামেও পরিচিত ছিলেন। একথার অর্থ হল পথের বাদশাহ। দক্ষিণে উৎকল বা উড়িষ্যা যাতায়াতের প্রাচীন পথ ছিল নারায়ণগড়ের ভিতর দিয়ে। এই প্রাচীন রাজপথ তথা জনপথের রক্ষক ছিলেন নারায়ণের সদ্‌গোপ বংশের রাজারা। সেই কারণে সম্রাট শাজাহান তাদের উপাধি দেন মাড়ি সুলতান। রাজা গন্ধর্ব দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, [১২১] কথিত আছে যে রানী মধুমঞ্জরী স্বপ্নাদেশ পান যে ব্রাহ্মনী দেবী তৃষ্ণার্ত এবং সেই তৃষ্ণা দূর হবে যদি বিস্তৃত জনপদের অধিবাসীদের জলকষ্ট দূরীকরণের ব্যবস্থা করা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই খনিত হয় রাণী সাগর। সহস্র প্রজার জলকষ্ট দূর হয়।[১২২] এই কাহিনী থেকে এটাই বোঝা যায় যে সম্ভ্রান্ত উচ্চবর্ণের কাছে যারা পাষণ্ড, অপাংক্তেয়, তাঁদের আঞ্চলিক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। জনসমাজে তাঁদের রাজ্য ছিল বিস্তৃত। প্রথানুগত্যের জন্য প্রজারা অতিদরিদ্র হলেও সামাজিক প্রতিনিধিরূপে রাজাদের মা্ন্য ও শ্রদ্ধা করত। রাজারাও প্রজাদের জনহিতকর কাজের মাধ্যমে প্রজার মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করতেন। এইভাবেই আদর্শ রাজা প্রজার সম্পর্কটি জেগে রয়েছে ব্রহ্মানীমন্দির আর রাণীসাগরকে ঘিরে।

পীর একদিল্ শাহ[১২৩] যখন ছুটি সাহেবের গৃহে গোচারণরূপে অবস্থান করেন,[১২৪] তখনও সেই দরিদ্র অন্ত্যজ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার ইঙ্গিতটি আভাসিত হয়।

'পীর হজরত একদিল শাহ বাজী বাংলায় পীর হজরত গোরাচাঁদ বাজীর সহিত ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আসেন। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার আনোয়ার পূর্ব অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের ভার প্রাপ্ত হন।[১২৫] এই একদিল শাহের অলৌকিক কীর্তিকাহিনী জনসাধারণের মনে তাঁর অসামান্য প্রভাবকে তুলে ধরেছে। কিংবদন্তীগুলির মধ্যে অন্যতম—এক ওঝা ভূত-প্রেত অধিকৃত জলাভূমিতে জোর করে মাছ ধরার চেষ্টা করে। ফলে কুপিত প্রেতকুল একযোগে আক্রমণ করে এবং পীর একদিল্ শাহের দরগায় আশ্রয় নিয়ে ওঝা আত্মরক্ষা করে। অর্থাৎ পীর সাহেব তাঁর কাজের দ্বারা হিন্দু মুসলিমের নিকট এতখানি শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন যে বিপক্ষীয় ব্যক্তিগণ চড়াও হয়ে পীরের নজরগাহে প্রবেশ এবং আক্রমণ করেনি।'[১২৬]

এছাড়া এই ঘটনায় জলাভূমির অধিকার নিয়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের আভাস যেমন মেলে তেমনি সংঘবদ্ধ প্রহরা ও প্রতিরোধের দৃঢ়তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভাবী ভারতের নবজাগরণ লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন—

'নতুন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে।......বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।'[১২৭]

—জনশ্রুতির মধ্যে সেই শূদ্রজাগরণেরই ভেরী বেজে উঠেছে। সেই কারণেই মেষপালিকার সঙ্গে সন্ন্যাসীর মিলনে মল্লনাথের জন্ম হয় যে মল্লনাথ প্রতিষ্ঠা করেন বীরভূমের রাজ্য মল্লারপুর এবং সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির।[১২৮]

তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথও প্রথম দর্শন দেন এক গো-পালককেই।

'রাজা ভারামল্লের গোরক্ষক ছিলেন মুকুন্দ ঘোষ। গভীর অরণ্যে মুকুন্দের কাছে স্বয়ম্ভু শিব আর্বিভূত হন। মুকুন্দই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে তাঁর পূজা করার আদেশ পান।'[১২৯]

আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের সঙ্গে যুক্ত করে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ অপসারণের প্রচেষ্টা বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত শৈবতীর্থ এক্তেশ্বর মন্দিরকে[১৩০] ঘিরে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে লোককথায়। ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে বেগলার সাহেব এক্তেশ্বর মন্দির সম্পর্কে লেখেন :

'The temple is remarkable in its way. the moulding of the basement are the boldest and finest of any I have seen though quite plain. The temple was built of laterite.'

নির্মাণ বৈচিত্র্যে অনন্য এই মন্দিরটি ঘিরে লোককথায় বলা হয়েছে যে শিবের স্বপ্নাদেশে এক রাজা প্রাচীনকালে উচ্চনীচ ভেদে সকল প্রজাকে এক পংক্তিতে বসিয়ে ভোজন করান। সেই থেকেই শিবের নব অভিধা এক্তেশ্বর।[১৩২]

এইভাবে জনশ্রুতির ছদ্মআবরণে যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা আত্মগোপন করেছে, কোচবিহার জেলার দেবী ভাণ্ডানীকে ঘিরে সংগ্রথিত লোককথাটিতে তারই এক ধাপ অগ্রসরণ লক্ষ্য করা যায়।

'কোচবিহার জেলার পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে প্রতিবৎসর আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার পরদিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে ব্যাঘ্রবাহনা চতুর্ভুজা দেবী ভাণ্ডানীর পূজা হয়। চৌষট্টি বিঘা জমি ভাণ্ডানী দেবীর নামে দেবোত্তর করা আছে।'[১৩৩] লোককথাটি এইরূপ—

বিজয়া দশমী তিথিতে দেবী দুর্গা মর্ত্য থেকে কৈলাসে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর মালপত্রের তত্ত্বাবধানকারিনী ভাণ্ডারনী পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবীকে বাধ্য হয়ে মর্ত্যে অবস্থান করতে হয়। গ্রামপ্রধানের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে যতদিন ভাণ্ডারনী সুস্থ না হন ততদিন তাঁর পূজা দিতে হবে। তিনদিন পরে ভাণ্ডারনী সুস্থ হয়ে ওঠেন। ভাণ্ডারনীকে উপলক্ষ্য করে এই পূজা প্রবর্তিত হয়, তাই দেবী এখানে ভাণ্ডানী বা ভাণ্ডারনী নামে খ্যাত।[১৩৪]

ভাণ্ডানী বা ভাণ্ডারনী নামটি প্রণিধানযোগ্য। শস্যেরই তো ভাণ্ডার হয়। শস্যের ভাণ্ডার রক্ষাকর্ত্রী দেবীই ভাণ্ডরনী। অনার্য শস্য দেবীকে আর্যীকরণের প্রচেষ্টা কাহিনীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে ভাণ্ডানীকে দেবী দুর্গার সঙ্গে যুক্ত করে লোকমনন পুরাণ

কাহিনীর প্রতি আত্যন্তিক মোহকেই ব্যক্ত করেছে।

লোকশ্রুতিরই পৌরাণিক কাঠামো আত্মপ্রকাশ করেছ অজস্র বাস্তব অঞ্চলে। মেদিনীপুরের বিখ্যাত গণগনির মাঠে[১৩৫] মেহনতী মানুষের পেশীবহুল দেহের মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডকে যে ভীমকর্তৃক নিহত বক্‌রাক্ষসের অস্থিচূর্ণ সে বিষয়ে লোকমনন নিশ্চিত।

'খড়্গপুরের কাছে ইন্দাগ্রামে একটি বড়ো মাঠের নাম হিড়িম্বা-ডাঙ্গা। লোকে বলে এখানেই ভীম হিড়িম্বা রাক্ষসকে বধ করে তার বোন হিড়িম্বাকে বিয়ে করেন। দাঁতনের একটি বড় পুকুরকে দেখিয়ে লোকে বলে যে ভীমের একটি মাত্র পদাঘাতে সে পুকুর সৃষ্ট হয়েছে।'[১৩৬]

বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণগুলিকে ঘিরে আবার পৌরাণিক ঘটনার নব পরিণতির বৈচিত্র্যময় ব্যাখ্যা হাজির করেছে লোককথা। যেমন অগ্নিকুণ্ডকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনীটি হল—

ঘোর কৃষ্ণবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু স্বীয় কৃষ্ণভক্ত পুত্র প্রহ্লাদকে নির্যাতন করায় কৃষ্ণ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এতে প্রহ্লাদের মনে তীব্র জ্বালার উদ্ভব হয়। তিনি মনে করেন তাঁর জন্যই তাঁর পিতা নিহত হয়েছেন। অতঃপর বহুতীর্থ ভ্রমণান্তে বক্রেশ্বরে এসে প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে স্নান করলে তাঁর অন্তর্জ্বালা নির্বাপিত হয়।[১৩৭]

লোক-ইতিহাস এইভাবে পুরাণের কল্পনাকে সত্যের পাথুরে জমিতে প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছে। বংশপরম্পরায় কাহিনীগুলি প্রবাহিত হয়ে চলেছে, একান্ত নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস্য তথ্য হিসাবে। সেই কারণেই গবেষক থম্পসন বলেন—

'Popular legends and traditions cannot fail to be impressed with the fertility of imagination with which man has viewed the world around him. Simple man, though unlettered and without benefit of science and history...possesses nevertheless his own science and his own history. These have been taught him by his fathers and his neighbours.' [১৩৮]

এইভাবে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত হয়েই গঠিত হয়েছে লোক ইতিহাস, যার সূত্রগুলি লুকিয়ে আছে লোককথার মর্মে-প্রাণে।

বাংলা লোককথার কিছু বাঁধা বন্দিশ আছে। পরস্পর দূরবর্তী একাধিক স্থান অথবা বস্তু সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীগুলিতে বর্ণনার সমতা দুর্লক্ষ্য নয়। বিজয়ী রাজার শ্বেত পারাবতের বদলে কৃষ্ণ কবুতরের প্রত্যাবর্তনের জন্য অন্তঃপুরিকাদের আত্মবিসর্জনের কাহিনী যে কেবল ঢাকার ফরিদপুর অঞ্চলে ছিরাম খাঁ [১৩৯] সম্পর্কে প্রচলিত আছে তাই নয়। 'উত্তরচব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপার' চন্দ্রকেতুগড়ের রাজা চন্দ্রকেতু'[১৪০] সম্পর্কেও প্রচলিত। প্রত্যহ একটি করে নরদেহ ভেট নিয়ে রাক্ষস সন্তুষ্ট থাকবে-- রূপকথার এই পরিচিত অভিপ্রায়টি বীরভূমের বারাগ্রামে আবির্ভূত লোহাজঙ্গপীরের[১৪১] মাহাত্ম্য সম্পর্কেও প্রচলিত;-রাক্ষসডাঙ্গা নামক স্থানে খোন্দকর-লোহাজঙ্গ নামে সমরকন্দ শহর থেকে আগত এক পীর বাবা এসে রাক্ষসটিকে নিধন করেন।[১৪২]

গৃহে উৎসব উপলক্ষে প্রচুর বাসনপত্রের প্রয়োজন হলে দীঘির কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করলে দীঘির জলে ভেসে উঠবে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র-এই ঐতিহ্য বাংলায় অসংখ্য দীঘির অতীতকে সমৃদ্ধ করেছে। 'গোবিন্দপুকুর, কালাপুকুর, বর্ষা-গাড়া, মোচাপুকুর,[১৪৩] ইত্যাদি বহু দীঘির উল্লেখ করে দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন 'বাঙ্গালাদেশের রাজারা যে ধনরত্ন-- এমনকি তামা-কাঁসার বাসনপত্র দীঘিতে ফেলিয়া রাখিয়া আপৎকালে চলিয়া যাইতেন, তাহারই প্রমাণ এই প্রবাদ।'[১৪৪]

অর্থাৎ সত্যের সামান্য রেণু, কোন একটি বিশেষ স্থান বা ঘটনার সঙ্গে যা যুক্ত ছিল, বহুব্যাপ্ত পরিচিতির সুবাদে তা অধিকার করে অন্য ঘটনাকেও, বিস্তার লাভ করে দূর প্রদেশে ভিন্ন স্থানে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় গবেষক থম্পসনের উক্তি--

'It may recount a legend of something which happened in ancient times at a particular place-- a legend which has attached itself to that locality, but which will probably also be told with equal conviction of many other places.'[১৪৫]

অর্থাৎ, জনশ্রুতিতে অত্যুক্তি আছে, উৎপ্রেক্ষা আছে আবার সত্যতার নজিরও কিন্তু কম নেই। ঐতিহ্যগত সেই আন্তরিক যোগই লোকশ্রুতির কালান্তরে পাড়ি দেবার স্বর্ণসেতু। সেই কারণে, লোককথায় লভ্য ইতিহাসে মানুষের প্রাণ-সত্তার সমীকরণ ঘটে। সমাজ জীবন এবং মানসের সচিত্র ইতিহাস মূর্ত হয়ে ওঠে। লোককথা ব্যক্তিত্ব চিহ্নহীন সাহিত্য, একথা যে সর্বাংশে সত্য নয়, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবদন্তীগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। তবে, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি চরিত্রকে ঘিরে বিকশিত হয় নৈর্ব্যক্তিক ধারণা; বলা চলে, লোকমানস নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে অনায়াসে ঐতিহাসিক ব্যক্তি অথবা নিদর্শনে আরোপ করে বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ নজির উপস্থিত করতে চায়। সেই কারণেই কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কীর্তি যখন লোককথায় বর্ণিত হয়, তাকে অবলম্বন করে সমগ্র জাতিরই মানসস্তরে উপনীত হয় শ্রোতা। বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাক--

রূপ সনাতন- ইতিহাসমালার ১০৯ সংখ্যক গল্পে[১৪৬] বৈষ্ণব ভক্ত রূপ-সনাতনের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। জগদীশ্বরী দুর্গা তাঁদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করলেন মায়া-নদী এবং সেই নদী পার করার শর্ত--'যে ব্যক্তি আমার উচ্ছিষ্ট তাম্বুল ভোজন করিবে সেই ব্যক্তি অনায়াসে পার হইবেক।'[১৪৭]

সিদ্ধ পুরুষ রূপ-গোস্বামী অনায়াসে সেই কাজ সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনাং'[১৪৮] চৈতন্যের এই শিক্ষা নিজের আচরণের মাধ্যমে রূপ ও সনাতন করে তুলেছেন রূপ গোস্বামী বংশপরিচয় সম্পর্কে গবেষক মতটি এইরূপ—

'লঘুতোষণী হইতে রূপ-সনাতনের বংশ পরিচয় পাই।.........

কর্ণাট দেশে শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদগুরু নামক ভরদ্বাজ গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন।

তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধদেব। অনিরুদ্ধের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর, কনিষ্ঠ হরিহর। উদ্ধত হরিহর জ্যেষ্ঠকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে রাজা হন। রূপেশ্বর সপত্নীক পৌরস্তা দেশে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহার পদ্মনাভ নামে এক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র হয় (১৩০৮শক)

পদ্মনাভের পৌত্র দ্বিজবর কুমারের গঙ্গাবাস ত্যাগের কাল ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দ আনুমানিক ধরিতে পারি। পীরালির অত্যাচারে কুমারদেব নৈহাটি পরিত্যাগ করে চন্দ্রদীপ রাজ্যে চলিয়া যান। ঐ স্থানেই তাঁহার ভুবনপাবন, পরম ভক্ত পুত্রত্রয় জন্মগ্রহণ করেন। উহাদের নাম অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। শ্রী চৈতন্যদেব যখন তাঁহাদিগকে ভক্তির পথে টানিয়া আনিয়াছিলেন, তখন ইহাদের তিনজনেরই নাম পরিবর্তন করিয়া শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও অনুপম এই নূতন নাম রাখিয়াছিলেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলী নগরে উপস্থিত হন তখন রূপ ও সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। '[১৪৯]

'সনাতন ছিলেন পরমপণ্ডিত, সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীতে তাঁহার মত সুপণ্ডিত সেকালে দুর্লভ ছিল। রূপের অসামান্য কবিত্ব শক্তি ছিল এবং তিনিও নানা শাস্ত্রবিৎ ছিলেন।'[১৫০]

'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে উল্লিখিত গল্পটির পরবর্তী অংশের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রের বর্ণনায়। উভয় ক্ষেত্রেই একটি শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে শ্রীরূপের লিখনীর মাধ্যমে। 'পৈত্রিক সম্পত্তির প্রতি আত্যন্তিক মোহবশতঃ যখন সনাতনের সঙ্গে এক ব্রাহ্মণের বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন--

'রূপ গোস্বামী শর্করা মধ্যে যবয এই অষ্টাক্ষর লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন ও কহিলেন— এই লিপি সমাতন গোস্বামিকে দিবামাত্র তোমার স্থান তুমি পাইবা।' ব্রাহ্মণ সেই লিপি লইয়া সনাতন গোস্বামীকে দিলেন। সনাতন গোস্বামী দৃষ্টি করিয়া ঐ অষ্টাক্ষরানুসারে এক শ্লোক করিলেন, যথা—

যদু পতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘু পতেঃ ক্বগতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয়।।

ইহার অর্থ এই ঃ যদুপতি যে কৃষ্ণ, তাঁহার মথুরাপুরী কোথা গেল? ও রঘুপতি রামের উত্তরাকোশল অযোধ্যা, কোথা গেল? ইহা বিবেচনা করিয়া মন স্থির কর ঃ এ জগৎ অনিত্য।—ইহা নিশ্চয় জান।

এই শ্লোকার্থ বুঝিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে আপন বাট্যাদি দিয়া সনাতন আপন ভ্রাতার অনুগত হইয়া তপস্যাতে নিযুক্ত হইলেন ইতি[১৫১]

অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তির অপূর্ব সম্মিলনে রূপ সনাতনের এই জীবনকথা সমগ্র লোকমানসকেই মহিমাময় ত্যাগমণ্ডিত শুদ্ধ চিন্তার স্তরে উপনীত করেছে, লোকমননের

সেই স্থায়ী প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত হয়েছে লোককথাটিতে।

'বীরভূমের লোককাহিনী'[১৫২] গ্রন্থের সঙ্কলক শিবরতন মিত্র অসংখ্য ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বিচিত্র কর্মসূচী বিবৃত করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম, তান্ত্রিক ঘনশ্যাম গোস্বামী। 'আবির্ভাব সপ্তদশ শতাব্দী'[১৫৩] তন্ত্র সম্পর্কিত তথ্যাবলীর সার আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। তবে ঘনশ্যাম গোস্বামীর বৈশিষ্ট্য এটাই যে--

'তিনি গোপাল ও কালিকা দেবীর বিগ্রহ মূর্তি একত্রপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বাক্সিদ্ধ ছিলেন,[১৫৪] অথচ প্রচলিত বহুল জনশ্রুতির একটিতে এই সিদ্ধাই গুণটিরই মোকাবিলা করা হয়েছে কুশলী চাতুর্যে--

'কোন এক শিষ্য ঘনশ্যাম গোস্বামীকে একটি গোবৎস প্রদানে উৎসুক হইলে, তিনি, এই বৎস কালে দুগ্ধবতী হইলে গ্রহণের অভিমত প্রকাশ করেন। শিষ্য গাভীর আশাতীত দুগ্ধের সঞ্চার দেখিয়া মায়াবশতঃ অন্য এক গাভী গোস্বামী মহাশয়ের সমীপে আনয়ন করেন। ...... গোস্বামী মহাশয় এই নিমিত্ত তাহার উপর বিরক্ত হইয়া-- 'যা তোরে বাঘে ধরিবে'-এই বলিয়া অভিসম্পাত বা তিরস্কার করেন। তদন্তর সন্ধ্যার সময়, এক ভয়ঙ্কর ও অতি বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে পতিত করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হয়। তখন এই গোপশিষ্য 'গোস্বামী মহাশয় ধরিতে বলিয়াছেন, 'খাইতে' বলেন নাই, এই কথা বলার স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে ব্যাঘ্রের আশু করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইল।'[১৫৫]

--এই ঘটনাটি আলৌকিক তন্ত্রশক্তির ঊর্ধ্বে লৌকিক বাস্তববুদ্ধির জয় ঘোষণা করেছে। উপস্থিত বুদ্ধির দৃঢ়তাই যে সঙ্কটকালে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়, সেই তথ্যই কাহিনীর গুণে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে লোকমন উপলব্ধি করেছে যে শাস্ত্রজ্ঞানের কূটতর্ক বহুক্ষেত্রে জীবনের সাধারণ কর্মগতিতে বিড়ম্বনা সৃষ্টি করতেই পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে লোককথা স্মরণ করেছে নৈয়ায়িক পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে (১৩/৯/১৬৯৪-১৯/১০/১৮০৭)।[১৫৬] তিনি হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবেণীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে দীর্ঘজীবী এই পণ্ডিত মৃত্যুর একমাস পূর্ব পর্যন্তও অধ্যাপনায় রত ছিলেন। তাঁর একক প্রচেষ্টায় সংস্কৃত চর্চায় নবদ্বীপের খ্যাতি প্রায় নিষ্প্রভ করে তোলেন। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থ (১৭৮৮-৯২) সঙ্কলন তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।'[১৫৭]

এই বিখ্যাত গ্রন্থটির একটি উক্তি সম্পর্কেই লোককথায় কটাক্ষপাত করা হয়েছে। কথিত আছে যে জনৈক ডাকাতের সর্দার শ্যাম মল্লিক একদিন রীতিমত দক্ষিণা দিয়ে জগন্নাথের কাছে জানতে চাইল যে লুটের মালে চোর ডাকাতের স্বত্ব আছে কিনা, জগন্নাথ বিবাদভঙ্গার্ণব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি নির্বাচন করেন--- 'চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্বন্তি' হৃত দ্রব্যে চোরের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে।

যেদিন তিনি ব্যবস্থাপত্র দেন, সেই দিন রাত্রেই তাঁর নিজগৃহে ডাকাতি হয়। এই

ডাকাতির ঘটনাটি সম্ভবত সত্য, কারণ ১২০২ সনের একটি তায়দাদে দেখা যায় যে, জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করেছেন—

'আমাদিগের বাটীতে ডাকাতি হইয়াছে এবং কোটা পড়িয়া কাগজপত্রাদি ও পুস্তক অনেক তছরূপ হইয়াছে।[১৫৮]

এইভাবে নৈয়ায়িক শাস্ত্র প্রমাণের জটিলতার সঙ্গে ডাকাতির ঘটনাকে যুক্ত করে, লোকমন পুঁথিবিশারদ পণ্ডিতের প্রতি কৌতুককটাক্ষই করে নি, জনসাধারণের কাছেও অগ্রিম সাবধানবাণী পৌঁছে দিয়েছে।

অবশ্য প্রকৃত জ্ঞানকে লোকসমাজ শ্রদ্ধা করেছে, জ্ঞানীর একাগ্র নিষ্ঠাকে সম্মান দিয়েছে আর মেধাবী পণ্ডিতের স্থূলসাংসারিক চিন্তা বিমুখ দার্শনিক মনকে অমর করে রেখেছে লোককথার মধ্যে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের প্রসঙ্গ অষ্টাদশ শতকের এই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপনা করতেন।[১৫৯] আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণনগরের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেননি। 'কথিত আছে, এইরূপে যখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষারহিত পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত হইতেছিল তখন তদানীন্তন নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র তাঁহাদের এই দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া কিছু সাহায্য-মানসে একদিন তাঁহাদের কুটিরে পদার্পণ করেন। রাজা উপবিষ্ট হইয়া কথান্তরে রামনাথকে তাঁহার কিছু অনুপপত্তি আছে কিনা, জিজ্ঞসা করেন, তাহাতে রামনাথ উত্তর করেন, "মহারাজ! সম্প্রতি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছুই তো অনুপপত্তি দেখিতেছি না।" এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্য হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও সস্ত্রীক রামনাথ তাঁহার দান অস্বীকার করেন।'[১৬০]

অর্থাৎ, বিষয়-বিমুখ নির্লোভ মহাপণ্ডিতের চিররক্ষিত সম্মান উপচিকীর্ষার করুণায় বিসর্জিত হয় না, আত্মসম্মান সূচক এই বোধই জনশ্রুতির সার কথা।

জনশ্রুতি এইভাবেই নিজস্ব ধ্যানধারণা মতাদর্শ, বিশ্বাসকে বিস্তারিত করেছে বাস্তব আশ্রয়ের মাধ্যমে। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের (১৭৩০--১৭৪০) ধর্মবিষয়ে[১৬১] অত্যধিক সতর্কতা লোকমননে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। প্রত্যেক প্রজাকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করতে বাধ্য করেন তিনি। শুধু তাই নয় এই নিয়ম পালন করা হয় কি না, তা লক্ষ্য করার জন্য অনেকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। এই উৎকট ধর্মান্ধতার প্রাবল্য লোকমানস থেকে আধ্যাত্মিব স্পর্শ নিশ্চিহ্ন করে ফেলে; হরিনাম কীর্তন কেবল যান্ত্রিক দায়বদ্ধতায় পরিণত হয়।[১৬২] যার সাক্ষ্য 'জপের ব্যাপারটা বিষ্ণুপুরে 'গোপালসিংহের বেগার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[১৬৩]

পরাধীনতার দৌর্বল্য সঙ্কুচিত করেছে বাঙালী হৃদয়কে। তাই নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরও (১৭১০-১৭৮২)[১৬৪] বহুবিধ চরিত্রগুণ লোকসমালোচকের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ থেকে রেহাই পায় নি। কারণ তিনি ছিলেন নবাব অনুগৃহীত এবং 'তাহারই অনুকম্পায় ও পরামর্শে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীক্ষেত্রে ইংরাজগণ এদেশ অধিকার করে। তাঁহার কৃত উপকারের স্মৃতি নিদর্শন স্বরূপ ইংরাজ তাঁহাকে দিল্লী হইতে রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি

ও পলাশীক্ষেত্রে ব্যবহৃত দ্বাদশটি কামান উপহার দেন।'[১৬৫]

কিন্তু জনগোষ্ঠী মানতে পারেনি কৃষ্ণচন্দ্রের এই ইংরাজতোষণ, যা দেশদ্রোহিতারই নামান্তর। সেই কারণে বিদ্রূপ ব্যক্ত হয়েছে লোককথায়, কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠা মহিষীর সংলাপে। কৃষ্ণচন্দ্র যখন গর্বভরে বলেন, 'দেখ আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি রূপার খাটে শয়ন করিলে।[১৬৬] তেজস্বিনী রাজমহিষী বলেন, 'আর একটু উত্তর যাইলে, সোনার খাটে শয়ন করিতে পারিতাম।'[১৬৭]

আর একটু উত্তর, অর্থাৎ আরও একটু হীনতা স্বীকার করে মুর্শিদাবাদের নবাবের সঙ্গে বিবাহ হলে কিংবা ইংরাজ তোষণ করলে তো অঢেল সম্পদের অধিকারী হওয়াই যায়।[১৬৮] মহিষীর এই ব্যঙ্গদৃপ্ত উত্তরটি লোকমননের গ্লানিকেই প্রকট করেছে।

দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণের নজীর পাই কুমিল্লা জেলার কান্তিরাজার দীঘিকে ঘিরে গড়ে ওঠা কিংবদন্তীটিতে।[১৬৯] সামান্য পশুপক্ষী পর্যন্ত আপন জন্মভূমি ভোলে না, এক ফকিরের এই উক্তির প্রমাণ দাবী করেন কান্তি রাজা। 'ফকির বলিলেন, এসো তোমার দীঘি থেকে একটা মাগুর মাছ ধরিয়া আনি।'' রাজা ধরিয়া আনিলেন। ফকির মাছটির দুই কানে দুইখানা সোনার গহনা পরাইয়া দীঘির পানিতে ছাড়িয়া দিলেন আর ঐ পানিতে একটা লোহার চাই পাতিয়া রাখিলেন।

......একযুগ বারো বৎসর পর দেখা গেল চাই-এর মধ্য একটা মাগুর মাছ লাগিয়াছে। স্বর্ণের গহনাগুলি এখনও আগের মতই আছে। কেবল মাছটার আর আগেকার যৌবন নাই বুড়া হইয়া গিয়াছে।'[১৭০]

এই লোককথার সত্যতা নিরেট নাও হতে পারে কিন্তু প্রতিপাদ্য মহান্। দেশপ্রেমের অমোঘ টানকে কোন সহিংস বিপ্লব আন্দোলন ছাড়াই নিপুণভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে লোককথাটি।

বাংলা লোককথায় এইভাবেই সমগ্র সমাজের জীবন ও হৃদয়বার্তা প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। ইতিহাস- জ্ঞানের সার্থকতা প্রসঙ্গে কার্লম্যান্‌হাইম বলেছেন--

'History conceived without its social medium is like motion conceived without that which is moving.'[১৭১]

অর্থাৎ সামাজিক মর্মকোষ বিহীন ইতিহাস গতিহীন সত্তা মাত্র। সেই সামাজিক বনিয়াদটি প্রতিষ্ঠিত করে দেয় জনশ্রুতি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরিপূরণ ব্যতীত লোককথার বক্তব্যকে যথার্থ ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান বিপজ্জনক, এ সতর্কতা ব্যক্ত করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর মতে--

'ইহার মধ্যে একাধারে অতীত যুগের চিত্র যেমন প্রকাশ পাইতে পারে, তেমনই সমসাময়িক কালের নিতান্ত অর্বাচীন চিত্রও প্রকাশ পাইতে পারে--কিন্তু উভয়ই এখানে সমান অস্পষ্ট হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করে। অস্পষ্টতাই যাহার ধর্ম. তাহার কোন ঐতিহাসিক দাবী থাকিতে পারে না।'[১৭২]

দাবী না থাক, কিন্তু ঐতিহাসিক যুগ ও সমাজ পরিবেশের মৃত্তিকাগন্ধী উপাদান আছে, এই মতটিকেও উপেক্ষা করেন নি গবেষক। ভট্টাচার্য স্বীকার করেছেন--

'উন্নততর সমাজ ও সমৃদ্ধতর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া নূতনতর রূপলাভ করিলেও হার অন্তর্নিহিত পরিচয় অক্ষুন্ন থাকিয়া যায়।'[১৭৩]

এই অন্তর্নিহিত পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের মতে 'আস্ত জগতের ভাঙ্গা টুকরা।'[১৭৪] ইংরাজগবেষক এই বিষয়ে সহমত যে বহিরঙ্গগত ক্রমপরিবর্তন সাধিত হলেও মূল ভাবধারা থাকে অপরিবর্তনীয়--

'It has been carried down the centuries and like a snow-ball without losing its ancient core has gathered round it the spiritual and imaginative riches of a people of a much more advanced age.'[১৭৫]

অতীতের খণ্ড স্মৃতির মাধ্যমেই প্রাচীন যুগের সঙ্গে যোগসূত্র, রচনা করে লোককথা 'পুরাতত্ত্ব আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।'[১৭৬]

সেইভাবেই, সনাতন বাংলার ত্যাগ, ধর্ম, তিতিক্ষা, মাতৃত্ব, সতীত্ব ও দেশপ্রেমকে সমগ্র বাঙালী সমাজ যে কত বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করেছে, তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ঐ ঐতিহাসিক স্পর্শ সম্বলিত বাংলার লোককথাগুলি।

উল্লেখপঞ্জী

১। Gomme George Lawrence, Folklore as an Historical science, London 1908,। P. 12

২। রায় নীহাররঞ্জন, ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি, বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (প্রকাশভবন, জানুয়ারী ১৯৯৬) উদ্ধৃত, পৃঃ ১৩১

৩। Mode Heinz, City Lore/Folklore India, Vol-1, No.5, 1968, P.56.

৪। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ষোড়শ সংস্কর মিত্র ও ঘোষ, বাং ১৩৯০, শঙ্খমালা, পৃঃ ৩৩৮

৫। ঐ, পৃঃ ৩৪১

৬। সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ৩

৭। ajumder R.C.History of Ancient Bengal . G. Bharadwaj and Co. Reprint. 974. P. 518

৮। মজুমদার আশুতোষ, মেয়েদের ব্রতকথা, দেব সাহিত্য কুটির, জুলাই ১৯৯০, পৃঃ২৯

৯। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রথম দে'জ সংস্করণ বৈশাখ, ১৪০০, পৃঃ ৫১৮

১০। ঐ, পৃঃ ৯৬৩

১১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক), পৃঃ ৩৪১

১২। মুখোপাধ্যায় আশুতোষ, রাক্ষস খোক্কস, পঞ্চদশ সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী, পৃ: ৫৪
১৩। ঐ
১৪। ভারতকোষ, পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাং১৩৮০, পৃ:৫৬৫
১৫। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক) পৃ:৮৬
১৬। ঐ
১৭। শাস্ত্রী হরপ্রসাদ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৫৩, পৃ: ২৩-২৭
১৮। সেন দীনেশচন্দ্র , পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক), পৃ:৮৬
১৯। ঐ, পৃ: ৮৭
২০। ভারতকোষ পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪ সংখ্যক), পৃ: ৫৬৫
২১। Banerjee Kashindranath. Popular Tales of Bengal, 1908, P. 182
২২। ভারতকোষ, তৃতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাং ১৩৭৪, পৃ: ৬৩৩
২৩। মিত্র সুবলচন্দ্র, সরল বাঙালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস, অষ্টম সংস্কারণ জুলাই ১৯৮৪, পৃ: ৬১৫
২৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, কথা, ক্যালকাটা,বুক হাউস, বাং ১৩৭০, পৃ: ২১৫-২১৭
২৫। ঐ, পৃ: ২১৫
২৬। ঐ
২৭। ঐ
২৮। ঐ
২৯। Marx Karl, On Literature and Art, Moscow, 1976. P. 79.P.81
৩০। ঐ
৩১। Mcculloch William Bengali Household Tales, London. 1912. P. 228-239
৩২। ঐ, P. 228-239
৩৩। P. 243
৩৪। ভারতকোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২২ সংখ্যক), পৃ: ২৮৫-২৮৬
৩৫। Majumdar R. C. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংখ্যক), P. 38
৩৬। ঐ, P. 39
৩৭। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক), পৃ:২১১
৩৮। সিদ্দিকী আশরাফ, লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, আগষ্ট ১৯৯৪, ঢাকা মল্লিক ব্রাদার্স, পৃ: ২৪০
৩৯। ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, প্রকাশভব, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ,২৫৫
৪০। ভারতকোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্ত (২২ সংখ্যক), পৃ: ৪৬১
৪১। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক), পৃ: ৪৯৬
৪২। ঐ, পৃ: ৪৯৫
৪৩। ঐ
৪৪। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৯ সংখ্যক), পৃ: ২৬০
৪৫। Majumdar R C. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক),পৃ: ৩৯০
৪৬। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক), পৃ:৩৯০
৪৭। মিত্র সতীশচন্দ্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ: ৪০৫
৪৮। ঐ, পৃ: ৪০৬-৪০৭
৪৯। Sarkar Jadunath, The History of Bengal, Third Impression, August, 1976.

University of Dacca, P. 221
৫০। মিত্র সতীশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক), পৃ. ৪০৮
৫১। ঐ। পৃ. ১৭৫-১৭৯
৫২। Bengal Past and Present 1961. Part II. P. 258•
৫৩। মিত্র সতীশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক), দ্বিতীয় সংস্করণ জুন, ১৯৬৫, পৃ:২৩১
৫৪। ঐ
৫৫। ঐ, পৃ: ২৮৫
৫৬। হোসেন হোসেনউদ্দীন, যশোর জেলার কিংবদন্তী, বুক সোসাইটী ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৭৪ পৃ:১০-২১
৫৭। ঐ
৫৮। সিদ্দিকী আশরাফ, কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫, পৃ: ৬৪-৬৬
৫৯। ঐ, পৃ: ৩৭
৬০। মিত্র সতীশচন্দ্র পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৩ সংখ্যক), পৃ: ১৮৫
৬১। Journal of the (Royal) Asiatic Society of Bengal. No. 6, Calcutta, 1907. P.425
৬২। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক), পৃ:১১৩৮
৬৩। ঐ পৃ: ২৬২
৬৪। ভারতকোষ, চতুর্থ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বাং ১৩৭৭, পৃ: ৩৭৪
৬৫। Majumder R. C. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭ সংক্যক). P. 136
৬৬। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক) পৃ. ২৬৩
৬৭। মিত্র সতীশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৫৩ সংখ্যক). পৃ. ৪৬৬
৬৮। ঐ, পৃ: ৪৬৬
৬৯। ঐ, প: ৪৬১
৭০। ঐ, পৃ: ৪৬১
৭১। ঐ, পৃ: ৪৬৬
৭২। সেন অশ্বিনীকুমার, মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩২৩ পৌষ পৃ: ৫৪১-৫৪২
৭৩। ঐ
৭৪। ভট্টাচার্য তরুণদেব, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, বাঁকুড়া, ফার্মা কে. এল.এম প্রাইভেট লিমিটিড, প্রথম প্রকাশ কলিকতা ১৯৮২, পৃ: ১২০
৭৫। ঐ, পৃ: ১১৮
৭৬। ঐ, পৃ: ১১৮-১১৯
৭৭। ঐ
৭৮। ঐ, পৃ: ১২০-১২১
৭৯। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক) পৃ: ১১৬
৮০। সেন প্রলয়, পশ্চিমবাংলার তীর্থ, মডেল পাবলিশিং হাউস, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৮৫, পৃ: ১৪৩-১৪৪
৮১। ঐ
৮২। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৯ সংখ্যক), পৃ: ২২৯
৮৩। Gomme George Lawrence. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক), P 122
৮৪। চৌধুরী তিতাশ, কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য, ঢাকা বাংলা একাডেমী; ১৯৮৩ পৃ: ২২৭-২২৮

৮৫। ঐ
৮৬। Sarker Jadunath. পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৯ সংখ্যক),P. 79
৮৭। ঐ
৮৮। দাস গিরীন্দ্রনাথ, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ: ১১৬
৮৯। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩৯ সংখ্যক), পৃ: ২৯৭
৯০। ঐ, পৃ: ২৯৮
৯১। মিত্র চিত্তপ্রিয়, বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্তুজা ও সুফি মর্তুজানন্দ, রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, বাং ১৩৭৯, কার্তিক পৌষ সংখ্যা।
৯২। ঘোষ সুবোধ, কিংবদন্তীর দেশে নিউ এজ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্কারণ, অক্টোবর ১৯ পৃ, ১৩৮--পৃ: ১৪৫
৯৩। সেন প্রলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংখ্যক), পৃ: ১১৪
৯৪। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, মাঘ ১৪০০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ, ৪৭১
৯৫। সেন প্রলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংখ্যক) পৃ: ১১৪
৯৬। মিত্র সতীশচন্দ্র পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক), পৃ.৯
৯৭। ঐ
৯৮। ঘোষ বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৯৪ পৃ: ৩০-৩১
৯৯। চক্রবর্তী রজনীকান্ত, গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৯৯, চতুর্থ অধ্যায়. পৃ: ২২৯
১০০। ঐ
১০১। ঐ
১০২। Sarkar Jadunath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) । P. 146
১০৩। ঘোষ সুবোধ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯২ সংখ্যক), পৃ: ২২৬-২৩৫
১০৪। ঐ, পৃ: ৩৬-৪২
১০৫। Sarkar Jadunath, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩সংখ্যক)। P. 215
১০৬। ঘোষ সুবোধ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯২ সংখ্যক), পৃ: ৪২
১০৭। ঐ, পৃ: ২৩৬-২৪৫
১০৮। ঘোষ বিনয় পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, তৃতীয় মুদ্রণ আগষ্ট ১৯৯৮ পৃ: ৬৯
১০৯। ঐ, পৃ: ৮৬
১১০। ঐ
১১১। ঐ, পৃ: ৮৯
১১২। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯২ সংখ্যক), পৃ:২৪৪
১১৩। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ৮৭
১১৪। ঐ: পৃ: ৮৬
১১৫। ঐ
১১৬। Watson William, Ancient China : The discoveries of Post Liberation. Archaelology, New York. 1974, P. 9
১১৭। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৮ সংখ্যক) পৃ: ২০
১১৮। ঐ
১১৯। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ১৩৯
১২০। ঐ
১২১। ঐ, পৃ: ১৩৭

১২২। ঘোষ সুবোধ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯২ সংখ্যক) পৃ.১০৮-১১৩
১২৩। দাস গিরীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮৮ সংখ্যক), পৃ: ৪২-৫
১২৪। ঐ, পৃ: ৪২
১২৫। ঐ
১২৬। ঐ, পৃ: ৬৯-৭০
১২৭। বিবেকানন্দ স্বামী পরিব্রাজক, উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বাদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮১, পৃ: ৩০-৩১
১২৮। সেন প্রলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংখ্যক) পৃ: ২০৪
১২৯। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক) পৃ: ৩৭৩
১৩০। সেন প্রলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংখ্যক), পৃ: ২১০-২১৪
১৩১। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংখ্যক), পৃ: ২১০
১৩২। সেন প্রলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংক্যক) পৃ: ২১০
১৩৩। মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত বাঘ ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ১৯৮০, পৃ: ৬৯
১৩৪। ঐ
১৩৫। ঘোষ বিনয় পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৮ সংখ্যক), পৃ: ৬৫-৭০
১৩৬। কামিল্যা, মিহির চৌধুরী আঞ্চলিক দেবতা ঃ লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববদ্যালয়, জানুয়ারী ১৯৯২, পৃ:৩৮
১৩৭। সেন প্রলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংখ্যক) পৃ: ১৬২
১৩৮। Thompson Stith, The Folktale, University of California, Press, Reprinted 1977. P. 235
১৩৯। লোকসাহিত্য, দশম খণ্ড, কিংবদন্তী সংকলন, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৭০, পৃ: ৭৫-৭৭
১৪০। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৯৮ সংখ্যক), পৃ: ১৫৭-১৬২
১৪১। সেন প্রলয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৮০ সংখ্যক), পৃ: ১৯৪
১৪২। ঐ
১৪৩। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক), পৃ: ১১৩৯
১৪৪। ঐ
১৪৫। Thompson Stith, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক), P. 8
১৪৬। দ্যতিয়েন ফাদার সম্পাদিত ইতিহামালা, গল্পসংখ্যা ১০৯, শান্তি সদন, পৃ: ৮০-৮১
১৪৭। ঐ
১৪৮। সেন সুকুমার, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৩, পৃ: ২৪৫
১৪৯। মিত্র সতীশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪৭ সংখ্যক) পৃ: ৩৮৪
১৫০। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক০ পৃ: ৭১৭
১৫১। দ্যতিয়েন ফাদার পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৪৬ সংখ্যক), পৃ: ৮১
১৫২। মিত্র শিবরতন, বীরভূমের লোককাহিনী, বীরভূম, চৈত্র ১৩১১, দ্রষ্টব্য গ্রন্থ কৌশিকী, বিশেষ রোমন্থন, সংখ্যা ১৯৯৭ পৃ: ২১৮-২২০
১৫৩। ঐ, পৃ: ২১৮
১৫৪। ঐ
১৫৫। ঐ
১৫৬। সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, ৩য় সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৪, পৃ: ১৬৮
১৫৭। ঐ
১৫৮। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৮০ সংখ্যক), পৃ: ২৯১

১৫৯। ঘোষ বিনয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫৬ সংখ্যক), পৃ: ৪৮৪
১৬০। মল্লিক কুমুদনাথ, নদীয়া কাহিনী, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ: ৯৩-৯৪
১৬১। ভট্টচার্য তরুণদেব, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৭৪ সংখ্যক), পৃ: ১২২-১২৩
১৬২। সেন দীনেশচন্দ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৬ সংখ্যক) পৃ: ১১১৬-১১১৭
১৬৩। ঐ, পৃ: ১১১৭
১৬৪। মল্লিক কুমুদনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১০৬ সংখ্যক), পৃ: ২৩১
১৬৫। মল্লিক কুমুদনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ(১৬০ সংখ্যক)পৃ: ২৩৩
১৬৬। ঐ, পৃ: ২৩৪
১৬৭। ঐ
১৬৮। ঐ, লেখকের ব্যাখ্যা, পৃ: ২৩৪
১৬৯। লোকসাহিত্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৩৯ সংখ্যক), পৃ: ১২৪-১২৫
১৭০। ঐ, পৃ: ১২৫
১৭১। Mannheim karl, Essays on the Sociology of Culture, London, 1956, P. 37
১৭২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড ক্যালকাটা বুক হাউস, পারিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২
১৭৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, ছেলেভুলানো ছড়া বিশ্বভারতী, ফাল্গুন ১৩৯৯, পৃ: ৩২
১৭৪। Dawkins R. M. The Meaning of Folktales, Folklore LXII, 1951. P. 428
১৭৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৭৪সংখ্যক), পৃ, ১৬

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

'স্বপ্নে দেখেছি আমি মধুমালার দেশ রে'[১] — মদনকুমারের এই স্বপ্ন প্রতিটি আত্মসচেতন মানুষের অতীতচারিতা। অতীতের দিকে ফিরে লৌকিক বুনিয়াদটি চিনতে চেষ্টা করে মানুষ। উদ্ধার করতে চায়, সংরক্ষণ করতে চায় আপন পিতৃ-পিতামহের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। দেশীয় ভাবসিক্ত এই অন্বেষণই জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির প্রাণবিন্দু। আমরাও প্রয়োগ করেছি এই পদ্ধতি। অবশ্য, শুধু বাংলা লোককথার ক্ষেত্রে।

বাংলা লোককথায় মনোরঞ্জক কাহিনীর বুননে পরিবেশিত জীবনেরই আলেখ্য। ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার সচেতন প্রয়াস নেই। পরিস্থিতির ক্রমাগত পদক্ষেপ দেখতে দেখতে চলেছে লোককথা। সে দেখার সামনে পড়েছে সমগ্র বাংলারই সমাজজীবন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন, ধর্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি যাবতীয় কাজই সেই জীবন ধারার অংশ। প্রাক্ অধ্যায়গুলিতে সেই জীবনধারারই অন্বেষণ।

সামাজিক কর্ম ও চিন্তাধারার নানা ঘাত-প্রতিঘাত প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি মানব প্রবৃত্তির নানা জটিল আবর্ত-সততার বিপরীতে কাপট্যের চোরা স্রোত। কতগুলি সমস্যাও সর্বদাই উত্যক্ত করেছে লোকজীবনকে। যেমন অস্তিত্বের সংকট। রূপকথা, ব্রতকথা, পুরাকথা সর্বত্রই এর অভিঘাত স্পষ্ট। 'নীলকমল আর লালকমল'[২] গল্পে দলে দলে লোক পালাচ্ছে রাজ্য ছেড়ে — রাক্ষসের ভয়ে। The Ghost Brahman[৩] গল্পে গৃহস্থের অনুপস্থিতির সুযোগে ধূর্ত ভূত জবরদখল করে নিচ্ছে গৃহ সম্পত্তি এমন কি গৃহস্থের স্ত্রীটিকেও। এরপর আছে প্রকৃতির রোষ। হুতোম পাখির জন্মকথায়[৪] প্রবল ভূমিকম্প ধবল ঘুঘুর জন্মবৃত্তান্তে[৫] করাল মহামারী ধ্বংস করছে লোকালয়।

ছিন্নমূল মানুষের জীবনের সাধারণ সমস্যাটি অর্থকষ্ট। ধনী রাজা মুহূর্তে দরিদ্রে পরিণত, সওদাগরের বাড়-বাড়ন্ত বাণিজ্য জাহাজডুবির সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে গেছে অতলে। স্বদেশে এবং দেশের বাইরে কোথাও তারা নিরাপদ নয়। ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত, বিবিধ বিপর্যয়ের বলি হয়ে পোড়্-খাওয়া মানুষ গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ। প্রতিবাদ চেতনাটি আন্তর্জাতিক। কখনো এককভাবে, কখনো বা দলগত যৌথ প্রচেষ্টায় মরিয়া মানুষ পাল্টা আঘাত হেনেছে। Kangala[৬] গল্পে দুঃখী কাঙাল নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিপ্‌টে মামাকে জব্দ করেছে, আদায় করেছে সম্পত্তি। ছোট্ট এক ঝাঁক মশার ক্রমাগত আক্রমণ ধনী বিলাসী রাজাকে পর্যুদস্ত করেছে। রাজা বাধ্য হয়ে টুনটুনির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।[৭]

লোককথার সদস্যরা বৃহৎ আর মহতের সাধনা করেনি, অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থান এই তিনটিই তাদের মুখ্য চাহিদা। এই প্রয়োজনই তাদের শিখিয়েছে উৎপাদন। পূর্ববর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি, চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন যুগে লোককথার সদস্যরা যে উৎপাদন করেছে, সেটাই তাদের সমকালীন সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা

নিয়ন্ত্রণ করেছে। বারমেসে লক্ষ্মীপুজোর ব্রতকথায় কৃষি মাহাত্ম্য,[৮] শঙ্খমণি,[৯] কাঞ্চনমালার[১০] গল্পে বণিককুলের রম্‌রমা। The Story of Prince Sabur[১১] গল্পে বয়ন ও সীবন শিল্পের সমাদর দুর্লক্ষ্য নয়।

প্রয়োজনের সূত্রেই শিল্প আর শিল্পীও বাঁধা পড়ে গেছে লোকগল্পে। লোহাসুরকে মারার জন্যই কামারের জন্ম,[১২] শিবের বিবাহের মৃৎপাত্র নির্মাণের জন্যই কুমোরের আবির্ভাব[১৩]। বাংলার বিখ্যাত নকৃশি কাঁথাটিও প্রদর্শনী নয়, কলাবতী রাজকন্যা[১৪] গল্পে ঐ কাঁথা ছুঁড়েই দুষ্টু বুড়ি আটকেছে বাঁদর বুদ্ধুকে। শাড়ীতে খবর বুনে বুনে প্রেমিকের কাছে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাঠিয়েছে রাজকন্যা আলম আরা। তাই কলাকৈবল্যবাদকে পেছনে ফেলে যাবতীয় সৃষ্টিই গল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ।

চাহিদার সিঁড়ি বেয়েই ধর্মচিন্তার উদ্ভব। আরাধ্য প্রত্যেক দেব-দেবীই পার্থিব চাহিদা পূরণের সঙ্গে যুক্ত। কৃষিক্ষেত্রের রক্ষক ক্ষেত্রপাল, নীরোগ সুস্থ লাবণ্যের বরাভয় দিয়েছেন সাতবিবি।[১৫]

আসলে, প্রিয়জন পরিবৃত হয়ে স্বচ্ছন্দে দিন যাপনই লোককথার প্রাণের কথা। প্রিয়কেও তাই দেবতা করে তুলেছে তারা। তৃতীয় অধ্যায়ে, শঙ্খমণি অদেখা মার জন্যই মন্দির গড়ে তুলেছে।[১৬] পূজনীয়াকে বন্দনাই ধর্মাচরণ— এই বোধটি অবশ্যই অগ্রসৃত মানসিকতার চিহ্ন। একই সঙ্গে যুক্তিহীন আচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদটিও উঠে আসছে। পুরোহিত কন্যাকে গিলে ফেলে দেবীকল্যাণেশ্বরী লজ্জায় বিমুখ হলেন [১৭]— এই অনুতাপ সভ্যতার পথে এগিয়ে আসা সমাজ সদস্যের। টুকরো টুকরো এই সব ছবির মাধ্যমে লোককথা ধরে রাখছে পরিবর্তিত মূল্যবোধকে।

পরিবর্তন সম্পর্কে লোকবিজ্ঞানী জেনো ব্লুস্টাইন বলেছেন যে লোকসমাজের মূল চরিত্রটাই একটি মেলটিং পট ওরফে হাঁড়ির মতো। ব্যবহারিক প্রয়োজনের খুন্তি দিয়ে অবিরাম একটি মন্থন হয়েই চলেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিদ্যা শিল্প বাণিজ্যের স্বার্থই সেই মন্থন দণ্ড। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখেছি, পরিবর্তনের একটি অন্য বড়ো কারণ ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ। অর্থাৎ সান্নিধ্য, সংঘাত আর সমন্বয়, সংস্কৃতির এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই লোককথায় পাওয়া যাচ্ছে। যুগান্তরের দ্বন্দ্বমুহূর্তগুলি ধরা পড়েছে এখানে। কৃষি বাণিজ্য সংঘাত রাজতন্ত্র বণিকতন্ত্র রেষারেষি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের লড়াই এমন কি দলে দলে রাক্ষস যখন লোকালয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তখনও আর্য-অনার্যের লড়াই-এর আঁচটা টের পাওয়া যায়।

কালের প্রভাবে সংঘাতের উত্তেজনা প্রশমিত, সমন্বয়ের মধ্যেই প্রার্থিত শান্তি খুঁজে পেয়েছে লোককথা। তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায়ের নজিরগুলি তার প্রমাণ। অর্থনীতি, রাজনীতি এমন কি ধর্মাচরণেও সমন্বয়ের বাণীটি উহ্য থাকেনি। ষষ্ঠী অনার্য দেবী। ভক্তকে স্বয়ং দেবী পূজার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন— বুড়ি বামনির বেশ ধরে দক্ষিণ-রায়ের সঙ্গে গাজী সাহেবের সংঘর্ষ মেটাচ্ছেন বিধাতাপুরুষ অর্ধ-হিন্দু অর্ধ-মুসলমান রূপধারী তিনি।[১৮]

সমন্বয় চিন্তাটির মধ্যেই আছে ঔদার্য। লোককথা এই উদারতাকে পুরোপুরি আত্মস্থ

করেছে। নতুনকে সমীকৃত করার গরজ আছে, সেই সঙ্গে সনাতনের প্রতি বিরাগও নেই পরীকন্যা, জায়নামাজের পাটি,[১৯] খোয়াজখিজির,[২০] কলফিরিঙ্গির[২১] মতো বিদেশী বস্তুগুলিও জায়গা পাচ্ছে। একই সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদ, রূপান্তরবাদ এই সব আদিম বিশ্বাসের স্মৃতিও প্রত্যক্ষ করেছি। এই স্থিতিস্থাপক গুণটির দৌলতে পরস্পর বিরোধী চেতনাও স্থান পাচ্ছে। The Barber Brahman[২২] ইত্যাদি গল্পে জাতিবর্ণভেদ বিশিষ্ট সমাজের জটিলতা ছাপ ফেলেছে, তেমনি সামাজিক স্তরভেদ ভুলে গিয়ে বন্ধুত্বের, স্নেহপ্রীতির আদর্শ উদাহরণ তুলে ধরেছে রাজপুত্র আর জেলেনির মধ্যে 'হাসন-সখি'[২৩] সম্পর্ক কিংবা ব্রতকথার ব্রাহ্মণী আর গোয়ালিনীর নিভাঁজ বন্ধুত্ব। এইভাবে প্রাক্‌অধ্যায়গুলির আলোচনা আমাদের এই তথ্য জানিয়েছে, লোককথা একই সঙ্গে যুগোপযোগী এবং যুগোত্তীর্ণ।

বাংলার নারী-মহিমা সম্পর্কে লোককথার দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। পুরুষ চরিত্রগুলি ছকে বাঁধা, কিছুটা একঘেয়েও। যাবতীয় দুর্বলতা কাটিয়ে মেয়েরাই উজ্জ্বল। ঝক্‌ঝকে সপ্রতিভতায় তারা মেটাচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রয়োজন। নৃত্য গীতে তাদের প্রতিভা সহজাত। অন্যদিকে, প্রয়োজনমতো শ্রম বিক্রয় করে পরিবার প্রতিপালনেও তারা পিছপা নয়। সঙ্কটকালে ব্যক্তিত্বহীন ভীরু পুরুষকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে মেয়েরাই বিপন্মুক্তি ঘটাচ্ছে। রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব থেকে চাষের আদর্শ পদ্ধতি কিংবা সফল বাণিজ্য কৌশল থেকে শুরু করে টাকা রোজগারের বিচিত্র পথগুলি তারাই চিনিয়ে দিয়েছে। নারী প্রতিভার এই সর্বমুখী বিকাশ আমাদের আলোচনায় এসেছে। সমাজে নারীর স্থান, অর্থনীতিতে অবদান, রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি যুগভেদে সহমতজ্ঞাপক ঐতিহাসিক সূত্রগুলিও উল্লিখিত।

বাংলা লোককথার প্রাণ-ভোমরা 'লোক'শব্দটির মধ্যেই রয়েছে। গবেষণার অধিকাংশ জুড়ে আছে তারাই। এই 'লোক' বাংলারই জনগণ। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিশ্লেষণ থেকে জেনেছি, এই জনগণ স্বভাবভীরু দরিদ্র। সম্পদের অসম বণ্টন স্পষ্টই ধনী-নির্ধনের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছে। বহুবিধ বঞ্চনা আর বিতৃষ্ণার শিকার হয়েছে তারা। রাজা আসে, রাজা যায়, কিন্তু তাদের অবস্থা অপরিবর্তনীয়। তাই ঐতিহাসিকদের একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত— "নিম্নশ্রেণীর স্তরগুলি ছিল একান্ত অবজ্ঞা ও হতচেতন ও সঙ্কীর্ণ। রাষ্ট্র ও জননায়কদের প্রতি তাহাদের কোন বিশ্বাস ছিল না। সচেতন দায়িত্ববোধ ছিল না। কাজেই— ইহাদের মধ্যে বিপ্লব বিদ্রোহের একটি বীজ সুপ্ত থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে।"[২৪]

কিন্তু লোককথার জনগণকে আমরা পাচ্ছি অন্যভাবে। আপন হতচেতন অবস্থাকে তারা কর্মপটুতার জোরে অতিক্রম করে গেছে। শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সব জায়গায় তাদের পরিশ্রমী হাতের ছাপ। ঘটনার অগ্রগতিতে তারা অনুঘটক, কখনো কূটবুদ্ধি আর কৌশলতৎপরতায় তারাই নায়ক বা নায়িকা। এক্ষেত্রে দেড় আঙুলে[২৫] গল্পটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। তার দৈহিক খর্বতা শ্রেণীগত হীনতারই সূচক। কিন্তু অধ্যবসায়, সাহস আর প্রজ্ঞার আলোকেই সে বিজয়ী, রাজ্যের উত্তরাধিকার আর রাজকন্যা তারই আয়ত্তে। তা সত্ত্বেও গল্পের শেষে শ্রম আর রাজসুখ দুয়েরই প্রতি তার সমান কদর। একবেলা কাঠ কাটে,

একবেলা রাজ্য করে। এর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোককথার জনগণ ওপরতলার চুঁইয়ে পড়া দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী নয়। বরং রাজা থেকে শুরু করে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সকলেই বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এদেরই ওপর নির্ভরশীল।

পঞ্চম অধ্যায়ে রাজা প্রজা সম্পর্ক আলোচনায় এই ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট।'রাজ্য রম্‌রম্ রাজসভা গম্‌গম লোকজন গুবগুব'[২৬]— সমারোহ আর আনুগত্য ছাড়া শাসন অচল। সম্পর্কটা এতই অচ্ছেদ্য যে নিষ্ঠুর রাজা যতই উৎপীড়ন করুক, প্রকাশ্য বিপ্লবের কথা প্রজারা ভাবতেই পারে না। মহোত্তর আদর্শেই তারা বিশ্বাসী— সেটি শুদ্ধিকরণ। এ প্রসঙ্গটি বিস্তৃতি পেয়েছে প্রাক্ অধ্যায়গুলিতে মালঞ্চমালা, দেড়আঙুলে, শীত-বসন্ত এই সব গল্পে। দুর্বিনীত আপনজনকে সুমন্ত্রণা দিয়ে সৎপথে ফিরিয়ে আনার মধ্যে যে মমতা, স্নেহ কাজ করে, বাংলা লোককথা সেই ভাবনাটিকেই প্রশ্রয় দেয়। শাসক-শাসিতের নীরস কেজো সম্পর্কের গণ্ডিকে মুছে ফেলা একান্তভাবে বাংলার জনগণেরই কৃতিত্ব। সম্ভবত, কোমল সরস জলবায়ুর গুণ এটি।

এইভাবেই, নিজস্ব চিন্তা-সিদ্ধান্তগুলিকেই বিস্তৃত করেছে লোককথার সদস্য। নানা অন্বেষী জিজ্ঞাসা সমাধান খুঁজেছে পুরাকথায়। সমাধানও একান্ত ভাবেই তাদের নিজস্ব। বহু ক্ষেত্রেই স্বীকৃত সত্যাসত্যের ধার ধারেনা এমনকি বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের বিপরীতে গিয়ে—মানুষ থেকে বাঁদরের উৎপত্তিও দেখিয়ে দেয়।[২৭] বিশ্লেষণের বনেদটি শক্ত করার জন্য আশ্রয় নিয়েছে বাস্তবের। প্রসঙ্গটি বিস্তৃত করেছি ষষ্ঠ অধ্যায়ে, কিংবদন্তীর আলোচনায়। দেখেছি ঐতিহাসিক ঘটনার নামমাত্র ছোঁয়া রেখে লোকমন সমর্থিত ব্যাখ্যাই উপস্থিত। সে ব্যাখ্যায় মঙ্গল, আত্মত্যাগ বা বীরত্বের পাল্লাটা ঝুঁকেছে দলিতের দিকেই। এও এক ধরনের আত্মকীর্তন, বলা চলে গণমানসের অভ্যাসই রূপ পেয়েছে এই সব গল্পে। পরিবেশনরসের গুণে অনৈতিহাসিক কল্পনার খাদটি পাকাপাকিভাবে বিশ্বাসের পলিতে ঢেকে গেছে। কাহিনীগুলিও লোকইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে।

কিংবদন্তীগুলির মধ্যে একজাতীয় লোকসাংবাদিকতার চেতনা কাজ করে। সাংবাদিকতার মুখ্য দিক Communication অর্থাৎ জনসংযোগ সাধন। কিংবদন্তীর ভেতরের ইচ্ছেটাও তাই। নিজ অঞ্চলের অনামা স্থান, ব্যক্তিত্ব কিংবা নামী ব্যক্তি সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্লেষণকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। আত্মনির্লিপ্তি, যেটি সৎসাংবাদিকতার আদর্শ, তা হয়তো নেই কিন্তু এগুলি বিচার করার আগে মনে রাখা উচিত ইংরাজ কবির সেই বাণীটি —

'Trade softly, for you trade upon my dreams' — আস্তে পা ফেল, কারণ আমার স্বপ্নের উপর তুমি পা ফেলছ।

কিংবদন্তীর মধ্যেও সেই অপূর্ণ চাহিদাগুলি, ইতিহাসের হারানো সূত্রগুলিই পূর্ণায়ত রূপ পেয়েছে। উদ্দেশ্য, অন্য দেশ বা জাতির গৌরবহানি নয়, নির্দোষ জাতিপ্রেম তথা দেশপ্রীতি আর বৃহত্তর জনহৃদয়েও সেই প্রীতি মন্ত্রটি সঞ্চারিত করে দেওয়া এ কাজেই অনুঘটক জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি।

তাই শুধুই কিংবদন্তী নয়, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি নিজেই একজন সাংবাদিক। সংগ্রাহক ও পরিবেশক। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া[২৮] বইটি। সে বইতে অবনঠাকুর বলেছেন যে শিল্প সৃষ্টির তিনটি মহল। একতলায় মালমশলা সংগ্রহ, দোতলায় রসের বিচার। আর তিন তলায় শিল্পী স্বাধীন। সেখানে সে শিল্পকে ইচ্ছেমতো গড়ছে, পিটছে, মায়ের মতো আদর করছে সাজাচ্ছে। আমাদের বাংলা লোককথা তেতলার বাসিন্দা। বস্তু আর কল্পনার মিশেলে সে সাজাচ্ছে, গড়ে তুলছে শিশু গল্পগুলি। জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি তেতলার বস্তুগুলি নিয়ে একতলা আর দোতলার কাজটি করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পদ্ধতিটির স্বরূপ বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন দেশে চর্চার ইতিহাস। লক্ষ্য করা গেছে, প্রতিটি দেশেই, দেশপ্রেমের গৌরবদীপ্ত আবেগই প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণায় আলো ফেলেছে।

বলা বাহুল্য, এই পথপ্রদর্শন সমৃদ্ধ করছে অন্যান্য আলোচনা ক্ষেত্রগুলিকেও। একটি নিদর্শন উল্লেখ করি ঠাকুরমার ঝুলি গ্রন্থে প্রাপ্ত সুখু আর দুখু [২৯] একটি বহু জনপ্রিয় পরিচিত গল্প। জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির অনুসন্ধানী দৃষ্টি গল্পটিকে বিশ্লেষণ করেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা তথ্য — বহু বিবাহ প্রথা, কার্পাস বস্ত্রের জনপ্রিয়তা, আর বয়নশিল্প, গাছের গোড়া খুঁড়ে সম্পদ সঞ্চয়, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু গরুর উপস্থিতি। কলাগাছ, শেওড়া গাছ পরিচিত বৃক্ষ, চুনী পান্না, হীরা মুক্তাও অপরিচিত নয়। অর্থাৎ অতীত ইতিহাসের গ্রামীণ চালচিত্রের কাঠামোটি প্রত্যক্ষ করছি। গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতিগুলিও কিন্তু লাভবান হচ্ছে। তুলনামূলক পদ্ধতি একই গল্পের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছে মাদার হোলে নামক গল্পটির। মার্কসবাদী পদ্ধতি আবিষ্কার করছে দুর্বলের অন্তিম জয়, সততার পুরস্কারকে। মনঃসমীক্ষক আবার দুখু বনাম সুখুর মধ্যে সুমতি বনাম কুমতির দ্বন্দ্ব দেখছেন। ঐ যে হীরে পান্নাগুলি, ওগুলি দুখুর মনের পবিত্র পরিতৃপ্তির চরিতার্থতাকেই বোঝাচ্ছে। সুখুর মুখ থেকে বেরোনো আরশোলা, ব্যাঙাচি, তারই অবচেতন অপরাধবোধের দ্যোতক। রূপান্তরবাদ, সর্বপ্রাণবাদ, ইত্যাদি বিশ্বাস, তিন ডুব দিতে জানা ইত্যাদি ট্যাবু, রূপান্তরবাদ, যাদুমন্ত্রে সুন্দরী হওয়া প্রভৃতি নানা শুক্ল ও কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল থেকে নৃতাত্ত্বিক সভ্যতার কালক্রমটি নির্ধারণ করছেন। গল্পটি থেকে আঞ্চলিকতার খোলস ছাড়িয়ে টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতি সন্ধান করছে উপকারী ঘোড়া কামধেনু (ডি ১৬৫২.৩.১), স্নানের মাধ্যমে সৌন্দর্য (ডি.১৮৬৬.১), চাঁদের চরকা কাটা বুড়ি (৭৫১.৮.১) ইত্যাদি মৌল অভিপ্রায়গুলি।[৩০] এইভাবে বাংলার লোককথাগুলি যে আন্তর্জাতিক স্তরেও গবেষণার উপকরণ জুগিয়ে যেতে পারছে দ্বিধাহীনভাবে, সেই অনুশীলন আর সাধন কার্যের প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি একনিষ্ঠ দিশারী।

যুগ বদলায়, সমাজমানসিকতায় প্রলয়ের ওলট পালট ঘটে। কেবল বিনাশ নেই তারই যা মানুষের শুভবোধের দ্বারা সৃষ্ট। ত্যাগের, নিষ্ঠার, সততার আর মানবতার আদর্শ দেশে দেশে কালে কালে এক ও চিরন্তন। লোককথা এই তথ্যটিই প্রতিষ্ঠিত করেছে। সনাতন মূল্যবোধগুলি লোককথার মোড়কে পরিবেশিত হয়ে অধিকতর আবেদনক্ষম। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রসঙ্গটি বিবৃত। আলোচনায় দেখেছি লোককথা সর্বত্রই ধর্মের জয়, পরিশ্রমীর সাফল্য আর

সৎ বুদ্ধির যথাযোগ্য সম্মান প্রাপ্তি। দৃষ্টান্তগুলি বৃহত্তর লোকসমাজকে প্রদান করেছে সংস্কৃতি উত্তীর্ণ মানবনীতির শিক্ষা। সুতরাং, অতীত ঐতিহ্য ধারণ করা বর্তমান কালকে বহন করা ছাড়াও, এই সমাজকল্যাণকারী দায়িত্বটিও সুচারুরূপে পালন করছে লোককথা ভবিষ্যতের রূপটিও তৈরী করে দিচ্ছে। বাংলা লোককথার গঠনভঙ্গি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বিচিত্র বাগ্‌বিধি, প্রাচীন শব্দগুলির বহুল প্রয়োগ পুনরাবৃত্তি, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে গবেষণার বিচিত্র উপকরণ জোগায়। অপরপক্ষে সাহিত্যের কারবারীরাও পেয়ে যান ভাবের রসদ, শব্দের ঝুলি। গল্পগুলিতে আছে হাসির খোরাক। আছে জৈব উত্তেজনার মুক্তি। একই সঙ্গে জীবনের সূক্ষ্মবুদ্ধিধর্মী রসচেতনাও মজুত। চিরন্তন মানবসমাজের নিত্যকার রূপ তুলে ধরে এরাই সুস্থ সাহিত্য উপকরণ যেমন সরবরাহ করে, তেমনি জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীও প্রতিষ্ঠা করছে এগুলি। ভাষা, সুর, ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহারে লোককথা বর্ণনার যে প্রয়োগ নৈপুণ্য, সহজ প্রাণাবেগ, তা লিখিত সাহিত্যের নান্দনিক প্রকাশেও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। দেশীয় ইতিহাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদ্ধতিটির গুরুত্ব উল্লেখ করেছি। প্রয়োগ করেছি লোককথার ক্ষেত্রে। ফলত, এই প্রমাণ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর — মানবজীবনের প্রত্যক্ষ স্পর্শে সমৃদ্ধ লোককথাগুলি দেশীয় ইতিহাসের আদি নিকেতন।

দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নয়। এই দেশানুরক্তির সঞ্চারক জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি। কোন কোন লোককথার মধ্যেও একই নির্যাস। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত একটি কিংবদন্তীতে [৩১] দেখি, অখ্যাত পল্লী পুকুরের ছোট মাছটি বড় দীঘিতে পুনর্বাসিত হওয়ার বার বছর পর ফিরে এসেছে ছোট পুকুরেই। এ আর কিছুই নয় স্বদেশে প্রত্যাগমনের ঝোঁকটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবার রইদ রাজার কন্যা আঁচল ভরে রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে শ্বশুরের রাজ্য মেঘরাজার দেশে শিখিয়ে দিচ্ছে সূর্যকিরণের ব্যবহার। [৩২] দেশীয় রীতি রেওয়াজের প্রচলন করছে একেবারে বিপরীত মনস্ক একটি দেশে। এই মেলবন্ধনের সুরটিই ধরে রাখছে জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি। দেশীয় সংস্কৃতির উপকরণগুলি তুলে আনছে, দেশবাসীকে স্বদেশী মাহাত্ম্য সম্পর্কে সজাগ করছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রচার করছে দেশীয় সংস্কৃতির গৌরব।

এইভাবেই, জাতীয় আবেগের সার্থক উপলব্ধিতেই— জাতীয়তাবাদী পদ্ধতির শেকড়গুলি মজবুত হয়ে ওঠে। বাংলা লোককথাগুলিও এই পদ্ধতির আলোকে দেশীয় সম্পদরূপে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়।

উল্লেখপঞ্জী

১। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় ভাগ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৮৮, পৃ.৩৮৩-৪১৭

২। ঐ, রচনাসমগ্র, প্রথমভাগ, ঠাকুরমা'র ঝুলি, পৃ. ৬৮-৭৮

৩। Dey Lal Behari, Folktales of Bengal, Uccharan, Calcutta, 1993, P. 159-162
৪। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, কাহিনী কিংবদন্তী বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৬ পৃ. ৩৯-৪৫
৫। ঐ, পৃ. ৪৬-৫৩
৬। Macculloch William, Bengali Household Tales, Heddar and Sloughten, Lon 1912, p. 62-72
৭। রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর, রচনাবলী, পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ১২৫-১২৭
৮। মজুমদার আশুতোষ, মেয়েদের ব্রতকথা, দেব সাহিত্য কুটীর, জুলাই ১৯৯০, পৃ. ৪৬
৯। মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক) পৃ. ৫১৪-৫৬৫
১০। ঐ, পৃ. ৪৮৪-৫১৩
১১। Dey Lal Behari, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৩ সংখ্যক) P.111-121.
১২। Risley. H.H.Tribes and Castes of Bengal. Firma Mukhopadhyay 1981,P.388
১৩। ঐ, p.518
১৪। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২ সংখ্যক) পৃ. ৩-২০
১৫। চৌধুরী মিহির কামিল্যা, আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান ১৯৯২, পৃ. ১১৯
১৬। দ্র ৯ সংখ্যক টীকা
১৭। চৌধুরী মিহির কামিল্যা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১৫ সংখ্যক) পৃ. ১২০
১৮। দাস গিরিন্দ্রনাথ, বাংলা পীরসাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮
১৯। হোসেন মুহম্মদ আয়ুব, বাংলার লোককথা, পুস্তক বিপণি কলকাতা, ১৪০৮ হিজরী, পৃ. ৮২-১১৭
২০। সিদ্দিকী আশরাফ, কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৮, পৃ.৬৪
২১। ঐ, পৃ.৬৬
২২। Banerjee Kasindranath, Popular Tales of Bengal, Calcutta 1905, P.32-39
২৩। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২সংখ্যক) পৃ.৭৯-৮৬
২৪। রায় নীহাররঞ্জন,বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বাং ১৪০০ পৃ. ৬৯৯
২৫। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, (২ সংখ্যক) পৃ. ১২৯-১৪০
২৬। ঐ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (১ সংখ্যক) পৃ. ৩৯১
২৭। ফরিদউদ্দীন মুহম্মদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (৪ সংখ্যক) পৃ. ১১৮-১২২
২৮। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৮
২৯। দক্ষিণারঞ্জন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ (২সংখ্যক)
৩০। মজুমদার দিব্যজ্যোতি, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স্, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৪
৩১। রাব্বী ফজলে (প্রকাশক), লোকসাহিত্য, দশম খণ্ড, কিংবদন্তী সংকলন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭০
৩২। বসাক শীলা, বাংলার ব্রতপার্বণ; পুস্তক বিপণি, কলকাতা মে ১৯৯৯ পৃ. ১১৮-১১৯

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

আহমদ ওয়াকিল : বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

ইসলাম মযহারুল : ফোকলোর পরিচিতি ও লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩

ইসলাম শামসুল : ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, লোকলৌকিক প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৮২

করণ সুধীরকুমার : সীমান্ত বাংলার লোকযান, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ বাং ১৪০২

কুমার মদনমোহন (সম্পাদিত) : ভারতকোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা,
১ম খণ্ড, বাং ১৩৭১
২য় খণ্ড বাং ১৩৭৩
৩য় খণ্ড বাং ১৩৭৪
৪র্থ খণ্ড বাং ১৩৭৭
৫ম খণ্ড বাং ১৩৮০

খালেক মুহম্মদ আবদুল : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

গুপ্ত বিভূতিভূষণ : বেড়াল ঠাকুরঝি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৮

গোস্বামী বিজন বিহারী : ঋক্‌বেদ, হরফ প্রকাশনী,কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩

(সম্পাদিত) : অথর্ব বেদ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯২

ঘোষ বিনয় : বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, বাং ১৩৯৩

: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রকাশ ভবন, কলকাতা
১ম খণ্ড, ১৯৮৯
২য় খণ্ড, ১৯৯২
৩য় খণ্ড, ১৯৮০
৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৬

ঘোষ সুবোধ : কিংবদন্তীর দেশে, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬১

চক্রবর্তী তিমিরবরণ : বাঙলা লোকসংস্কৃতি চর্চার আদিযুগ, মায়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪

: বাঙলা লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যযুগ, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২৭ শে মার্চ ২০০২

চক্রবর্তী রজনীকান্ত : গৌড়ের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী, ১৯৯৯

চট্টোপাধ্যায় অঘোরনাথ : মেয়েলি ব্রত (শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), প্যাপিবাস, কলকাতা, ১৯৯৭

চট্টোপাধ্যায় তুষার : লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা, ১৪০১

চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ : লোকায়ত দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, ১৩৬৩

চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার : বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, কলকাতা, ১৯৯৪

চৌধুরী তিতাশ : কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাং ১৩৯০
চৌধুরী দুলাল (সম্পাদিত) : পূর্ব বাংলার লোকসংস্কৃতি, পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার সম্প্রীতি সমিতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১
চৌধুরী মিহির কামিল্যা : আঞ্চলিক দেবতা : লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান ১৯৯২
ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ : বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম রূপা সংস্করণ এপ্রিল ১৯৬২
: বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪০২
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : ইতিহাস, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৯৫
: গল্পগুচ্ছ, বিশ্বভারতী কলকাতা ফাল্গুন, ১৩৯৯
: গ্রামসাহিত্য, বিশ্বভারতী,কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৯৯
: লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৩৯৯
: লিপিকা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, মাঘ, ১৪০১
তর্করত্ন পঞ্চানন (সম্পাদিত) : মনুসংহিতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৯৩
তালুকদার খগেশকিরণ : বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭
দাস ক্ষুদিরাম (সভাপতি) : একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২
দাস গিরীন্দ্রনাথ : বাংলা পীরসাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮
দাস ঘনশ্যাম (সম্পাদিত) : মহাভারতম্, গীতা প্রেস, কলকাতা, ২০১৬ বিক্রমাব্দ
দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন : বাঙ্গলা ভাষার অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা,
১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৭৯
২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৭৯
দে অসিতকৃষ্ণ (সম্পাদিত) : প্রসঙ্গ বাঙালী, অতিথি, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯৩
দে আশিসকুমার ও মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত : লোকভাষা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০০
দে রঞ্জিৎ : ত্রিপুরার লোকসাহিত্যে জনজীবন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জুন ১৯৯৫
দে সুশীলকুমার : বাংলা প্রবাদ, এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, বাং ১৩৯২
দ্যতিয়েন ফাদার (সম্পাদিত) : কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা, শান্তিসদন, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত
পাঠক যোগেশরঞ্জন : লোকসংস্কৃতির দর্পণে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা বইমেলা, ১৪০১
পাল অনিমেষকান্তি : লোকসংস্কৃতি, মেদিনীপুর, ১৯৯৬
পোদ্দার সুস্মিতা : বহির্বিশ্বে লোকসংস্কৃতিচর্চা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮
ফরিদ উদ্দীন মুহম্মদ : কাহিনী কিংবদন্তী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬
বন্দ্যোপাধ্যায় সলিলকুমার : রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪
বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষ : পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৯
বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ : বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য একাদেমি, নিউদিল্লী,
১ম খণ্ড পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮
২য় খণ্ড পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৮

বসাক রাধাগোবিন্দ : কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮১

বসাক শীলা : বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, মে ১৯৯৯

বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ১৯৮৭

বসু প্রসুন (সম্পাদিত) : প্রবাদমালা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ১ম খণ্ড, ১৯৮০, ২য় খণ্ড ১৯৮১

: সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, খণ্ড ১০ নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ১৯৮১

বসু মলয় : বাংলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৮০

বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ ও বন্দ্যোপাধ্যায় সুবীর (সম্পাদিত) : লোকসংস্কৃতি, বিদিশা প্রকাশনী, মেদিনীপুর, ১৯৯৫

বিবেকানন্দ স্বামী : পরিব্রাজক, উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮১

ভট্টাচার্য আশুতোষ : বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালকাটা, বুক হাউস, কলকাতা, ১ম খণ্ড, ১৯৬২, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৬৬

: বাংলার লোকশ্রুতি সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ বাং ১৩৯২

: বাংলার লোকসংস্কৃতি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

ভট্টাচার্য গুরুদাস : বাংলার কাব্যে শিব, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮২

ভট্টাচার্য তরুণদেব : বাঁকুড়া, ফার্মা কে. এস. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

ভট্টাচার্য বামদেব (সম্পাদিত) : শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, জেনারেল লাইব্রেরী, কলকাতা, বাং ১৩৮২

ভৌমিক নির্মলেন্দু : বিহঙ্গচারণা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা ১৯৮৫

: লোকশিল্প ও সাহিত্য : অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৭

মজুমদার আশুতোষ : মেয়েদের ব্রতকথা, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১৯৯২

মজুমদার দিব্যজ্যোতি : বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৩

: লোককথা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্থা, কলকাতা জুন ১৯৯৮

: লোককথার ঐতিহ্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬

মজুমদার মানস : লোক ঐতিহ্যের দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

মজুমদার রমেশচন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস: প্রাচীন যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, অষ্টম সংস্করণ ১৯৮৮

মজুমদার লীলা : বাংলার উপকথা, মনোমোহন প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, বাং ১৩৮৪

মজুমদার সত্যেন্দ্রনাথ : মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি মনীষা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬

মণিরুজ্জামান মোহাম্মদ : ঢাকার লোককাহিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

মল্লিক কুমুদনাথ : নদীয়া কাহিনী, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৮

মাহাতো বঙ্কিমচন্দ্র : ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৪

মিত্র মজুমদার দক্ষিণারঞ্জন	: রচনাসমগ্র, প্রথম ভাগ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, বাং ১৩৮৬
	: 'রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় ভাগ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স', কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৮
	: ঠাকুরদাদার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, বাং ১৩৯৩
মিত্র সতীশচন্দ্র	: যশোর খুলনার ইতিহাস, দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৩ ২য় খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫
মিত্র সনৎকুমার	: রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য; সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, বাং ১৩৭৯
মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত	: বাঘ ও সংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০
মিত্র সুবলচন্দ্র	: সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ ১৯৮৪
মুখোপাধ্যায় আশুতোষ	: ভূতপেত্নী, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯৫
	: রাক্ষস-খোক্কস, মডার্ন বুক এজেন্সী পঞ্চদশ সংস্করণ, কলকাতা, প্রকাশ কাল অনুল্লিখিত
মুখোপাধ্যায় দুর্গাশঙ্কর (সভাপতি)	: একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২
রহমান আন্তোয়ার	: লোককৃতি কথাগুচ্ছ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭
রাব্বী ফজলে (প্রকাশক)	: লোকসাহিত্য, দশম খণ্ড, কিংবদন্তী সংকলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭০
রায় অরুণকুমার	: লোকায়নচর্চার ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৫
রায় নিখিলনাথ	: মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুঁথিপত্র, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারী ১৯৯৬
রায় নীহাররঞ্জন	: বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বাং ১৪০০
রায়চৌধুরী উপেন্দ্রকিশোর	: রচনাবলী, পাত্রজ পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯০
রায় বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র	: পূজাপার্বণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৯০
শাস্ত্রী হরপ্রসাদ	: প্রাচীন বাংলার গৌরব, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৬৩
সরকার পবিত্র	: লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৬
	: লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৭
সিদ্দিকী আশরফ	: আবহমান বাংলা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, মে ১৯৯১
	: লোকসাহিত্য, মল্লিকবাজার, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৯৪, ২য় খণ্ড, ১৯৯৫
	: কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮
সুর অতুল	: বাংলা ও বাঙালী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৩৮৭
সেন দীনেশচন্দ্র	: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১
	: বাংলার পুরনারী, দি ন্যাশনাল লিটারেচার অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯
	: বৃহৎ বঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, দে'জ সংস্করণ ১৯৯৩

সেন প্রলয় : পশ্চিমবাংলার তীর্থ, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বাং ১৩৮৫

সেন সুকুমার : গল্পের গাঁটছড়া, সাহিত্যম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বাং ১৩৯২

: গল্পের ভূত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৯

: প্রাচীন বাংলা ও বাঙলী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৩

: মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪০৩

: বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা, আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৩

সেনগুপ্ত পল্লব : লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি (সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫

: পূজা পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯০

: লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র (সম্পাদিত) : সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, শিশু সাহিত্য ,সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৪

হাফিজ আব্দুল : লোককাহিনীর দিক্‌দিগন্ত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৬

হোসেন মুহম্মদ আয়ুব : বাংলার লোককথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০৮ হিজরী

হোসেন সেলিনা ও হোসেন মোবারক সম্পাদিত : বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান, সংকলন ৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭-৯৮

হোসেন হোসেনউদ্দীন : যশোর জেলার কিংবদন্তী, বুক সোসাইটী ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭৪

ইংরেজি

Banerjee Kasindranath : Popular Tales of Bengal, Calcutta 1905

Bhattacharya Asutosh : The Sun and The Serpant Lore of Bengal, Firma K.L.M. Private Limited, Calcutta, 1977

Bodding P. O. : Santal Folk Tales, Oslo, 1925

Bompass Cecil Henry : Folklore of The Santal Parganas, Ajay Book Service, New Delhi, 1981

Chowdhury Kabir : Folktales of Bangladesh Bangla Academy, Dacca, 1972

Clarke Kenneth and Mary : Introducing Folklore, USA, 1965

Dalton Edward Tuite 1960 : Descriptive Ethnology of Bengal, Indian Studies, Past and Present, Calcutta Reprint.

De S. K : Bengali Literature in the Nineteenth Century, C.U. Calcutta, 1919

Dey Lal Behari : Folktales of Bengal Uccharan, Calcutta, 1993

Dorson R.M 1961 : Folklore Research Around the World, Indiana University Press. Bloomington, USA.

Fowler and Fowler (Ed): The Pocket Oxford Dictionary, Oxford University Press, 1955

Frazer James George : The Golden Bough, Macmillan and Co. London, 1957

Gorkey Maxim : On Literature, Moscow, No date

Gove. Phillip B. (Ed) : Webster's Seventh New Collegiate Dictionary, Scientific Book Agency, Calcutta, April 1971

Herskovits Melville J. Indian : Cultural Anthropology, Oxford and IBH Publishing Co. PV LTD. New Delhi, Second Reprint 1974

Hunter Devid E. and Whiten Philip (Ed) : Encyclopaedia of Anthropology USA, 1976

Islam Mazharul : Social Change and Folklore, Rabindra Bharati Society, Calcutta First Publication 1985

: A History of Folktale, Collection in India, Bangladesh and Pakistan, Panchali Prakashan, Calcutta, Second Indian Reprint 1974

Leach Maria (Ed) : Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Funk and Wagnalls, new York, Vol-I 1949, Vol-II, 1950

Majumdar R. C : History of Ancient Bengal, G. Bharadwaj and Co. Calcutta Reprint 1974

Malinowski B. : Magic Science and Religion and other essays. Doubleday and Company, New York, 1948

Mcculloch William : Bengali Household Tales, Heddar and Sloughten, London, 1912

Risley Herbert Hope : Tribes and Castes of Bengal. Firma Mukhopadhyay, Calcutta, Reprint 1981

Sarkar Jadunath : The History of Bengal, Vol-II, University of Dacca, Third Impression August 1976

Sen Dinesh Chandra : The Folk Literature of Bengal, University of Calcutta, Calcutta, 1920

Sokolov Y. M : Russian Folklore, USA, 1950

Sur A. K. : Folk Life of Bengal, Best Books, Calcutta, First Edition 1999

Tagore Rabindranath : Creative Unity, Macmillan India Limited, Madras, 1988.

Thompson Stith : The Folktale, University of California Press. Reprint, 1977.

পত্র পত্রিকা

বাংলা

অনুষ্টুপ : শারদ-সংখ্যা ১৯৯৬

এক্ষণ : চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বাং ১৩৭২

ঐতিহাসিক : তৃতীয় বর্ষ,৩-৪ সংখ্যা, জুলাই ১৯৮১

কৌশিকী : তৃতীয় বার্ষিক বিশেষ রোমন্থন সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭

গাণ্ডীব : সপ্তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯০
ছত্রাক : নববর্ষ সংখ্যা, বাং ১৩৯০
পশ্চিমবঙ্গ : অবনীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
প্রতিভা : ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৮
লোকলৌকিক : প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বাং ১৩৮৪
লোকশ্রুতি : পঞ্চম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৯
: ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ ১৯৯০
: দশম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৩
: একাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৪
: দ্বাদশ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬
লোকসংস্কৃতি গবেষণা : প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৯৫
: প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ- চৈত্র, ১৩৯৫
: দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯৬
: তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৯৭
: পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়,১৩৯৯
: পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক- পৌষ, ১৩৯৯
: ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ- চৈত্র ১৪০০
: সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০১
: অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০২
: একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ, ১৪০৫

ইংরেজি
Bangla Academy Journal: Vol. VII, January 1979- December 1980
Dacca
Indian Antiquiry : Vol. I, 1872
: Vol. II, 1873
: Vol. III, 1874
: Vol. IV, 1875
: Vol. IX, 1880
Man in India : Vol. XXIII, 1943
Visva Bharati Quarterly : Vol. I, 1935

নির্ঘন্ট